বিশ্বভারতী
পত্রিকা
সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রাবণ ১৩৫৩—আষাঢ় ১৩৫৪

উষসী
অভিজাত প্রসাধন-রেণু
লুপ্ত ও সুপ্ত
দেহ-সৌন্দর্যকে
জাগ্রত করে
শিশুর কোমল অঙ্গেও
নির্ভয়ে ব্যবহার চলে
USASI
BENGAL CHEMICAL
বেঙ্গল কেমিক্যাল • কলিকাতা • বোম্বাই

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৩—আষাঢ় ১৩৫৪

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা-সূচী

চিত্রসূচী

মহিষাসুরমর্দিনী

বাঁকুড়া

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

দেশ। পঞ্চম সওয়ারি

আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি!
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে!
গাহিবারে স্বর ভুলে গেছি রে!

[১৩০২]

২

বারোয়াঁ মুলতান

বঁধু, মিছে রাগ কোরো না!
মন বুঝে দেখো মনে মনে, সখা—
মনে রেখো, কোরো করুণা।

পাছে আপনারে রাখিতে না পারি
তাই কাছে কাছে থাকি আপনারি-
মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই,
সে আমার নহে ছলনা।
বঁধু, মিছে রাগ কোরো না!

দিনেকের দেখা তিলেকের সুখ,
ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ,

পলকের পরে থাকে বুক ভ'রে
চিরজনমের বেদনা !

তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি !
অবুঝ আঁধারে কেন মরি কাঁদি !
দূর হতে এসে ফিরে যাই শেষে
বহিয়া বিফল বাসনা !
বঁধু, মিছে রাগ কোরো না ।

পতিসর
১০ আশ্বিন [১৩০৪]

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সংগ্রহে একখানি 'গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা' গ্রন্থ আছে, তাহার পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে তিনটি গান কোনো রবীন্দ্র-গীতিসংগ্রহপুস্তকে লক্ষ্যগোচর হয় নাই ; তাহার দুইটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল, অবশিষ্ট গানটি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সমীরচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্র-রচনার একটি খাতা আমাদের দেখিতে দিয়াছেন, তাহাতেও এই গান তিনটি আছে ; রচনাকাল ও স্বরনির্দেশ ঐ খাতায় পাওয়া গিয়াছে।

স্কেচ । শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

৮

পতিসর। ২৮শে নবেম্বর (?) [১৮৯৫]

একটা কোন লেখায় হাত দেব দেব করচি কিন্তু এখনও কিছুতেই মনটাকে কাজে নিবিষ্ট করতে পারচিনে— এই সুগভীর ঔদাসীন্য দূর করতে কতদিন যাবে জানিনে, আবার ততদিনে হয়ত কলকাতায় ফেরবার সময় এসে পড়বে— মনে হচ্চে যেন অনেকদিন হল মফস্বলে এসেছি এবং এতদিন অবিচ্ছেদে অকর্ম্মণ্যভাবে কাটিয়েছি— যদি গান তৈরি করবার সেই ঝোঁকটা থাকৃত তাহলে অবিশ্রাম গুন্ গুন্ শব্দে দিনগুলো উন্মত্তভাবে চলে যেত, সঙ্গীতের নেশায় অচেতনভাবে বেলা কাটিয়ে দিতুম। সম্প্রতি জমিদারী কাজ দেখচি, খবরের কাগজ পড়চি, বই পড়চি এবং আহার করচি। কোনমতে ঘাড় ধরে নিজেকে একবার লেখার স্রোতের মাঝখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আমি আর জগৎসংসারকে কেয়ার করিনে— তখন আমার জগৎ আমার নিজেরই জগৎ— সেখানে আমি একমাত্র রাজা— সেখানে আমি সমস্ত সুখদুঃখ সৌন্দর্য্যের বিধাতাপুরুষ। আমি কতদিনেরই বা, আমার সুখদুঃখ কতক্ষণই বা থাকবে— কিন্তু আইডিয়ার প্রবাহ অনাদি উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শত সহস্র মনের মধ্যে দিয়ে অনন্তকালের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ; সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ্য, আমি রবি নামক ব্যক্তিবিশেষ নই—সেখানে আমার আনন্দ এবং বেদনা বিশ্বব্যাপী। দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ভাবরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, চঞ্চলা লক্ষ্মীর চেয়ে ঢের বেশী চঞ্চলা,—আমি যখন তাঁকে চাই তখন তিনি সব সময়ে দেখা দেন না, কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর আমার একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করবার যো নেই—তখন দুনিয়ার সমস্ত জরুরী কাজ ফেলে দিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে হাজির হতে হয়। কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত সংঘর্ষে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, সুদূর নির্জ্জনে আমার জন্যে আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন,—যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং আমার ভাবলক্ষ্মী সুদূরতর নির্জ্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন; একদিন সন্ধ্যাবেলায় হয়ত নক্ষত্রালোকে বোটের ছাতের উপর আমার পিছনে নিঃশব্দপদে এসে দাঁড়াবেন এবং আমার কাঁধের উপর তাঁর কোমল হস্তখানি ধীরে ধীরে স্থাপিত করবেন—এবং আমি আস্তে আস্তে মুখ তুলে অনন্ত মৌন আকাশের মধ্যে তাঁর সেই মৌন মুখখানি দেখতে পাব—এবং তার পরে আমার আর কোন অসম্পূর্ণতা থাকবে না।

পতিসর। ২৯শে নবেম্বর। [১৮৯৫]

কালিগ্রাম জায়গাটির কথা অবশ্য আমার অনেক চিঠিতে অনেকবার পেয়েছিস তার আর সন্দেহ নেই—কিন্তু তবু পুনরুক্তি না করলে চিঠিপত্র লেখা চলে না—এবং হয়ত ঠিক পুনরুক্তি হবে না—কারণ

পুরাতন জিনিষও আমাকে নূতন করে আঘাত করে ; আমার চিরপরিচিত প্রিয় পদার্থগুলির সঙ্গে প্রত্যেক পুনর্ম্মিলনের মধ্যে একটা অংশ থাকে যেটা প্রথম মিলন—প্রত্যেক বারেই একটা নূতন বিস্ময় কোথা থেকে আবির্ভূত হয়। কালিগ্রাম স্থানটি ঠিক আমার প্রিয় পদার্থের মধ্যে নয়—কিন্তু তবু এখানে একবার এসে উপস্থিত হলে এর পুরাতন মুখশ্রী আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে। এই অতি ছোট নদী এবং নিতান্ত ঘোরো রকমের বহিঃপ্রকৃতি আমার কাছে বেশ লাগচে। ঐ অদূরেই নদী বেঁকে গিয়েছে—ওখানটিতে একটি ছোট গ্রাম এবং গুটিকতক গাছ—এক তীরে পরিপক্কপ্রায় ধানের ক্ষেত—নদীর উঁচু পাড়ের উপর পাঁচ ছটি গোরু ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচ্‌মচ্‌ শব্দে ঘাস খাচ্চে—অন্য তীরে শূন্য মাঠ ধূ ধূ করচে—নদীর জলে শ্যাওলা ভাস্‌চে—মাঝে মাঝে জেলেদের বাঁশ পোঁতা, বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখী ছবির মত স্থির হয়ে বসে রয়েছে—আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রে এক পাল চিল উড়চে। তুপুরবেলা—সামনে গয়লাদের বাড়ির কাছে একখণ্ড শর্ষের ক্ষেতে বিকশিত শর্ষে ফুল একেবারে যেন আগুন করে রয়েছে—তাদের বাড়ির মেয়েরা জল তুলে নিয়ে গোরুর জাব্‌না দিচ্চে ; মাটি দিয়ে নিকোনো আঙ্গিনায় বাঁধা গোরু গামলার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্চে—খড় স্তূপাকার করা রয়েছে—গয়লাদের বাড়ির কাছে আমাদের কাছারির একটা পুষ্করিণী খনন হচ্চে—রঙিন কাপড় পরা হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি করে মাটি নিয়ে একটা ডোবার মধ্যে ফেলে যাচ্চে। এখানে সমস্তই খুব কাছাকাছি। নদীটির এদিকে ওদিকে তুদিকেই বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ ঝিলের মত দেখতে—এই ঝিলের তুই প্রান্তে তুটিমাত্র গ্রাম—আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে তুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের দ্বারা বেষ্টিত—এই আমার সমস্ত জগৎ। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চে, স্নান করচে, কাপড় কাচচে, ছোট ডোঙ্গায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোট নদী পার হচ্চে, অপরাহ্নে গৃহভিত্তির যে দিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে তুই একটি কর্ম্মহীন মেয়ে সম্মুখ জগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্চে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুঁটুলি হাতে বাড়ি ফিরচে—সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বালচে, গোয়ালে ধোঁয়া দিচ্চে,—তুটি গ্রাম তুটি নীড়ের মত নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্চে—আমি খড়খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্ত্তিকাহিনী অধ্যয়ন করচি। কোথায় নাগর নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি—আর কোথায় বিচিত্রকর্ম্মসঙ্কুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে !

সাহাজাদপুর। ১৯শে অগ্রহায়ণ। [১৩০২। ১৮৯৫]

সকাল থেকে অত্যন্ত একটা পুরাতন কথা ক্রমাগতই মনে উদয় হচ্চে, যে, সংসারটা অনিত্য। কিন্তু তবু শোক তুঃখ মৃত্যু এমনভাবে আমাদের আঘাত করে, যেন সংসারটা নিত্য। সমস্ত মরীচিকা হোক্ মায়া হোক্ যাই হোক্, তবু ত বিধবা স্ত্রীকে আপন শিশুসন্তানগুলিকে মানুষ করে তুলতে হবে—বেদান্তদর্শনে ত মায়ের মন থেকে স্নেহকে উড়িয়ে দিতে পারে না ! মৃত্যু যতই অপ্রতিহত ক্ষমতাবান্ হোক্, ভালবাসার বন্ধন ত কম প্রবল নয়—অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও স্থির নিশ্চয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন ? আমি বসে বসে কল্পনাকে আর একশো বৎসর পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের মধ্যে প্রেরণ করছিলুম—ভাবছিলুম একশো বৎসরের আগের দিন, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটা ঠিক আমাদের আজকের দিনের মত এইরকম প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান ছিল—এইরকম শীত, এইরকম রৌদ্র, এইরকম জনকোলাহল—কিন্তু আজকের সকালে

সেই সকালের ছায়ামাত্রও নেই—তখনকার দিনেও কত উৎসব কত শোক, কত জন্মমৃত্যু, কত হাসিকান্না জাজ্বল্যমান সত্যরূপে দেখা দিয়েছিল—আবার ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে একদিন ১৯শে অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটি ঠিক যথাসময়ে জগৎ সংসারের উপর প্রকাশিত হবে—এইরকম শিশিরসিক্ত ঘাস, এইরকম শীতের হাওয়া, এইরকম মৃদু রৌদ্র—কিন্তু সেদিন জ্ঞা···র মৃত্যু তার অনাথা বিধবা এবং পিতৃহীন সন্তানদের কঠোরতম শোকদুঃখের ছায়ামাত্র স্মৃতিমাত্র থাকবে না—এবং আমিও একশো বৎসর আগের দিনে সকালে সম্পূর্ণ সজীব সত্য আকারে নিজেকে অসীম জগৎ ও অনাদিকালের কেন্দ্রবর্ত্তী জ্ঞান করে আমার আত্মীয় বান্ধব ও প্রিয় পরিজনদের মধ্যে নিজেকে চিরপ্রতিষ্ঠিত অনুভব করছিলুম, সেদিন সকালের সমস্ত জাগ্রত মানবহৃদয়ের স্মৃতির মধ্যে আমার রেখামাত্র কোথায় থাকবে! আমার সেদিন শোক নেই, বাসনা নেই পরিতাপ নেই—অথচ এই পৃথিবী এবং এই আকাশ আছে।

জলপথে। শনিবার। [ডিসেম্বর ১৮৯৫]

বোট আজ ভোরের বেলায় ছেড়ে দেওয়া গেছে—সঙ্কীর্ণ নদী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে এসে পড়েছি। উজ্জ্বল রৌদ্র এবং কন্‌কনে শীতের হাওয়াটা বেশ লাগচে—সকাল বেলাকার ফুলের মত শিশিরোজ্জ্বল জগৎটি আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাচ্চে—অনেকদিন পরে পতিসরের সেই ছোট নদীগহ্বরটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমার মন আজকে তার সমস্ত ডানা আকাশে মেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি যেন এই স্নিগ্ধ নির্ম্মল রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি। এ জায়গাটাও অপূর্ব্ব রকমের। স্থলে জলে, সংলগ্ন যমজ ভাই-বোনের মতন—উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই—জলস্থল সমতল—খানিকটা ইস্পাতের মত রৌদ্রে ঝিক্ ঝিক্ করচে, আবার খানিকটা নানাপ্রকার শ্যাওলায় ঘাসে উদ্ভিদমিশ্র মাটির স্তরে সবুজ হয়ে আছে—শাদা থেকে পাট্‌কিলে পর্য্যন্ত নানা জাতের বক্ ও চিল্ উড়ে বেড়াচ্চে—পানকৌড়ি তার চিক্‌চিকে কালো লম্বা গ্রীবাটি নিয়ে একবার করে জলে ডুব মারচে এবং তার পরে বুক ফুলিয়ে অবলীলাগতিতে ভেসে বেড়াচ্চে—বাঁশের উপরে জেলেদের জাল খাটানো রয়েছে—তারি উপর যত লম্বচঞ্চু মাছরাঙার আড্ডা। দেখতে দেখতে কোথায় এক জায়গায় দুই ধারের ডাঙ্গা উঁচু হয়ে উঠল—জলে স্থলে ভাগ হয়ে গেল—মাঝখানে নদী, দুইধারে তীর—তীরে অঘ্রান মাসের হল্‌দে ধানের ক্ষেত—উঁচু পাড়ের উপর একমনে ঘাড় হেঁট করে গোরু চরচে, এবং তাদেরই মুখের গ্রাসের কাছাকাছি শালিখ পাখী নৃত্য করতে করতে কীটশিকারে প্রবৃত্ত—দ্বীপের মত এক এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর গুটিকতক কলাগাছ এবং কুলগাছের মধ্যে কুষ্মাণ্ডলতায় সমাকীর্ণ গুটি দুই তিন খোড়ো ঘর—তারই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ শিশু এবং কৌতূহলী বধূগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার বোট নিরীক্ষণ করচে—শাদাকালো রঙের পাতিহাঁস জলের ধারে দল বেঁধে ঠোঁটের খোঁচা দিয়ে শশব্যস্তে পিঠের পালকগুলি পরিষ্কার করচে—দূরে বাঁশঝাড় এবং ঘনতরুশ্রেণী দিগন্ত অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে—খানিকটা দূর দুই ধারে শূন্য মাঠ—আবার হঠাৎ এক জায়গায় ছেলেদের চেঁচামেচি, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যালাপ, শোকাতুরা প্রৌঢ়ার বিলাপধ্বনি, কাপড় কাচার ছপ্‌ছপ্, স্নানাভিহত জলের ছল্‌ছল্ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়া গ্রামের ধারে একটি ঘাট এসেছে—গোটা দুয়েক নৌকো বাঁধা আছে এবং অনিচ্ছুক রোরুদ্যমান ছেলের নড়া ধরে তার মা জোর করে স্নান করাচ্চে।

সাহাজাদপুর পথে। [ডিসেম্বর ১৮৯৫]

ওরে বাস্‌রে! কি তুমুল ব্যাপার! এইমাত্র কাঁচিকাটা পার হওয়া গেল—একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল। এ জায়গাটা একটা সঙ্কীর্ণ খালের মত, আঁকাবাঁকা—এইটুকুর ভিতর দিয়ে বিপুল জলস্রোত ফেনিয়ে ফুলে একেবারে যেন ঝরণার মত ঝরে পড়চে—ক্রুদ্ধ জল সমস্ত বোটটাকে একেবারে কেড়ে ছিঁড়ে ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে চলে—বিদ্যুতের মত ছুটে যায়, কি হল কি হচ্চে কিছু বোঝবার অবসর পাওয়া যায় না—মাঝিমাল্লার মধ্যে একটা কেবল হৈ হৈ হাঁ হাঁ রব ওঠে,—জল কল্‌কল্ গল্‌গল্ করতে থাকে—বুকের মধ্যে প্রাণটা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে থাকে—তারপরে মিনিট দশেকের মধ্যে সঙ্কটের জায়গা উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদের ক্রোড়ের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়তে হয়। কালিগ্রামের বিলগুলো ছাড়িয়ে এবারে নদীর মধ্যে এসেছি। এখন আঁকাবাঁকা উঁচু পাড়ের মাঝখান দিয়ে দুই তীরে পাকা ধান এবং বিকশিত শর্ষে ক্ষেতের প্রান্ত দিয়ে অনুকূল স্রোতে হুহুঃশব্দে চলে যাবো। এই শর্ষে ক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভারি মুগ্ধ করে—আমার মনে কি একটা ছবি এবং সৌন্দর্য্যের আবেশ আনয়ন করে—যেন অনেক দিনের দেখা একটা রৌদ্ররঞ্জিত মাঠ, শীতল স্নিগ্ধ বাতাস, পুষ্করিণীর ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘট-কক্ষ অবগুণ্ঠিত বধূ এবং সেই সঙ্গে ঐ শর্ষেক্ষেতের মৃদু সুগন্ধে অনুপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্ম্মল আকাশ মনে পড়ে—যেন কোন এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির সুগভীর সুখস্মৃতি ঐ শর্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে।

শিলাইদহ জলপথে। [ডিসেম্বর ১৮৯৫]

কাল থেকে জলপথেই আছি। আশা ছিল আজ শিলাইদহে পৌঁছব কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখচিনে। সেজন্যে দুঃখ করতে চাইনে—পথের মধ্যে যেক'টা দিন পাওয়া যায় সেই কদিন আমার পক্ষে অবিমিশ্র ছুটি—স্বেচ্ছাকৃত চিন্তা এবং কাজ ছাড়া কোন কর্ত্তব্যই নেই—দুই জানলা দিয়ে চেয়ে দেখচি, পড়চি এবং লিখচি—চারিদিকে ধূসর চর এবং ঈষৎ নীল জল, দূরে সবুজ গ্রাম এবং ঊর্দ্ধে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে দুচার জায়গায় আশঙ্কার স্পর্শও পাওয়া গিয়েছিল—শীতে পদ্মার জল কমে আসচে কিনা, সেই জন্যে সঙ্কীর্ণ প্রবাহ স্থানে স্থানে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করেছে—জল যেন ইস্পাতের করাতের মত বোটের তলাটা থর্‌থর্ শব্দে কাটতে কাটতে চলেছে—সেই তীব্রগতি জলের দিকে চেয়ে দেখলে চোখের ত্বকে যেন আঘাত লাগতে থাকে। সমস্ত দিন আমার খসড়া কবিতার খাতাটা খুলে পেন্সিল হাতে যখন তখন দুচার লাইন করে লিখচি, এবং তারপরে অলসভাবে কোন একটা দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল—উঠে কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বেলে উর্ব্বশী নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেল্লুম—যখন সাড়ে সাতটা তখন স্নান করতে গেলুম—এম্‌নি করে এই দুদিনে দুটি বেশ বড়সড় রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি। সমস্ত দিন খোলা আকাশ এবং অজস্র আলোকের মধ্যে এইরকম অবিশ্রাম অখণ্ড অবসর পেলে, তবে, প্রকৃতি যেরকম করে তার ফুল ফোটায় এবং ফল পাকায়, সেইরকম করে সমস্ত রং ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়—নইলে ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদা একটা তাড়া থাকে—ইচ্ছাক্রমে এবং অনিচ্ছাক্রমে মন এমন সকল পথ এবং বিপথে ধাবিত ও তাড়িত হয় যেখানে কল্পনার সহায়কারী কিছুই নেই। তাই এক একবার মনে করি, বোটে করে যদি মাসখানেক মাস দেড়েকের মত একেবারে পশ্চিমে চলে যাই—বাড়ির সমস্ত খবর এবং কাজকর্ম্মের সমস্ত আলোচনা থেকে নিজেকে

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিই—বিস্মৃতি এবং বিরামের মধ্যে, সুদূরে উড্ডীয়মান পাখীর মত একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাই, তাহলে প্রভূত অবসরের মধ্যে কতকগুলো লেখা শেষ করে আসতে পারি। লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্ত্তব্য আমার আর কিছুই নেই। আমার অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি—যখন সেটা পালন করি তখন সুখদুঃখ সমস্তই লঘু হয়ে আসে—যখন না করি তখন সুখদুঃখের দল একপাল ডালকুত্তার মত একেবারে কণ্ঠ চেপে ধরতে আসে—মানুষের উপর এ এক বিষম জুলুম !

শিলাইদহ। ১৪ই ডিসেম্বর। [১৮৯৫]

আজকাল আমি আমার লেখা এবং আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্‌সের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি। পাছে একদমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেইজন্যে রেখে রেখে রয়ে রয়ে পড়ি—পড়তে বেশ লাগে। আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড় কবি থাকতে পারে অমন মনের মত কবি আর নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা অল্পদিন বেঁচে ছিল, এবং অল্পই লিখতে সময় পেয়েছিল।··· কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে—ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে—যেটি তৈরি করে তুলেছে, সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ির যোগ আছে—টেনিসন্ সুইন্‌বর্ণ্ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা ভাব আছে—তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য্য আছে—কিন্তু কবির অন্তর্য্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের "মড্" কবিতায় যে সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং সুতীব্র হৃদয়বৃত্তিদ্বারা উজ্জ্বলরূপে পরিপূর্ণ বটে—কিন্তু তবু মিসেস্ ব্রাউনিংয়ের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গরূপে সত্য—টেনিসনের অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট্ তার উপর নিজের রঙীন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে; কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারি আকর্ষণ করে—কীট্‌সের লেখা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়, এবং তার প্রায় কোন কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্য্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয়নি, কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কীট্‌সের জীবনচরিতটি তোকে পড়তে দেব। ওর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জীবনটি বড় সকরুণ।

শিলাইদহ। ১৫ই ডিসেম্বর। [১৮৯৫]

দিনটা এইরকম কাটে। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড় টেনে ওপারে চরে গিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। ওপার থেকে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ নদী এবং পরপারের গাছপালার উপর সন্ধ্যাবেলাটি যে কি অপরূপ সুন্দর তা অনেকবার বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে বর্ণনার অতীত—সেই সৌন্দর্য্য এবং শান্তি দূরে থেকে কল্পনা করাই যায় না—কলকাতায় গিয়ে আমিই হয়ত ঠিক মনে আনতে পারব না। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসচি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের

এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমন্ কল্যাণে আলাপ শোনা গেল—সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল—ইতিপূর্ব্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই—যেই পূরবীর তান বেজে উঠল, অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি—সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হল না—আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল। বোটে ফিরে এসে অনেকদিন পরে আবার একবার হার্ম্মোনিয়মটা নিয়ে বসলুম—একে একে নতুন তৈরি করা অনেকগুলো গান নীচু সুরে আস্তে আস্তে গেয়ে গেলুম—ইচ্ছে হল আবার কতকগুলো গান তৈরি করে ফেলি—কিন্তু সে আর হয়ে উঠচে না।

বাউল। শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীযুক্ত এ. পেরুমলের সৌজন্যে
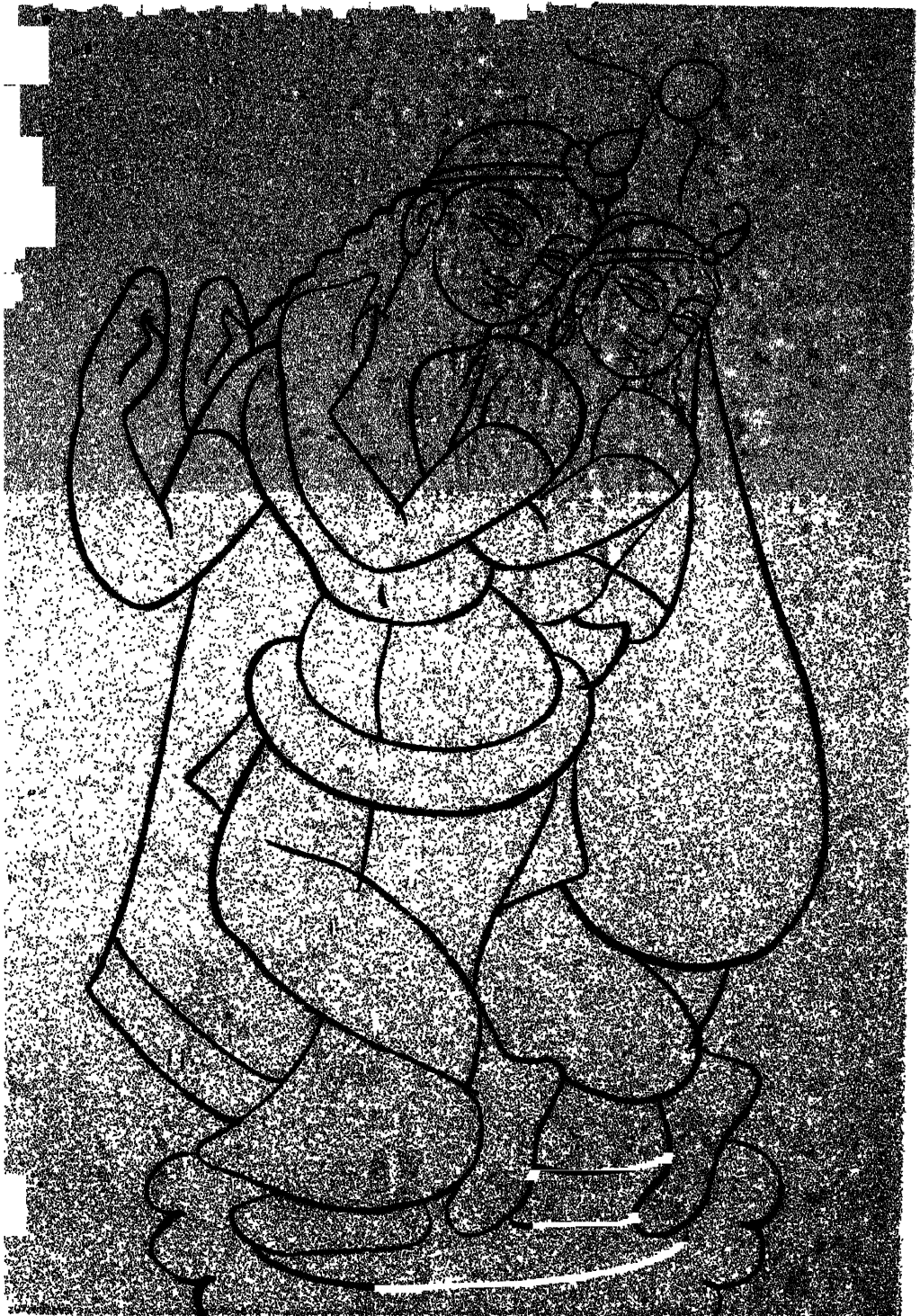
কৃষ্ণ-রাধিকা

কালীঘাটের পট

জাতিভেদ-প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

যখন বর্ণাশ্রমধর্ম প্রবর্তিত হয় তখন তাহার সঙ্গে একটা খুব উচ্চ সামাজিক আদর্শও লোকনেতাদের মনে থাকার কথা ছিল। তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণের স্থান যেমন দিলেন উচ্চে তেমন তাহার দায়িত্বও দিলেন অপরিসীম। সকলে যদি ব্রাহ্মণকে মানে তবে সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীর জ্ঞান, উচ্চ আদর্শ, কঠোর তপস্যার সমন্বয় করিয়া সমস্ত সমাজকে তপস্বী ব্রাহ্মণেরা অতি সহজে অল্প ব্যয়ে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। ইহা খুবই বড় কথা। তাই তখনকার দিনে আদর্শরক্ষার অর্থ ই ছিল ব্রাহ্মণকে রক্ষা। ব্রাহ্মণরক্ষার্থ তখন সর্বত্র সেইজন্য এত ব্যাকুলতা। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে ব্রাহ্মণের নিত্যযোগ না থাকিলে তো এই ব্রাহ্মণরক্ষার কোনো অর্থ হয় না। ইতিহাসের কাছেই প্রশ্ন করিতে হয় এই আদর্শ কি পরে বজায় থাকিল? শ্রদ্ধা ও সম্মান যেখানে সুলভ এবং বিনা তপস্যাতেও তাহা যেখানে লভ্য, সেখানে মানুষ ধীরে ধীরে কি আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া পারে? তখন দিনে-দিনে তপস্যা ও আদর্শ শক্তিহীন নির্বীর্য হইয়া যায়। সাত্ত্বিকতা এমন কি রাজসিকতার স্থানেও অচল হইয়া বিরাজ করিতে থাকে জড় তামসিকতা। এমন করিয়াই তো ক্রমে তপোভূমিগুলি পরিণত হইল তীর্থে ও মঠে, আচার্য ও তপস্বীরা পরিণত হইলেন পাণ্ডায় ও মহন্তে।

আজ যাঁহারা সেই স্থান অধিকার করিয়া সমাজকে পথ দেখাইবেন তাঁহারা সরল অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন ছাড়িয়া বড় বড় চাকুরি ও জঘন্য সব ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এমন অবস্থায় পুরাতন সম্মানের লোভ পরিত্যাগ না করিলে চলিবে কেন? দুই দিকেরই সুবিধা কি একসঙ্গে দাবি করা যায়? হয় তপস্বিজনোচিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠা উপার্জন করুন না হয় তো এখনকার দিনের আরাম ও ঐশ্বর্য মনের সুখে সম্ভোগ করুন। একসঙ্গে দুই দিকেই লোভ যেন কেহ না করেন।

শাস্ত্র কিন্তু জোরের সহিতই বলেন যে ব্রাহ্মণের আদর্শ উচ্চ ও মহান থাকা চাই, সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণও আর ব্রাহ্মণ থাকেন না। তাই স্কন্দপুরাণ বলেন: যে ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে থাকিয়া বেদ বিক্রয় করে সে পতিত (প্রভাস খণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ২০৭ অধ্যায় ২২, ২৭)। সদাচারহীন ব্রাহ্মণও শূদ্র (ঐ ২৮-৩২)। হীনবৃত্তি দ্বারা বা সুদ খাইয়া যে ব্রাহ্মণ বাঁচে সে শূদ্র (ঐ, ৩৩), দুর্নীতিপরায়ণ (ঐ ৩৪) ব্রাহ্মণও শূদ্র। সুদ খাইলে ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য হয়, তবে আপৎকালে যদি কেহ এই বৃত্তি লইতে বাধ্য হয় তবে স্নান করিলে তখনকার মত মাত্র সে স্পৃশ্য হয় (ঐ ৫৯)। বেদবিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকর্মান্বিত হইলেও শূদ্রমাত্র (সৌরপুরাণ, ১৭ অ, ৩৭)। তাহার পুত্র বেদাধ্যায়ী হইলেও সে শূদ্রপুত্র বলিয়া গ্রহীতব্য (ঐ, ২৭, ৩৯)। শুধু বেদ পড়িলে হইবে না। বেদ পড়িয়াও বিচার পূর্বক যে ব্রাহ্মণ তাহার তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম সে শূদ্রকল্প এবং অপাত্র (পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ২৬, ১৩৫)।

তখনকার যুগে যাঁহারা লোকমতকে চালনা করিতে চাহিতেছিলেন তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে যে মহৎ আদর্শ ছিল সেই আদর্শটি যাহাতে সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলে এই ছিল তাঁহাদের অভিপ্রায়। তাই বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে মানবমাত্রেরই সার্থকতা ও পরমকল্যাণ-সাধন

তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আদর্শ ও উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ থাকে সেখানেই মানুষের বিচারবুদ্ধিও জাগ্রত থাকে। যেখানে কোনো আদর্শ বা লক্ষ্যই নাই সেখানে আবার বিচার কিসের? তাই সেই যুগেও জাতিভেদের দ্বারা তখনকার দিনের মানবজীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য যখন সফল হয় নাই তখন সেই যুগেই তীব্রভাবে ইহার বিরুদ্ধে বিচারবাণীও উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার দিনে এই সব বালাই নাই। এখন আদর্শ বা উদ্দেশ্য কোথায়? এখনকার দিনে বিচারই বা হইবে কিসের? প্রাচীন কালের তুলনায় আমাদের চিত্ত এইসব বিষয়ে একেবারে তামসিকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তবু মাঝে মাঝে এক-আধবার মনে বিচারবুদ্ধি যদি জাগে পরক্ষণেই চারিদিকের তামসিক অবস্থার মধ্যে তাহা বিলীন হয়।

এইসব বিচার-বিতর্ক যে শিক্ষিত কাহারও কাহারও মনে আজকালই উঠিতেছে তাহা নহে। আউল-বাউলরা বহুদিন হইতে এই বিষয়ে সকলকে সচেতন করিতেছেন। কবীর রবিদাস তুকারাম নানক দাদূ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সব বিষয়ে বারবার তাঁহাদের তীব্র বাণী ব্যবহার করিয়াছেন। জাতিভেদ জিনিসটা দক্ষিণ-ভারতেই সর্বাপেক্ষা প্রবল: তাই দক্ষিণ দেশের তামিল ও তেলেগু কবিদের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র ঘোষণা দেখা যায়।

তামিলদেশে অগস্ত্যলিখিত বলিয়া প্রথিত তামিল গ্রন্থে আছে, "সহজ অন্নসংস্থানের জন্য জাতিভেদ মানুষেরই রচিত ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণপোষণের জন্যই বেদ রচিত।" তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য বলেন, "জন্ম মৃত্যু সবারই সমান। কোথাও ভেদ নাই।" সূক্ষ্মবেদান্ত গ্রন্থেও একই কথা: "যেদিন হইতে নারীরা শূদ্র হইলেন, সেদিন হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রা নারীর গর্ভে জাত সবাই পারশব। ব্রাহ্মণকন্যা হইলে হইবে কি, নারীমাত্রই যে শূদ্র। তার পর পারশবের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে সন্তান তার আবার জাতি কি? এই অনন্তপরম্পরায় যে-সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ জাত তাদের আবার কিসের ব্রাহ্মণত্ব?"

তেলেগু কবি বেমন বলেন, "জন্মকালে কোথায় গায়ত্রী কোথায় উপবীত? সূত্রহীনা মাতা শূদ্রা। তার পুত্র আবার কেমনে হয় ব্রাহ্মণ? সবাই সমান, সবাই ভাই। সবারই জন্ম একভাবে, একই রক্তমাংসে সবার শরীর। তবে কেন এত ভেদ-বিভেদ? ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মত সকলে এক হইয়া কেন রহ না?"[১]

বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বসব ও রময়্য উভয়েই সবলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। জৈন ও বৌদ্ধগণও এই প্রথাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। মহাভারতে দেখি রাজা যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "সত্য দান ক্ষমাশীলতা আনৃশংস্য তপ দয়া যে ব্যক্তিতে লক্ষিত হয় সে-ই ব্রাহ্মণ" (বনপর্ব, ১৮০, ২১)। "শূদ্রবংশ হইলেই কেহ কিছু শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণবংশ হইলেই কিছু ব্রাহ্মণ হয় না; যাঁহাতে এই সব সদ্‌বৃত্ত লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ, তাহা না থাকিলে তিনি শূদ্র" (ঐ ১৮০, ২৫-২৬)। মহাভারত-শান্তিপর্বে ঠিক এই কথাই ভৃগু ভরদ্বাজকে একটু বিস্তৃত করিয়া ও স্পষ্টতর করিয়া বলিতেছেন (১৮৯ অধ্যায়, ১-৮)। বর্ণভেদ বিষয়ে ভরদ্বাজকে ভৃগু বলিলেন, "ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত, শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ" (শান্তিপর্ব, ১৮৮, ৫)। ভরদ্বাজ বলিতেছেন, "তবে তো দেখা যায় সর্বত্রই বর্ণসঙ্কর চলিয়াছে (ঐ, ১৮৮, ৬)। সবারই মানসিক ও দৈহিক ধর্ম এক, তবে বর্ণভেদ হয় কিসে?" (ঐ, ১৮৮, ৭-৯)। তাহাতে ভৃগু বলিলেন, "এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, বর্ণসকলের

১ Wilson, *What the Castes are*, Vol. II, p. 90.

বিশিষ্টতা কিছুই নাই। পূর্বে ব্রহ্মা সব (একভাবেই) সৃষ্টি করেন, নিজ নিজ কর্ম (বৃত্তি) অনুসারে বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে" (শান্তিপর্ব, ১৮৮, ১০)। তাহার পর নানা কাজকর্ম ও মানসিক বৃত্তি ভেদে বর্ণভেদ-পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে দেখানো হইয়াছে (বনপর্ব, ১৮৮, ১১-১৮)।

মহাভারতে আদিপর্বে দেখা যায় ভীম কর্ণকে জন্মসম্বন্ধে বিদ্রূপ করিলে দুর্যোধন ভীমকে বলিলেন, "বীরগণের ও নদীসকলের উৎপত্তিস্থান দুর্জ্ঞেয়।"

শূরাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ দুর্বিদাঃ প্রভবাঃ কিল। —আদি, ১৩৭, ১১

"অগ্নির উৎপত্তি হইল জল হইতে, অথচ চরাচর তাহাতে ব্যাপ্ত। দধীচির অস্থি হইতেই দানবসূদন বজ্রের উৎপত্তি। অগ্নি, কৃত্তিকা, রুদ্র ও গঙ্গার সন্তান হইলেন কার্তিক (আদিপর্ব, ১৩৭, ১২-১৩)। ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অব্যয় ব্রহ্মত্বলাভ করিয়াছেন (ঐ, ১৩৭, ১৪)। জলপাত্র হইতে জন্মলাভ করিয়াও আচার্য দ্রোণ শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ। গৌতমবংশীয় গৌতমের জন্ম তো শরস্তম্বে (ঐ, ১৩৭, ১৫)। হে পাণ্ডব, তোমাদের জন্মকথাও তো আমাদের অজ্ঞাত নহে (ঐ, ১৩৭, ১৬)।"

এই রকম সব কথাই অতি তীব্রভাবে ঘোষিত হইয়াছিল বজ্রসূচী বা বজ্রসূচিকোপনিষদে। দক্ষিণদেশে "কপিলদ্বীপম্" নামে ঠিক এইরূপ "জাত-পাঁত-তোড়ক" গ্রন্থ আছে। তেলেগু শূদ্র কবি বেমনও বর্ণাশ্রমধর্মকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন।[২] কিন্তু বজ্রসূচীকোপনিষদের মত অগ্নিময়ী বাণী কাহারও নহে।

বজ্রসূচীর রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না। ১৮২৯ সালে নেপালে হডসন সাহেব একখানি হস্তলিখিত বজ্রসূচী গ্রন্থ পাইয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন গ্রন্থখানির রচয়িতা অশ্বঘোষ। উইণ্টারনিট্জ সাহেবের মতে অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা বজ্রসূচীর একখানি পুঁথি নাসিকে পাওয়া যায়। স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলেন তাহা শঙ্করাচার্য রচিত। ৯৭৩-৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে চীনভাষাতে একখানি বজ্রসূচী অনুবাদিত হয়। সেখানে বলা হইয়াছে ইহার রচয়িতা ধর্মকীর্তি। ভারতবর্ষে কিন্তু বজ্রসূচীগ্রন্থ উপনিষদ বলিয়াই পরিচিত। উপনিষদের তো আর রচয়িতা থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমার কাছে কয়খানা বজ্রসূচিকোপনিষৎ আছে। তাহার কোনোটিতেই এই গ্রন্থরচয়িতার বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পণসীকর রচিত গ্রন্থে, খেমরাজ কৃষ্ণদাস প্রকাশিত গ্রন্থে মাত্র মূল আছে। মাদ্রাজ আড্যারের মহাদেব শাস্ত্রীর সংস্করণে শ্রীবাসুদেব-শিষ্য উপনিষদ্ব্রহ্মযোগীর একটি ব্যাখ্যাও আছে। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদের গ্রন্থে বাংলা অনুবাদও আছে। এই গ্রন্থখানিতে বিচার্য, ব্রাহ্মণ কে? জীব বা দেহ বা জাতি বা জ্ঞান বা কর্ম বা ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। অদ্বিতীয়াত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই ব্রাহ্মণ হয়।

অতিশয় তীব্রভাষাতে অথচ অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে এই গ্রন্থখানি লেখা। রাজা রামমোহন এই গ্রন্থখানি দেখিয়া তাহার বিচারপ্রণালীতে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইলে বুঝা যাইবে না যে বজ্রসূচীর বিচারপ্রণালী কিরূপ সংহত সংযত অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাই বজ্রসূচীগ্রন্থ হইতে কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

তত্রচোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ, কিং দেহঃ, কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানম্, কিং ধার্মিক ইতি ॥২॥

---

২ Nanjundayya and Iyer, *Mysore Tribes and Castes*, Vol. IV, p. 463.

"অর্থাৎ প্রশ্ন উঠিতেছে কে ব্রাহ্মণ ? জীব দেহ জাতি জ্ঞান বা ধর্মরত, ইহার মধ্যে কে ব্রাহ্মণ ?"

তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্মবশাদনেকদেহসম্ভবাৎ সর্বশরীরাণাং জীবস্য একরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি ॥৩॥

"প্রথমেই বিচার করা যাউক জীবই কি তবে ব্রাহ্মণ ? তাহা তো নহে। অতীত ও অনাগত কালে অনেকবিধ ও অনেক জাতীয় দেহের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে যে জীব তাহার তো একরূপত্ব, একই জীবের কর্মবশত অনেক দেহসম্ভবত্ব, সর্বশরীরের জীবের একরূপত্বের কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায় জীব তো ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। আচণ্ডালাদিপর্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্য একরূপত্বাৎ জরামরণধর্মাধর্মাদিসাম্যদর্শনাৎ। ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি ॥৪॥

"দেহই কি তবে ব্রাহ্মণ ? না, তাহা নহে। আচণ্ডালাদি সকল মানুষেরই দেহ পাঞ্চভৌতিক এবং একরূপ, এবং সর্বত্রই জরামরণধর্মাধর্মের সমতা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এমন তো কোনো নিয়ম দেখা যায় না। দেহ ব্রাহ্মণ হইলে পিতার দেহ দাহ করিলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইত। তাহাই বা হয় কই ? তাই দেহ ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি জাতি র্ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবাৎ মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বূকো জম্বূকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্তকন্যকায়াম্, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বসিষ্ঠ উবশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলশে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাঽপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি ॥৫॥

"তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ ? তাহা নহে। তবে জাত্যন্তরবিশিষ্ট অনেক জন্তুতেও অনেক জাতি জন্মিত। মনুষ্যজাতি ছাড়াও নানা স্থানে বহু মহর্ষির উদ্ভব ঘটিয়াছে। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বূক হইতে জাম্বূক, বল্মীক হইতে বাল্মীক, কৈবর্তকন্যাতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্বশীতে বসিষ্ঠ, কলশের মধ্যে অগস্ত্য জাত এইরূপ শ্রুতি আছে। জাতি বিনাই জ্ঞানসম্পন্ন ঋষি বহুতর আছেন। তাই জাতি ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ঃ অপি পরমার্থদর্শিনঃ অভিজ্ঞাঃ বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি ॥৬॥

"জ্ঞানই কি তবে ব্রাহ্মণ ? অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ক্ষত্রিয়ও তো বহু আছেন। তাই জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে।"

তর্হি কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসংচিতাগামিকর্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ কর্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্বন্তীতি। তস্মান্ ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি ॥৭॥

"কর্মই কি তবে ব্রাহ্মণ ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীরই তো প্রারব্ধ সঞ্চিত ও আগামী কর্মের সমতা দৃষ্ট হয়। কর্মের দ্বারা অভিপ্রেরিত হইয়াই সকলে ক্রিয়া করে। তাই কর্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।"

তর্হি ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি ॥৮॥

"তবে কি ধার্মিকই ব্রাহ্মণ ? তাহাও নহে। হিরণ্যদাতা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রও তো অনেক আছেন ! তাই ধার্মিকও ব্রাহ্মণ নহেন।"

তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানম্ অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং···সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপং···সাক্ষাদ্ অপরোক্ষীকৃত্য···বর্ততে···স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব ॥৯॥

"তবে ব্রাহ্মণ কে ? অদ্বিতীয় জাতিগুণক্রিয়াহীন সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপ আত্মাকে যিনি অপরোক্ষ-ভাবে সাক্ষাৎকার করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, ইহাই হইল শ্রুতিস্মৃতিপুরাণইতিহাসাদির অভিপ্রায়। অন্যথা আর কোনো প্রকারেই ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধি হইতে পারে না।"

এইখানে ভবিষ্যপুরাণের নামও করা উচিত। ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মপর্বে ৪১, ৪২ অধ্যায়ে ভীষণ ভাবে তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্মকে ঠিক এই রকমেই আক্রমণ করা হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ বলেন, "যেহেতু শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের সামগ্রী এবং অনুষ্ঠানগুণ সমতুল্য তাই ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনো ভেদই নাই।

সামগ্র্যনুষ্ঠানগুণৈঃ সমগ্রাঃ শূদ্রা যতঃ সন্তি সমা দ্বিজানাম্।
তস্মাদ্বিশেষো দ্বিজশূদ্রনাম্নো নাধ্যাত্মিকো বাহ্যনিমিত্তকো বা ॥ ৪১, ২৯

তার পর জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে যথার্থতঃ কোনো ভেদ নাই তাহা এক-এক করিয়া তীব্রভাবে দেখাইয়া চলিয়াছেন ভবিষ্যপুরাণ (৪১, ৩০, ৩৪)।

তস্মান্ন চ বিভেদোঽস্তি ন বহির্নান্তরাত্মনি।
ন সুখাদৌ ন চৈশ্বর্যে নাজ্ঞায়াং নাভয়েষ্বপি ॥ ৩৫
ন বীর্যে নাকৃতৌ নাক্ষে ন ব্যাপারে ন চায়ুষি।
নাংগে পুষ্টে ন দৌর্বল্যে ন স্থৈর্যে নাপি চাপলে ॥ ৩৬
ন প্রজ্ঞায়াং ন বৈরাগ্যে ন ধর্মে ন পরাক্রমে।
ন ত্রিবর্গে ন নৈপুণ্যে ন রূপাদৌ ন ভেষজে ॥ ৩৭
ন স্ত্রীগর্ভে ন গমনে ন দেহমলসংপ্লবে।
নাস্থিরন্ধ্রে ন চ প্রেম্নি ন প্রমাণে ন লোমসু ॥ ৩৮। ৪১, ৩৫-৩৮

"তাই বাহিরে, অন্তরাত্মায়, সুখে, ঐশ্বর্যে, আজ্ঞায়, অভয়ে, বীর্যে, কৃতিত্বে, জ্ঞানদৃষ্টিতে, ব্যাপারে, আয়ুতে, অঙ্গপুষ্টিতে, দৌর্বল্যে, স্থৈর্যে, চপলতায়, প্রজ্ঞায়, বৈরাগ্যে, ধর্মে, পরাক্রমে, ত্রিবর্গে, নৈপুণ্যে, রূপাদিতে, ভেষজে, স্ত্রীগর্ভে, গমনে, দেহমলসংপ্লবে, অস্থিরন্ধ্রে, প্রেমে, প্রমাণে, লোমে কোথাও তো জাতিতে জাতিতে কোনোই ভেদ দেখা যায় না।"

তার পর পুরাণকার বলেন, "এমন কি দেবতারা একত্র হইয়া যদি অতি যত্নেও অন্বেষণ করেন তবু শূদ্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনো ভেদ মিলিবে না।"

শূদ্রব্রাহ্মণয়োর্ভেদো মৃগ্যমাণোঽপি যত্নতঃ।
নেক্ষ্যতে সর্বধর্মেষু সংহতৈ স্ত্রিদশৈরপি ॥ ৪১, ৩৯

"ব্রাহ্মণেরাও কিছু চন্দ্রমরীচিশুভ্র নহেন, ক্ষত্রিয়েরাও কিংশুকপুষ্পবর্ণ নহেন, বৈশ্যেরাও হরিতালের মতো হরিদ্রাবর্ণ নহেন, শূদ্রেরাও অঙ্গারসমানবর্ণ নহেন।

ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্রমরীচিশুভ্রা ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপুষ্পবর্ণাঃ।
ন চেহ বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ শূদ্রা ন চাঙ্গারসমানবর্ণাঃ ॥ ৪১, ৪১

"পাদপ্রচারে, তনুতে, বর্ণে, কেশে, সুখে, দুঃখে, রক্তে, ত্বকে, মাংসে, মেদে, অস্থিতে, রসে সবাই তো সমান। তবে চারিবর্ণের ভেদ কোথায় ?"

পাদপ্রচারৈস্তনুবর্ণকেশৈঃ সুখেন দুঃখেন চ শোণিতেন।
ত্বঙ্‌মাসমেদোঽস্থিরসৈঃ সমানাশ্চতুঃ প্রভেদা হি কথং ভবন্তি ॥ ৪১, ৪২

"বর্ণে, প্রমাণে, আকৃতিতে, গর্ভবাসে, বাক্যে, বুদ্ধিতে, কর্মে, ইন্দ্রিয়ে, প্রাণে, শক্তিতে, ধর্মে, অর্থে, কামে, ব্যাধিতে, ঔষধে কোথাও জাতিগত বিশেষ ধর্ম নাই।"

বর্ণপ্রমাণাকৃতিগর্ভবাসবাগ্‌বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়জীবিতেষু।
বলত্রিবর্গাময়ভেষজেষু ন বিদ্যতে জাতিকৃতো বিশেষঃ ॥ ৪১, ৪৩

"এক পিতারই যদি চারিটি সন্তান থাকে তবে সেই সন্তানদের একই জাতি। এইরূপ সকল প্রজার এক ভগবানই পিতা, এক পিতা হওয়ায় মানবের মধ্যে জাতিভেদ নাই।"

চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ তেষাং সুতানাং খলু জাতি রেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব পিত্রৈকভাবান্‌ ন চ জাতিভেদঃ ॥ ৪১, ৪৫

"ডুমুর গাছের উর্ধ্বে মধ্যে অধোভাগে যেখানে যে ফল সবই ডুমুর। তবে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মার মুখে ব্রাহ্মণ, পদে শূদ্র উৎপন্ন, সে আবার কেমন কথা ? সবারই তো সমান বর্ণ-আকৃতি-স্পর্শ-রসাদি।" ৪১, ৪৬

তাহার পর বজ্রসূচী উপনিষদের মতো ভবিষ্যপুরাণও ব্রাহ্মণের উৎপত্তিতে, দেহে, অবয়বে, কোথাও যে ভেদ নাই তাহা দেখাইয়াছেন (৪১, ৪৭-৫৭)।

৪২তম অধ্যায়ে আরও ভয়ংকরভাবে জাতিভেদকে আক্রমণ করা হইয়াছে। তার পর পুরাণকার বলিতেছেন, "জাতি-জাতি যে কর, তবে ঋষি-মুনিদের উৎপত্তিগুলি বিচার করা যাউক। কৈবর্তীর গর্ভে ব্যাসের জন্ম, চণ্ডালকন্যার গর্ভে পরাশর, শুকীর গর্ভে শুক, উলূকীর গর্ভে কণাদের জন্ম, মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ, গণিকার গর্ভে বসিষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল নাবিকার সন্তান, মণ্ডূকীর গর্ভে মুনিরাজ মাণ্ডব্য। এই ভাবেই তো অনেকে বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছেন।"

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাসরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যস্তথোলূক্যাঃ সুতোঽভবৎ ॥ ২২
মৃগীজোঽর্ষশৃঙ্গোঽপি বসিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মংদপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে ॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মংডূকীগর্ভসংভবঃ।
বহবোঽন্যোঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্ববদ্দ্বিজাঃ ॥ ২৪ । ৪২, ২২-২৪

ইঁহারা সকলেই জাতির দ্বারা নহে, তপস্যার বলে সংস্কারের দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন (৪২, ২৬-৩০)। ৪৩তম এবং ৪৪তম অধ্যায়েও এই জাতি সম্বন্ধেই বিচার চলিয়াছে। তাহাতে ভবিষ্যপুরাণ দেখাইয়াছেন জন্মের দ্বারা নহে, চরিত্রে আচারে ও তপস্যাতেই যথার্থ উচ্চতা বা নীচতা। বাহ্যবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণভেদ নিতান্তই ভৌতিক ও মিথ্যা। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগকে ভবিষ্য-পুরাণের এই কয়টি অধ্যায় যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

এই রকম কথা আরও নানা গ্রন্থে নানা ভাবাতে পাওয়া যায়। এই দুই-একটা নমুনাই যথেষ্ট। ইহাতেই বুঝা যায় তখনকার দিনেও এইসব বিষয়ে মানুষের মন সচেতন ছিল। লোকে শুধু ব্রাহ্মণকে দোষই দেয় কিন্তু এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্রতম আক্রমণ দেখি যে-সব শাস্ত্রে ও পুরাণে তাহা প্রায় ব্রাহ্মণেরই লেখা।

প্রাচীন যুগে বীরশৈবমতস্থাপয়িতা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধঘোষণা করেন সেই আচার্য বসব নিজেই ব্রাহ্মণবংশী। এই যুগেও ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক রামমোহন ব্রাহ্মণ। তিনি প্রত্যক্ষত জাতি ভেদকে আঘাত না করিলেও ক্রমশ তাঁহাদের সাধনা জাতিভেদের বিরোধী হইয়া উঠিল। আর্যসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত জ্ঞান ও গুণ অনুসারে। মধ্যযুগে রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ, ভক্ত-সাধক ঢেঢরাজ ছিলেন ব্রাহ্মণ। উভয়েই জাতিভেদকে কঠোরভাবে আঘাত করেন। হয়তো বজ্রসূচীপ্রণেতাও ব্রাহ্মণ। মহাত্মা তুলসী হাথরসী প্রভৃতি আরও বহু ব্রাহ্মণ ধর্মগুরু আছেন যাঁহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন। এখনও এই সব সমাজসংস্কারের কাজে যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই উচ্চবর্ণের লোক। তাঁহারা সর্বাপেক্ষা এই বিষয়ে প্রতিকূলতা পাইয়াছেন নিম্নবর্ণের লোকেরই কাছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর।

সমাজসংস্কারের সকল ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণকে অগ্রগামী দেখা যায়। এই যুগে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ। যিনি প্রথম বিধবা কন্যার বিবাহ দেন ও যিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। বেথুন কলেজের প্রবর্তকগণ প্রধানত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাদের কন্যাকে সেখানে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

২

ক্রমে এইদেশে চারদিকের প্রভাববশত প্রাচীন আর্যদিগের সেই সব উদার বিচারবুদ্ধি সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন পূর্ব পূর্ব যুগে এইসব বিধি চলিলেও কলিকালে ইহা চলিবে না। নির্ণয়সিন্ধু তাই বৃহন্নারদীয়ের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—সমুদ্রযাত্রা, সন্ন্যাসগ্রহণ, দ্বিজগণের অসবর্ণাকন্যাবিবাহ, কলিতে আর চলিবে না।

সমুদ্রযাতুঃ স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপয়মস্তথা॥

—তৃতীয় পূর্বার্ধ, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ. ১২৮৭

যতিগণের পক্ষে বিধানানুসারে সকল জাতির অন্নগ্রহণ ও ব্রাহ্মণদের গৃহে শূদ্র পাচক থাকাও কলিকালে নিষিদ্ধ হইল।

যতেশ্চ সর্ববর্ণেষু ভিক্ষাচর্যাবিধানতঃ ...

ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পচনাদিক্রিয়াপিচ।

—তৃতীয় পূর্বার্ধ, পৃ. ১৩০০

বৈদ্যনাথের বর্ণাশ্রমকাণ্ডেও দেখা যায় দ্বিজগণ সকল দ্বিজেরই অন্নগ্রহণ করিতে পারেন। সকল জাতির গৃহেও অন্নগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রহ্মচারী প্রয়োজন হইলে সর্বজাতির গৃহেই ভিক্ষাচরণ করিতে পারেন। তবে, ব্রাহ্মণের গৃহে শূদ্রপাচক কলিযুগে আর চলিতে পারে না।[৩]

"কলিযুগে চলিবে না" এই কথার দ্বারাই বুঝা যায় পূর্বযুগে ইহা চলিত। ইহা বন্ধ করিবার জন্য বহু শাস্ত্রের বহু দোহাই তাঁহাদের দিতে হইয়াছে। এখন তাহা এমনই অপ্রচলিত হইয়াছে যে শত শাস্ত্র বা যুক্তিতে আর তাহার নড়চড় হইবার সম্ভাবনা নাই।

পরাশরস্মৃতিতেও দেখি কলিতে এইসব বর্জনীয়। দ্বিজাতিগণের অসবর্ণা-বিবাহ—

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

শূদ্র ভৃত্যের হস্তে ব্রাহ্মণাদির অন্নগ্রহণ—

শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্ধসীরিণাম্।

ভোজ্যান্নতা ...

যতিদের পক্ষে সর্ববর্ণের অন্নগ্রহণ—

যতেস্তু সর্ববর্ণেভ্যো ভিক্ষাচর্যা বিধানতঃ।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণাদির গৃহে যে শূদ্র পাচক থাকিত ক্রমে পরবর্তীকালে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া গেল—

ব্রাহ্মাণদিষু শূদ্রস্য পচনাদিক্রিয়াপি চ।[৪]

বীরমিত্রোদয়ে দেখা যায়—ব্রহ্মচারী দ্বিজগণের গৃহে বা সকল বর্ণের গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন। ভবিষ্যপুরাণ উদ্ধৃত করিয়া বীরমিত্রোদয় বলেন[৫] প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মচারী চারিবর্ণের কাছেই অন্নগ্রহণ করিতেন। কাহারও কাহারও মতে দেখা যায় শূদ্রান্ন ভাল নহে তবে আপৎকালে যদি শূদ্রান্ন খাইতে হয় তাহা হইলে মনস্তাপের দ্বারা শুদ্ধি ঘটে।[৬]

অধ্যাপক ঘুরে[৭] দেখাইয়াছেন যে ক্রমে পরবর্তীকালে জাতিভেদের তীব্রতা এতদূর উগ্র হইয়া উঠিল যে মাধবের মতে শূদ্রের সঙ্গে এক গৃহে বাস বা এক যানে গমন করা পর্যন্ত অবৈধ হইল। শূদ্রের অন্ন অভক্ষ্য হইল। তাঁহার মতে অন্ন যদি ঘৃতে তৈলে বা দুগ্ধে পাক করা হয় তবে নদীতীরে বসিয়া তাহা খাওয়া যায়। পরাশরের মতের উপরই তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

চতুর্বর্গচিন্তামণিকার হেমাদ্রি বলিলেন যে শূদ্রের দত্ত বস্তু যদি ব্রাহ্মণ নিজেও পাক করেন তবে তাহাও শূদ্রগৃহে বসিয়া খাইলে পাতক হয়। শূদ্রান্ন যে নিষিদ্ধ তাহা দেখাইতে গিয়া কমলাকর পুরাতন বহু শাস্ত্রবাক্যের অপব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।[৮]

---

৩ R. Shama Shastri, *Evolution of Castes*, p. 7.

৪ চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, পরাশর মাধব, ১ম অধ্যায়, আচারকাণ্ড, পৃ ১২৩ ২৫ এবং নির্ণয়সিন্ধু, পৃ. ১২৯৪-১৩০০

৫ সংস্কার প্রকাশ, ভৈক্ষচর্যাবিধি

৬ আপস্তম্ব স্মৃতি আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী, নং ৪৮, পৃ. ৮, ২০

৭ *Caste and Race in India*, p. 93.

৮ *Ibid.*

দক্ষিণ-দেশে ক্রমে এমন হইল যে পথে চলিবার সময় ব্রাহ্মণের অগ্রে অগ্রে লোক দৌড়াইয়া হীনজাতীয় লোককে অপসারিত করিয়া দেয়। লোকেরা ব্রাহ্মণ দেখিলে যানবাহনাদি হইতে নামিতে বাধ্য। অন্তরজন্মা জাতির কোনো কন্যা যদি বিবাহের পূর্বে মারা যায় তবে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া বিবাহসূত্র গলায় বাঁধাইলে তবে তাহার দাহ হইতে পারে। শূদ্রের গৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ পথের ধারে এক সারিতে নির্মিত হইতে পারে না। কূর্মপৃষ্ঠবৎ রচিত কাঠের পিঁড়াতে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ বসিলে পূর্বে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। ক্ষত্রিয়কন্যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেরাই সহবাস করিতে পারেন। তাঁহাদের হাতের অন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে দূষণীয় নহে।[৯] ব্রাহ্মণী ছাড়া অন্য জাতির নারীরা নাভির উপরের অঙ্গ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে পারেন না।[১০]

শবসংকারের বিষয় স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন[১১] পূর্বে সূত্রযুগে পদ্ধতি ছিল ব্রাহ্মণাদি জাতির লোকের মৃতদেহ বৃদ্ধ দাসেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত।

অথৈনমেতয়া আসন্দ্যা সহ তত্তল্পেন কটেন বা সংবেষ্ট্য দাসাঃ প্রবয়সো বহেয়ুঃ।
অর্থাৎ বৃদ্ধ দাসেরা মাদুরে জড়াইয়া খাটে করিয়া মৃতদেহ বহন করিবে।

মনুর সময়ে দেখা যায় এই ব্যবস্থা আর চলে না। তখন ব্রাহ্মণাদির দেহ শূদ্রে স্পর্শ করিবে ইহা কেহ আর পছন্দ করিতেন না। মনু বলিলেন—

ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা॥ ৫, ১০৪

স্বজাতি বর্তমান থাকিতে শূদ্রের দ্বারা দ্বিজাতিগণের শব বহন করাইতে নাই। মৃতদেহ শূদ্রসংস্পর্শে দূষিত হইলে উহা মৃতাত্মার স্বর্গবিরোধী হয় (অনুবাদ, বঙ্গবাসী)।

বিষ্ণু বলেন—

মৃতং দ্বিজং ন শূদ্রেণ ন চ শূদ্রং দ্বিজাতিনা…

মৃত দ্বিজকে শূদ্রের দ্বারা বা মৃত শূদ্রকে দ্বিজাদির দ্বারা বহন করাইবে না।

যম বলিলেন, শূদ্রের অগ্নিতে বা শূদ্রবাহিত তৃণকাষ্ঠঘৃতাদিতে দ্বিজগণের মৃতদেহ দাহ করা চলিবে না—

যস্যানয়তি শূদ্রাগ্নিং তৃণ কাষ্ঠ হবীংষি চ…

বৃহন্মনু বলেন, দ্বিজগৃহে যদি কুকুর শূদ্র বা অন্ত্যজ মারা যায় তাহাতেও অশুচিত্ব ঘটে—

শ্বশূদ্রপতিতশ্চান্ত্যা মৃতশ্চেদ্ দ্বিজমন্দিরে।
শৌচং তত্র প্রবক্ষ্যামি মনুনা ভাষিতং যথা॥[১২]

এখন প্রশ্ন এই যে পূর্বকালে তো এত বাঁধাবাঁধি দেখা যায় না। দেখা যাইতেছে কলির পূর্বে অসবর্ণ বিবাহ চলিত ছিল এবং শূদ্রের হাতে দ্বিজাতিরা খাইতেন, কলিতে ইহা তবে নিষিদ্ধ হইল কেন?

---

৯ J. Wilson, *What Castes are*, Vol. II, pp. 76, 77.
১০ *Ibid*, p. 79.
১১ *Indo-Aryans*, Vol. II, p 130.
১২ *Ibid*, p. 131.

শামশাস্ত্রী বলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বৈরাগ্য-প্রধান মতবাদ ও কৃচ্ছ্রাচারই তাহার কারণ।[১৩] জৈন ও বৌদ্ধদের সমালোচনার ভয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা জীবহিংসা ছাড়িলেন, শূদ্রেরা ছাড়িলেন না। কাজেই একের হাতে অন্যের খাওয়া আর চলিল না।[১৪] রাজা রাজেন্দ্রলালও বলেন বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের অনুরোধে হিন্দুরা গোমাংস ছাড়িয়াছিলেন।[১৫]

এখানে একটা কথা মনে আসে। বৌদ্ধ যুগে বর্ণাশ্রম এবং সামাজিক ব্যবস্থার অনেক ওলটপালট ঘটে। সেই রকমের অবস্থা প্রায় হাজার দেড় হাজার বৎসর থাকে। তাহার পরে যখন বর্ণাশ্রমধর্ম আবার স্থাপিত হইল তখন কি করিয়া ঠিক ঠিক চতুর্বর্ণ ভাগ হইল? যদি কেহ বলেন পরবর্তী বর্ণাশ্রমীরা সকলে আগেকার দিনের বর্ণাশ্রমীদেরই সন্তান, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে বর্ণাশ্রমবিদ্রোহী বৌদ্ধরা সবাই নির্বংশ হইল এবং বর্ণাশ্রমীরাই সর্বব্যাপী হইয়া গেল—সে-ই বা কেমন? বাংলাদেশেও পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্বে সাত শত ঘর বা দল ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে দেখা যায় তখন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন বাংলায়। অথচ এখন সপ্তশতী খুব কমই দেখা যায়, নাই বলিলেই হয়। সব ব্রাহ্মণই সেই পঞ্চব্রাহ্মণেরই সন্তান। ইহাই বা কিরূপ কথা? সপ্তশতীরা তবে গেলেন কোথায়?

কেহ কেহ মনে করেন উপনিষদের যুগেই ক্ষত্রিয়দের ধর্মমত যাগযজ্ঞ হইতে ক্রমে একটু একটু সরিতে থাকে। বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতির সময় সেই ক্ষত্রিয়মত আরও স্বাধীন হয়। হয়তো এইসব মতামতের পার্থক্য হইতেই পরশুরামের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের বিরোধের উৎপত্তি।

কেহ কেহ মনে করেন বেদবিদ্যা হইতে ক্ষত্রিয়দের যে সরাইয়া দেওয়া হইল তাহাতেই ক্ষত্রিয়েরা জৈন ও বৌদ্ধাদি মত প্রবর্তিত করেন।[১৬]

বৌদ্ধযুগের ইতিহাস খোঁজ করিলে দেখা যায় তখন জাতিভেদ প্রথাটা এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চারিবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও তাহাদের ভেদবিভেদগুলি এতটা সুনির্দিষ্ট হয় নাই।[১৭]

আভিজাত্য বিষয়ে দেখা যায় বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উন্নত ও তাই তাঁহাদের সামাজিক অনুশাসনও বেশি কড়া। রাজা ওক্‌কাক নিজের সুয়োরাণীর সন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বড়রাণীর সন্তানদের নির্বাসিত করেন। তাঁহারা হিমালয়ের পাশে এক শাকবৃক্ষের নিকটে হ্রদের তীরে গিয়া বাস করেন। পাছে তাঁহাদের বংশে হীন রক্তের আমদানি হয় তাই তাঁহারা ভাইয়ে ভগ্নীতে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইলেন তবু হীন জাতির সঙ্গে ক্রিয়া করিলেন না (অম্বট্‌ঠ সুত্ত, ১৬)।

ব্রাহ্মণ পোক্করসাদীর শিষ্য ব্রাহ্মণ অম্বট্‌ঠ বুদ্ধের কাছে আসিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের কিছু বেশি বড়াই করেন (অম্বট্‌ঠ সুত্ত, ১০-১৫)। তখন বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি কোনো ব্রাহ্মণকন্যাকে ক্ষত্রিয় বিবাহ করে তবে কি ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিবে?" অম্বট্‌ঠ বলিলেন, "নিশ্চয়ই করিবে।" বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিলেন, "ক্ষত্রিয়েরা কি তাহাকে স্বীকার করিবে?" অম্বট্‌ঠ বলিলেন, "না, কারণ ক্ষত্রিয়েরা বলিবেন, তাঁহার মাতৃকুল হীন—অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নহে, ব্রাহ্মণ মাত্র" (ঐ, ২৪-২৫)। অম্বট্‌ঠ

---

১৩ *Evolution of Castes*, p. 9.

১৪ *Ibid*, p. 11.

১৫ *Indo-Aryans*, Vol. II, p. 388.

১৬ *Caste and Race in India*, p. 64.

১৭ *Sacred Book of Buddhists*, Vol. II, p. 101.

ইহাও স্বীকার করিলেন যে ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণকে স্বীকার করেন না কিন্তু জাতিচ্যুত ক্ষত্রিয়কে স্বীকার করে (ঐ, ২৬)। কাজেই ক্ষত্রিয়েরাই আভিজাত্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ঐ, ২৭)। সনৎকুমার বলেন যাঁহারা গোত্রবিশুদ্ধি দেখেন তাঁহাদের পক্ষে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ। আসলে যিনি বিদ্যায় ও আচরণে শ্রেষ্ঠ তিনি দেবতা ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঐ, ২৮)।

মহাভারতেও সনৎকুমারের একটি ব্যাখ্যায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একত্র হইলেই মহাশক্তি (বনপর্ব, ১৮৫, ২৫)। রাজাই ধর্ম, রাজাই ইন্দ্র, রাজাই বিধাতা (ঐ, ২৬)। শাস্ত্রপ্রমাণ সব আলোচনা করিয়া দেখা যায় রাজাই জগতে শ্রেষ্ঠ (ঐ, ৩১)।

বুদ্ধের কাছে আচার্য সোণদণ্ড ব্রাহ্মণের পঞ্চ লক্ষণ বলিয়াছেন, (১) জন্মের বিশুদ্ধি, (২) সর্ববিদ্যায় (মন্ত্র, সনিঘণ্টু বেদত্রয়, কর্মানুষ্ঠান, সাক্ষর প্রভেদ, ইতিহাস, ব্যাকরণ, লোকায়ত, মহাপুরুষলক্ষণ ইত্যাদি শাস্ত্রে) পারগতা, (৩) দেহের শক্তিপ্রমাণ ও সৌন্দর্য, (৪) শীল ও সদাচার, (৫) এবং পাণ্ডিত্য (সোণদণ্ড সুত্ত, ১৩ ও ২০)।

বরং দেখিতে পাই (কন্‌হবংশীয়) কন্‌হায়ণ বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করিয়াছিলেন যে অম্বট্‌ঠ এবং সকল ব্রাহ্মণ যাঁহার সমর্থন করিতেছিলেন (অম্বট্‌ঠ সুত্ত, ১৭) সেই অম্বট্‌ঠের পূর্বপুরুষ কন্‌হ ছিলেন শাক্যবংশের একজন দাসীর পুত্র (ঐ, ১৬)। রাজা ওক্‌কাকের দিসা নামে এক দাসী ছিলেন। কন্‌হ হইলেন তাঁহার পুত্র (ঐ)।

বুদ্ধদেব এই বার্তাটুকু ব্যক্ত করিলে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "অম্বট্‌ঠকে এমন করিয়া দাসীপুত্র বলিয়া অপমান করিবেন না। অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, কল্যাণবাক্‌করণ, পণ্ডিত ও প্রশ্নের সদুত্তরদাতা (ঐ, ১৭)।

বুদ্ধদেব তখন অম্বট্‌ঠকেই জিজ্ঞাসা করিলেন এই সব কথা সত্য কিনা, অম্বট্‌ঠ চুপ করিয়া রহিলেন (ঐ, ১৬-২০)। অবশেষে সকলের পীড়াপীড়িতে অম্বট্‌ঠ এই কথা যে সত্য তা স্বীকার করিলেন (ঐ, ২০)। তখন ব্রাহ্মণেরা গোলমাল করিলে বুদ্ধই বরং বলিলেন, "তাহাতে দোষ কি ? কান্‌হ দক্ষিণ দেশে গিয়া সর্ববিদ্যাতে এবং সর্বসাধনাতে প্রবীণ হইলেন এবং রাজা ওক্‌কাকের কন্যা মদ্দরূপীকে বিবাহ করিলেন। কন্‌হ একজন মহা ঋষি হইয়াছিলেন, কাজেই দাসীপুত্রের বংশে জন্ম বলিয়া অম্বট্‌ঠের উপর আপনাদের বিরূপ হইবার কোনো হেতুই নাই (ঐ, ২২-২৩)।"

যদিও অম্বট্‌ঠের দাম্ভিকতা দেখিয়া বুদ্ধদেব তখনকার কালে ক্ষত্রিয়দের যে প্রবল আভিজাত্যগর্ব ছিল তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের কৌলীন্য যে তখন বেশি ছিল তাহা দেখাইয়া দিলেন তবু এই সব বিষয়ে বুদ্ধদেবের মত অতিশয় উদার ছিল। সুত্তনিপাতের আমগন্ধ সুত্ত অতি প্রাচীন শাস্ত্র। তাহাতে দেখা যায়, বিশেষ বস্তু খাওয়ায় বা বিশেষ বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির হাতে খাওয়ায় মানুষের অশুচিত্ব ঘটে না। অশুচিত্ব ঘটে অসৎ কর্মে, অসৎ বাক্যে, অসৎ চিন্তায়।[১৮]

সুত্তনিপাতের বা সেই সুত্তে প্রশ্ন উঠিল কিসে ব্রাহ্মণ হয়। বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সরীসৃপ বা মৎস্যাদির মধ্যে নানা জাতির নানা বাহ্যলক্ষণ দেখা যায়। মানুষের মধ্যে এইরূপ কোনো লক্ষণগত বৈশিষ্ট্য নাই, কাজেই জাতির কোনো ভেদ নাই।[১৯] বুদ্ধদেব একেবারে

---

১৮ *Sacred Book of Buddhists*, Vol. II, pp. 103-4.

১৯ *Ibid*, p. 104.

বৈজ্ঞানিকদেরই মত বলিলেন, "সকল মানুষই এক-জাতি, বর্ণ বা অন্য কোনো উপাধির দ্বারা তাহাদের মধ্যে ভেদবিভেদ হওয়া সম্ভব নহে।[২০]

তাহার পর বজ্রসূচী, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বসব, কবীর প্রভৃতি সবাই সেই এক কথাই বলিলেন। কবীরের মতে—

গুপ্ত প্রকট হৈ একৈ মুদ্রা।
কাকো কহিয়ে ব্রাহ্মণ শূদ্রা ॥

"গুপ্ত প্রকট সবারই এক চিহ্ন। তবে কাকে বলিবে ব্রাহ্মণ, কাকে বলিবে শূদ্র ?"

জৈনধর্মপ্রবর্তক মহাবীরেরও জন্ম কুলীন ক্ষত্রিয়কুলে। তিনি সোরাগকুলসংভূত (উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ১২, ১)। জৈন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বাণিয়াদের বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা পল্লীর উল্লেখ দেখা যায়।[২১] উড়িষ্যায় ক্ষত্রিয়প্রাধান্য ছিল। মহাবীরের পিতার ক্ষত্রিয় বন্ধু উড়িষ্যায় থাকাতে মহাবীর সেখানে যান, ইহা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কথা।[২২]

ক্ষত্রিয়ের দ্বারা জৈনধর্ম প্রবর্তিত হওয়ায় প্রথমে জৈনধর্মে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল না। যদিও জাতির গৌরব যে একেবারে ছিল না তাহা নহে। নন্দবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা দাসী মুরার সন্তান। কিন্তু পরে তাঁহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির দাবি করিয়াছেন।[২৩] জৈনদের মধ্যে বহু বহু ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি মহা মহা পণ্ডিত জন্মিয়াছেন। তথাপি ভারতের ভূমির গুণে ইঁহাদের মধ্যেও ক্রমে জাতিভেদ এখন আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

কোশলরাজের দ্বারা বিতাড়িত শাক্যবংশীয়দের কেহ কেহ হিমালয়ের ময়ূরবহুল বিভাগে বাস করাতে তাহাদের নাম মৌর্য হইয়াছে। কোনো কোনো পালিগ্রন্থে এইরূপ মত পাওয়া যায়।

বৌদ্ধজাতকে দেখা যায় ক্ষত্রিয়েরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের স্থান তাহার নিচে। বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও ক্রমে উন্নত হইয়া ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। যে-কোনো বর্ণের লোক পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতে পারে। বিবাহসম্বন্ধে জাতির গণ্ডী লইয়া মারামারি নাই। ক্ষত্রিয়-বিধবাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতেছেন ইহা দেখা যায়। ক্ষত্রিয়বংশজাত হইলেও বুদ্ধ এক দরিদ্র চাষার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জাতির বাহিরেও বিবাহ চলে, তবে জাতির মধ্যে বিবাহ হইলেই ভাল। উচ্চবর্ণের লোকদের নিচে তাঁতি নাপিত কুম্ভকারদের স্থান, চণ্ডাল ও অন্ত্যজদের স্থান সবার নিচে।[২৪]

মনুর সময় হইতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতাই অবিসংবাদিত হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষত্রিয়েরা পিছাইয়া গেলেন এবং ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র বর্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। হয়তো ইতিহাসগত কারণও ইহার জন্য দায়ী। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত যে যুগ তাহাতে বহু জাতি বাহির হইতে ভারতকে আক্রমণ করে। তাহাতে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত্রিয়েরা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যান। বৌদ্ধধর্ম ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত। বহু শতাব্দী তাহা প্রধান ছিল, পরে তাহা ব্রাহ্মণশাসিত ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

---

২০ *Sacred Book of Buddhists*, Vol. II.

২১ N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*, p. 107 and C. T. Shah, *Jainism in Northern India*, p. 103.

২২ *Ibid*, p. 178.

২৩ *Ibid*, p. 132.

২৪ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. I, p. 131.

ক্রমে বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণবল হইয়া আসিল। রাজা হর্ষের পর ক্ষত্রিয়দের যে প্রাধান্য ছিল তাহা গেল ব্রাহ্মণদের হাতে। পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের নিঃশেষ করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা কথা আছে। নানা-ভাবেই ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য ভারতে লুপ্ত হইল।[২৫]

তথাপি দেখা যায়, মেগাস্থিনিসের সময়েও ভারতে অস্পৃশ্যতাদোষ ছিল না। হয়তো তাহা কতকটা বৌদ্ধপ্রভাব বলিয়াও হইতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেগাস্থিনিসের যুগ পর্যন্ত কোনো সময়েই অস্পৃশ্যতাদোষ ভারতে দেখা দেয় নাই।[২৬]

স্কেচ। শ্রীনন্দলাল বসু

[২৫] *Mysore Tribes and Castes*, Vol. I, p. 134.

[২৬] *Dayananda Commemoration Volume*, 1933, p. 187.

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় লেখক। বড়ই বিস্ময়ের কথা। বসুমতী গ্রন্থাবলী-সিরিজ ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বসুমতী গ্রন্থাবলীও সম্পূর্ণ নহে। তাঁহার ইংরেজি রচনা, সাহিত্য নয়, ভারতীয় শিল্পের পরিচয়, বোধ করি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী গ্রন্থখানার কথা কোন কোন পাঠকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে সে অনেকটা কিম্বদন্তীর মতো, পঠিত-অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের একজন major বা মহৎ লেখকের এমন অবলুপ্তি যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের হেতু।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক বা satirist. সৌভাগ্যের বিষয় বাংলা সাহিত্যে satire বা satirist-এর অভাব নাই। মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যিকের রচনায় কিছু না কিছু satire আছে, কিন্তু কেহই বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি ব্যঙ্গসাহিত্যিকের দৃষ্টি নয়; ব্যঙ্গসাহিত্যিক যে-দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিয়া থাকেন—সে-দৃষ্টিতে তাঁহারা অভ্যস্ত নন, সে দৃষ্টি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গের বক্রদৃষ্টি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গ রচনাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এখন একজন বিস্মৃতপ্রায় লেখকের পক্ষ হইতে এতবড় দাবীর উত্থাপন অনেকের কাছেই বিস্ময়কর লাগিতে পারে--কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে স্মৃতি ও বিস্মৃতি, খ্যাতি ও অবলুপ্তি বিচারের অপেক্ষা রুচির উপরেই বেশি নির্ভর করে, আর রুচির ন্যায় পিচ্ছিল ও চঞ্চল-বৃত্তি অল্পই আছে, কাজেই ত্রৈলোক্যনাথের অবলুপ্তিতে বিস্মিত না হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। বিচারান্তে যদি প্রমাণ হয় আমরা তাঁহার পক্ষ হইতে যে দাবী উত্থাপন করিলাম তাহা সত্য—তবে প্রসন্ন মনে বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গরচনার শ্রেষ্ঠ আসনখানি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত। রচনার পরিমাণ ও গুণ এই দুই দিকের বিচারেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তদপেক্ষা বড় কথা এই যে—ব্যঙ্গশিল্পীর সম্পূর্ণ সহজাত বক্রদৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন, এই দৃষ্টির সম্পূর্ণতার অধিকারী বাংলা সাহিত্যে তিনি একাই—অপর যাঁহারা ব্যঙ্গ রচনা করিয়াছেন—ব্যঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রেই tour de force; স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার নহে।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের ঘটনা ও ভাবনার ধারা না বুঝিলে তাঁহার সাহিত্য বোঝা দুর্ঘট হইবে। তাঁহার বাল্যকালের ও প্রথম যৌবনের দুঃখদারিদ্র্য; সেই দুঃখদারিদ্র্যের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার মনুষ্যত্ব; অপরের দুঃখদুর্দশার প্রতি তাঁহার সমবেদনাপূর্ণ আত্মীয়তা—এ সমস্তই একাধারে তাঁহার জীবনের ও সাহিত্যের উপকরণ। একটিকে জানিলে তবে অপরটি বুঝিয়া ওঠা সহজ। তারপরে কর্ম-জীবনে দেশের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য ও অসহায় ভাব দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যেমন করিয়া পারেন, আমৃত্যু দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহার কর্মজীবন, দেশীয় শিল্প

প্রসারের প্রয়াস, দেশীয় শিল্পের ইতিহাস রচনা, পরিণত বয়সে আজন্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে বিলাতযাত্রা—সমস্তই এই প্রতিজ্ঞারক্ষার অংশ। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতন ভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল না—তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার রচনা তাঁহার জীবন-কর্মেরই একটা প্রক্ষেপমাত্র—তাঁহার অবসরজীবন তাঁহার কর্মজীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মে ও অবসরে, ঘটনায় ও ভাবনায় এরকম একপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি বাংলা দেশে সত্যই বিরল। ব্যক্তিত্বের বিচারে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়—বাংলাদেশেও তাঁহার মতো নিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষ খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এখন হইতে নিরানব্বই বৎসর পূর্বে ১৮৪৭ সালের ৬ই শ্রাবণ ত্রৈলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল। কতকটা সেই কারণে, কতকটা সেকালের নূতন আমদানি ম্যালেরিয়ার জন্য, আর অল্প বয়সেই পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তির ফলে—তাঁহার ইস্কুলের লেখাপড়া অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয়-জাত জ্ঞানলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর নিরুদ্দেশ সংসারে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। তখন হইতে অজানা পৃথিবীর অনাত্মীয় পথঘাটই তাঁহার প্রকৃত বিদ্যালয় হইয়া উঠিল।

১৮৬৫ সালে পদব্রজে তিনি মানভূম-পুরুলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠারোর বেশি নহে। পথের কষ্ট অবর্ণনীয়। তারপরে ১৮৬৮-তে তিনি কটক জেলায় পুলিশ দারোগার সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন। মাঝখানের তিন বৎসর তাঁহার জীবনের দুর্বহ দুঃখ-কষ্ট ও খণ্ডিত চাকুরীর ইতিহাস। এই তিন বৎসরে তিনি বীরভূমের দুইটি ইস্কুলে—আর পাবনা জেলার সাজাদপুরের একটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এই তিন বৎসর পথেঘাটে যে দুঃখ কষ্ট তিনি পাইয়াছেন তাহার প্রধান কারণ—তাঁহার অনমনীয় আত্মসম্মানবোধ। দীর্ঘ বিদেশযাত্রায় বাহির হইতেছেন—হাতে একটিও পয়সা নাই—অথচ পরমাত্মীয়ের নিকটেও টাকা পয়সা চাহিবেন না। এমন লোকের পক্ষে অপরিচিত স্থানে ক্লেশ ছাড়া আর কি জুটিবে?

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন,

আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে বর্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটি ইন্সপেকটার অব্ স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাষ্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন, সেখানে কিছু হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাট গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে কপর্দক শূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন—কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।

রামপুর হাট হইতে পদব্রজে শিউড়ি ফিরিয়া আসিয়া······বর্ধমানের দিকে চলিলাম। ৫।৬ ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। অতি কষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুণ-হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়ীতে কোনরূপ শুভকার্য হইয়াছে—ইহাদের বাড়ীতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতিতে সদ্‌গোপ। বাটীর কর্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনরুজ্জীবিত হইল। পুনরায় বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।······

এ রকম অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রথম জীবনে অবিরল। বাল্যকালে তিনি দরিদ্র ছিলেন, দুরন্ত ছিলেন —কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাঁহার বিদ্যাসাগরী প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ। এই শেষোক্ত গুণটি তাঁহার চরিত্রে অতিমাত্রায় না থাকিলে শেষ পর্যন্ত তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

আর-একবারের কথা। ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন,

সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পৌঁছিলাম। মেমারি স্টেশনের পুষ্করিণীর সানবাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম, দু'দিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি—তবে কাল প্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না একটা তেঁতুল গাছ হইতে তেঁতুল পাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার সময়ে মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফালাহার করিতে দিল, আর গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাটি আসিলাম।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম জীবন এইরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতায় পূর্ণ—কিন্তু কখনই তিনি আত্মসম্মান-বোধ বিসর্জন দেন নাই।

ইহার পরে যখন তিনি উখড়ায় দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য করিতেছেন—তখন সেখানে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্ষুধার কঙ্কালসার মূর্তি চারিদিকে। অপরের ক্ষুধার সঙ্গে নিজের ক্ষুধাও মিশিল। দেশের শিশুভাইদের জন্য টাকা বাঁচাইতে গিয়া অনেক দিনই তাঁহাকে একান্ন, কখনো কখনো বা সারা দিন অনাহারে থাকিতে হইত। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলে শীতল জল পান করিয়া শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেন। সেই সময়ে দ্বিবিধ ক্ষুধার অশ্রু-সরস্বতীর তীরে বসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেইদিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্ততঃ অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন পাইয়াছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখমোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন; বড় জোর না হয়, ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষ্যে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে একদিন কি দুই দিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীব দুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্যে কয়জনের দৃষ্টি আছে?

ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রতিজ্ঞাই তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড। তাঁহার কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনকে এই একটি মেরুদণ্ডই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্মের দ্বারা যতদিন সম্ভব এই প্রতিজ্ঞা-পালনে তিনি তৎপর ছিলেন—কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহার সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাঁহার প্রতিজ্ঞা —এবং প্রতিজ্ঞার পটভূমি স্বরূপ তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রথমে বুঝিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়াই এত বিস্তারিতভাবে তাঁহার জীবনের এই অংশটিকে ব্যাখ্যা করিতে হইল।

সরকারী চাকুরিতে ঢুকিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দুইজন উদার ও উন্নতমনা ইংরেজের সহিত পরিচিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা স্যর উইলিয়াম হাণ্টার ও স্যর এডওয়ার্ড বক্। ইঁহাদের সাহায্যে ও নিজের কর্ম-

কুশলতায় তিনি ক্রমে ক্রমে গভর্মেণ্টের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ও কৃষি-বাণিজ্যবিভাগে দায়িত্বসম্পন্ন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রাখিতেন। এই সময়ে দেশের শিল্প-প্রসারের জন্য তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন। বড় বড় রেল স্টেশনে ও হোটেলে দেশীয় শিল্পবস্তু রাখিয়া বিক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা এখন চলিত আছে তাহা তাঁহারই প্রবর্তিত। ১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজরের চাষ করিয়া তদ্দ্বারা লোকের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে—তিনি গভর্মেণ্টকে এই প্রস্তাবটি দেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হওয়াতে বহু সহস্র লোকের প্রাণ বাঁচিয়া যায়। অতঃপর তিনি রাজস্ববিভাগে বদলী হন।

১৮৮৬ সালে বিলাতে শিল্পপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়। দেশীয় শিল্পপ্রসারে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবেন এই ভরসায় তিনি সামাজিক সংস্কারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিলাতযাত্রা করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার "Visit to Europe" গ্রন্থে লিখিত আছে।

সরকারী চাকুরির শেষ কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি ১৮৯৬ সালে পেন্সন লন।

১৯১৯-এর নভেম্বর মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার প্রকৃত সাহিত্যজীবন সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইবার পরেই আরম্ভ হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী দ্বিভাষিক—ইংরাজি ও বাংলা।

ইংরাজি গ্রন্থগুলি ভারতীয় শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্যাদির বর্ণনা ও ইতিহাস। তাঁহার বাংলা রচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান ও নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ। তিনি ও তাঁহার অগ্রজ একযোগে বিশ্বকোষ নামে অভিধানগ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত করেন। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তাঁহার রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাবলী।

বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্য গ্রন্থাবলীই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে তাঁহার ইংরাজি ও বাংলা সমুদয় গ্রন্থই একই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত—দেশের কল্যাণ-সাধন। তাঁহার প্রথম জীবনের প্রতিজ্ঞার কথা কি ভাবে তিনি বিস্মৃত হইবেন ?

স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প—অন্য শ্রেণীর শিল্পের সহিত ইহার প্রভেদ এইখানে। অন্য শিল্পের মৌলিক প্রেরণা যাহাই হোক—মূলটা গুপ্ত থাকে—কিন্তু ব্যঙ্গের মূলটা যে শুধু মুখ্য তাহাই নয়—মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখা চলে না। উপমার ভাষায়—ব্যঙ্গ যেন মূলা ; মূলটাই এখানে মুখ্য—সমস্ত গাছের লক্ষ্য ওই মূলটাকে পুষ্ট করিয়া তোলা। ইহাই ব্যঙ্গের প্রধান গুণ—আবার এইখানেই তাহার গুণের সীমা। ব্যঙ্গ অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য—কিন্তু কোন মতেই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্যে গণ্য হইতে পারে না।

ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প—অর্থাৎ ইহাকে একপ্রকার প্রচার-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের অনুকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে লোকটা স্বেচ্ছাকৃত নকীব হইয়া তারস্বরে তাহার পক্ষে প্রচারকার্য চালাইতেছে—তাহাকে দ্বারের কাছেই

রাখিয়া দেয়—আর যে-কবিতা তাহার কানে কানে স্বর্গীয় প্রলাপবাণী ঢালিতে থাকে, সাংসারিক প্রয়োজন-সাধনে যে-প্রলাপের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই—সেই স্বর্গীয়প্রলাপবাদিনীকে অন্তঃপুরের গোপন কক্ষে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসায়। সকল দেশে—সকল কালেই কবিতার স্থান ব্যঙ্গের অনেক উর্ধ্বে।

ব্যঙ্গসাহিত্যিকগণ তাঁহাদের শিল্পের এই ন্যূনতার কথা জানেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেমন ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা প্রধানতঃ সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে চান। মূলতঃ তাঁহারা কর্মী কিন্তু কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে বলিয়াই শিল্পের মাধ্যমে তাঁহাদের কর্মপ্রবণ চিত্ত আপনাকে যেন প্রকাশ করিতে থাকে। ব্যঙ্গশিল্প সাহিত্যিকের কর্ম-শক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ। এই জন্যই দেখা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-সাহিত্যকদের অনেকেই কর্ম-কুশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে হয়তো তাঁহারা আর শিল্প-মাধ্যমের প্রয়োগে অগ্রসর হইতেন না। আপাততঃ ভল্‌টেয়ার ও সুইফ্‌টের নাম মনে পড়িতেছে। ভল্‌টেয়ারের মতো কর্মকুশলতা খুব অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। শুধু সাহিত্যিক কেন—ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তাঁহার জুড়ি মেলা সহজ নয়। পরবর্তী কালে ধনোপার্জনে ও ব্যবসায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে সার্থক প্রবণতা দেখাইয়াছে—ভল্‌টেয়ার তার আদর্শস্থল। তাঁহাকে প্রথম সার্থক মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বলা যাইতে পারে। (অর্থোপার্জনে তাঁহার যে কেবল কুশলতা ছিল তাহা নয়—পন্থার ভালোমন্দ বিচারেরও অভাব তাঁহার ছিল। তৎকালে যুদ্ধের বাজারে টাকা খাটাইয়া (সব সময়ে সদুপায়ে নয়) তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এবারের যুদ্ধের বাজারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না বলিয়া খুব সম্ভবতঃ তাঁহার মধ্যেকার ব্যবসায়ীটা পরলোকে বসিয়া বুক চাপড়াইয়া মরিতেছে। ভল্‌টেয়ারের আর্থিক-দুর্নীতিপরায়ণতার উল্লেখের জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা নয়—তাঁহার কর্মকুশলতার বর্ণনার জন্য মাত্র।) সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে কর্মীপুরুষ ছিলেন তাঁহার জীবনী-প্রসঙ্গে তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ব্যঙ্গশিল্পের উদ্ভবের কারণ কি? সময়ের গুণ ও ব্যক্তির বিশেষগুণের সমন্বয়ের ফলেই ব্যঙ্গ-শিল্পের—তথা সমস্ত শিল্পেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। মানুষের সমাজে এক একটা যুগ আসে—ব্যঙ্গ রচনার যাহা অনুকূল। ইউরোপের অষ্টাদশ শতক ছিল—এইরকম একটা যুগ। এই যুগাধিনায়ক ছিলেন ভল্‌টেয়ার ও সুইফ্‌ট্‌। সে-যুগে কবির অভাব ছিল না—কিন্তু ব্যঙ্গ-ই ছিল তখনকার প্রধান শিল্প। ব্যঙ্গ এবং ইতিহাস। এ দুই যতই ভিন্নশাখাশ্রয়ী হোক না কেন—এক জায়গায় মিল আছে। দুইয়েরই অন্যতম মূল উপাদান সংশয় ও নাস্তিক্য। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার ও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস একই শাখার ফল—একই রসে পুষ্ট। বাংলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের সঙ্গে ওদেশের অষ্টাদশ শতকের কার্যকারণের ঐক্য থাকা সম্ভব নয়—তৎসত্ত্বেও দেখি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন উঁচুদরের ব্যঙ্গ লেখক। এ কেমন করিয়া হইল? তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া কি একই হাওয়া বহিতেছিল?

এ যেমন গেল যুগের গুণ, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণ আছে। সংসার ভালোয় মন্দয় জড়িত। কোনো কোনো লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় স্বভাবতই ভালোর দিকে—কাহারো আবার মন্দর দিকে। সংসারের ভালো দেখিয়া কেহ বা উল্লসিত হন—মন্দটা দেখিয়া বা কেহ ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। আর

ভালো-মন্দকে সমান ভাবে দেখিবার সৌভাগ্য ও শক্তি মানুষে কদাচিৎ দেখা যায়—যে দেখিতে পারে সে শেক্সপীয়ার হয়।

বুঝিলাম যে বিশিষ্ট কালগুণ আছে—আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগুণ আছে। কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় হয় কিরূপে? কাকতালীয় না কার্যকারণসম্ভূত? ভালো-মন্দ সব সময়েই আছে তবে এক-একটা সময়ে এক-একটা দিক উগ্রতর হইয়া ওঠে—আর এমন হইবার পিছনে পূর্বগামী অনেক কার্যকরণের ধাক্কা থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসানকালই ব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাবের সময়। রেণেসাঁসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে ভল্‌টেয়ার; বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদনার পরে বিদ্যাসুন্দর; বিদ্যাসুন্দর রাধাকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র।

জগতের কল্যাণরূপ যে-সব শিল্পীর চোখে পড়ে তাহারা জগতের কবিশ্রেষ্ঠ হয়—গ্যেটে আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, ইহারা কখনো কখনো স্যাটায়ার-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—কিন্তু তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই—দৃষ্টিভঙ্গী ও যুগধর্ম দুই-ই প্রতিকূল। শেলি ও ওয়ার্ডস্বার্থ একই কারণে বারংবার ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

ভল্‌টেয়ার তৎকালীন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া, তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ব্যঙ্গ-পুস্তিকার বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসি তাঁহার ক্রোধের চেয়েও মারাত্মক। মানব-জীবনের দুঃখের লবণাম্বুরাশির দ্বীপমালার ভ্রান্ত পথিক ইউলিসিসের মতো ভল্‌টেয়ার গৃহে ফিরিয়া দেখেন যে মানুষের শুভবুদ্ধিকে মূঢ় প্রণয়ীর দল ঘিরিয়া ধরিয়াছে। তখন তাঁহার ধনুক হইতে যে Candide শর নিক্ষিপ্ত হইল—তাহা আজিও মূঢ়তার সপ্ততাল ভেদ করিতে করিতেই চলিয়াছে। ভল্‌টেয়ার কখনো ভোলেন নাই যে ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক—এবং নিজের উদ্দেশ্যের মূল সম্বন্ধেও তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন যে ধর্মান্ধতা ও মূঢ়বুদ্ধিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু।

পূর্বেই বলিয়াছি ব্যঙ্গরসিকের সহজাত দৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কি চাহিতেন তিনি জানিতেন। তিনি জানিতেন মানুষ বড়ই হৃদয়হীন, বড়ই নৃশংস—ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তা ছাড়া আর কিছু বড় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। পৃথিবী যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা তিনি জানিতেন। তবে মানুষে আর একটু যদি হৃদয়বান্ হয়, আর একটু পরার্থপর হয়, আর একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তবে সংসারের দু'একটি কণ্টক উৎপাটিত হইয়া স্থানটা আর একটু ভদ্ররকম ও বাসোপযোগী হয়। ইহাই তো যথেষ্ট। ইহার বেশি আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়—তাই তদধিক তিনি কিছু চাহিতেন না। ভল্‌টেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা, ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষেত্রে তেমনি হৃদয়হীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। এই দুটির কবল হইতে মানুষ আর একটু মুক্ত হোক ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুখানি সজাগ করিয়া তোলাই তাঁহার শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

মানুষ কেবল যে মানুষের প্রতি হৃদয়বান হইবে মাত্র তাহাই নয়, ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার ব্যবহার সদয়তর হওয়া উচিত। ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষে যে নৃশংস আচরণ করে—ইহা তাঁহাকে বড় বাজিত। মূঢ় পশুদের প্রতি এমন করুণা অল্প বাঙালী সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গড়গড়ি মহাশয় কলিকাতায় গিয়া তাহার গুরুদেবের

কশাই বৃত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহার গুরুদেবের পাঁঠার বেনামে ছাগল বধের কৌশল বর্ণিত হইতেছে—

তাহার পর তাহার (ছাগলটির) মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক্ হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা, আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। * * আমি বলিয়া উঠিলাম—'ঠাকুর মহাশয়, করেন কি! উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথমে উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।' ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন—'চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা কম্পিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে বসিয়াছি বাবা। দয়া মায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।'······আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে। মাথার উপরে কি ভগবান্ নাই?

নৃশংসভাবে নিহত সেই অসহায় দুর্বল পশুটির দৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। সেই দৃষ্টি বারংবার পাঠককে ডাকিয়া বলে—আর কিছু নয়, তোমরা ওই অতিরিক্ত দুই আনার লোভ বর্জন করো। আমার ছাল যদি একান্তই চাও অন্ততঃ আগে আমাকে বধ করিয়া লও। মানুষের কাছে ত্রৈলোক্যনাথের আশা অতি যৎসামান্য—পশুবধ যদি নিতান্তই বর্জন করিতে না পারো ব্যাপারটাকে যত অল্প সম্ভব নৃশংস করো। ষোলো আনার লোভ পরিত্যাগ যদি সম্ভব না হয় অতিরিক্ত দুই আনার লোভ পরিত্যাগ করো—তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না।

পশু, পক্ষী এবং মানব-সমাজের অন্তর্গত অসহায় দুর্বলের প্রতি করুণা ত্রৈলোক্যনাথের রচনার প্রধানতম সম্পদ। ভল্টেয়ারের হাসি শীতের তীব্র বাতাসের মতো জলকণাশূন্য, তাহা হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে।

এই জীবনদর্শন-প্রকাশের বাহন তাঁহার হাসি এবং তাঁহার ভাষা। তাঁহার ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পদ ও অলৌকিক মহিমা আশা করা বৃথা। এই ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য শরবৎ ঋজুগতি। ঋজুতাই ব্যঙ্গের প্রধান সম্পদ। ভাষা যদি ঋজু না হয় তবে ব্যঙ্গের প্রচণ্ডতার অনেকটাই মাঝপথে নষ্ট হইয়া যায়। অনাড়ম্বর সরল ভাষার মাধ্যম ব্যঙ্গের তীব্রতাকে একটুও নষ্ট হইতে দেয় না। আর এই অনাড়ম্বর ভাষার মেরুদণ্ড লেখকের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণশক্তি। তাঁহার চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে—তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তির আতস কাচের ভিতর দিয়া তাহাকে তীব্রতর ভাবে রূপদানের ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তি ও তাহার বাহনস্বরূপ অনাড়ম্বর ভাষার উদাহরণ 'পাপের পরিণাম' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

খাঁদা ভূত রাত্রে বিকট শব্দ করিতেছে "হু হু। হু হু।" তেঁতুল গাছ হইতে যাই এই শব্দ উত্থিত হইল আর চারিদিকে হুাক্কা- হুয়া, হুাক্কা-হুয়া-হুঃ শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল। সেই সময় কাক পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়া, বৃষ্টি-বাদল না মানিয়া, বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে একবার তাহারা এ ডালে বসিল, পুনরায় সে ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে গিয়া বসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাঁশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর মস্তক লুকাইয়া ভিজিতেছিল। কক্ কক্ রবে তাহারাও চারিদিকে উড়িতে লাগিল। বাদুড়গণ সন্ সন্ রবে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পেঁচকগণ হুট হুট রবে রায় মহাশয়ের অট্টালিকাগাত্রে কোটরের ভিতর আশ্রয় লইল। নিকটস্থ কয়েক বাটী হইতে কুকুরগুলা ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইলে যেই সেই তেঁতুল গাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল, আর তাহারা বসিয়া পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাখিয়া পশ্চাৎ পদদ্বয়ের উপরে ভর দিয়া উচ্চভাবে বসিয়া, দূর হইতে তেঁতুল গাছের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া তাহারা অতি ভয়ংকর শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশাকালে সেই চীৎকারে একে লোকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পরে আবার সেই প্লুতস্বরে কুকুরের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

পশুপক্ষীর ব্যবহারের এই চিত্র বাস্তবতায় উজ্জ্বল। সহৃদয়তার দৃষ্টিতে পশুপক্ষীর জগৎকে যে দেখিয়াছে কেবল তাহার পক্ষেই এইরূপ পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন ত্রৈলোক্যনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল কল্পনাশক্তি তেমন ছিল না। বস্তুতঃ দিব্য কল্পনাশক্তির যেন তাঁহার কিছু অভাব ছিল। আর কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য ব্যতীত কেহই শিল্পের চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-শিল্পীরও প্রচুর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সত্য বলিতে কি—অনেক সময়েই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীগণ উঁচুদরের কবিও বটে—যেমন মলিয়ের, এরিস্টফেনিস এবং হায়নে। এই কল্পনাশক্তির অভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীদের অন্যতম হইতে পারেন নাই, শ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্যঙ্গশিল্পী মাত্র হইয়া আছেন। তাঁহার রচিত বাঙাল নিধিরাম কোন কোন স্থানে হুগোর 'Toilers of the Sea'র অনুক্রমণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা লেখকের অভিপ্রেত কি না জানি না। কিন্তু এ দাবী করা উচিত নয়। বাঙাল নিধিরামে সহৃদয়তা গুণ আছে, পর্যবেক্ষণশক্তির অভাব নাই, গল্প বলিবার ক্ষমতাও অসাধারণ কিন্তু হুগোর কাব্য-উপন্যাসের এবং তাঁহার সমস্ত রচনার-ই যাহা প্রধান গুণ সেই অলৌকিক কল্পনাশক্তি কোথায়? হুগোর যে কল্পনার নিকটে সমুদ্রও গোস্পদ—সেই কল্পনা কোথায়? হুগোর কল্পনা ও ভাষার কোটালের বন্যা না থাকিলে তাঁহার কাব্যের (Toilers of the Sea কাব্যছাড়া আর কি?) অনুসরণ করিবার আশা বৃথা। যে গুণে হুগোর মহত্ত্ব, সেই গুণেই ত্রৈলোক্যনাথের দীনতা—কাজেই হুগোকে অনুসরণ করিবার শক্তি তাঁহার স্বল্পতম! বরঞ্চ তিনি ভল্‌টেয়ার বা সুইফ্‌টের কোন গ্রন্থের ভাবানুসরণ করিলে আশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গদৃষ্টি, জীবন-দর্শন, বিশেষ শক্তি ও বিশেষ শক্তির অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এবার তাঁহার শিল্পের টেকনিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলিবার সহজাত শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তি অতিশয় বিরল। গল্প অনেকেই লেখেন—কিন্তু গল্প বলিবার ভঙ্গী সাহিত্য হইতে প্রায় লোপ পাইবার মুখে। সাহিত্য লিখিত-আকার ধারণ করিবার পূর্বে গল্প বলিবার ভঙ্গী মানব-সমাজে প্রচলিত ছিল—কিন্তু

তাহা লুপ্তপ্রায়। এখন আমরা গল্প পড়ি—গল্প শুনি না। ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প বলিবার আদিমশক্তি বিদ্যমান। সে গল্পও আবার বাংলায় যাহাকে আষাঢ়ে গল্প বলে। এ শক্তি বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল বলিলেও চলে।

আরব্যোপন্যাস এখন লিখিত-আকার ধারণ করিলেও তাহার মধ্যে মূল কথনগুণ এখনো যেন ধ্বনিত। ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় গল্প পড়িতেছি না—অদৃশ্য কথক বলিয়া যাইতেছে—আমরা শুনিতেছি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আরও একটি কারণে আরব্যোপন্যাসের উল্লেখ করিতে হইল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের টেক্‌নিক বস্তুতঃ আরব্যোপন্যাসের টেক্‌নিক। এই অমর কাব্য উপন্যাস নয়—আবার গল্পও নয়—অফুরন্ত গল্প-শৃঙ্খল। একটি গল্পের সহিত আর-একটি গল্প গ্রন্থিযুক্ত হইয়া শ্রোতার অন্তহীন মনোযোগের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গ্রন্থই গল্পের শৃঙ্খল। কঙ্কাবতী, পাপের পরিণাম, ফোকলা দিগম্বর ও বাঙাল নিধিরাম ব্যতীত আর সব রচনাই গল্পের মালা ছাড়া আর কিছু নয়। ডমরুধর চরিত, মজার গল্প, মুক্তামালা, এমন কি লুল্লু—সবই গল্পসমষ্টি। এগুলি উপন্যাসও নয়—ছোট গল্পও নয়—একটি কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলি গল্পের সমষ্টি মাত্র। একটা শক্ত কাঠামোর মধ্যে সমস্ত বিষয়টাকে ঘনীভূত করিয়া আঁটিয়া দিলে কথনগুণ অনেক পরিমাণে লোপ পায়। সে চেষ্টা লেখক করেন নাই। শিথিলপিনদ্ধ ফ্রেমের মধ্যে বহুতর গল্পকে সন্নিবেশ করিয়া রস জমাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ সহজ গুণ নয়।

তাঁহার রচনার আর-একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়িবে। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের উপাদান ভূতপ্রেত, দৈত্য দানা। স্বপ্ন বা তজ্জাতীয় অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা তাঁহার অন্যতম প্রকাশপন্থা। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ভুতুড়ে গল্পের লেখক বলিয়া সংক্ষেপে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাঁহার উপাদান ভূত প্রেত—কিন্তু কেবল ভুতুড়ে গল্প বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

সুইফট্ গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তে ক্ষুদ্রকায় লিলিপুট ও অতিকায় ব্রব্‌ডিংনাগের অবতারণা করিয়াছেন। কি জন্য? মানবচরিত্রের অসঙ্গতি প্রদর্শনই তাঁহার লক্ষ্য। এই অসঙ্গতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রকায়িক ও অতিকায়িক জীবের সৃষ্টি করিয়া তুলনায় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিসামর্থ্যের নিরর্থকতা দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূত প্রেতের আবির্ভাব; মানুষের খেয়াল খুসী ও কল্পনাকে যথেচ্ছ দৌড় দিবার উদ্দেশ্যেই বাস্তব-বন্ধন-বর্জ্জিত স্বপ্ন-প্রসঙ্গের অবতারণা।

মানুষের অসঙ্গতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুলনীয় আবশ্যক। ভূতপ্রেতের সমাজের সহিত মানবসমাজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বহুপ্রচলিত। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতের সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য—ভৌতিক গল্প বলা নয়।

লুল্লু গল্পে একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া গল্পের নায়ক আমীর তাহাকে বশ করিয়া ফেলিল। আমীর বলিতেছে, মানুষ সম্পাদকের গালিতে আর খবরের কাগজ আগের মতন বিকায় না—এখন ভূত সম্পাদক হইয়া ভূতের গালি প্রয়োগ করিলে কাগজ বিকাইবার অধিকতর সম্ভাবনা। ভূতে ও মানুষে এই যে অসঙ্গতি, এবং এই অসঙ্গতিজাত ব্যঙ্গ, ইহা আর কি ভাবে ফুটানো যাইত!

কিম্বা আর-এক স্থলে তিনি বাংলা থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে শব-সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। শব-সাধক আর-সব বিভীষিকাকে জয় করিতে সমর্থ হইল—কিন্তু ভৌতিক সত্তা থিয়েটারের বীরের ভঙ্গীতে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করা মাত্র সে শবাসন ছাড়িয়া পলায়ন করিল—মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ইহা এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে আর কেমন করিয়া দেখানো যাইত?

ঠিক এই একই উদ্দেশ্যে স্বপ্নপ্রসঙ্গেরও অবতারণা তাঁহার রচনায়। কঙ্কাবতীর স্বপ্ন, বীরবালা গল্পে নায়কের মূর্ছা—তাঁহার বক্তব্যপ্রকাশের সমীচীনতম পন্থা। ত্রৈলোক্যনাথ যদি বাস্তবপন্থার লেখক হইতেন তবে এসব দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ব্যঙ্গশিল্পে এগুলি দোষ তো নয়ই—বরঞ্চ এইগুলিই সর্বজনস্বীকৃত বহুসমাদৃত চিরকালীন প্রকাশভঙ্গী।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কঙ্কাবতী সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলাদেশের বহুপ্রচলিত একটি জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসাকারে সামাজিক ব্যঙ্গের এই উর্ণাতন্তু রচিত। ভূতপ্রেত ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি লেখকের প্রিয় টেকনিক ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। কঙ্কাবতীর রোগশয্যায় স্বপ্ন ও প্রলাপই পরবর্তী কাহিনীর বৃহত্তর অংশের বাহন। ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে ভূতের গল্প বা আষাঢ়ে কাহিনী বলিয়া মনে হইলেও ইহা মূলতঃ সামাজিক-ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ও ডন্‌কুইক্‌সটের অপূর্ব কাহিনী প্রভৃতির মতো এই শ্লেষপূর্ণ চমকপ্রদ গ্রন্থ একাধারে বালক ও বয়স্ক দুই শ্রেণীর পাঠকেরই প্রিয়।

পাপের পরিণাম ও ফোকলা দিগম্বরে গল্পের জাল বুনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাপের পরিণাম স্পষ্টতঃ নীতিকথাপ্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। এমন স্থলে গ্রন্থ প্রায়ই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখকের শিল্পকৌশল গ্রন্থখানাকে আশ্চর্যরকমের সজীব ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

বীরবালা একখানা রূপক কাহিনী। খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা, তাহার প্রাচীন গৌরব, ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের যোগস্থাপন প্রভৃতিই কাহিনীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত।

কিন্তু লেখকের বিশিষ্টতম শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে—ডমরুধর চরিত, লুল্লু, নয়নচাঁদের ব্যবসা এবং মুক্তামালার কোন কোন গল্পে।

ডমরুধর ও নয়নচাঁদ তাঁহার দুইটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি—আর শুধু তা-ই নয়—বাংলা সাহিত্যের আসরেও তাহাদের জুড়ি মেলা ভার। ইহাদের বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে আস্ত বই দুখানাই উদ্ধার করিয়া দিতে হয়। তাহার চেয়ে বই দুখানা পড়িয়া লইবার ভার পাঠকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল।

ত্রৈলোক্যনাথের মতো বাংলা সাহিত্যের একজন মহৎ লেখকের অবলুপ্তির কারণ কি? কারণ যাহাই হোক—ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয় ১৯১৯-এ। ঠিক এই সময়েই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎ-সাহিত্যের আত্যন্তিক জনপ্রিয়তা যে তাঁহার বিস্মৃতির একটি কারণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ঠিক এই একই কারণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সাধারণ পাঠকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়াছেন। অথচ ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতোই অসাধারণ। তবে এমন কেন হইল? শরৎ-সাহিত্যের সর্বজনবোধ্যতা, সহজ-সম্বেদ, ভাষার উজ্জ্বলতা ও ঈষৎলঘু ভাবালুতার নিকটে পূর্বোল্লিখিত লেখকদ্বয়ের ব্যঙ্গ, রঙ্গ ও কশাঘাত, উদ্দেশ্যমূলক হাসি, এবং

বুদ্ধির প্রতি আবেদন পরাজিত হইয়াছে। অশ্রুর নিকটে হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেদনের নিকটে বুদ্ধির পরাজয়। ইহা স্বাভাবিক হইলেও যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা। বাঙালী পাঠকের কাছে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের আবেদনই অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে—শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা তাহারই একটি প্রকাশ। ত্রৈলোক্যনাথ বিস্মৃতপ্রায় হইলেও তাঁহার বিশিষ্ট রচনানীতি লুপ্ত হয় নাই। পরশুরাম ও আধুনিকতর কোন কোন লেখকের ব্যঙ্গরচনায় তাঁহারই ধারা প্রবাহিত। কাজেই তাঁহার প্রতিভা বন্ধ্যা নহে—পরবর্তী অনেক রচনার জননী।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমারের রচনায় চিরকালীন বস্তুর অভাব নাই। কাজেই তাঁহাদের ক্ষণিক অবলুপ্তি স্থায়ী নশ্বরতা নহে। তাঁহাদের রচনার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এখন উদ্‌যোগী প্রকাশকগণ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর সহজলভ্য নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির করিলে এই আবির্ভাবের স্পৃহনীয় আনুকূল্য করিবেন। তাঁহাদেরও ক্ষতি হইবে না—আবার বাঙালী পাঠকগণও লাভবান হইবেন। *

* এই প্রবন্ধ-রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সকৃতজ্ঞ সাহায্য স্বীকৃত হইল।

১। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড। (বসুমতী)

২। বঙ্গভাষার লেখক

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস —ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন

৪। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় —শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থপঞ্জী মুদ্রিত আছে।
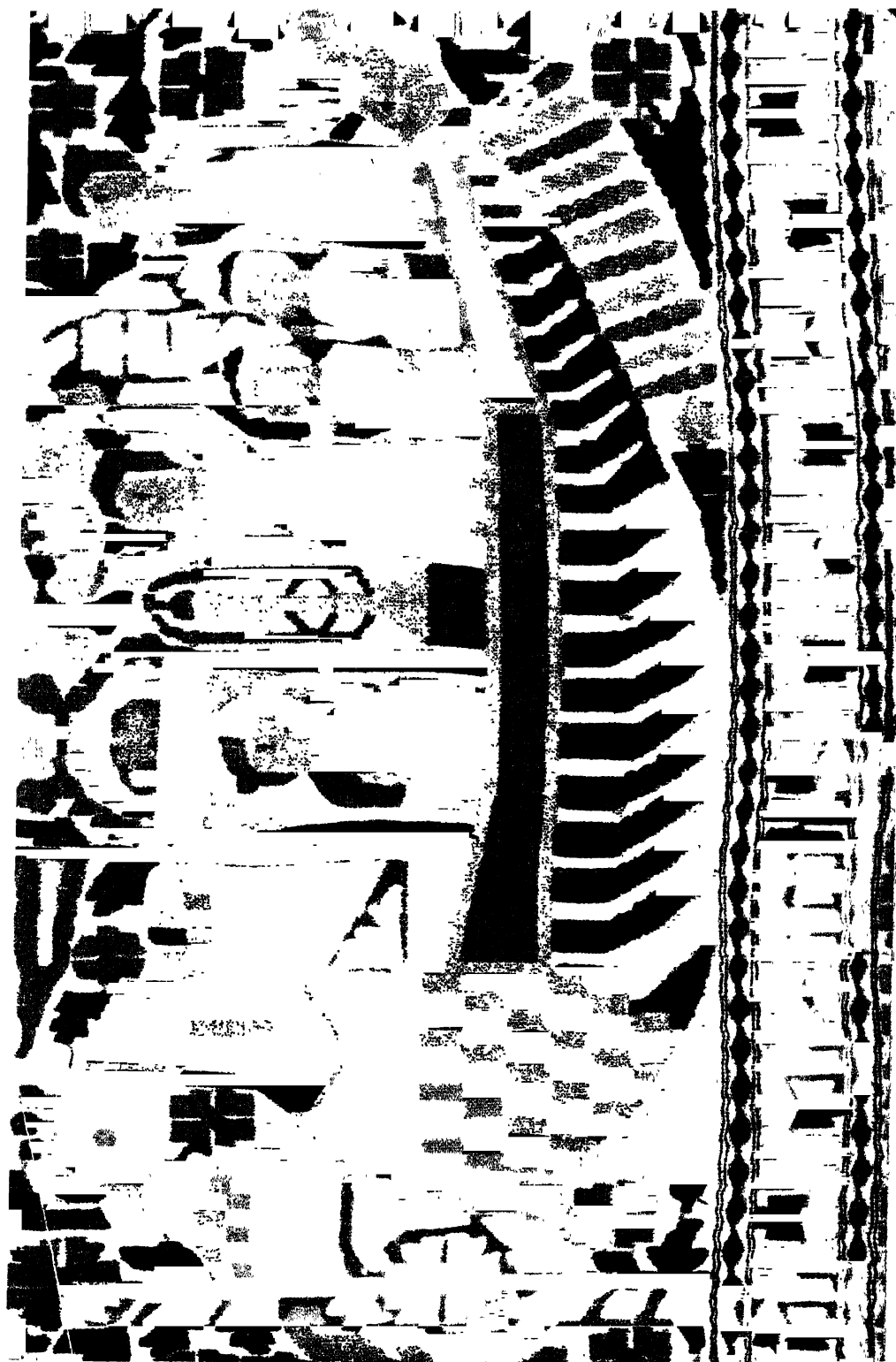
আমাদের সাহিত্যে ভূতের-গল্প

শ্রীসুকুমার সেন

দেশ কাল ও সমাজ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মনে অল্পবিস্তর ভূতের ভয় অর্থাৎ অজানিতের আতঙ্ক আছেই। জ্ঞানের পরিধি যেমন বেড়ে যাচ্ছে আর বিজ্ঞানের আলো যেমন উজ্জ্বলতর হচ্ছে আধুনিক মানুষের মন থেকেও তেমনি আদিম সংস্কারজাত অহেতুক ভূতের ভয় লোপ পাচ্ছে। কিন্তু যে-সংস্কার মানুষের মজ্জাগত, যা মৃত্যুভয়েরই উল্‌টো পিঠ মাত্র, তা কখনোই মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন থেকে একেবারে মুছে যেতে পারে না। একথা সত্য যে এখন সুস্থমস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তি প্রত্যুষের আলো-আঁধারিতে ব্রহ্মদৈত্যের পীঠস্থান বলে প্রখ্যাত বেলগাছতলা দূর থেকে এড়িয়ে যায় না; অথবা দিবা দ্বিপ্রহরে নির্জন নিঃসীম প্রান্তর মধ্যস্থিত নিঃসঙ্গ ঝুপসি বৃদ্ধ বটগাছের ডালপালায় দৈত্যদানার দ্রুততাল মালঝাঁপ কল্পনা করে দ্রুততর বেগে পদচালনা করে না; কিংবা হেমন্তের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় গ্রামপ্রান্তে ছায়া গভীর দীঘির পাড়ে সুবিপুল তেঁতুলগাছের ঘনপল্লব চিক্কণ সুনিবিড় ঝিঁঝিঁ-ডাকা অন্ধকারে গলাশী-কন্ধকাটার নীরব সভা অনুভব করে কম্পিত হৃদয়ে পাশ কাটায় না; বর্ষানিশীথে বঙ্কিম গ্রামপথপ্রান্তে অশান্ত বেণুকুঞ্জে প্রেতিনী-শঙ্খিনীর দ্বন্দ্বকোলাহল স্মরণ করে শয়িত বংশশাখা উল্লঙ্ঘন করতে ইতস্তত নাও করতে পারে; কিন্তু এমন ডানপিটে সাহসী কজন আছেন যাঁরা—অবশ্য "কারণ" আদি না করে—জঙ্গলাক্রান্ত গ্রামের ফৌতি পড়ো ভিটায় জীর্ণ দালানের বিজন কক্ষে অকম্প্রবক্ষে সুখসুপ্তিতে রাত্রি ভোর করতে পারে।

আসল কথা, ভৌতিক ভীতির মূল শুধু প্রত্যক্ষের অগোচর বাস্তবকায়াহীন সত্তার অস্তিত্ব কল্পনায় নয়। প্রাণের নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মৌলিক অসহায়তাভীতির মধ্যেই এর বীজ রয়েছে। উপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে; সৃষ্টির পূর্বক্ষণে সিসৃক্ষু ব্রহ্ম নিজেকে একেলা দেখে ভয় পেলেন, এই ভয় ভেঙে তিনি আনন্দ প্রবর্তন করলেন জগৎ সৃষ্টির দ্বারা নিজের একাকিত্ব দূর করে। "সোঽবিভেৎ তস্মাদ্ একাকী বিভেতি"—উপনিষদের মিতভাষিণী উক্তিতে এই যে নিঃসহায় একাকিত্বের অহেতুক ভীতি এই-ই ভূতের ভয় প্রভৃতি সর্ববিধ অনির্দেশ্য আতঙ্কের বীজ।

সংস্কৃতির প্রসারে যেমন ভূতের ভয়ের মাত্রা হ্রাস হয়েছে তেমনি ভূতের-গল্প শোনবার আগ্রহ বেড়েছে। সত্যকার ভূতের ভয় থাকলে কেউ ভূতের-গল্প শুনতে চায় না। আদিম সংস্কার প্রবল থাকলে মানুষের মনে রসবোধের উপযুক্ত নিরাসক্তি ও বিশ্লেষণপ্রবণতা আসে না। তাই সাহিত্যে ভূতের-গল্পের প্রবর্তন হয়েছে অনেক দেরিতে। সেকালে ভূতের-গল্প বিশুদ্ধ গল্প, অর্থাৎ সাহিত্যরসের বাহন মাত্র ছিল না। তখন ভূতের-গল্পের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ভয়েরই উদ্দীপন, দুরন্ত ছেলেকে সন্ধ্যার পর সহজে শান্ত করে ঘুম পাড়াবার উপায় মাত্র। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নানাদিক দিয়ে খুব উন্নত ছিল; ভূতের-গল্পও একেবারে উপেক্ষিত হয় নি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ভূতের-গল্প ভীতিরসের বাহন নয়, নীতিকথার সরসসম্পুট রূপেই তার গৌণ প্রয়োগ। তবে ঐতিহাসিক বিচারে ছোট গল্পের মত ভূতের-গল্পেরও বীজ মেলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদেহরাজ জনকের সভায় ব্রহ্মজ্ঞান-আলোচনা প্রসঙ্গে যে ভূতে-পাওয়ার কথা আছে তাই আমাদের সাহিত্যে সবচেয়ে পুরানো তথাকথিত "সত্যঘটনামূলক" ভৌতিক কাহিনী। এই অংশটুকু উদ্ধৃত করছি।

অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈর্ম। তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি। সোঽব্রবীৎ সুধন্বাঙ্গিরস ইতি। তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামাথৈনমব্রূম ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি।......

অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষ্ববসাম পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ ভার্য্যা গন্ধর্বগৃহীতা। তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎ সূত্রং যেনায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধাণি ভবন্তীতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ ভগবন্ বেদেতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং যমিমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্ বেদেতি।

[তার পর ভুজ্যু লাহ্যায়নি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা যখন ছাত্ররূপে মদ্রদেশে ঘুরছিলুম তখন একবার পতঞ্চল কাপ্যের ঘরে উঠেছিলুম। তাঁর এক কন্যা ছিল ভূতে-পাওয়া। সেই ভূতকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তুমি কে?' সে বলেছিল, 'আমি সুধন্বা আঙ্গিরস।' তাকে আমরা লোকের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'পরিক্ষিতের বংশধর সব গেল কোথায়?' "......

তারপর উদ্দালক আরুণি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা যজ্ঞ শিখবার জন্য মদ্রদেশে ছিলুম পতঞ্চল কাপ্যের ঘরে। তাঁর স্ত্রী ছিল ভূতে-পাওয়া। সেই ভূতকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'আপনি কে?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি কবন্ধ (কন্ধকাটা?) আথর্বণ।' তিনি পতঞ্চল কাপ্যকে ও যাজ্ঞিকদের বলেছিলেন, 'কাপ্য, জান কি তুমি সেই সূত্রকে যাতে করে ইহলোক ও পরলোক ও সমস্ত সত্ত্ব দৃঢ় আবদ্ধ রয়েছে?' পতঞ্চল কাপ্য উত্তর করেছিলেন, 'না ভগবন্, আমি তা জানি না।' তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও যাজ্ঞিকদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাপ্য, জান কি তুমি সেই অন্তর্যামীকে যিনি অন্তরে থেকে ইহলোক ও পরলোক ও সমস্ত সত্ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করছেন?' পতঞ্চল কাপ্য বলেছিলেন, 'না ভগবন্, তাঁকে আমি জানি না।' "]

মিডিয়ামের সাহায্যে প্রেতাত্মার আবির্ভাব করিয়ে অতীত-অনাগত ঘটনার জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-বিদ্যার উপার্জন তখনো তা হলে অজ্ঞাত ছিল। প্রেতাত্মা দুটির গোত্রও অনুধাবনযোগ্য। একজন অঙ্গিরস্ গোত্রের, অপরটি অথর্বন্ গোত্রের ভূত। বৈদিক যুগে ভূতের রোজা ও তন্ত্রমন্ত্রের কারবারীরা সব এই দুই গোত্রেরই লোক ছিলেন।

বৈদিক-পরবর্তী সাহিত্যে, অর্থাৎ সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে, কখনো কখনো কিংবদন্তীমূলক ও নীতি-উপদেশাত্মক গল্পে যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি ভৌতিক পাত্রপাত্রীর অবতারণা হয়েছে। এরকম গল্পকে ঠিক ভূতের-গল্প বলা চলে না, কেননা এখানে কাহিনীতে আগাগোড়া বিভীষিকার বাতাবরণ-সৃষ্টির প্রয়াস নেই; অপদেবতা এখানে কেজো ভূত বা convenient ghost মাত্র; এখানে গল্পের আসল রস হচ্ছে বিস্ময়, ভীতি নয়। তবে লোমহর্ষণ আখ্যান অথবা বীভৎস ঘটনা ভূতের-গল্পের একমাত্র কিংবা প্রধান উপাদান মনে করা ভুল। ভূতের-গল্পের রসবস্তু হচ্ছে বর্ণনকৌশলে ভীতিজনক সোৎকম্পে পরিবেশের অবতারণা করে ছায়াতরল বিমূঢ় অনির্দেশ্য আতঙ্কের সৃষ্টি। আমাদের দেশে শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যার নিরাপদ গৃহকোণে "রুধিয়া জানালা সাসি" জমাট হয়ে বসে, অথবা বিলাতে

বড়দিনের তুহিনপাতবিজন নিশীথে নিস্তব্ধ parlour-এ অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে ভূতের-গল্প শুনতে শুনতে চারপাশের বাস্তব ভরসাকে ছাপিয়ে মনের মধ্যে যে নিবিড় ভীতি-ঔৎসুক্যশিহরণ জেগে ওঠে তার নাম দিতে পারি "ভীতিরস"। এ রস অলঙ্কারশাস্ত্রের নবরসের বাইরে; এ রস রৌদ্রও নয় বীভৎসও নয়। এই ভীতিরসের অখণ্ডতাব অভাবেই আমাদের পুরানো সাহিত্যের অতিলৌকিক গল্প নীতিকথা-উপকথার পর্যায়েই রয়ে গেছে, আধুনিক ভূতের গল্পের রসরূপ পায়নি।

তবে একেবারেই যে পায়নি, তাই বা কেমন করে বলি। বেতাল পঞ্চবিংশতির পটভূমিকায় যে ছবি আঁকা হয়েছে তাতে অল্প আয়োজনেই ভীতিরসের পরিপূর্ণতা উদ্বেল হয়েছে। শীতকাল, কৃষ্ণ-চতুর্দশীর নীরন্ধ্র নিশীথ, লুপ্তচন্দ্রতারক আকাশের মৃদু বর্ষণ, ঝড়ো হাওয়া হা-হা করে বইছে; নগর-বাহিরে বিজন প্রান্তরে শ্মশানভূমিতে ভিজে অন্ধকার যেন থেকে থেকে "অশিবৈঃ শিবারুতৈঃ" কেঁপে কেঁপে উঠছে; বিক্রমাদিত্য চলেছেন একাকী সত্যরক্ষা করতে—তান্ত্রিক যোগীর সাধকসঙ্গী হয়ে শিংশপা বৃক্ষে উর্দ্ধপদ অধঃশির দোদুল্যমান শবদেহ কাঁধে করে বয়ে আনতে।—আমাদের দেশের গল্পের ভৌতিক আতঙ্কের প্রায় সব মামুলি উপাদানই রয়ে গেছে এই ছবিতে।

অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকগুলি ভালো ভালো ভূতের-গল্পের বীজ নষ্ট হয়ে গেছে নীতি-কথার কিংবা রসিকতার ঊষর ভূমিতে পড়ে। যেমন ভোজপ্রবন্ধের গল্পটি যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কালিদাসের প্রত্যুৎপন্নকবিত্বশক্তির জয়ঘোষণা। গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বলছি। হানাবাড়ি উপলক্ষ্য করে কাহিনীর পটভূমিকা ফাঁদা হলেও এতে ভীতিরস সৃষ্টির একটুও প্রয়াস নেই।

ভোজরাজা নোতুন বাগানবাড়ি করিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আগেই তা দখল নিয়েছে এক ব্রহ্মদৈত্য যে গতজন্মে ছিল একজন বড় বৈয়াকরণ পণ্ডিত। রাত্রিতে সে বাড়িতে কেউ তিষ্ঠতে পাবে না ব্রহ্মদৈত্যের প্রশ্নের জ্বালায়। তাব প্রশ্ন হচ্ছে পাণিনির ব্যাকরণের একএকটি সূত্র। পাণিনির সূত্র প্রশ্নরূপে উপস্থাপিত হলে স্বয়ং পাণিনিরও সাধ্য ছিল না উত্তর দেবার। অতএব কেউই জবাব দিতে পারত না। বুদ্ধিমানদের পালিয়ে আসতে হত, হঠকারীরা প্রাণটি রেখে আসত। কালিদাসের কানে এই ভূতুড়ে বাড়ির খবর পৌছলে তিনি রাজার কাছে বাড়িটি চাইলেন। রাজাও "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" করে স্বস্তি লাভ করলেন। রাত্রিতে কালিদাস একলা গেলেন বাড়ির দখল নিতে। সন্ধ্যার পর খানিকক্ষণ বেশ নির্বিঘ্নে কাটল। প্রথম প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি থেমে যেতেই ব্রহ্মদৈত্য আবির্ভূত হয়ে প্রশ্ন করলে কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। ব্রহ্মদৈত্য তখনকার মত চলে গেল। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের শেষেও ঐরকম ঘটল। চতুর্থ প্রহরের শেষে কালিদাসের উত্তরে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মদৈত্য বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বৈয়াকরণ-ভূতের সঙ্গে কবি-মানুষের লড়াইয়ে এই ব্যবহারিক-নীতি শ্লোকটি ব্যাকরণের সূত্রে মন্দাক্রান্তা ছন্দে গাঁথা হয়ে রইল।

ব্রহ্মদৈত্য "সর্বস্য দ্বে"

কালিদাস সুমতি-কুমতী সম্পদাপত্তিহেতূ

ব্রহ্মদৈত্য "বৃদ্ধো যূনা"

কালিদাস সহ পরিচয়াৎ ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ

ব্রহ্মদৈত্য "একো গোত্রে"

কালিদাস প্রভবতি পুমান্ যঃ কুমারং বিভর্ত্তি
ব্রহ্মদৈত্য "স্ত্রীপুংবচ্চ"
কালিদাস প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্ ॥

[সুমতি-কুমতি দুটি সকলের সম্পদ-বিপদের হেতু ; যুবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে কামিনীরা বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করে ; গোষ্ঠীর মধ্যে তারই বেশি খাতির যার পুত্রসন্তান হয়েছে ; স্ত্রীলোক যদি পুরুষের মত কর্তৃত্ব করে তবে ঘর হয় নষ্ট।]

বাংলা দেশের প্রচলিত উপকথায় ও ছেলে-ভুলানো গল্পে আদ্যন্ত একান্তভাবে ভয়ের পরিবেশ পাওয়া যায় না। এ-সব গল্পে অপদেবতা সাধারণত ভালোমানুষ ভূত (benign ghost) অথবা কেজো ভূত (profitable ghost) কিংবা ঘরো ভূত (domestic ghost)। তবুও এক-আধটি ছোট ছোট গল্পে ভীতিরস উপচিত হয়েছে। যেমন থালু-মালুর গল্পে।[১]

আমাদের দেশে দু-তিন শ বছর আগে ছেলে-ভুলানো গল্প ছাড়া কি ধরনের ভূতের গল্প চলিত ছিল তা জানবার উপায় নেই। তবে সেকালের "সত্যঘটনামূলক" ভৌতিক কাহিনীর একটু দুর্লভ নিদর্শন সম্প্রতি পেয়েছি একতাড়া পুঁথির মধ্যে একটি পাতড়ায়।[২] পাতড়াটি একটি "ভাষ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থা প্রার্থনা পত্র। পাতড়ার প্রথম পৃষ্ঠায় এই "ভাষ" আছে :—

> শ্রীহরিঃ ॥ পরমপূজনীয় শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বরাবরেষু লিখিতং শ্রীরামকানাঞি দেবশর্ম্মণো নিবেদনপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে বিশেষঃ * * * * আমার একটি ভাদ্দরবধু অসুস্থ হইয়া কথক দিবস ছিলেন * * * * *মৃত্যুর পূর্ব্বে একমাস থাকিতে অচল হইয়া শয্যাগত থাকেন মলমূত্র সেইস্থানে করেন স্বয়ং বসিতে পারেন না এবং তুলসীক্ষেত্র কয়েকবার করা গেছে এমত অচল
> মৃত্যুদিবস সন্ধ্যাকালে দ্বারে শয়ন করিয়াছিলেন * * * * তাহার স্বামী রামনিধি বন্দ্যোপাধ্যায় কোলে করিয়া লইয়া ঘরে শয়ন করাইলেন * * * * তাহার পর সেই ঘরের নিকট পাঁচ সাত হাত অন্তরে অপর ঘরের দ্বারে আমার তিন ভাই অপর স্ত্রীলোক প্রভৃতি সমস্ত সন্ধ্যাকাল অবধি বসিয়া আছি * * * * তাহার পর ৬ দণ্ড কিংবা ৭ দণ্ড রাত্রি মধ্যে ভোজন করিয়া তাহার স্বামী ঘরে গিয়া দেখেন শয্যাতে নাই * * * * না দেখে আমাদিগ্যে কহিলেন এ বধু শয্যা হতে কোথা গেল * * * * আমরা শুনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম * * এ অচল কিরূপে গ্যালেন * * * * তাহার পর আমরা সকল অপর পড়স একে একে সমস্থ একত্তর হইয়া প্রদীপ ও মশাল লয়িয়া বাটিঘর ও বাটির নিকট পুষ্কর্ণী সমস্ত খোজা গেল পাইলাম না * * * * তাহার পর বাটির অন্তর ৪ কুড়া[৩] কি ৫ কুড়া অতীত হইয়া একটি গেড়্যা পুষ্কর্ণী জলেতে পড়িয়াছিল পাইলাম * * * * নিশ্চয় করিলাম নিতান্ত ভৌতিক বিষয় নতুবা অচল ব্যক্তি কিমতে আইসে * * * * তাহার পর প্রমাদ মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ঔর্দ্ধদেহাদি ক্রিয়া সমস্ত করা গিয়াছে * * * * এখন মহাশয়েরা কর্ত্তা * * * * এ বিষয় শাস্ত্রসিদ্ধ হইছে কিম্বা না হইয়া থাকে আপনারা যেমত ব্যবস্থা আজ্ঞা করিবেন সেই প্রমাণ * * * * নিবেদনমিতি ॥

---

১ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত-পেত্নী'-তে (১৩১০) সঙ্কলিত।
২ শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল, এম. এ. কর্তৃক সংগৃহীত।
৩ অর্থাৎ বিঘা।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও ব্যাপারটি ভৌতিক ভেবে ব্যবস্থা অনুমোদন করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন নিজেদের স্বাক্ষরে পাতড়ার অপর পৃষ্ঠায়,

> শ্রীশ্রীরাম শরণং * * * * এতৎ লিপ্যর্থানুসারেণৈতৎ ভৌতিকচরণং অত ঔর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া সিদ্ধেতি সতাং মতম্। * * * * শ্রীকৃপারাম দেবশর্ম্মণাম্ * * * * শ্রীরামসুন্দর দেবশর্ম্মণাম্ * * * * শ্রীরামদেব শর্ম্মণাম্।
>
> শ্রীশ্রীরামঃ শরণং * * * * এতৎ পত্রানুসারেণ প্রায়শ্চিত্তাভাব * * * * শ্রীনিমানন্দ দেবশর্ম্মণাম্।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছিল মহামারী রূপে। তার ফলে অনেক গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল। অনেকে মনে করেন এর থেকে একধরণের চলিত ভূতের-গল্পের সৃষ্টি হয়েছে ; যেমন মৃত শাশুড়ী কর্ত্তৃক জীবিত জামাতার আতিথ্যপরিচর্যা। বিলাতেও সপ্তদশ শতাব্দীতে Black Death মড়কের পর অনুরূপ ভূতের-গল্পের চলন হয়েছিল।

ইংরেজি সাহিত্যে অনেক ভালো ভূতের-গল্প আছে। আমেরিকায়ও অনেক ভালো ভূতের-গল্প লেখা হয়েছে। আমাদের সাহিত্যের সকল ধারায় যেমন ভূতের-গল্পেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ সর্বাতিশায়ী। 'ক্ষুধিত পাষাণ' বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্যরসপরিপূর্ণ ভূতের-গল্প। 'মণিহারা'-র কাহিনী আমাদের traditional ভূতের-গল্পের পথ অনুবর্ত্তন করেছে। 'মাষ্টারমশায়'-এর উপক্রমণিকাও বেশ জমাট ভৌতিক কাহিনী। এই তিনটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। ক্ষুধিত-পাষাণের পরিকল্পনা যুগিয়েছে কৈশোরে শাহীবাগ প্রাসাদের অভিজ্ঞতা। মণিহারার কাঠামো রবীন্দ্রনাথ প্রথম শুনিয়েছিলেন কুচবিহারের মহারাণীকে। বিপিনবিহারী গুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমায় বলিতেন—আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছেন, একটি ভূতের গল্প বলুন।—আমি যত বলিতাম যে আমি ভূত দেখি নাই, তিনি ততই মাথা নাড়িতেন, বলিতেন,—না, কথনই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন।—অগত্যা আমাকে একটি ভূতের গল্পের অবতারণা করিতে হইল।—ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী, কঙ্কালের খট্‌খট্ শব্দ, এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া আমি 'মণিমালিকা' গল্পটি তাঁহাকে শুনাইলাম।"[১]

মণিহারার কাহিনী সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতালব্ধ না হলেও এর পিছনে তাঁর প্রগাঢ় বাস্তব অনুভূতির প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। ফণিভূষণ সাহা রবীন্দ্রনাথের বেনামদার নয় জানি, কিন্তু এটা সত্যি যে তিনিও এককালে পাটের ব্যবসা করে কিছু টাকা জলে দিয়েছিলেন।

মাষ্টারমশায়ের উপক্রমণিকায় প্রত্যক্ষ অনুভূতির তীব্র ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। কাহিনীর প্রথম পরিকল্পনা যে উপলক্ষ্যে ও যে ভাবে হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন।[২] এটুকুও একটি চমৎকার ভূতের-গল্প বলে এখানে উদ্ধৃত করছি।

"একদিন Woodlands-এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, নাটোরের মহারাজও তথায় উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মহারাণী বলিলেন—"রবিবাবু, এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন, আপনি যে ভূত দেখেন নাই তা হতেই পারে না।" অগত্যা আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, তবে একটা ঘটনা বলিতে

১ রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩। ২ ঐ।

পারি ; নাটোরের মহারাজ সেই ঘটনার কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কতকদূর পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারেন। একদিন নিমন্ত্রণ পার্টি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইল। নাটোরের মহারাজ বলিলেন, রবিবাবু আমার গাড়ী প্রস্তুত, আসুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতে পারিব। অনেক দূর গিয়া আমি মহারাজার গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, বলিলাম—'কোথায় আপনার বাড়ী আর কোথায় জোড়াসাঁকোয় আমার বাড়ী, অত ঘুরিয়া যাওয়া আপনার নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুবিধাজনক, আমি এইখান হইতে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া যাইতে পারি।' মহারাজার সনির্ব্বন্ধ নিষেধ আমি মানিলাম না। কিন্তু পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি একটু থামিলাম। মহারাণী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তার পর ?' আমি বলিলাম—'একখানা মাত্র ভাড়াটিয়া গাড়ী চৌমাথায় দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়োয়ানকে বলিলাম—'জোড়াসাঁকোয় অমুক জায়গায় আমাকে লইয়া চল।' সে কিছুতেই রাজি হইল না। নাটোরের মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, 'ভাড়াটিয়া গাড়ীর টিকিট লইয়া এখানে রহিয়াছ, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, নহিলে পুলিসের হাতে দিব ;—এই বলিয়া তাহার গাড়ীর নম্বর টুকিয়া লইলেন। পুলিসের ভয়ে সে রাজি হইল। আমি গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। মহারাজ চলিয়া গেলেন।

"আমি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম যে আমার পরিচিত বড় রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিতেছে না, অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিয়া গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। কিছু বলিলাম না ; ভাবিলাম বোধ হয় সহজেই বাড়ী পৌঁছাইব। কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। হঠাৎ বোধ হইল যেন গাড়ীর মধ্যে আমি একাকী বসিয়া নহি ; কে যেন আমার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে ; আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম, কিছুই হাতে ঠেকিল না ; আবার চুপ করিয়া বসিলাম, আবার সেই রকম যেন মনে হইতে লাগিল, মনটা যেন কেমন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল ; গাড়ীর পিছনে যে ছোকরা বসিয়া ছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওরে তুই ভিতরে এসে বোস্।' সে বলিল—না বাবু, 'আমি ভিতরে যাব না।' যতই আমি তাহাকে আহ্বান করি, ততই জোর করিয়া সে বলিতে লাগিল—'না বাবু, আমি ভিতরে যাব না।' এদিকে গাড়ী একেবারে গড়ের মাঠে রেড রোডের নিকটে গিয়া উপস্থিত। গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম, কোনও ফল হইল না। সেই বিস্তৃত ময়দানে, সেই চন্দ্রালোকিত গভীর নিশীথে, গাড়ী ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। আমার গা ঘেঁষিয়া কি একটা যেন জিনিষ রহিয়াছে অনুভব করিতে লাগিলাম, সবলে দুই হাত দিয়া সেটাকে যেন ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম। সহসা দেখিলাম যেন গাড়ীর ভিতরে একটা বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম ; মাথা ঘুরিয়া গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিলাম ভোর হইয়া আসিতেছে, এবং আমাদের বাড়ীরও সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি।

"পরদিন নাটোরের মহারাজকে রাত্রির কথা বলিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেলেন। দারোগা আমাদের কাহিনী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের গাড়ীর নম্বর কত ? নম্বর শুনিয়া বলিল,—'আপনারা যদি কাল রাত্রে গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া থানায় আসিতেন তাহা হইলে এমন হায়রান্ হইতে হইত না। অনেকদিন হইল একজন কেরাণী আপিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ঐ গাড়ী করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া ঐ গাড়ীতেই আত্মহত্যা করে। তদবধি রাত্রিকালে ও গাড়ীতে লোক

চড়িলেই ভয় পায়। আমরা তাহা জানিতে পারিয়া পাছে ঐ গাড়ীর লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দি, এই ভয়ে গাড়োয়ানটা রাত্রে আর সওয়ার লয় না।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিলাম। কুচবিহারের মহারাণী বলিলেন, 'অ্যাঁ, সত্য নাকি?' আমি হাসিয়া বলিলাম—'না মোটেই সত্য নয়, গল্প করিলাম মাত্র।"

ভূতের-গল্পের আসর জমাতেও রবীন্দ্রনাথ কম ওস্তাদ ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রও ভূতের-গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন শেষ জীবনে, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, আরব্ধ নিশীথরাক্ষসীর কাহিনীটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। এই কাহিনীর মূলে তাঁর নাকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যখন কাঁথিতে ছিলেন তখন কর্ম্মোপলক্ষ্যে একবার তাঁকে এক ভূতুড়ে বাড়ীতে রাত কাটাতে হয়েছিল। তাঁহার এই ভৌতিক অভিজ্ঞতা তিনি নাতিদের কাছে অনেকবার বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি ছাপিয়ে ছিলেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ায় আর কোনো নামী লেখক ভূতের-গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন নি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছাড়া। ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্পের প্রধান রস কৌতুক ও বিস্ময়, ভীতি নয়। তাই তাঁর গল্পে ভূত ও মানুষ পরস্পর বন্ধু ও প্রতিবেশী। তবে একটি গল্প, 'পূজার ভূত', ভালো ভূতের-গল্প। কাহিনী বিদেশী গল্প থেকে পরিকল্পিত বলে বোধ হয়। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' যেমন রূপকথার phantasy শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূতপতরীর দেশ'-ও তেমনি ভূতের-গল্পের phantasy, সে কারণে এ দুটি ঠিক ভূতের-গল্পের পর্যায়ে পড়ে না। অবনীন্দ্রনাথের 'পথে-বিপথে'-র 'মোহিনী' গল্পটিতে অতি প্রাকৃতের বেশ সূক্ষ্ম ও শিল্পদক্ষ স্পর্শ আছে, Walter de la Mare-এর লেখার মত।

গত বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালায় কিছু কিছু ভালো ভূতের-গল্প লেখা হয়েছে। তার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি', শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর 'রেবতী' ইত্যাদি দুই-একটি ছাড়া প্রায় সবগুলিই মুখ্যত অল্পবয়সীদের জন্যে লেখা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভালো গল্পগুলির প্লট প্রায়ই বিলাতি গল্প-উপন্যাস থেকে নেওয়া। ছেলেদের জন্য লেখা হলেও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি ভৌতিক কাহিনী বেশ শ্রুতিরোচক ভূতের-গল্প।

ভূত বাদ দিয়েও ভালো ভূতের-গল্প লেখা যেতে পারে। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষমতার দরকার। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' এই ধরণের ভূত-ছাড়া ভূতের-গল্প। গল্পটিতে এক অসুস্থমস্তিষ্ক অনুতপ্তচিত্ত মাতালের ভীতিচঞ্চল মানসে বহিঃপ্রকৃতির সাধারণ ব্যাপার কেমন সহজে ও সুষ্ঠুভাবে ক্ষণিকের জন্য অতিলৌকিক রহস্যময় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। তন্ময় পাঠকও যেন মনের কানে শুনতে পায়—চন্দ্রালোকিত গভীর নিশীথে পদ্মার চরে দূরগামী নিশাচর পাখীর অব্যক্ত কূজনে ও পক্ষস্পন্দনে যেন জীবনের ওপারের ভীতিরহস্যগহন যবনিকার ঈষৎ-উদ্ভিন্ন প্রান্ত থেকে অতৃপ্ত আশাহত বিদেহী সত্তার আর্ত্ত ক্রন্দন ডুকরে উঠছে, "ও কে—ও কে—ও কে গো!"

ভূত-ছাড়া-ভূতের-গল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা'। ভৌতিক কাহিনী না হলেও গল্পটি উৎকৃষ্ট ভূতের-গল্প হয়েছে শুধু ভীতিজড়িত প্লট-পরিকল্পনার দ্বারা

রহস্যময় ঔৎসুক্যরস সৃষ্টির জন্য। এ গল্পটি যখন প্রথম পড়েছিলম প্রবাসীতে তখন যে সোৎকম্প ভীতি-শিহরণ অনুভব করেছিলুম তা এখনো ভুলি নি।

দেশবিদেশের ভৌতিক কাহিনীতে অপদেবতার আকৃতি-প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন আচরণও তেমনি স্বতন্ত্র। হাঙ্গেরীর Vampir (রক্তপায়ী শব), আয়র্লাণ্ডের Banshee (অশুভশংসী ক্রন্দনকারী অপদেবতা), জার্মানীর Poltergeist (খুনসুটে বাস্তভূত), উত্তর-ইয়োরোপের Werewolf (নরবৃক), প্রশান্তমহাসাগরীয় নিগ্রোদের Zombie (জীবিত শব) ইত্যাদির কল্পনা আমাদের দেশে নেই। আবার আমাদের দেশের "গুটিয়া দেও" (বেঁটে ভূত)[১], ব্রহ্মরাক্ষস বা ব্রহ্মদৈত্য, জটাধারী, যখ, দানা বা দানো, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো[২], নিশী, আলেয়া বা উল্কামুখী বা বা পেত্তা পেতী, শাকিনী বা শাঁখচুন্নী, আঁষটে-পেতী[৩], গেছো-পেত্নী, গুয়াশী[৪] কানিপিশাচী[৫], বিষ্টাপ্রেতিনী, গল্‌শে বা গলাশী[৬] বা গলায়-দড়ে, একঠেঙ্গো, কন্দকাটা গোভূত বা গোদানা[৭] ইত্যাদির ধারণাও অন্যত্র নেই।

বিশুদ্ধ উপকথার বাইরে, তথাকথিত "সত্যি" ভূতের-গল্পেরও কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ আছে আমাদের দেশে যার থেকে ভূতের আবির্ভাবের বা অস্তিত্বের এই মামুলি হেতুগুলি নির্দেশ করা যায়—পরলোকে সদ্‌গতির অভাব, স্নেহাস্পদ আত্মীয়-স্বজনের উপকার, গুপ্তধনের সংরক্ষণ, বৈরনির্যাতন ইত্যাদি। ইংরেজিতে চলিত সমস্ত traditional ভূতের-গল্প সংকলিত হয়েছে। এমন কি হানাবাড়ীর কাহিনী সংগ্রহ করে বড় বড় বই হয়েছে; যেমন ইন্‌গ্রামের *Haunted Homes of Great Britain* দুখণ্ড। আমাদের দেশে traditional ভূতের-গল্পে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য অনেক বেশি। এগুলি এখন লোপ পেতে বসেছে। কোন অধ্যবসায়ী সাহিত্যিক যদি এগুলি সংগ্রহ করতে লেগে যান তবে ভবিষ্যতের জন্যে কীর্ত্তি রেখে যেতে পারবেন, এবং বর্ত্তমানেও আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বলেই মনে করি। কিন্তু যে দেশে ডিটেক্‌টিভ গল্প-উপন্যাস এখনো "শিশু"-সাহিত্যেরই একচেটে সেখানে ভূতের-গল্পের সংগ্রহে অকস্মাৎ প্রাবীণ্য-বুদ্ধি আশাতীত মনে হয়।

১ হিন্দুস্থানী ভূতবিশেষ।

২ যে পেঁচো ভূতের মুখ বা হাঁ প্রকাণ্ড।

৩ অর্থাৎ মেছো-পেত্নী।

৪ গুহাবাসী বা গুহাপাশিক; অর্থাৎ যে ভূত ঘরের অন্ধকার আনাচে-কানাচে পথের বাঁকে ঝুপসি ঝোপে লুকিয়ে থাকে আর একাকী লোক পেলে জাল, কাপড়, বস্তা বা ঐ রকম কিছু চাপা দিয়ে মেরে ফেলে।

৫ যে পেত্নী ছেঁড়া নেকড়া ঘাঁটাঘাঁটি বা কাচাকাচি করে।

৬ গলপাশিক; অর্থাৎ গলায় পাশ (দড়ি) দিয়ে মরে যে ভূত হয়েছে।

৭ আমাদের দেশের সবচেয়ে বিশিষ্ট গৃহপালিত পশু হচ্ছে গোরু, তাই ইতর প্রাণীদের মধ্যে গোরুই ভূত-ত্বের গৌরব পেয়েছে। বিলাতের বিশিষ্টতম গৃহপালিত পশু গোরু নয়, ঘোড়া, তাই সেখানে গো-ভূত নেই ঘোড়া-ভূত আছে, এমন কি ঘোড়া-ভূতের "কন্ধকাটা" সংস্করণও আছে।

সমরান্তিক শিল্প-বিবর্তন

শ্রীভবতোষ দত্ত

ভারতবর্ষের যুদ্ধান্তিক অর্থনৈতিক কর্মপন্থার আলোচনাতে অনেক সময় বাস্তববোধের অভাব দেখা যায়। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের দেশের পণ্ডিতদের রচনাতে কুটিরশিল্প, কৃষিকর্ম এবং যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে যে পরিকল্পনাগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি প্রায় একই স্বরে বাঁধা: ফলে, ১৮৯৩তে প্রকাশিত ডক্টর ফোয়েল্কারের রিপোর্ট এবং ১৯৪৪এ রচিত নানাবতী ও আঞ্জারিয়ার ভারতীয় পল্লী-সমস্যার বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যে-জাতীয় উপদেশ বিদেশী বিশেষজ্ঞ দিয়েছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে, তারই পুনরাবৃত্তি আধুনিকতম রচনায়ও পাওয়া যাবে—নূতনের মধ্যে হয়তো বানের জলে জমির লাভক্ষতি, বা মরুভূমির নিকটবর্তী জমির "শুকা" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা, বা রাসায়নিক সার সম্বন্ধে এক-আধটা প্যারাগ্রাফ, কিম্বা 'ভার্নেলাইজেশন' (Vernalisation) বা 'সবুজ সার' (green manuring) সম্বন্ধে দু-একটা আশাপ্রদ ইঙ্গিত। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে উৎপাদকের উৎসাহবর্ধনের দিকেই নজর বেশি; তাই যতকিছু আলোচনা তার সকলেরই লক্ষ্য একরকম—ট্যাক্স কমানো, সংরক্ষণ, ভারতীয় ব্যবসায়ীকে রপ্তানির সুবিধাদান, ভারতীয় উৎপাদককে যন্ত্রপাতি আমদানি করতে সাহায্য করা। গত পনেরো বছরে—অর্থাৎ ১৯৩০-পরবর্তী মন্দা ও ১৯৩৯-পরবর্তী যুদ্ধের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক পটভূমিকাতে যে পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত নন। অথচ নূতন আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী করতে গেলে আমাদের পরিবেশে যে পরিবর্তন হয়েছে তার অনুধাবন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পরিবর্তন এসেছে নানা দিকে। ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনায় ১৮৯০তে রাণাডে, ১৯১৮তে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন, ১৯৩১এ ব্যাঙ্কিং কমিশন ইত্যাদি অনেকেই মূলধনের অভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন—আমাদের দেশে যেটুকু আর্থিক মূলধন আছে সেটা মুখচোরা, তার গতিবিধি জমির ক্রয়বিক্রয় বা বড়জোর কোম্পানির কাগজের বাজারে, যন্ত্রশিল্পের প্রসারে ভারতবাসীর সঞ্চয় সহজে আসতে চায় না। আজকাল পর্যন্ত অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনায় ভারতীয় সঞ্চয়ের লজ্জাশীলতার উপরে গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা যায়। অথচ, গত কয়েক বছরেই ভারতবাসীর সঞ্চয় বহুগুণে বেড়েছে। চল্লিশ কোটি লোকের দেশে যন্ত্রশিল্প কায়েম করতে যতটা মূলধন দরকার হয় ততটা অবশ্য এখনো হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষে আর্থিক মূলধন নেই বা মূলধনের জন্য আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী হতেই হবে এ ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 'বাস্তব মূলধন' আমাদের বিদেশ থেকেই এখনো আনতে হবে, কিন্তু এই আমদানির জন্য যে সঞ্চিত ক্রয়শক্তির দরকার সেটা আমাদের যা আছে তাতে প্রথম অবস্থার কাজ চলে যাবে। এই সঞ্চিত মূলধনের কতটা দেশবাসীর বাধ্যতামূলক সমষ্টিগত ভোগ-সঙ্কোচ থেকে তৈরী (যেমন আমাদের ১৭০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ব্যালান্স) সেটা এখন ইতিহাসের কথা। বর্তমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় এখন এটাই বড় কথা যে আমাদের দেশে আর্থিক মূলধনের প্রাচুর্য না থাকলেও স্বল্পতা নেই।

তারপর দেখি সঞ্চয়ের মুখচোরা ভাব কেটে গিয়েছে। জমিদারি কিনে সঞ্চয় নিয়োগ নানাকারণে এখন আর লোভনীয় নয়—জমিদারের আয়-হ্রাস, আদায়ের অনিশ্চয়তা, প্রতিপত্তিলোপ, নূতন নূতন আইন, রায়তের সঙ্গে গোলযোগের সম্ভাবনা, গভর্মেণ্ট কর্তৃক জমিদারি ক্রয়ের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা

কারণে জমিদারি এখন আর লাভের ব্যবসায় বলে গণ্য হয় না। কোম্পানির কাগজ এবং সরকারি ঋণপত্রের সুদের হার কমে গিয়েছে ; এইসব ঋণপত্রের বাজারে সুদলোভী ক্রেতার চেয়ে দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির আশায় যারা ফটকা খেলে এমন ক্রেতার সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে শেয়ারের বাজার চড়া এবং নূতন শেয়ার বিক্রী করতে কোনো কোম্পানিকে আজকাল বিশেষ বেগ পেতে হয় না। শেয়ারের বাজারে ক্রেতার বাহুল্য গত তিন বছর ধরে আমাদের নূতন পরিস্থিতি এনে দিয়েছে। যুদ্ধের সময়ে অর্জিত টাকার প্রাচুর্য, ব্যয়ের পথের অভাব, হাতের টাকাকে আয়-প্রদ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করবার প্রয়াস এবং সর্বোপরি একটা জুয়াড়ী মনোভাব—সব কিছু মিলে ১৯২৯-এ আমেরিকার ওয়ালষ্ট্রীটের ঘটনা সংস্থানের মত একটা অবস্থা আমাদের ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দুর্ঘটনার আগেই যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও গভর্মেণ্ট শেয়ারের বাজারের অবস্থা স্থির করে আনতে পারেন তবে স্থিতিশীল সঞ্চয়ের গতিশীলতা-উৎপাদনের লাভটা আমাদের থেকে যায়।

এই সম্পর্কে আর একটা বড় পরিবর্তনের উল্লেখ করা যেতে পারে। গত দশ-পনেরো বছরে ভারতে অবস্থিত বিদেশী কোম্পানির শেয়ার বহুপরিমাণে লণ্ডনের বাজার থেকে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে চলে এসেছে। কলকাতার ট্রাম কোম্পানি ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা গঙ্গাতীরের পাটের কলের শেয়ারের কী পরিমাণের মালিক এখন ভারতবাসী তার স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ নেই, কিন্তু পাটের শেয়ারের প্রায় বারো আনা যে আমাদের দেশের লোকের হাতে এসে গিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সবশুদ্ধ ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধন ১৯১৮তে যা ছিল এখন তার এক-তৃতীয়াংশও আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য বলা যেতে পারে যে অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক দীর্ঘমেয়াদে নিযুক্ত বিদেশী ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং তাদের সঙ্গে চুক্তি যতদিন শেষ না হয় ততদিন শেয়ারের মালিক পরিবর্তন হলেও মূলব্যাপারে বিদেশী কর্তৃত্ব থেকেই যাবে। কিন্তু এখানেও দুটি কথা মনে রাখা দরকার—প্রথমতঃ, আগামী দশ-বারো বছরের মধ্যে অধিকাংশ ম্যানেজিং এজেণ্টের চুক্তিকাল শেষ হবার সম্ভাবনা, এবং দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সিগুলিও ভারতবর্ষীয়দের কাছে বিক্রী হতে আরম্ভ হয়েছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীট এখনো ভারতবর্ষের একটা বড় স্নায়ুকেন্দ্র, কিন্তু এই কেন্দ্রের পরিচালকের পরিবর্তন হয়ে আসছে। বিদেশীর হাত থেকে ভারতবর্ষীয়ের হাতে মালিকানা এবং পরিচালনা আসলেই সর্বকার্যোদ্ধার হয়ে গেল বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের লক্ষ্যস্থল প্রায় সমুপস্থিত। বিঠলদাস ঠাকুরসী বেঁচে থাকলে বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে তাঁর বহুল-প্রচারিত মন্তব্য নিশ্চয়ই এখন প্রত্যাহার করতেন।

গত পনেরো বছরে আমাদের দেশের প্রধান পরিবর্তন ভারতীয় মূলধনে পরিচালিত যন্ত্রশিল্পের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা, বিদেশী অধিকারের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব দূর করে তার জায়গায় ভারতীয় ধনিকের প্রভুত্ব-স্থাপন। আশ্চর্যের কথা, ১৯৩০-পরবর্তী মন্দাতে সারা পৃথিবীতে যন্ত্রশিল্পে সঙ্কোচন এসেছিল আর আমাদের দেশে ঠিক এই মন্দার সময়েই শিল্প-বিবর্তন দানা বাঁধে। মন্দার কয়েক বছর আমাদের চাষীদের কী দুরবস্থা হয়েছিল সেটা ভুলে যাবার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু এটা অনেকের নজরেই পড়েনি যে এই মন্দার সময়েই আমাদের দেশের চিনির কারখানাগুলির সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছিল, এতবেশি যে আমাদের চিনির আমদানি ১৯৩০-৩১এ দশলক্ষ টন থেকে ১৯৩৬-৩৭এ মাত্র ২৩,০০০ টনে নেমে এসেছিল। অন্যদেশের মন্দা আমাদের দেশে কোনো কোনো দিকে সুবিধার সৃষ্টি করেছিল ; নূতন মূলধন নিয়োগের

অনধিকৃত ক্ষেত্র ছিল আমাদের দেশে অন্যদেশের চেয়ে বেশি ; উচ্চহারে সংরক্ষণ ক্রেতার উপরে বোঝা চাপিয়ে শিল্পপতির লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল ; আর তার উপরে ছিল নূতন গড়ে-ওঠা সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসায়, কাঁচামালের বাজারে একচেটিয়া ক্রয় এবং শিল্পজ দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া বিক্রয়ের প্রভাব বৃদ্ধি। •১৯৩৯-এ যুদ্ধ বাধবার আগেই এদেশে নূতন ধরণের ধনিকতন্ত্রের সূচনা দেখা গিয়েছে, শতকরা সত্তর জন কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও।

তার পরে ছয় বছরের যুদ্ধে আমাদের অর্থনৈতিক পটভূমিকাতে বিশেষ ভাবে নাড়া পড়েছে। একদিকে গভর্মেণ্টের ব্যয়বৃদ্ধি, ইনফ্লেশন, জনসাধারণের আয় এবং ব্যয়ের বাহুল্য, নূতন নূতন ব্যবসায়, এবং উপার্জনের উপায়, নূতন লোকের সাহচর্য, লাভশিকারের অপূর্ব সুযোগ, দুর্নীতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা—এবং অন্যদিকে নূতন রাস্তাঘাট-কলকব্জা, নূতন উৎসাহ ও উদ্যম, সাহসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্মবিশ্বাস, সমাজগঠনে পরিবর্তন, রাজনীতির ক্ষেত্রে নব-অর্জিত মনোবল ইত্যাদি সব কিছু মিলে যে পরিবেশ তৈরী হয়েছে তার সঙ্গে অর্থনীতিবিদ্-বর্ণিত পুরাণো কাঠামোর মিল খুব কম। গ্রাম এখন এসে সহরে ঢুকেছে, সহর ঢুকেছে গ্রামে। জ্ঞাতি-কুটুম্ব-মুখরিত যৌথপরিবার ভেঙে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ছোট পরিবার হয়ে এসেছে সমাজের ইউনিট। গ্রামের লোকের স্থিতিশীলতা কমে গিয়েছে—নোয়াখালীর লোক গেছে পঞ্জাবে আর মালাবারী এসেছে আসামে। কুটিরশিল্প এখন ক্ষুদ্রায়তন যন্ত্রশিল্পে পরিণত হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের রপ্তানির হিসাবে অনেক রকমের যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসের নাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। চিরাচরিত প্রথা-অনুসারে শ্রমিকের মজুরীস্থির হয় একথা আর বলা চলে না—গ্রামে মজুরী নির্ভর করে লোক-স্বল্পতার পরিমাণের উপরে, আর সহরে মজুরী নির্ণয় করে মজুরসঙ্ঘ, তাদের নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে। কৃষি-ঋণের পরিমাণ এবং বোঝা দুই-ই কমে গিয়েছে। ব্যাঙ্কে এখন আমানতের অভাব নেই ; অভাব টাকা খাটানোর উপায়ের, যার ফলে ট্রেজারি বিলের এবং সরকারি ঋণপত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হল ব্যাঙ্কগুলি।

এই পরিবর্তনের অধিকাংশই শিল্পবিবর্তনের শেষ অধ্যায়ের লক্ষণ। আশ্চর্য এই যে এই বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থাগুলি আমাদের দেশে প্রায় দেখাই গেল না। দীর্ঘকালস্থায়ী কৈশোরের পরেই প্রৌঢ়ত্বের সূচনা আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষত্ব—এবং এই প্রৌঢ়ত্ব এসেছে মাথায় আর চেহারায়, দেহের অন্যান্য অংশে বালসুলভ পঙ্গুতা এখনো আমাদের ঘোচে নি। তবে মোটের উপর, লাভের আশায় যে-কোনো কাজে পশ্চাদ্‌পদ না হওয়ার বীরত্ব যে অবস্থায় সার্বজনিক হয়ে দাঁড়ায়, সেটা শিল্প-বিবর্তন এবং যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে এসে গিয়েছে।

অন্যদিকে যুদ্ধকালীন ঘটনা-সংস্থানে আমরা অনভ্যস্ত অনেক জিনিসে অভ্যস্ত হয়েছি। সরকারি নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন আমাদের ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে। এর একটা শুভ ফল এই হবে যে নিয়ন্ত্রণের সুদক্ষ পরিচালনা যখন আসবে তখন আমরা সহজেই এটাকে গ্রহণীয় মনে করতে পারব। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষকে দেখতেও আমার নূতন করে শিখেছি এবং অন্যান্য দেশের কর্মপন্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অবহিত হয়েছি ; ব্রেটন-উড্‌স্ চুক্তি-অনুসারে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে টাকা যোগাতে ব্যবস্থাপরিষদের কংগ্রেসী সদস্যরাও অসম্মত হন্ নি। দেশের লোকের কাজ যোগানোতে সরকারের যে দায়িত্ব আছে সেটাও আমরা প্রণিধান করেছি ; সরকারের প্রত্যেকটি

•••

কর্মপন্থা—মুদ্রানীতি, ট্যাক্স, অর্থব্যয়—শেষ পর্যন্ত দেশের মোট আয় এবং শ্রমনিয়োগকে প্রভাবান্বিত করে, তা আমরা আজকাল সহজেই বুঝি। অতএব একদিকে যেমন নূতন পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই পরিবেশকে সাধারণের উপকারের পথে নিয়ন্ত্রিত করাও হয়তো সহজতর হয়ে এসেছে।

অথচ এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারি বা আধা-সরকারি কর্মপন্থাতে নূতনত্বের স্পর্শ লাগে নি। বোম্বাই পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ভারত সরকারের সমরান্তিক কর্মনীতি পর্যন্ত সব কিছুতেই উৎপাদক-প্রধান যন্ত্রশিল্পের উন্নতির দিকেই নজর বেশি। যে সব পরিকল্পনা আমাদের দেশে গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে ভারতবর্ষের নূতন ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা নেই, বরং এই ধনিকপ্রধান শিল্পবিবর্তন আরো অগ্রসর করে দেবার চেষ্টা আছে। এই ধরণের শিল্পোন্নয়ন আনতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন লাভের ক্ষেত্র বাড়ানো। সরকারি প্রচেষ্টায় এটা সহজেই সম্ভব হতে পারে; উৎপাদক-সঙ্ঘের রাজনৈতিক জোরের প্রভাবে সরকারি কর্মনীতিকে 'জাতীয়তা-পন্থী' করে আনাও যায়—জাতীয়তা-পন্থী এই অর্থে যে একজন ভারতীয় কোটিপতিকে আরো দশ লক্ষ টাকা লাভ করতে দিলে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণেরই লাভ। আর তা' ছাড়া লাভের ক্ষেত্র প্রসারের চেষ্টা শিল্পপতিরা নিজেরাই করতে পারে—সঙ্ঘমূলক ব্যবসায়ের সাহায্যে বা নানারকমের শিল্পের একত্রীকরণে। আমাদের যুদ্ধের পরের প্রথম বছরের বজেটে যে করনীতি দেখতে পাওয়া যায় সেটাও উৎপাদকের লাভ বাড়িয়ে শিল্পপ্রসার আনবার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী; না হলে অতিরিক্ত লাভকর এত সহজে উঠে যেত না, ইন্‌কম ট্যাক্স যুদ্ধশেষের এক বছরের মধ্যে কমতো না। আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক হালচাল দেখে মনে হয় যে নূতন স্তরের 'জাতীয়তা-পন্থী' লোক-ভুলানো কর্মনীতি আসতেও বেশি দেরী নেই।

এদিকে যারা শিল্প-বিবর্তনের নূতন পর্যায়ের যজ্ঞাধিকারী তারাও চুপচাপ বসে নেই। মন্দাতে যে বিবর্তনের উপক্রম এবং যুদ্ধেতে যার প্রতিষ্ঠা তার স্থায়িত্ব-সম্পাদন করতে হলে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার একটী হল একই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ফেলা। আমাদের দেশে এই ধরণের একচেটিয়া উৎপাদক-সঙ্ঘ গড়ে উঠছে; এরা লাভ করে দু'দিক থেকে—কাঁচামালের একচেটিয়া বিক্রয়ে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের একচেটিয়া বিক্রয়ে। সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসায় আমেরিকা ও জার্মানিতে জন্মলাভ করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এখন সবদেশেই নূতনতম সমস্যা আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে রূপান্তর। ভারতবর্ষের বাইরে যুদ্ধের আগেই খনিজ তেল, ইস্পাত, রাসায়নিক রঞ্জনদ্রব্য ইত্যাদিতে আন্তর্জাতিক 'কার্টেল' স্থাপিত হয়েছিল। এখন ভারতীয় শিল্পপতিরা এই সব কার্টেলে যোগদান করার অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। বিলাতী মোটর কোম্পানির সঙ্গে ভারতীয় ধনিকের যোগস্থাপন বা আমেরিকার এরোপ্লেন কারখানার মালিকের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতির সংযোগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা 'জাতীয়' এবং আন্তর্জাতিক কার্টেলের কাছ থেকেই শিল্পজাত সব জিনিস কিনতে বাধ্য হব।

ব্যবসায়ীদের নিজেদের নেওয়া পন্থায় লাভের ক্ষেত্র সুদৃঢ় এবং প্রসারিত করবার আর-একটি উপায় নানা ধরণের শিল্পের মালিকানার কেন্দ্রীকরণ। নানা ধরণের শিল্প একই পরিচালনায় আসলে একটির ক্ষতি আর-একটির লাভে পুষিয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে একটি অপর-একটির লাভ অর্জনে সহায়তা করে। আর তা ছাড়া যে ব্যক্তিযূথের হাতে এই সব কয়টি শিল্পের মালিকানা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নানা দিকে —বাজারে, সমাজে, এবং ব্যবস্থাপরিষদে।

যেমন ধরা যাক, একদল ব্যবসায়ী—বন্ধু বা একই পরিবারের লোক—কয়েকটি চিনির কারখানা ও একটি ওষুধের কারখানার মালিক। চিনির কারখানায় উৎপন্ন অ্যাল্‌কহল ওষুধের কারখানার ব্যয়সংস্থান করবে। যদি এদের হাত একটি শিশি-বোতলের কারখানাও থাকে তবে সুবিধা আরো বাড়বে। এদের যদি ছোটখাট রেল কোম্পানি বা মোটর বাসের লাইন থাকে তবে জিনিসপত্র চলাচলের লাভের কিছুটাও নিজেদেরই থেকে যায়। এই রকমের একত্রীকরণ যখন খুব বিরাট ভাবে করা হয় তখন সাধারণের ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরী, কাঁচা মালের ক্রয় বিক্রয়, যন্ত্রপাতি তৈরী বা আমদানী, মাল চলাচল ইত্যাদি সব রকমের কোম্পানি এক দল ডিরেক্টরের হাতে চলে আসে। তারপর এরা যদি একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে দেশের লোকের স্বল্প-মেয়াদে রক্ষিত টাকার একটা ভাগও এরা পায়; নিজেদের পরিচালিত ব্যবসায়গুলির চল্‌তি মূলধনের যোগান এই ব্যাঙ্কই দিতে পারে। একটা ইনভেস্‌ট্‌মেন্ট-ট্রাস্ট কিম্বা একটা জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান যদি এরা খুলতে পারে তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে জমানো টাকাও এদের হাতে আসে। তারও পরে, যদি এই শক্তিশালী দল দেশের নানা স্থানে কয়েকটি সংবাদপত্রের মালিক হয়ে বসতে পারে তাহলে জনমতও নিয়ন্ত্রণ করা চলবে। পরোক্ষভাবে শিল্পপতিদের পক্ষে যেটা মঙ্গলজনক প্রত্যক্ষ ভাবে তাতেই যে দেশের উপকার সেটা প্রমাণ করার জন্য যুক্তিজাল বর্ষণ করে সহজেই জনমতকে মোহাবিষ্ট করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে শিল্পপতিদের যোগাযোগ যদি অন্তরঙ্গ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই।

যদি ধরে নেওয়া যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্ভব হবে তাহলে সবশুদ্ধ যেটা গিয়ে দাঁড়াবে সেটা হল রাজনৈতিক ডেমোক্র্যাসির মধ্যে মোহাবিষ্ট জনমতের অনুমোদন-প্রাপ্ত অর্থনৈতিক অ্যারিস্টোক্র্যাসি—ইম্পেরিয়ম ইন ইম্পেরিয়ো—রাজ্যের মধ্যে রাজ্য। শিল্পবিবর্তনের ফল যদি আমাদের দেশে এই গিয়ে দাঁড়ায় তবে আমাদের অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগবে। অথচ প্রথম থেকে সাবধান না হলে এই রকমের একটা কিছু যে গিয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র আমরা শীঘ্রই লাভ করব, এ আশ্বাসের কারণ আছে; অন্যদিকে একটা বিরাট প্রাক্‌-আধুনিক কৃষি-কেন্দ্রিক পটভূমিকার উপরে আধুনিকতম সঙ্ঘবদ্ধ ধনিকতন্ত্রের অবাধ লীলা দেখতে পাওয়া যাবে, এ আশঙ্কার কারণও আছে।

রাজনৈতিক সাম্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সামন্ততন্ত্রের বিরোধ সুস্পষ্ট; সুতরাং যদি আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির জোর বাড়তে থাকে তাহলে এই শিল্পপতি-পরিচালিত নবপর্যায়ের সামন্ততন্ত্র হয়তো বেশীদিন চলতে পারবে না। কিন্তু পরিণামে ঝড়-ঝাপটা সবই শান্ত হয়ে যাবে এ আশায় বসে থাকলে বর্তমানের দুঃখ ঘোচে না। তা' ছাড়া আমাদের আর্থিক বিবর্তনে এমন দু-একটি বিপদের সম্ভাবনা আছে যাতে হয়তো কাম্য পরিণাম আসতে বিলম্ব হবে। প্রথমতঃ এখনো আমাদের দেশ দরিদ্র; এখনো যে কোনো উপায়ে শিল্পোন্নতি হলেই দেশের মোট সম্পদ কিছুটা বাড়বে এবং হয়তো দরিদ্রদের আয়েও কিছুটা বৃদ্ধি দেখা দেবে। এই বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ হয়তো সঙ্ঘবদ্ধ ধনতন্ত্রের খারাপ দিকটা পুরোপুরি বুঝতে পারবে না। ব্রিটেনে উনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণ লোককে বর্ধিত আয়ের অঙ্ক দেখিয়ে বোঝানো হয়েছিল যে শিল্পপতিদের লাভ বাড়ালে দেশশুদ্ধ সকলেরই লাভের সম্ভাবনা। মালিকের লাভ একটাকায় তিন টাকা করে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুরি টাকায় চার আনা বাড়লে যে

আপেক্ষিক ভাবে অসাম্য বেড়ে যায় এটা বুঝতে ব্রিটেনের জনমতের প্রায় একশ' বছর লেগেছিল। আমেরিকার ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্যে এখনো সেখানকার সাধারণ লোকের চোখ খোলেনি। দ্বিতীয়তঃ সঙ্ঘবদ্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মালিক যারা তারাই যদি সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা হয় তাহলে বহুদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে ভুল বোঝানো চলবে। শেষ পর্যন্ত জনমত একদিন জেগে উঠবেই; শিল্পবিবর্তনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাদের, যারা ঠেকে শিখল, তাদের চোখ খুলতে যদি একশ বছর লেগে থাকে, যারা দেখে শিখেছে তাদের হয়তো কুড়ি-পঁচিশ বছরের বেশি লাগবে না। কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বছর মানে একটা পুরুষ, যাদের দেশের শিল্পোন্নতির ফলাফলের পূর্ণ অংশ থেকে বঞ্চিত করার কোনো হেতু নেই।

অবশ্য এখন থেকেই বিরোধের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের জোর বেড়েছে এবং ক্রেতা-সাধারণের রাজনৈতিক প্রভাবও এখন আগের চেয়ে বেশী। পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘবদ্ধ ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠাকামী সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকতন্ত্রের অভিযান বর্তমান অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সব চেয়ে কাম্য সেই অবস্থা যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ মজুর-আন্দোলনের প্রয়োজনই হয় না, যেখানে যে জনমত মজুর-আন্দোলনের ভিত্তি সেই জনমতই মজুরির নির্ধারক। অন্য বিরোধটিও ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসছে। সম্মিলিত ক্রেতাশক্তির সঙ্গে সম্মিলিত উৎপাদকসঙ্ঘের একটা সংঘর্ষ বাধলে শেষ পর্যন্ত ক্রেতাদের রাজনৈতিক প্রভাব হয়তো তাদের জয়যুক্ত করবে। কিন্তু যতদিন সংঘর্ষটা চলতে থাকবে ততদিন অসুবিধার ভাগের অধিকাংশই ভোগ করবে জনসাধারণ। আবার, ক্রেতার জয়লাভের শেষফল শিল্পজাত জিনিসের উৎপাদকের উপরে না পড়ে হয়তো গিয়ে পড়বে শ্রমিকের বা কাঁচামাল উৎপাদকের উপরে। অপর পক্ষে, যতদিন শ্রমিকসঙ্ঘ, সঙ্ঘবদ্ধ ধনিকতন্ত্র এবং সম্মিলিত ক্রেতাশক্তির মধ্যে ত্রিস্রোতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকবে ততদিন শ্রমিক-আন্দোলনের সাফল্যের শেষ ফল শিল্পপতির কৌশলে ক্রেতার উপরে এসে পড়তে পারে।

যে ভবিষ্যৎ আমরা আশঙ্কা করছি সেটার বিরুদ্ধে এখন থেকেই প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমাদের মূল কথা, ভারতবর্ষের সর্বস্থানে দ্রুত শিল্পোন্নতি আবশ্যক। এই শিল্পোন্নতির ফলে অসাম্যের বৃদ্ধি হোক কিম্বা নূতন ধরণের ধনিকপ্রধান সামন্ততন্ত্র স্থাপিত হোক এটা আমরা চাই না। অথচ যে পন্থায় আমাদের শিল্পোন্নতি চলেছে তাতে শেষ পর্যন্ত মালিক, শ্রমিক এবং ক্রেতাদের রাজনৈতিক শক্তি এই তিনের মধ্যে একটা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অনিষ্টজনক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী। এটা যাতে না আসে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসানে যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হবে তার সূচনা যাতে সহজেই হতে পারে, তাই হওয়া উচিত আমাদের সমরান্তিক কর্মপন্থা।

এই কর্মপন্থার মূলসূত্র হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের দায়িত্ব প্রদান। রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিযূথের হাতে উৎপাদনের ভার থাকলে আমরা সেই পথেই যাব যে পথে ব্রিটেন চলেছে বহুকাল ধরে, যে পথের জর্মান পরিণাম নাৎসিবাদ এবং যে পথে আমেরিকা সাময়িক দীপ্তিতে মোহমুগ্ধ হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, যখন ভিত্তি স্থাপন হয়ে গেছে কিন্তু নির্মাণ এখনো অনেক বাকি, রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের ভার নিয়ে যাওয়া সহজতর হবে। সরকারি যন্ত্রশিল্প বা ব্যবসায় কঠিন হয় প্রথম অবস্থায়; সে অবস্থা আমাদের কেটে গিয়েছে। সরকারি

পরিচালনায় যন্ত্রশিল্পকে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয় শেষ অবস্থায় যখন সঙ্ঘমূলক এবং একত্রীকৃত উৎপাদনের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ; সে অবস্থা আমাদের আগতপ্রায়, কিন্তু এখনো সময় আছে। ঐতিহাসিক বিচারে উৎপাদনের রাষ্ট্রীয়করণের উপযুক্ত অবস্থা আমাদের বর্তমান কালেই উপস্থিত। জলসেচন ও হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি-উৎপাদন ; খনিজ দ্রব্য-উত্তোলনের কাজ ; কাপড়ের কল ও ইস্পাতের কারখানা ; চিনির ফ্যাক্টরি, পাটকল ও চা বাগান ; ব্যাঙ্ক, বীমা এবং ইনভেস্‌ট্‌মেণ্ট ট্রাস্ট্ ; যানবাহন ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ বর্তমান অবস্থাতেই সম্ভব।

সরকারি পরিচালনায় উৎপাদন করতে গেলে অনেক নূতন সমস্যা উঠবে ; যাঁরা পরিবর্তনের বিরোধী তাঁরা এই সব সমস্যার দিকেই জোর দেবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে এই সমস্যা গুলির বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। মোটের উপরে বলা যায় যে উৎপাদনের মূল সমস্যা—কাঁচামালের যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণনির্ণয়—সরকারি পরিচালনায়ও থাকবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে গলদগুলি ধরা পড়বে আগে, চোখের উপরে মোট ফলাফলটা দেখতে পাওয়া যাবে। অজানা বিপদের চেয়ে জানা বিপদ ভাল এবং বিপদ যেখানে আসতে পারে সেখানে এমন কর্মপন্থাই যুক্তিযুক্ত যাতে বাধা গুলি থাকে চোখের সম্মুখে, আশে পাশে গোপনে নয়।

কেবল যে যুদ্ধান্তিক ধনিক-পরিচালিত কার্টেলের হাত থেকে আমাদের বাঁচা দরকার তাই নয়। এখন একথা সর্বদেশে স্বীকৃত যে দেশের মোট আয় ও শ্রমনিয়োগ নির্ভর করে দেশের মোট ব্যয়ের উপরে এবং এই মোট ব্যয় আসে প্রধানতঃ তিন দিক থেকে—জনসাধারণের ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়, উৎপাদকদের নূতন প্রচেষ্টা এবং সরকারি ব্যয়। এদের মধ্যে প্রথমটি খুব বেশি বাড়ে কমে না। এবং তৃতীয়টির পরিমাণ এখন পর্যন্ত তুলনায় কম। ফলে, উৎপাদকের ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধিই দেশের মোট আয়ের এবং শ্রমনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান কারণ। যতদিন এই কারণটি সাধারণ শিল্পপতিরা নিয়ন্ত্রণ করবে ততদিন দেশের আর্থিক জীবনের মূলসূত্র তাদেরই হাতে থাকবে। অথচ সরকারের প্রধান কর্তব্য দেশের লোককে যতটা সম্ভব কাজ যোগানো—যাকে 'ফুল এমপ্লয়মেণ্ট' বলে সে অবস্থার সংস্থাপন। কেবল সরকারি করনীতি এবং শাসনব্যয়ের ইতরবিশেষে মোট শ্রমনিয়োগের উপরে প্রভাব আনা অসম্ভব ; তাই উৎপাদনব্যয়ের পরিমাণ-নির্ধারণও যথেষ্ট পরিমাণে সরকারের হাতে আনা প্রয়োজন। যে সমাজে দেশের লোকের কাজ যোগানোর ভার গভর্মেণ্টের, সে সমাজে শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ সমাজের উদ্দেশ্যসাধনে অন্যতম প্রধান সহায়।

বিবর্তনের যে পর্যায়ে রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের দায়িত্ব নেওয়া চলে এবং নেওয়া প্রয়োজন সেটা আমাদের এসেছে। তা' ছাড়া ঠিক যুদ্ধ-পরবর্তী কালে অন্য কয়েকটি সুবিধাও পাওয়া যাবে। যে বিরাট পরিমাণ স্টার্লিং ব্যালান্স জমে আছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার সরকারি পরিচালনায়ই সম্ভব। যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক ব্যবসায় সরকারি প্রভাবে এসে গিয়েছে। নিয়ন্ত্রণে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি ; নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক অসাফল্যের অবস্থাটা আমরা যুদ্ধের মধ্যেই কাটিয়ে উঠেছি। যুদ্ধকালীন ক্রয় এবং ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণের স্থানে যদি যুদ্ধপরবর্তী উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ অধিকতর সাফল্য লাভ করে, এবং সরকারি উৎপাদনের ফলে যদি শ্রমনিয়োগ উঁচু হারে স্থির থাকে তাহলে জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে সহজে। আমাদের রাজনৈতিক উৎসাহ যে সঙ্কীর্ণ খাতে চলেছে সেটা ছেড়ে নূতন জোয়ারের জলে বেড়ে উঠতে থাকবে।

বাংলার প্রাচীন লোকচিত্র

শ্রীঅজিত ঘোষ

বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ"[১] প্রবন্ধে, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈত্রমেলা অথবা হিন্দুমেলাকে "ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অগ্রদূত" ব'লে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় এই মেলার উল্লেখ করে বলেছেন :

"[নবগোপাল মিত্র, মেলার সহকারী সম্পাদক] একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম,—'ও সব ত দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার?' মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায়, এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।"—'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়।

এই উদ্‌ধৃতি থেকে বুঝতে পারা যায় যে বাংলার পুরুষানুক্রমিক লোক-চিত্রকলার সঙ্গে সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের কোনো পরিচয়ই ছিল না। 'হিন্দুস্থান'[২] পত্রিকার একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম যে, সেকালে শিল্পকলা সম্বন্ধে সাধারণ অজ্ঞতার মধ্যে খুব অল্প লোকই বাংলার লোকচিত্র সম্বন্ধে কিছু জানতেন বা জানবার প্রয়াস পেতেন। নবগোপাল মিত্র যে ছবিটি আঁকিয়েছিলেন এবং মেলাতে বিশেষ স্থানে স্থাপন করেছিলেন সেটি বিলাতি রীতির অনুকরণে কাপড়ের উপর আঁকা একটি বড় ছবি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার ধনীসমাজে এইজাতীয় চিত্র বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। সেকালের ধনী ব্যক্তিগণ নিজেদের প্রাসাদতুল্য ভবনের হলঘর সজ্জিত করার জন্য বাংলার চিত্রকরদের ক্যাম্বিশের উপর পৌরাণিক দৃশ্যাবলীর বড় তৈলচিত্র আঁকতে প্রবৃত্ত করতেন। এই সকল চিত্রে পাশ্চাত্য শিল্পের বিসদৃশ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ কয়েকটি ছবি আমি দেখেছি যার মধ্যে জয়পুরী চিত্রের প্রভাবও দেখা যায়। শেষোক্ত ছবিগুলি বহুবর্ণে রঞ্জিত এবং সৌন্দর্যের দিক থেকেও তাদের মনোরম আকর্ষণী শক্তির অভাব নেই। "পট" কথাটি মূলত বাংলার পুরুষানুক্রমিক পদ্ধতিতে আঁকা চিত্র সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হত, কিন্তু সাধারণ ভাবে এই বৃহৎ ছবিগুলিকেও পট বলা হ'ত। এই চিত্রগুলি পরবর্তী কালে অতি নিকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় "পট" কথাটিই অবজ্ঞাসূচক হয়, ফলে পট বলতে অতি তুচ্ছ মোটা রকমের চিত্র বোঝাত। তৎসত্ত্বেও আসল কালীঘাটের পট এই পাশ্চাত্য প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পায়, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পট-চিত্র আঁকা হয়।

বাংলার আদি ভিত্তিচিত্রের কোনো চিহ্নই আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা অধিক পুরাতন যে লোকচিত্রশিল্প আজ দেখতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে পুঁথির চিত্রিত মলাট, যাকে বাংলায় "পাটা" বলা হয়। আদি সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের মলাটরূপে ব্যবহৃত কাঠের উপর এই

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫২, পৃ, ২৭৭-৭৮

২ Hindusthan, Vol. I. No. 3. p. 21.

নরসিংহ

বিষ্ণুপুরের তাস

তারকেশ্বর

কালীঘাটের পট

মুরলীধর

মালদহের দারুমূর্তি। আশুতোষ মিউজিয়ম

বাঁকুড়ার পাটা

শ্রীকৃষ্ণ, বড়াইবুড়ি ও গোপিনীগণ

বষ্টন মিউজিয়ম
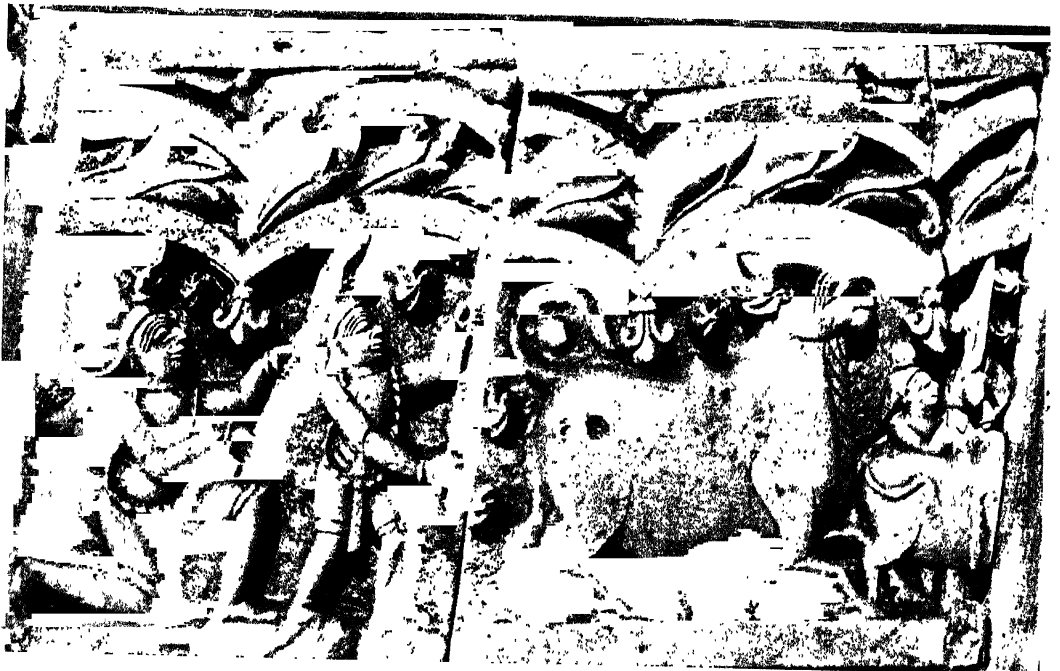
মৃন্ময় ফলক

গোচারণরত কৃষ্ণ-বলরাম

আশুতোষ মিউজিয়ম

সকল ছবি আঁকা হ'ত অথবা কাঠের উপর কাপড় এঁটে সেই কাপড়ের উপর ছবি আঁকা হ'ত। পাটার শিল্পকলা দেখে মনে হয়, এক কালে বাংলাদেশে ভিত্তিচিত্রেরও খুব প্রচলন ছিল এবং সম্ভবত তা বিশেষ উৎকর্ষও লাভ করেছিল ; এখানে যথার্থ প্রমাণের অভাবে অনুমানের উপরই নির্ভর করছি।

• বাংলাদেশের পটশিল্প একটি সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আমাদের দেশের নানা প্রাচীন গ্রন্থে "পট" ও "চিত্রপট"এর বহু উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে বাংলা সাহিত্যের যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে, সেই সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শিল্পটি নিশ্চয়ই আরও পুরাতন। ভারতবর্ষের লোকচিত্র-শিল্প বৌদ্ধযুগ থেকে পুরুষানুক্রমিক চলে আসছে। সে সময়ে এই চিত্রকে 'চরণ-চিত্র' বলা হ'ত এবং এই চিত্র খুবই জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য এইরূপ আদি শিল্পকলার ধারাবাহিকতার কোনো প্রমাণই আমরা পাই না ; কারণ কাপড় অথবা কাঠের ন্যায় অচিরস্থায়ী পদার্থের উপর আঁকা ছবি বেশীদিন রক্ষা পায় না। তাই অতি প্রাচীন কালের ছবিগুলির কোনো চিহ্নই আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই-সকল ছবি আঁকবার জন্য শিল্পীরা যে প্রথা অবলম্বন করত এখন তা বর্ণনা করি। প্রথমে কাঠের বা কাপড়ের উপর নরম বালুহীন মাটি দিয়ে পাতলা করে একটি প্রলেপ দেওয়া হ'ত। এই প্রলেপ শুকিয়ে উঠলে তার উপরিভাগটাকে ঘসে ঘসে মসৃণ করে তুললেই ছবি আঁকবার উপযুক্ত জমি তৈরি হ'ত। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্, শিল্পরত্নম্ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই মাটির প্রলেপটি ভিত্তি-চিত্রের জমিরূপে ব্যবহৃত বজ্রলেপেরই অনুরূপ। তারপর বেলের আঠা জলে সিদ্ধ করে, সেই সঙ্গে খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে তৈরি রং মিশিয়ে ছবি আঁকা হ'ত। প্রথমে তুলির সাহায্যে একটি রেখাচিত্র এঁকে নেওয়া হ'ত, তারপর রং লাগানো হ'ত। সর্বশেষে বেলের আঠার প্রলেপ বার্নিশরূপে ব্যবহৃত হ'ত।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে পাটাচিত্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১) বিষ্ণুর রামচন্দ্ররূপে আবির্ভাবের ছবি, (২) বিষ্ণুর শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভাবের ছবি এবং (৩) চৈতন্যজীবনীর নানা ঘটনার ছবি। শৈব বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা ছবিও আছে, কিন্তু পাটার মধ্যে এই ছবির প্রচলন খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায় ; তবে পরবর্তী কালে হরপার্বতীবিষয়ক ছবি পটুয়াদের বিশেষ প্রিয় ছিল। বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় যখন দেশ প্লাবিত, সেই সময় থেকেই আমরা 'পাটা' চিত্রের পরিচয় পাই। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্য সেকালে সর্বসাধারণের সম্পত্তি ছিল। বৈষ্ণবধর্ম আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেই প্রভাব আমাদের শিল্প ও সাহিত্যকে একটি নূতন শক্তি দান করেছিল। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই আমাদের লোকশিল্প বাংলার জাতীয় শিল্পে পরিণত হয়। পাটাচিত্রের মধ্যেই প্রকাশ পায় যুগের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। বাল্যকালে মা অথবা ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাব গঠনে সাহায্য করেছে এবং দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই-সকল গল্পের মধ্যে থেকেই শিল্পীরা চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করত। অনেক পাটাতে দেখা যায় যে, একটি মলাটে হয়তো রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনো কাহিনীর একটি দৃশ্য আঁকা হয়েছে আর অন্যটিতে আঁকা হয়েছে একটি সংকীর্তনের দৃশ্য। দেখা যায় যে, শিল্পীরা চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যদের এই-সকল সংকীর্তনের দৃশ্য এঁকে বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করত।

১৪২১ শকাব্দে (১৪৯৯ খ্রীঃ) লেখা একটি বিষ্ণুপুরাণ পুঁথির মলাটে আঁকা[৩] পাটাচিত্রই হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন লোকচিত্র যার তারিখ জানা গেছে। এই পাটাটিতে দশাবতারের ছবি আঁকা আছে। এতে ভগবান বুদ্ধকে বলরামের পরেই নবম অবতার রূপে আঁকা হয়েছে এবং এখানে তাঁকে ধর্মচক্র-প্রবর্তনের মুদ্রায় দেখানো হয়েছে। এই গ্রন্থের মলাটে আঁকা ছবি হচ্ছে বাংলা লোকচিত্রশিল্পের ইতিহাসের গোড়াপত্তন। এর পূর্বেকার সকল চিত্রই কালে লোপ পেয়েছে এবং যতদূর জানা যায়, মনে হয় যে, এই ছবিই মধ্যযুগীয় বাংলা চিত্রশিল্পের সর্বাপেক্ষা পুরাতন উদাহরণ। উজ্জ্বলবর্ণ-শোভিত তালপাতার বৌদ্ধ পুঁথিগুলি, তার মধ্যে অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতাই প্রধান, আরও অনেক পুরাতন। এইগুলির অঙ্কনরীতি সম্পূর্ণ পৃথক এবং এর শিল্পকলা সাধারণ 'পাটা' বা পটের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম। উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত বৌদ্ধ পুঁথির ছবিগুলি অজন্তার মার্জিত শিল্পের ধারায় আঁকা; এই শ্রেণীর শিল্পকলার কোনো নিদর্শনই আজ আর বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। এ কথা অবিশ্বাস্য যে, আমাদের বাংলার লোকশিল্প অজন্তার শিল্প থেকেই জন্মলাভ করেছে অথবা তার সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত। অনেকে ভালো ভাবে প্রশ্নটি মীমাংসা না করেই এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বৌদ্ধ তালপাতার পুঁথির ছবিগুলি অজন্তা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং ন্যায়তঃ এইগুলি অজন্তার শিল্পধারার সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ বলা যেতে পারে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, পটুয়াদের শিল্পকলার সঙ্গে বৌদ্ধ-লোকচিত্র বা চরণচিত্রের আংশিক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যেহেতু এই চরণচিত্রের সঙ্গে বাংলার কোনো পুরুষানুক্রমিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না সেই কারণে আমাদের অন্য কোনো দেশীয় লোকশিল্পের মধ্যে বাংলার লোকচিত্রের মূল আদর্শের স্বরূপ খুঁজে বার করতে হবে। এইরূপ একটি সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই বাংলার মৃৎশিল্পের (terracottar) সঙ্গে। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে ও কুমিল্লা জেলার ময়নামতীতে সম্প্রতি-আবিষ্কৃত পোড়া-মাটির টালির মধ্যে আমরা বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাই। সারা বাংলাদেশে মন্দিরগাত্রের শোভা বৃদ্ধি করতে বাংলার শিল্পকলার এই পোড়ামাটির ফলকগুলি একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। অতীতের সুঙ্গরাজগণের এবং হয়তো মৌর্য রাজাদের রাজত্বকাল থেকে এই মৃৎশিল্পের একটি অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস পূর্ব-ভারতে আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উত্তর-বিহার ও বঙ্গদেশে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক থেকে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অনেক অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরগাত্রেও সুন্দর কারুকার্যখচিত ফলক আছে। মৃৎশিল্পের ন্যায় লোকচিত্রকলার গোড়াপত্তনও ধর্মে। যে-সকল ধর্ম-বিষয়ক দৃশ্য জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, বিশেষত বৈষ্ণব কবিতা ও মঙ্গল-কাব্যের মধ্য দিয়ে, জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেই-সকল ধর্মসম্বন্ধীয় দৃশ্যই এই দুই শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল।

পোড়ামাটির ফলকে শিল্পী রেখা ও কমনীয় ভাস্কর্যের সাহায্যে জড়পিণ্ডকে আকার প্রদান করত। বহিঃসীমা নির্দেশ করার জন্যে রেখার সাহায্যে মূর্তির নকশা তৈরি পুরাকালে একটি বিশিষ্ট শিল্প ব'লে গণ্য হ'ত। এই সংখ্যায় মুদ্রিত "গোচারণরত কৃষ্ণবলরাম" মৃৎফলকে আমরা দেখতে পাই যে, এই-সকল ফলকে contour বা প্রান্তরেখার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। পটচিত্রকে ভিন্ন উপাদানে মৃৎশিল্পের ধারাবাহী বলে বর্ণনা করা যায়, কারণ প্রান্তরেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনই হচ্ছে পটশিল্পের বিশেষত্ব, আর বাংলার

৩ French, J. C., 'Tbe Land of Wrestlers', Indian Art and Letters, 1927, No. I. Pl. II A.

মৃৎশিল্পেও বহিঃস্থ রেখাঙ্কন শিল্পীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করত। এইরূপে বাংলার পটশিল্প পোড়ামাটির টালির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, এমনকি প্রান্তরেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি মৃৎশিল্প থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। অবশ্য, এর থেকে লোকচিত্রের প্রাচীনতার গৌরব কমে না। পূর্বেই বলেছি যে, এই লোকচিত্র চরণচিত্রের সময় থেকে চলে আসছে এবং এর উল্লেখ আমরা আদি বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যেও দেখতে পাই। কিন্তু তালপাতার পুঁথির ছবির সঙ্গে বাংলার লোকচিত্রের সম্বন্ধের কল্পনা একেবারে ত্যাগ করাই ভালো।

আমাদের দেশীয় শিল্পীরা রেখার সাহায্যে অন্যান্য জড় পদার্থকেও আকার বা রূপ দিতে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিল। এখানে মালদহ জিলায় প্রাপ্ত একটি প্রায় প্রমাণ মাপের কাঠের মুরলীধর মূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি এখন আশুতোষ মিউজিয়মে আছে, এর একটি প্রতিলিপি এই সংখ্যায় ছাপা হ'ল। এই মূর্তিটি প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে নিমগাছের গুঁড়ি থেকে খোদাই করা হয়। যারা কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থে শিল্পসাধনা করত, আমরা এই মূর্তিটি থেকেই সেই-সকল শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা ও বালুচরের তাঁতশিল্পীরা মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের নক্‌শা বুনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করত; তাদের শিল্পের মধ্যেও এই বহিঃস্থ রেখার সাহায্যে আঁকায় দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের শিল্পকলাকে সমসাময়িক কালের পটশিল্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

সবচেয়ে পুরাতন যে লোকচিত্রের তারিখ জানা গেছে তা হচ্ছে ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে আঁকা বিষ্ণুপুরাণ পুঁথির 'পাটা', এ কথা পূর্বেই বলেছি। পরবর্তী প্রায় একশ' বছরের মধ্যে আঁকা এমন কোনো লোকচিত্রের নমুনা আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না, যার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব। কয়েকটি পাটাচিত্র আছে যা ষোড়শ শতাব্দীতে আঁকা বলে অনুমিত হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলির শিল্পরীতি থেকে মনে হয় যে, এগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে আঁকা নয়। ফ্রেঞ্চ বলেছেন যে, বিষ্ণুপুরাণ পাটার মধ্যে একটি আদিম উগ্রতার (primitive fiercenessএর) আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এর পরবর্তী কালের পাটার মধ্যে দেখতে পাই, উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ, ঐক্যবদ্ধ ছন্দ ও সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কন, যা সেই যুগের বিশেষত্ব ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতেই দেখা যায় রাজপুত চিত্রশিল্পের অগ্রগতি এবং কাংড়া ও বাসোলী-প্রমুখ পাহাড়ী-শিল্পের অভ্যুদয়। এই সময়েই বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি মনোরম পাটাচিত্রে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার নানা স্থানে পাটাচিত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের মল্লভূম বা বাঁকুড়া জেলার লোকশিল্পই অসামান্য উন্নতি লাভ করেছিল এবং বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেই সময়ে মল্লভূমে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের আনুকূল্যে জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতি তথা শিল্পকলা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ফ্রেঞ্চ বলেছেন যে, মোগল-অভিযানের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা মল্লভূমকে প্রায় স্পর্শই করেনি। মোগল-অভিযানের হাত থেকে রক্ষা লাভ করে এই মল্লযোদ্ধাদের দেশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, কারণ আদি হিন্দুকলা ও সংস্কৃতি এখানে আজও যে পরিমাণে বিদ্যমান তা পূর্ব-ভারতের অন্যান্য স্থানে অজ্ঞাত।

এরূপ মনে করা অসংগত নয় যে, গুজরাটী বণিক এবং মোগল বাদশাহদের প্রেরিত রাজপুত রাজা ও তাঁদের পারিষদবর্গ বঙ্গদেশের সঙ্গে যে যোগাযোগ স্থাপন করেন তা কেবলমাত্র দেশের সামাজিক আচারব্যবহার ও বেশভূষাতেই নয়, শিল্পকলাতেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই যুগের লোকচিত্রশিল্পে

নরনারীর বেশভূষা ও বিদেশীয়দের মূর্তির মধ্যে পশ্চিম-ভারতীয় প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান; এমন কয়েকটি পাটা দেখতে পাওয়া যায় যাতে পশ্চিম-ভারতীয় বেশে ভূষিত পুরুষদের সংকীর্তনের দৃশ্যে আঁকা হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যেও এই দৃশ্যের সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অনুমান করা যেতে পারে যে, এই যুগ হতেই নরনারীর প্রচলিত বেশভূষায় পশ্চিম-ভারতীয় পরিচ্ছদের প্রভাব পড়ে।

এই সময়ের কয়েকটি "পাটা" রাজপুত ছবির কথা মনে পড়িয়ে দিলেও তাদের শিল্পকলা, বর্ণসম্ভার ও ধরন সম্পূর্ণ দেশীয়। কেবল বেশভূষা ও কোনো কোনো স্থলে গাছপালার সাদৃশ্য দেখে এরূপ মন্তব্য করা চলে না যে, রাজপুত শিল্পকলা বাংলার শিল্পের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার লোকশিল্পীরা সত্য সত্যই কখনো রাজপুত ছবি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল কি না, বলা খুবই কঠিন। বরঞ্চ এই বলা যায় যে রাজপুত রাণারা বাংলাদেশ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জয়পুর ও রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে বসবাস করার জন্য আহ্বান করে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত রাজপুত পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেও তাঁরা নিশ্চয় রাজপুতানার সংস্কৃতি ও কলার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আমরা জানি, গীতগোবিন্দ রাজপুতানায় প্রচারিত হয়েছিল এবং কাংড়া ও বাসোলির কয়েকজন চিত্রকর গীতগোবিন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সে যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিত্রে রূপ দিয়েছিল।

অন্যান্য শতাব্দী অপেক্ষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আঁকা পাটার সংখ্যাই বেশী। শিল্পকৌশল, উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশ ও সাবলীল ভঙ্গীই হচ্ছে পাটার বিশেষত্ব। কিন্তু সেই উচ্চদরের শিল্পনৈপুণ্য এখন আর বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। রেখার সে সূক্ষ্মতা, বর্ণের সে বৈচিত্র্য এখন আর দেখা যায় না।

শিল্পকলা বরাবরই রাজদরবারের আনুকূল্যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। হাম্বীর যখন মল্লভূমে রাজত্ব করতেন তখনও এর অন্যথা হয় নি। বহুবৎসর পূর্বে বাংলার বিশিষ্ট লোকচিত্রের সন্ধানে ভ্রমণ-কালে নদীয়ার সাধারণ পাঠাগারে একটি পাটা দেখতে পাই। তাতে গোষ্ঠলীলার একটি দৃশ্য আঁকা ছিল। পাটাসংলগ্ন পুঁথি হ'তে জানতে পারি যে, যে সময়ে বঙ্গদেশ থেকে পাটা-শিল্প প্রায় লোপ পেয়েছিল, সেই যুগেই শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে উক্ত পাটা আঁকা হয়।

এখানে পাটার প্রসাধন বা পাড়ের কারুকার্য সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। বহু পাটা দেখা যায় যাতে সাধারণ ফুল-কাটা নক্‌শার দ্বারা বহিঃপ্রান্ত সরল ও সুন্দররূপে আঁকা হয়েছে, আবার অনেক পাটা আছে যাতে পিছনের সমস্ত কাঠটাই রঙিন ফুল ও লতাপাতার সাহায্যে আল্‌পনার মত আঁকা। কিন্তু এগুলির মধ্যে মৌলিক ও চিত্তাকর্ষক নক্‌শা খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস। এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। যাঁরা এই প্রাচীন দশাবতার খেলাটির বিষয় কিছু জানতে ইচ্ছুক, তাঁরা শাস্ত্রী মহাশয়ের 'Notes on Vishnupur Circular Cards' [8] শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়তে পারেন। তবে তিনি এই তাসগুলির শিল্পনৈপুণ্যের বিষয় কিছুই উল্লেখ করেননি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই দশাবতার তাস মল্লরাজগণের রাজত্বকাল থেকে প্রচলিত হয়।

8. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1895, Pt. I, pp. 284-85
Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1896, p. 2.

এই সংখ্যায় মুদ্রিত নরসিংহ অবতারের গঠনভঙ্গী দেখলেই শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নরসিংহ অবতারের এই ছবিটি যে কোনো সংস্কৃতিবান্ শিল্পীর পক্ষেই একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হতে পারত, এবং সামান্য গ্রাম্য শিল্পীর পক্ষে সত্যই অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই অজ্ঞাতনামা শিল্পী নরসিংহের যে রূপ দিয়েছে তার চেয়ে জীবন্ত রূপ কল্পনা করাও যায় না। অন্যান্য গ্রাম্য লোক-শিল্পীরা বহু প্রাচীন উপকথা বা কিম্বদন্তী পুরুষানুক্রমিক প্রথায় এঁকেই সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু এই শিল্পী বিষয়ের যে অভিনব গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে তাই তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছে। এখানে ছবির মধ্যে কোনো সমতল মূর্তি বা অর্ধাস্য (profile) আঁকা হয় নি ; গোলাকার মাংসপেশীবহুল একটি বলিষ্ঠ ও সতেজ মূর্তিই এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমার মতে এটা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আঁকা হয়। এর চেয়ে পুরাতন তাস দুষ্প্রাপ্য। অন্যান্য সকল শিল্পকলার ন্যায় দশাবতার তাসও যুগে যুগে একই রূপে আঁকা হ'ত, কিন্তু এর সৌন্দর্য ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও দশাবতার তাস তৈরি হ'ত।

বাংলার লোক-চিত্রশিল্পের মধ্যে মনসা-ঘট ও লক্ষ্মীসরায় আঁকা ছবি আজও পূর্ববঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পকলার দিক থেকে পুরাতন পাটা বা দশাবতার তাসের সঙ্গে এর তুলনা হয় না।

পটশিল্পীরা নিজেদের রূপকল্পনা ও রসবোধ প্রকাশ করবার প্রয়োজনে চিত্রাঙ্কন বিদ্যাটিকে একটি সহজ উপায় ব'লে মনে করত। তাদের শিল্পকলার মধ্যে এমন একটি সজীবতা আছে যা অন্য লোকশিল্পের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। এমনকি অধুনা যে-সকল শিল্পী পাশ্চাত্যের প্রাচীন ভাস্কর্য বা জীবন্ত নগ্নমূর্তির সাহায্যে ছবি আঁকতে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁরাও এই গ্রাম্য শিল্পীর ছবিকে ঈর্ষার চক্ষে দেখবেন। কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বহিঃস্থ রেখার দ্বারা আঁকা এই সজীব ছবিগুলি আমাদের দেশীয় শিল্পের ইতিহাসে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য পটুয়াদের উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছে। প্রকৃত শিল্পকৌশলময় অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তারা অল্পসংখ্যক রেখার সাহায্যে ছবি আঁকত। অনেক সময় তুলির অবিচ্ছিন্ন দ্রুতগতিতে একটি বহিঃস্থ রেখা মাত্র আঁকা হ'ত, কিন্তু এই-সকল চিত্রের মধ্যেও কি সুন্দর সৌষ্ঠব ফুটে উঠেছে। ছবিতে যেমন সহজে দেহের অঙ্গভঙ্গী ও ভাবাবেগ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি সহজেই ধরা পড়েছে বিশ্রামের শান্ত মূর্তি। পটুয়া শিল্পীরা যে কেবলমাত্র রেখাঙ্কনে বিশেষ অধিকার ও নিপুণতার পরিচয় দিয়েছে তা নয়, তাদের ছবির মধ্যে একটি প্রশংসার্হ সৌষ্ঠব ও সহজাত ছন্দবোধও দেখা যায়। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে এই সংখ্যায় মুদ্রিত 'কৃষ্ণরাধিকা'র ছবিটি উল্লেখযোগ্য।

পটুয়ারা কিরূপে কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে দেহের আয়তন ফুটিয়ে তুলত তার নমুনা বিশেষ ভাবে দেখতে পাওয়া যায় 'ঘুমন্ত-শ্রী' নামে পরিচিত ছবিটির মধ্যে। আবার, মাত্র কয়েকটি রেখার সাহায্যে কেমন সুন্দর ভাবে দেহ বস্ত্রাবৃত করা যায় তার প্রমাণ পাই রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তিতে। যে কোনো যুগে, যে কোনো জাতির শিল্পীর পক্ষেই এই ছবিগুলির অসামান্য নৈপুণ্য প্রশংসনীয় হ'ত ; নগণ্য গ্রাম্য পটুয়ার সৃষ্টি হিসাবে এগুলি সত্যই বিস্ময়কর। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের 'History of Fine Art in India and Ceylon' গ্রন্থের নূতন সংস্করণে কড্রিংটন (Codrington) বাংলার পটশিল্পকে "বাজার পণ্য" ব'লে অভিহিত করেছেন। বাংলার 'পট' সম্বন্ধে এরূপ উক্তি শুধুই দৃষ্টিহনতা ও দাম্ভিকতার পরিচয়।

সাধারণত পট-চিত্রগুলি কাগজে আঁকা হ'ত, কিন্তু কাপড়ে আঁকা বহুপ্রাচীন ছোটো পটও কয়েকটি দেখতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগেও কাপড়ের উপর আঁকা দুর্গা ও অন্যান্য দেবদেবীর পট বহু স্থানে পূজিত হ'ত। কাপড়ের উপর পট আঁকবার পূর্বে জমিটি সব ক্ষেত্রেই পাটার জমির মতো তৈরি করা হ'ত। কোষ্ঠীপত্রের ন্যায় গুটানো রামায়ণ অথবা কৃষ্ণলীলার পট সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পটুয়ারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এইগুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াত এবং পটগুলি সমবেত গ্রামবাসীর সামনে খুলে ধ'রে, জনপ্রিয় সংগীত অথবা কবিতার সাহায্যে প্রত্যেক ছবির তাৎপর্য সকলকে বুঝিয়ে দিত।

সম্প্রতি কলকাতার কোনো এক চিত্রপ্রদর্শনীতে এক সম্ভ্রান্ত অতিথিকে এট্রুস্কান্ (Etruscan) শিল্পের সঙ্গে বাংলার পটের তুলনা করতে শোনা গিয়েছিল, যদিও এই দুটির মধ্যে কোনো যোগসূত্রের কল্পনা করাও হাস্যকর। আবার কোনো এক নব্য লেখক বাংলার পট-শিল্পকে ইউরোপীয় প্রভাবপুষ্ট শিল্পকলা ব'লে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু, এরূপ মন্তব্যও যুক্তিসংগত নয়। যে-সকল পটের মধ্যে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় তার সংখ্যা খুবই অল্প। আমরা এরকম পট দেখেছি যার সঙ্গে কিউবিজ্‌ম্‌এর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, অনেকে হয়ত এ ছবিতে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বিশেষ পটটি কিউবিক শিল্পের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের বহু পূর্বে আঁকা হয়। কাপড়ে আঁকা মিশ্রশিল্পের তৈলচিত্র, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, তা ব্যতীত পটশিল্পের উপর কোনরূপে ইউরোপীয় শিল্পকলা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আমাদের দেশের পটুয়াদের পক্ষে সাধারণত ইউরোপীয় শিল্প অথবা শিল্পপরিকল্পনার কথা জানবার কোনো সুযোগই ছিল না। পটুয়ারা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও প্রচলিত কিম্বদন্তীকে পুরুষানুক্রমিক প্রথায় ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত ছিল। নব্য শিল্পীরা এখন শিল্পবিষয়ক বই ও সাময়িক-পত্র মারফতে গোগাঁ, পিকাসো, ভ্যান্‌-গগ্‌ ও মোদিলিয়ানি প্রভৃতি শিল্পীর চিত্রকলার যেটুকু পরিচয় সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা পটশিল্পের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন। একটা কথা এখানে বলা উচিত যে, পটশিল্পের বিশেষত কালীঘাটের পটের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে দৃঢ় ও দ্রুত তুলির টান; অনেক সময় পট তুলির এক টানে আরম্ভ ও শেষ করা হ'ত; কিন্তু পটুয়াদের আধুনিক অনুকারিগণ, পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণে একটি দৃঢ় রেখার পরিবর্তে অনেকগুলি ছোট রেখার সাহায্যে ছবি আঁকেন। এইরূপ ছবিকে কোনো উপায়েই দেশের পুরুষানুক্রমিক শিল্পকলার ধারাবাহিক রূপ বলা চলে না। আধুনিক শিল্পীদের এই-সকল শিল্পপ্রচেষ্টা এবং অনভিজ্ঞ অথচ উৎসাহী সমালোচকদের এই বিষয়ে অসংলগ্ন রচনা, কোনো কোনো বিলাতী শিল্পীর বিফল প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লরেন্স বিনিয়ন-এর উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। বিনিয়ন লিখেছেন: At the present day mastery of craft is often deprecated in favour of a sort of ferocious incompetence backed by good intentions.*

* Binyon, L, 'English Water-colours,' 2nd ed., p 93

অন্যত্র নানা প্রবন্ধে* বিভিন্ন প্রকার 'পাটা' ও 'পট' এবং এই-সকল চিত্রের শিল্পীদের সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছি, এই প্রবন্ধগুলির প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটি বিশেষ-শ্রেণীর পট পুরাকালে 'যম-পট' নামে প্রচলিত ছিল। যাদু-পটুয়া নামক একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা 'যম-পট' আঁকা হ'ত এবং সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে এইগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর কৌতুক-পটচিত্রগুলি ভারতীয় শিল্পে বাংলার অতুলনীয় দান বলা যেতে পারে; কারণ ভারতের কোনো প্রসিদ্ধ পুরুষানুক্রমিক চিত্রশিল্পের সঙ্গে এর কোনোরূপ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, এটি বাংলার পটুয়াদের নিজস্ব সৃষ্টি। এগুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে যথা, গুজরাট, রাজপুতানা, দাক্ষিণাত্য এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত সমসাময়িক লোকশিল্প থেকে পৃথক। অন্যদিকে আবার 'পাটা' শিল্পকে প্রায় সমগ্র ভারতে প্রচলিত একটি অপরূপ পুরুষানুক্রমিক শিল্পকলার ধারাবাহী বলা যেতে পারে।

সামাজিক কৌতুকচিত্রগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রচলিত হয়; ভারতের চিত্রশিল্পে এই ছবিগুলি একটি নূতন দিক খুলে দিল। পটুয়ারা সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতির প্রবল সমালোচক ছিল। সামাজিক কুৎসা ও কলঙ্ককে ভিত্তি ক'রে তারা ব্যঙ্গচিত্র আঁকত, তার ফলে সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হ'ত। তাদের তুলির ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে কেউই নিষ্কৃতি পেতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আঁকা তারকেশ্বরের মোহন্ত সম্বন্ধে একটি কৌতুকচিত্র এই সংখ্যায় মুদ্রিত হ'ল। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই চিত্রে দলবদ্ধ তিনটি মহিলার ছবি হুবহু ঐ একই ভঙ্গীতে বর্তমানে কোনো শিল্পী কর্তৃক বহুবার আঁকা হয়েছে। ব্যঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়ে পটুয়ারা কপট বকধার্মিক পুরুষদের সংশোধন করত। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের বিষয়ে মার্জিত ও মৃদু কৌতুক ক'রেও তারা ছবি এঁকেছে। আবার সতীনদের দুঃখদুর্দশা বর্ণনা ক'রে বহুবিবাহের কুফলও দেখিয়ে দিয়েছে, স্ত্রৈণ স্বামীদেরও ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে নি। সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র ব্যতীত কৌতুক-নকশা বড় একটা আঁকা হ'ত না। গাছপালা ও পাখীর ছবি-আঁকা পটও দেখা যায়। এরূপ একটি ছবিতে পটুয়া একটি শুকপাখী এঁকে কৌতুক করে তার নামকরণ করেছে 'লালমোহন বাবু'। বাংলার লোকশিল্পের মধ্যে নিজস্ব একটি বিশেষ সম্পদ আছে এবং এই ছবিগুলি জনসাধারণের মনোভাবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে। এই ছবিগুলির মধ্য দিয়েই আমরা সেকালের জনসাধারণের প্রকৃত পরিচয় পাই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পটচিত্রের অকপট সরলতা সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। লোকশিল্পের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করতে হলে, তার রচনাকাল, তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ এবং ছবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে পটের শিল্পনৈপুণ্য এমন সহজেই চিত্তাকর্ষণ করে যে, এ সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর আলোচনা না ক'রেও আমরা সহজেই এই সকল পটের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি।

* Indian Art and Letters Vol. II. No. 2. pp 41-53; 'Old Bengal Paintings', Rupam, Nos, 27-28, July- December. 1926; Hindusthan, Vol. 1 No. 3, pp 21-26.

সাঁওতাল মেয়ে

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসীর সৌজন্যে

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫৩

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র-কানাড়া

বৃথা গেয়েছি বহু গান !
কোথা সঁপেছি মনপ্রাণ !
তুমি ত ঘুমে নিমগন,
আমি জাগিয়া অনুখন !
আলসে তুমি অচেতন,
আমারে দহে অপমান !
বৃথা গেয়েছি বহু গান !

যাত্রী সবে তরী খুলে
গেল সুদূর উপকূলে ;
মহাসাগরতটমূলে
ধূ ধূ করিছে এ শ্মশান !
কাহার পানে চাহ, কবি,
একাকী বসি ম্লানছবি !
অস্তাচলে গেল রবি,
হইল দিবা অবসান।
বৃথা গেয়েছি বহু গান !

২৮ ভাদ্র ১৩০৪

চঞ্চল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রজাপতি, আপন ভুলি
ফিরিস ওরে
ফুলের দলে ছুলি ছুলি
কিসের ঘোরে।
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের
গোপন বাসা
আকাশে তুই বয়ে বেড়াস
তারি ভাষা—
অপ্সরী তার ইন্দ্রসভার
স্বপ্নগুলি
পাঠালো তোর পাখায় ভ'রে।

যে গুণী তার কীর্তিভাণ্ডার
খেলা খেলে,
চিকন রঙের লিখন মুছে
হেলায় ফেলে,
সুর বাঁধে আর সুর সে হারায়
পলে পলে,
গানের ধারা ভোলা সুরের
পথে চলে—
তার হারা সুর নাচের তালে
কোন্ সকালে
ডানাতে তোর পড়ল ঝ'রে।

শান্তিনিকেতন
২৭ ফাল্গুন ১৩৩৩

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা ('বনবাণী'র অন্তর্ভুক্ত) নাট্যে ইহার পাঠান্তর দেখা যায়। শিরোনাম একই; প্রথম ছত্র— 'ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে পরশ করিল তোরে'। কবিতা দুইটি দুইপ্রকার ছন্দে লেখা।

বিলাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এ নূপুর তব
যে পথে বাজিয়ে চল
চিহ্ন কেমনে তার
আপনি ঘুচাবে বলো।
অশোকের রেণুগুলি
রাঙাইল যার ধূলি
সেখানে শিশিরে তৃণ
করিবে কি ছলোছলো।

পাতা পড়ে, ফুল ঝরে,
যায় ফাগুনের বেলা—
দখিন-বাতাস যায়
শেষ করি শেষ খেলা।
তার মাঝে অমৃত কি
ভরিয়া রহে না, সখী।
স্বপনের মালা-সম
তারো স্মৃতি টলোমলো।

শান্তিনিকেতন
ফাল্গুন ১৩৩৩

এই কবিতার ভিন্ন দুইটি পাঠ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা ('বনবাণী'র অন্তর্ভুক্ত) নাট্যে 'বিলাপ' শিরোনামে 'চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি' ইত্যাদি রচনাটি দ্রষ্টব্য; উহা শরৎ-বিদায়ের বিলাপ বলা যাইতে পারে। তৎপূর্বে 'বিচিত্রা'র সর্বপ্রথম সংখ্যায় নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা যখন মুদ্রিত হয়, তখন সেই গান বসন্তবিদায়ের বিলাপ রূপে সন্নিবিষ্ট ছিল; প্রথম ছত্র ও শিরোনাম বনবাণীর অনুরূপ। এস্থলে মুদ্রিত গানটি বিচিত্রায় প্রকাশিত পাঠেরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতের মানবচরিত্র

শ্রীরাজশেখর বসু

মহাভারতকথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিচিত্র সংমিশ্রণ, পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বপ্নদৃষ্ট লোকে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে দেবতা আর মানুষের মধ্যে অবাধে মেলামেশা চলে, ঋষিরা হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করেন এবং মাঝে মাঝে অপ্সরার পাল্লায় প'ড়ে নাকাল হন; তাঁদের তুলনায় বাইবেলের মেথুসেলা অল্পায়ু শিশু মাত্র। যজ্ঞ করাই রাজাদের সবচেয়ে বড় কাজ। বিখ্যাত বীররা যেসব অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অস্ত্র তুচ্ছ। লোকে কথায় কথায় শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা যায় না। স্ত্রীপুরুষ অসংকোচে তাদের কামনা ব্যক্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিছুই অসম্ভব ব'লে গণ্য হয় না; গরুড় গজকচ্ছপ খান; মনুষ্যজন্মের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসীতেও জরায়ুর কাজ হয়।

সুখের বিষয়, অতিপ্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন এই পরিবেশে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সুখদুঃখ আমাদেরই সমান। মহাভারতের যা মুখ্য অংশ, কুরুপাণ্ডবীয় আখ্যান, তাতে অপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী নেই; স্বাভাবিক মানবচরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত, নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রতিহিংসা, মহত্ত্ব ও নীচতা, নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আজকাল যাকে 'মনস্তত্ত্ব' বলা হয়, অর্থাৎ গল্পবর্ণিত নরনারীর আচরণের আকস্মিকতা এবং জটিল প্রণয়ব্যাপার, তারও অভাব নেই। অতিপ্রাচীন ব্যাস ঋষি যে কোনও অর্বাচীন গল্পকারকে এই বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারেন।

জীবন্ত মানুষের চরিত্রে যত জটিলতা আর অসংগতি দেখা যায় গল্পবর্ণিত চরিত্রে ততটা দেখালে চলে না। নিপুণ রচয়িতা যখন বিরুদ্ধ গুণাবলীর সমাবেশ করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতান্ত অসম্ভব না ঠেকে। বাস্তব মানবচরিত্র যত স্থিতিস্থাপক, কল্পিত মানবচরিত্র ততটা হ'তে পারে না, বেশী টানাটানি করলে রসভঙ্গ হয়, কারণ পাঠকসাধারণের প্রত্যয়ের একটা সীমা আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যের লেখকরা বরং অতিরিক্ত সরলতার দিকে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশ নায়ক নায়িকা ছাঁচে ঢালা পালিশ করা প্রাণী, তাদের চরিত্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই; যে ভাল তার কোনও ত্রুটি নেই, যে মন্দ তার কোনও সদ্‌গুণ নেই। রঘুবংশের দিলীপ রঘু অজ প্রভৃতি একই আদর্শে কল্পিত। কালিদাসের নাটকের পাত্রপাত্রীদের চরিত্রেও বেশী বৈচিত্র্য নেই। ভাস প্রাচীনতর, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট নরনারীচরিত্র অপেক্ষাকৃত বিচিত্র। তিনি কবিত্বে কালিদাসের সমান না হ'লেও তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরা অধিকতর স্বাভাবিক ও কৌতূহলজনক।

মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কিন্তু তাতে অসংখ্য চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে তা দুর্লভ। মহাভারতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র অব্যাহত আছে এমন বলা যায় না। মহাভারত সংহিতা গ্রন্থ, তাতে বহু রচয়িতার হাত আছে, এবং

একই ঘটনার বিভিন্ন কিংবদন্তী গ্রথিত হয়েছে। মূল আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিন্তু পরে বহু লেখক তাতে যোগ করেছেন। এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত বিরাট পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ গড়বেন, মূল প্ল্যান থেকে কোথাও বিচ্যুত হবেন না। মহাভারত তাজমহল নয়, বারোয়ারী উপন্যাসও নয়।

মহাভারতে আমরা যে ঘটনাগত ও চরিত্রগত অসংগতি দেখতে পাই তার একটি কারণ — বহু রচয়িতার হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্ন কিংবদন্তীর যোজনা। অন্য কারণ — প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ আর বিচারপদ্ধতি সকল ক্ষেত্রে একালের সমান হ'তে পারে না। মহামতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিতে বললেন, অর্জুনও তাতে খুশী। জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পাণ্ডবরা বিনা দ্বিধায় একজন নিষাদী আর তার পাঁচ পুত্রকে পুড়ে মরতে দিলেন। দুঃশাসন যখন চুল ধ'রে দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রৌপদী আকুল হয়ে বললেন, 'ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে পাচ্ছেন না?' দ্রৌপদী বহু বার প্রশ্ন করলেন, 'আমি ধর্মানুসারে বিজিত হয়েছি কিনা আপনারা বলুন।' ভীষ্ম বললেন, 'ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।' বীরশ্রেষ্ঠ শিভালরস কর্ণ অম্লানবদনে দুঃশাসনকে বললেন, 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কর।' মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চুপ ক'রে ব'সে ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাবতে লাগলেন। এইপ্রকার অনেক স্থলে চরিত্রের সংগতি খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য। ভীষ্ম-দ্রোণ দুর্যোধনাদির অন্নদাস, তাঁরা কুরুকুলের হিতসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দুর্যোধনের উৎকট দুষ্কর্ম সইতেও কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন? তাঁদের কি স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার উপায় ছিল না? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই না। পক্ষান্তরে মহর্ষি ব্যাস যদি আধুনিক গল্প পড়তেন তবে তিনি পতিপ্রাণা সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নিতান্ত অসংগত মনে করতেন, স্বামী আর একটা বিবাহ করেছেন তাতে হয়েছে কি? ধার্মিক নলিনাক্ষ কমলাকে অসংকোচে নিলেন, অগ্নিশুদ্ধি করালেন না, দৈববাণীরও অপেক্ষা রাখলেন না — এও ব্যাসের বিচারে অন্যায় ঠেকত।

আমাদের সৌভাগ্য, মহাভারতে চরিত্রগত অসংগতি খুব বেশী নেই। অধিকাংশ স্থলে মহাভারতীয় নরনারী সম্পূর্ণ স্বাভাবিকরূপে চিত্রিত হয়েছে, তাদের আচরণ আমাদের অবোধ্য নয়। যেটুকু জটিলতা ও আকস্মিকতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের কৌতূহল আর আগ্রহ বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জীবন্ত মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাই।

ধৃতরাষ্ট্রের উদারতা আছে, নীচতাও আছে, দুর্যোধন তাঁকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছেন। এই অস্থিরমতি হতভাগ্য অন্ধের ধর্মবুদ্ধি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, তখন তিনি দুর্যোধনকে ধমক দেন। সংকটে পড়লে তিনি বিদুরের কাছে মন্ত্রণা চান, কিন্তু স্বার্থত্যাগ করতে হবে শুনলেই চ'টে ওঠেন। ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক ইচ্ছা, যুদ্ধ না হয় এবং দুর্যোধন যা অন্যায় উপায়ে দখল করেছেন তাও বজায় থাকে। শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে কৃষ্ণ যখন কৌরবসভা থেকে চ'লে যাচ্ছিলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র নিজের এই সাফাই গাইলেন — 'জনার্দন, পুত্রের উপর আমার কতটুকু প্রভাব আছে তা তুমি দেখলে। আমার দুরভিসন্ধি নেই, সকলেই জানে আমি সর্বপ্রযত্নে শান্তির চেষ্টা করেছি।'

যুধিষ্ঠিরকে লোকে যত নির্বোধ মনে করে বোধ হয় তিনি তত নির্বোধ নন। তিনি জুয়া খেলতে ভালবাসেন, এই তাঁর মহৎ দোষ। তাঁর ক্রোধ অল্প, সেজন্য প্রতিশোধের প্রবৃত্তি তীক্ষ্ণ নয়। দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে তিনি একবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন, কিন্তু সাধারণত তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু, পাপপুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার না ক'রে কোনও কর্ম করেন না, এজন্য দ্রৌপদী আর ভীমের কাছে তাঁকে বহু ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে, কুন্তীও তাঁকে গঞ্জনা দিতে ছাড়েন নি। যুধিষ্ঠির ভালমানুষ হ'লেও দৃঢ়চিত্ত, যা সংকল্প করেন তা থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারে না।

ভীমকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'রক্তপ রাক্ষস', কিন্তু সাধারণ লোকে এই হঠকারী স্থূলবুদ্ধি সরল নিষ্ঠুর লোকটিকে স্নেহ করে। ভীম তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা হনুমানের মত পূজনীয় হ'তে না পারলেও জনপ্রিয় হয়েছেন। তিনি চমৎকার কুযুক্তি দিতে পারেন। বনবাসে তের মাস যেতে না যেতে ভীম অধীর হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'কেবল ধর্মাত্মা হ'লে কোনও রাজাই ধন ও লক্ষ্মী লাভ করতে পারেন না। কৃষক যেমন অল্পপরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ করেন। আপনার বুদ্ধি শাস্ত্রের অনুসরণ ক'রে নষ্ট হয়ে গেছে। মনীষীরা বলেন, সোমলতার প্রতিনিধি যেমন পূতিকা (পুঁইশাক) সেইরূপ বৎসরের প্রতিনিধি মাস। আমরা তের মাস বনবাসে কাটিয়েছি, অতএব এখন রাজ্যোদ্ধারের সময় এসেছে। যদি এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধুস্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন।'

অর্জুন সর্বগুণান্বিত এবং মহাভারতীয় বীরগণের অগ্রগণ্য। তিনি কৃষ্ণের সখা ও মন্ত্রশিষ্য। মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত গুণ তাঁর আছে, এই কারণে এবং অত্যধিক প্রশস্তির ফলে তিনি কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছেন। মহাভারতের শ্রোতা আর পাঠকরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, বাহবা দেন, কিন্তু জল্পনার যোগ্য সরস বস্তু তাঁর চরিত্রে বেশী কিছু পান না।

দ্রৌপদী শ্যামাঙ্গী কিন্তু অসামান্য রূপবতী। বার বৎসর বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করতে আসেন। তখন দ্রৌপদী বয়সের হিসাবে যৌবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি পঞ্চ বীরপুত্রের জননী, তারা দ্বারকায় অস্ত্রশিক্ষা করছে। তথাপি জয়দ্রথ তাঁকে দেখে বলছেন, 'এঁকে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন নেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী।' দ্রৌপদী যখন বিরাটভবনে সৈরিন্ধ্রী রূপে এলেন তখন রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁকে দেখে বলছেন, 'রাজা যদি তোমার প্রতি লুব্ধ না হন তবে তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। এই রাজভবনে যে সকল নারী আছে তারা একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? সুন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখলে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন।' এই আশঙ্কাতেই সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের কবলে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন। বৃদ্ধ বিরাট স্পষ্টত কোনও অনুরাগ দেখান নি, কিন্তু দ্রৌপদী ভীমকে বলেছেন, 'অন্যের পেষা চন্দন বিরাটের রোচে না।' বহু কষ্ট ভোগ ক'রে দ্রৌপদীর মন তিক্ত হয়ে গেছে, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পঞ্চ স্বামীকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, স্বামীরাও তা নির্বিবাদে সহ্য করেন। দ্রৌপদী পাঁচজনকেই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসার কিঞ্চিৎ প্রকারভেদ দেখা যায়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ভক্তি করেন, কৃপাও করেন, ভালমানুষ একগুঁয়ে গুরুজনকে যেমন করা উচিত। বিপদের সময় দ্রৌপদী ভীমের উপরেই বেশী ভরসা রাখেন এবং শক্ত কাজের জন্য তাঁকেই ফরমাশ করেন।

নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্জুন তাঁর প্রথম অনুরাগের পাত্র, পরেও বোধ হয় অর্জুনের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। বিদেশে অর্জুন কিছুকাল উলূপী আর চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, পঞ্চ স্বামীর পত্নী দ্রৌপদী তা গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু অর্জুন যখন সুন্দরী সুভদ্রাকে ঘরে আনলেন তখন দ্রৌপদী অতি দুঃখে বলেছিলেন, 'কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্বার বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।' দ্রৌপদীর একটি বৈশিষ্ট্য — কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধ সম্বন্ধ। তিনি কৃষ্ণের সখী এবং সুভদ্রার ন্যায় স্নেহভাগিনী। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অন্ত নেই, সকল সংকটে কৃষ্ণই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।' তিনি কর্ণের গুণাগুণের জমাখরচ ক'ষে সদ্‌গুণাবলীর মোটারকম উদ্‌বৃত্ত পেয়েছিলেন কিনা জানি না। আমরা কর্ণচরিত্রে নীচতা আর মহত্ত্ব দুই দেখতে পাই, কিন্তু তার সমন্বয় করতে পারি না। বোধ হয় বহু রচয়িতার হাতে প'ড়ে কর্ণচরিত্রের এই বিপর্যয় হয়েছে। একটি বিষয় লক্ষণীয় — ভীষ্ম বহুদর্শী স্থিরবুদ্ধি, হঠাৎ কারও নিন্দা করা তাঁর স্বভাব নয়; তিনি কর্ণকে মোটেই দেখতে পারেন না। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাদের নাম করবার সময় তিনি দুর্যোধনকে বলছেন, 'তোমার প্রিয় সখা ও মন্ত্রণাদাতা নীচপ্রকৃতি অত্যন্ত গর্বিত এই কর্ণ অতিরথ নয়, পূর্ণ রথীও নয়। এ সর্বদাই পরনিন্দা করে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরথী, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে জীবিত অবস্থায় ফিরবে না।'

মহাভারতে সব চেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রক্ষেপের জঞ্জাল উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে আদর্শনরধর্মী ঈশ্বর ব'লে মেনেছেন। মূল মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান নি। মহাভারতের বর্ণনায় স্পষ্ট বোঝা যায়, সর্বত্র ঈশ্বর রূপে স্বীকৃত না হ'লেও কৃষ্ণ বহু সমাজে অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় ভীষ্ম বলছেন,

অসূর্যমিব সূর্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।
ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ ॥

— সূর্য যেমন অন্ধকারময় স্থান উদ্‌ভাসিত করেন, বায়ু যেমন নির্বাত স্থান আহ্লাদিত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহ্লাদিত করেছেন॥ কিন্তু শিশুপালের ন্যায় কৃষ্ণদ্বেষী লোকেরও অভাব ছিল না। দুর্যোধন দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণকে খুব সম্মান দেখিয়েছিলেন, কৃষ্ণ যখন যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে হস্তিনাপুরে আসেন তখনও দুর্যোধন সংবর্ধনার প্রচুর আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কৃষ্ণপ্রীতি আন্তরিক নয়। যুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি শকুনিপুত্র উলূককে পাণ্ডবশিবিরে দূত রূপে পাঠালেন। দুর্যোধনের প্রতিনিধি হয়ে উলূক পাণ্ডবদের খুব গালাগালি দিলেন, তারপর বললেন, 'কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পুংচিহ্নধারী নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে, সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি।'

মহাভারতের আদিপর্বে এই শ্লোকটি আছে—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥

— কয়েক জন কবি এই ইতিহাস পূর্বে ব'লে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরা বলবেন ॥ এই শেষোক্ত কবিরা মহাভারতের ত্রুটি শোধনের চেষ্টা করেছেন। মহাভারতের দুষ্মন্ত ইচ্ছা ক'রে শকুন্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কালিদাসের দুষ্মন্ত শাপের বশে না জেনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কচ পরম ক্ষমাশীল। কাশীরাম দাসের গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কর্ণচরিত্র সংশোধিত হয়েছে।

মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দু-তিন হাজার বৎসর ধ'রে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যনাটকাদির উপাদান যুগিয়েছে। মহাভারতীয় নায়ক-নায়িকাদের কোথায় কি ত্রুটি আছে তা লোকে গ্রাহ্য করে নি, যা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে।

দুঃখময় সংসারে মিলনান্ত আখ্যানই জনপ্রিয় হবার কথা, কিন্তু এদেশের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক প্রচলিত লোকসাহিত্য রামায়ণ মহাভারত বিয়োগান্ত হ'ল কেন? এই দুই গ্রন্থের স্পষ্ট উদ্দেশ্য, বিচিত্র ঘটনার বর্ণনার দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন এবং কথাচ্ছলে ধর্মশিক্ষা, কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যও আছে। মানুষ চিরজীবী নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত। রামায়ণ মহাভারতের রচয়িতারা নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে সুখদুঃখ মিলনবিরহ প্রভৃতি জীবনদ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন, তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও অনাসক্তি সঞ্চারিত করা। তাঁরা শ্মশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেন নি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন —

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥

— সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয় ॥

প্রসাধন

শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

সাঁওতালী জীবন-চিত্র

প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয়

দ্বিতীয় প্রস্তাব

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বঙ্গদেশের অপর নাম গৌড়দেশ। কিন্তু বঙ্গ ও গৌড় মূলত ছিল আধুনিক বাংলা দেশের দুটি বিভিন্ন অংশের নাম। বলা বাহুল্য বঙ্গ ও গৌড় নামক দুটি 'জন'এর বাসভূমি বলেই দুটি 'জনপদ' ওই দুই নামে পরিচিত হয়েছে। বাংলা দেশের প্রাচীন জনসমূহের মধ্যে অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম ব্রহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচটি জনই অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ ছিল।[১] বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচটি জনের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্ম নামটি অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়।[২] বস্তুত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম ব্রহ্ম ও পুণ্ড্র এই ছয়টি জন পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ছিল। গৌড় জন কিন্তু এই জনগুচ্ছের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হয় না। অঙ্গবঙ্গাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গৌড় জনের কি সম্পর্ক ছিল বলা সম্ভব নয়। বৈদিক সাহিত্যে এবং রামায়ণ-মহাভারতে গৌড় নামটি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জনটি যে অতি প্রাচীন কালেই বাংলা দেশের একাংশে বাস করত তাতে সন্দেহ নেই। পাণিনির ব্যাকরণে (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক), মল্লনাগ বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে (তৃতীয় শতক) ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (তৃতীয় শতক) নানা প্রসঙ্গে গৌড় নামের উল্লেখ আছে।[৩] কিন্তু বাংলা দেশের কোন্ অংশে গৌড় জনপদ অবস্থিত ছিল, উক্ত গ্রন্থগুলি থেকে তা জানা যায় না।

গৌড় জনপদের অবস্থান জানা যায় আরও পরবর্তী কালের গ্রন্থ থেকে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (ষষ্ঠ শতক) পূর্বভারতীয় জনপদসমূহের যে তালিকা আছে তাতে 'গৌড়ক' জনপদকে তাম্রলিপ্তক ও বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ), পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ ও উপবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ) এবং সমতট (পূর্ববঙ্গ) থেকে পৃথক্ বলে গণ্য করা হয়েছে (১৪।৬-৮)। বৃহৎসংহিতার অপর একটি তালিকায় (১৬।১-৩) পৌণ্ড্র বঙ্গ সুহ্ম ও বর্ধমানের নাম পাওয়া যায়, এই তালিকায় গৌড়ক জনপদের নাম নেই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৮।১৩-১৪) বৃহৎসংহিতার প্রথম তালিকার অনুরূপ একটি তালিকা আছে, তাতেও গৌড় জনপদ বর্ধমান ও তাম্রলিপ্ত থেকে পৃথক্ বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই তালিকাগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় গৌড় জনপদ অবস্থিত ছিল বাংলা দেশের মাঝামাঝি কোনো জায়গায়। অন্যান্য সূত্র থেকেও এই অনুমানই সমর্থিত হয়। স্মার্ত রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থের (ষোড়শ শতক) একস্থানে আছে—

প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্ধমানতমোলিপ্তপ্রাগ্ জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥

১ "অথ সর্বে প্রথমং প্রাচীং দিশং শিশ্রিয়ুর্যত্রাঙ্গবঙ্গসুহ্মব্রহ্মপুণ্ড্রাদ্যা জনপদাঃ।—কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় অধ্যায় (G. O. Series পৃ ৮)।

২ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৩ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ ২৫০-৫৩।

৩ পাণিনি-অষ্টাধ্যায়ী ৬।২।৯৯-১০০; অর্থশাস্ত্র ২।১৩; কামশাস্ত্র ৫।৬।১২, ৬।৪।৯, ৬।৫।৩৩; নাট্যশাস্ত্র ২৩।৬৪।

আগ্নেয্যামঙ্গবঙ্গোপবঙ্গত্রৈপুরকোশলাঃ।
কলিঙ্গৌড্রান্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যাবিদর্ভশবরাদয়ঃ ॥

—জ্যোতিস্তত্ত্ব, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৪২৩

এখানেও গৌড়কে বঙ্গ উপবঙ্গ বর্ধমান এবং তমোলিপ্ত থেকে পৃথক্ করা হয়েছে। অধিকন্তু বারেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) এবং রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) থেকেও স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। কবিরামের দিগ্‌বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থের (ষোড়শ শতক) মতে গৌড় রাঢ়দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত।[৪] ভবিষ্যপুরাণের এক স্থানে বলা হয়েছে গৌড় গঙ্গার (অর্থাৎ ভাগীরথীর) তীরবর্তী—

গৌড়দেশে গঙ্গায়াঃ কূলে।

—ভবিষ্যপুরাণ ৩।৪।৬।৬১, পৃ ৩৩৬

এবং অন্যত্র গৌড় জনপদকে বর্ধমানের উত্তরে ও পদ্মার দক্ষিণে স্থাপন করা হয়েছে।[৫] বাণভট্টের হর্ষচরিত (সপ্তম শতক) থেকে জানা যায় হর্ষবর্ধনের পরম শত্রু শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের অধিপতি। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসাঙ বলেন শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ নগরে। ঐতিহাসিকদের মতে মুরশিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরের ছয় মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী রাঙামাটি নামক স্থানের নিকটেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগর অবস্থিত ছিল।[৬] সুতরাং আধুনিক মুরশিদাবাদ জেলার কতকাংশ যে গৌড় জনপদের অন্তর্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত মুরশিদাবাদ জেলাটাই যে গৌড়ের এলাকাভুক্ত ছিল না তারও প্রমাণ আছে। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহারাজাধিরাজ পরমভাগবত জয়নাগদেব কর্ণসুবর্ণক নগরে অবস্থিত ছিলেন।[৭] তাঁর বপ্পঘোষবাট (বা মল্লিয়) তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ঔদুম্বরিক নামে একটি 'বিষয়' বা জনপদ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন এই ঔদুম্বরিক বিষয়টিই আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ঔদম্বর সরকার নামে উল্লিখিত হয়েছে।[৮] আবুল ফজলের সময়ে এই সরকারটি যে-সমস্ত মহল নিয়ে গঠিত ছিল তার মধ্যে দুটির নাম আকমহল ও কুমারপ্রতাপ। আকমহল হচ্ছে আধুনিক রাজমহলের (সাঁওতাল পরগনা জেলা) প্রাচীন নাম। আর, কুমারপ্রতাপ হচ্ছে মুরশিদাবাদ জেলার উত্তরাঞ্চলের একটি পরগনার নাম। এই নাম এখনও প্রচলিত আছে। সুতরাং রাজমহল অঞ্চল এবং মুরশিদাবাদ জেলার উত্তরাংশ প্রাচীন ঔদুম্বরিক বিষয়ের অন্তর্গত ছিল এবং এই বিষয়টি সর্বাংশে না হলেও প্রধানত ভাগীরথীর পশ্চিমে ও গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল, একথা নিঃসন্দেহেই মনে করা যেতে পারে। ব্লকম্যান সাহেবের মতে বীরভূম জেলার কতকাংশও ঔদম্বর সরকারের মধ্যে ছিল। সুতরাং এই জেলাটিও অংশত প্রাচীন ঔদুম্বরিক বিষয়ের এলাকাভুক্ত ছিল একথা মনে করা যেতে পারে। এর থেকে সহজেই

---

৪ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড পৃ ১৪ পাদটীকা ৫; বসুমতী ১৩৪০ মাঘ পৃ ৬১০।

৫ *Indian Antiquary* ১৮৯১ পৃ ৪১৯; *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড পৃ ১৩ এবং ১৫ পাদটীকা ১।

৬ নন্দলাল দে-প্রণীত *Geographical Dictionary* দ্বিতীয় সং পৃ ৯৪; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী-সম্পাদিত কানিংহামের *Ancient Geography* পৃ ৭৩২-৩৩।

৭ *Epigraphia Indica* ১৮শ খণ্ড পৃ ৬৩।

৮ *Epigraphia Indica* ১৯শ খণ্ড পৃ ২৮৬।

অনুমান হয় ঔদুম্বরিক বিষয়টি গৌড় বিষয়ের উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল এবং সম্ভবত তার সংলগ্নই ছিল।

ভবিষ্যপুরাণের মতে গৌড়ভূমি অবস্থিত ছিল পদ্মা নদীর দক্ষিণে। সুতরাং পদ্মাকেই গৌড়ের উত্তরসীমা বলে স্বীকার করতে হয়। বৃহৎসংহিতা, জ্যোতিস্তত্ত্ব, দিগ্‌বিজয়প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। কিন্তু আধুনিক কালে অনেক সময় উত্তরবঙ্গকেই গৌড়ভূমি বলে মনে করা হয়। এরকম ধারণা হবার কারণ আছে। গৌড়েশ্বর রামপাল গঙ্গার উত্তর তীরে রামাবতী নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] তাঁর রাজধানীও এই নগরীতেই স্থানান্তরিত হয় বলে অনুমিত হয়। পরবর্তী কালে সেনরাজবংশের প্রথম গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন রামাবতীর অদূরে গঙ্গার উত্তর তীরেই (মালদহ জেলায়) লক্ষ্মণাবতী নামে আরেকটি নগরী স্থাপন করেন।[১০] এটিও সম্ভবত তৎকালীন গৌড় রাজ্যের অন্যতম রাজধানী বলে স্বীকৃত হয়েছিল। তাই কালক্রমে এই নগরীটি গৌড় নামেই অভিহিত হয় এবং তুর্কিবিজয়ের পরে এই গৌড় নগরেই বাংলা দেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী এই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী মূল গৌড়ভূমির প্রায় সংলগ্নই ছিল। সম্ভবত এসব কারণেই গৌড় জনপদকে অনেক সময় পুণ্ড্র- বা বরেন্দ্রী-ভূমিতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। একথা অবশ্য ঠিক যে গৌড় কথার অর্থপ্রসার ঘটার ফলে কালক্রমে বরেন্দ্রীভূমিও গৌড় নামভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এবিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তথাপি একথাও বোধ করি অস্বীকার করা চলে না যে, গৌড় বিষয় অর্থাৎ মূল গৌড় জনপদ গঙ্গা বা পদ্মার দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরেই অবস্থিত ছিল।

এবার গৌড় জনপদের দক্ষিণ সীমা নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার হরাহা-শিলালিপিতে[১১] (খ্রী ৫৫৪) আছে—

কৃত্বা চায়তিমোচিতস্থলভুবো গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্।

অর্থাৎ ঈশানবর্মা গৌড়গণকে চিরকালের জন্য স্থলভূমি ত্যাগ করে সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় গৌড়দের একটি 'সমুদ্রাশ্রয়' ছিল। একাদশ শতকের গুরগি-শিলালিপিতে[১২] বলা হয়েছে—

জলনিধিজলদুর্গং গৌড়রাজোঽধিশেতে।

বোঝা যাচ্ছে গৌড়রাজাদের একটি সমুদ্রজলদুর্গ ছিল এবং সেখানে তাঁরা অবস্থান করতেন কিংবা প্রয়োজন-মতো আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সম্ভবত এই সমুদ্রদুর্গটিই হরাহালিপির 'সমুদ্রাশ্রয়' কথার লক্ষ্য। যাহোক, এই সমুদ্রাশ্রয় বা সমুদ্রদুর্গের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে (ষোড়শ শতক) বলা হয়েছে, গঙ্গানদী সপ্তগ্রামের নিকটে 'সমুদ্রে' পড়েছে। ওই শতকেই বৈদেশিক ফ্রেডারিক সপ্তগ্রামের অদূরবর্তী (হাওড়া জেলার অন্তর্গত) বেতড় নামক স্থানে অসংখ্য

---

৯ আইন-ই-আকবরীতে (ষোড়শ শতক) এই নগরীটি রামৌতি নামে উল্লিখিত হয়েছে।

১০ মিনহাজ উদ্দীনের তবকাৎ-ই-নাসিরীতে (ত্রয়োদশ শতক) এই নগরীটি লখ্‌নৌতি নামে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে।

১১ *Epigraphia Indica* ১৪শ খণ্ড পৃ ১১৭।

১২ *Epigraphia Indica* ২২শ খণ্ড পৃ ১৩২।

জাহাজ দেখতে পেয়েছিলেন।[১৩] এর থেকে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অনুমান করেন যে, সম্ভবত সরস্বতী নদীর বিস্তৃত মুখটিই তৎকালে সমুদ্র বলে গণ্য হত। তাঁর এই অনুমান অসংগত নয়। কিন্তু হরাহা ও গুরগি লিপিতে কথিত সমুদ্রাশ্রয় বা সমুদ্রদুর্গ সপ্তগ্রামের নিকটে অবস্থিত ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। আবুল ফজলের সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী নদীমুখই 'সমুদ্র' বলে বিবেচিত হত। কিন্তু তৎপরে তিন শো বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আধুনিক কালে এই 'সমুদ্র' অনেক দক্ষিণে সরে গিয়েছে। সুতরাং এ অনুমান করা অসংগত নয় যে, আবুল ফজলের পাঁচ শো বছর বা ততোধিক কাল পূর্বে উক্ত 'সমুদ্র' সপ্তগ্রাম থেকে আরও উত্তরে অবস্থিত ছিল। মজার বিষয় এই যে, সপ্তগ্রাম থেকে আনুমানিক পঁয়ত্রিশমাইল উত্তরে এবং নবদ্বীপ থেকে অল্প দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে 'সমুদ্রগড়' নামে একটি স্থান আছে। স্থানটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশন[১৪] এবং ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমার মনে হয় গুরগিলিপিতে কথিত সমুদ্রদুর্গ এবং এই সমুদ্রগড় অভিন্ন। যদি তাই হয় তবে স্বীকার করতে হবে প্রাচীন গৌড় জনপদের দক্ষিণ সীমা অন্তত নবদ্বীপ ও সমুদ্রগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'জলনিধিজলদুর্গে গৌড়রাজোঽধিশেতে' এই কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় উক্ত সমুদ্রদুর্গ গৌড় জনপদের অন্তর্গতই ছিল। হরাহালিপিতে বলা হয়েছে গৌড়রাজ সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্ভবত এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের কথা বলাই লিপিরচয়িতার অভিপ্রায়। সমুদ্রে বা সমুদ্রতীরে আশ্রয়গ্রহণের কথা কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এই দুর্গ গৌড় জনপদের (গৌড়রাজ্যের তো বটেই) অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা মনে করাই সংগত। তাহলে বর্ধমান জেলার উত্তরপূর্বাংশকেও গৌড়ের অংশ বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বর্ধমান নগরটি যে গৌড়ের অন্তর্গত ছিল না তা বৃহৎসংহিতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থের তালিকা তথা ভবিষ্যপুরাণের উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়।

২

এবার গৌড় জনপদের প্রধান নগরগুলির একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের দুটি সূত্রে[১৫] 'গৌড়পুর' শব্দের উচ্চারণবিধান দেওয়া হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় তৎকালে (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে) গৌড়পুর প্রায় সমগ্র উত্তরভারতে সুবিদিত ছিল। পাণিনির সূত্র থেকে অনুমিত হয় যে এই গৌড়পুর পূর্বভারতেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই পুরটি সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

হিউএন্ৎসাঙের ভারতবিবরণ থেকে জানা যায় খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ নগরে। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই (খ্রী ৬৩৮) হিউএন্ৎসাঙ এই নগরটি দর্শন করেন। তাঁর গ্রন্থে এই নগরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[১৬] অতঃপর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গৌড়রাজ্য

---

১৩ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড পৃ ১২ পাদটীকা ৭ এবং পৃ২৮ পাদটীকা ১ ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ তৃতীয় সং পৃ ৩৪৭।

১৪ স্টেশনটি নবদ্বীপধাম স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

১৫ "পুরে প্রাচাম্। অরিষ্টগৌড়পূর্বে চ।" —পাণিনি ৬।২।৯৯-১০০।

১৬ Samuel Beal, *Si-Yu-Ki*, দ্বিতীয় খণ্ড ২০১-২০৪।

অধিকার করে কর্ণসুবর্ণ নগরে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেন।[১৭] কিন্তু গৌড়রাজধানীটি কতকাল তাঁর অধিকারে ছিল জানা যায় না। অতঃপর (সম্ভবত খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে) জয়নাগ নামে একজন স্বাধীন রাজা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তারপর দীর্ঘকাল কর্ণসুবর্ণের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। এই নগরটির শেষ উল্লেখ পাওয়া যায় রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নামক প্রাকৃত নাট্যগ্রন্থে (দশম শতক)।[১৮] এই উল্লেখ শুধু উল্লেখমাত্রই। কিন্তু তা থেকেই মনে হয় এই গৌড়নগরটির খ্যাতি তখনও একেবারে ম্লান হয়নি। অতঃপর নগরটি কিভাবে বিনষ্ট ও বিস্মৃত হয়ে গেল ইতিহাস সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব।

কবি মুরারির অনর্ঘরাঘব নামক সংস্কৃত নাটকে গৌড়রাজধানী চম্পার উল্লেখ আছে—

দেবি, ইয়ং পুনস্ততোঽপি পুরস্তাচ্চম্পানাম গৌড়ানাং রাজধানী।

—অনর্ঘরাঘব, ৭।১২৪

গৌড়ের রাজধানী এই চম্পা নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত অনর্ঘরাঘব রচনার সময়ে (আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ) বাংলা দেশে পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদি তাই হয় তাহলে এই গৌড়রাজধানী চম্পা ও অঙ্গজনপদের প্রধান নগরী চম্পা (ভাগলপুরে) অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে অঙ্গ মগধ প্রভৃতি বহু জনপদ গৌড়সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট্ দেবপালের (এবং হয়তো ধর্মপালেরও) উপাধি ছিল গৌড়েশ্বর। অনর্ঘরাঘব যদি পালসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পূর্বেই রচিত হয়ে থাকে তাহলে রাজধানী চম্পা গৌড় জনপদেরই অন্তর্গত ছিল বলে স্বীকার করতে হয়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে মদারন সরকারের (বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলি জেলার কতকাংশ) বিবরণে এক চম্পানগরীর উল্লেখ আছে। কেউ কেউ মনে করেন অনর্ঘরাঘবের রাজধানী চম্পা ও আইন-ই-আকবরির চম্পানগরী অভিন্ন হতে পারে।[১৯]

পূর্বে বলেছি গুরগিলিপিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, কোনো এক জলদুর্গে গৌড়রাজাদের একটি আবাসস্থল ছিল এবং সেটি অবস্থিত ছিল জলনিধিতে অর্থাৎ সমুদ্রে। সম্ভবত এটিই হরাহালিপিতে গৌড়দের (অর্থাৎ গৌড়রাজাদের) সমুদ্রাশ্রয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। আমি যথাস্থানে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, গৌড়রাজাদের এই জলদুর্গটি সম্ভবত নবদ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রগড় নামক স্থানে কিংবা তার কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল। মনে হয় দুর্গটি নদীমধ্যস্থ কোনো দ্বীপ বা চরের উপরে নির্মিত হয়েছিল। চতুর্দিকে নদীজলের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল বলেই এটি জলদুর্গ বলে বর্ণিত হয়েছে। এই অঞ্চলের 'সমুদ্রে' অর্থাৎ নদীমোহানায় দ্বীপেরও অভাব ছিল না। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি নামেই তার প্রমাণ রয়েছে। গুরগিলিপির 'অধিশেতে' শব্দ থেকে মনে হয় একাদশ শতাব্দীতে এই জলদুর্গে গৌড়রাজাদের একটি স্থায়ী বাসস্থানই ছিল, অর্থাৎ এই স্থানটিকে গৌড়ের অন্যতম রাজধানী বলে মনে করা যায়।

১৭ নিধনপুর তাম্রশাসন, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "কামরূপশাসনাবলী" পৃ ১১।

১৮ মনোমোহন ঘোষ-সম্পাদিত কর্পূরমঞ্জরী (খ্রী ১৯৩৯) পৃ ৫; Sten Konow-সম্পাদিত কর্পূরমঞ্জরী (খ্রী ১৯০১) পৃ ৯ পাদটীকা ১৪।

১৯ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড পৃ ১৩ এবং ৩১।

গুরগিলিপির সমুদ্রদুর্গ আর আধুনিক সমুদ্রগড় যদি বস্তুতই অভিন্ন হয় তাহলে এই স্থানের নিকটবর্তী নবদ্বীপকেও গৌড়ের অন্যতম প্রধান নগর বলে স্বীকার করতে হয়। মিনহাজ উদ্দীনের তবকাৎ-ই-নাসিরী (ত্রয়োদশ শতক) গ্রন্থ থেকে জানা যায় গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের (খ্রী ১১৭৯-১২০৫) অন্যতম বাসস্থান ছিল নদিয়া বা নবদ্বীপ নগরে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে গঙ্গাতীরবর্তী রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা আছে।

স্কন্ধাবারং বিজয়পুরম্ ইত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা তাবদ্ ভুবনজয়িনস্তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।

—পবনদূত, ৩৬

পূর্বে বলেছি তবকাৎ-ই-নাসিরীর নদিয়া এবং পবনদূতের বিজয়পুর সম্পূর্ণ অভিন্ন নাও হতে পারে, নবদ্বীপ সম্ভবত বিজয়পুরের অদূরেই একটি নবপ্রতিষ্ঠিত নগর।[২০] যদি তাই হয় তাহলে একথাও হয়তো সত্য যে, পূর্বতন গৌড়রাজধানী সমুদ্রদুর্গেরই বিজয়সেনকৃত নূতন নাম বিজয়পুর। পবনদূতে রাজধানী বিজয়পুরের কথা যে ভাবে বলা হয়েছে তাতে মনে হয় এই নগরটি ব্রহ্ম দেশের (অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ের) অন্তর্গত ছিল। কিন্তু গ্রন্থশেষে (শ্লোক ১০১) লক্ষ্মণসেনকে 'গৌড়েন্দ্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর, গ্রন্থের গোড়ার দিকে (শ্লোক ৫-৬) যে ভাবে 'গৌড়ী ক্ষৌণী' বা 'গৌড়দেশ'এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় বিজয়পুর গৌড়দেশেরই রাজধানী। পূর্বে বলেছি তবকাৎ-ই-নাসিরীর লখন-ওর বা লক্ষ্মণপুর সম্ভবত নবদ্বীপেরই নামান্তর। যদি তাই হয় তাহলে নবদ্বীপকে রাঢ়ের নগর বলে মানতে হয়। কেননা তবকাতের মতে লখন-ওর রাঢ়েরই অন্তর্গত।[২১] এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, উত্তর রাঢ়ের বিশেষ নাম হচ্ছে ব্রহ্ম। এ হিসাবে পবনদূতের সঙ্গে তবকাতের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু পবনদূতের অপরাংশের সঙ্গে তবকাতের সামঞ্জস্য স্থাপন করা কঠিন। কারণ রাঢ় ও গৌড় এক নয়। শুধু তাই নয়, পবনদূতেরই দুই বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায় তার কারণও খুব স্পষ্ট নয়। হয়তো এখানে গৌড়ী ক্ষৌণী বা গৌড়দেশ বলতে গৌড় রাষ্ট্রই বোঝাচ্ছে।

নদিয়া (অর্থাৎ নবদ্বীপ) ও বিজয়পুর সম্পূর্ণ অভিন্ন না হলেও এই দুটি স্থান পরস্পর সংলগ্ন কিংবা খুবই কাছাকাছি ছিল বলেই মনে হয়। যাহোক, এই নবদ্বীপ-বিজয়পুর ছাড়াও লক্ষ্মণসেনের আরেকটি রাজধানী ছিল বলে অনুমিত হয়। এই দ্বিতীয় রাজধানীর নাম লক্ষ্মণাবতী। এই লক্ষ্মণাবতীই পরে গৌড় নামে পরিচিত ও সমগ্র বাংলা দেশের রাজধানী বলে স্বীকৃত হয়। আর গৌড় নামের সমস্ত গৌরব ও স্মৃতি এই শহরটির সঙ্গেই জড়িত হয়ে যায়। কিন্তু এই গৌরবও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ষোড়শ শতকের শেষভাগে (খ্রী ১৫৭৫) এক ভীষণ মহামারীর আক্রমণে এই মহানগরীটি চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হয়। প্রাচীন গৌড়রাজ্যের শেষ রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর এই শোচনীয় পরিণতি গৌড়াধিপ শশাঙ্কের কীর্তিক্ষেত্র কর্ণসুবর্ণের ঐকান্তিক বিলুপ্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

লক্ষ্মণাবতীর কিছু দক্ষিণেই গঙ্গার উত্তরতীরে রামপালপ্রতিষ্ঠিত রামাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। এই নগরীটি কিছুকালের জন্য পালরাজ্যের রাজধানী হবার গৌরব লাভ করেছিল। কিন্তু অদূরেই

২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৩ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ ২৫১ এবং ২৫৪।

২১ H. G. Raverty-কৃত ইংরেজি অনুবাদ, প্রথম খণ্ড পৃ ৫৮৪-৮৫।

লক্ষ্মণাবতীর অভ্যুদয়ের ফলে অচিরকালের মধ্যে তার মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়।[২২] রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী এই দুটি নগরীই সম্ভবত আসলে ছিল পুণ্ড্র জনপদের অন্তর্গত। কিন্তু গৌড়ভূমির সংলগ্ন ও গৌড়রাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকাতে এই দুটি নগরীকে বর্তমান আলোচনায় গৌড়ের অন্তর্গত বলেই গণ্য করা গেল।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়রাজ্যের যে কয়টি রাজনৈতিক বিভাগ ছিল তার মধ্যে একটির নাম কঙ্কগ্রামভুক্তি।[২৩] তার দক্ষিণেই ছিল বর্ধমানভুক্তি। সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্মভূমি ছিল বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। উত্তর রাঢ় বা ব্রহ্ম ছিল কঙ্কগ্রামের অন্তর্গত। অধিকন্তু মূল গৌড়ভূমির কতকাংশও (মুরশিদাবাদ ও বীরভূম জেলার অংশ, বিশেষত ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরাংশ) কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বর্ধমানভুক্তি প্রভৃতি নামের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় এই ভুক্তিটির শাসনকেন্দ্র ছিল কঙ্কগ্রাম। এটি অবশ্যই একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল এবং কালক্রমে একটি প্রধান নগরের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল সন্দেহ নেই। এই গ্রামটির আধুনিক অবস্থিতি সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। কারও মতে রাজমহলের নিকটবর্তী কাঁকজোলই প্রাচীন কঙ্কগ্রাম। অপর মতে মুরশিদাবাদ জেলায় ভরতপুর থানার অন্তর্গত কাগ্রামই প্রাচীন কঙ্কগ্রামের আধুনিক প্রতিনিধি। এই দ্বিতীয় মতই সমীচীন মনে হয়। কাগ্রাম রাঙামাটি থেকে বেশি দূরবর্তী নয়। তাই মনে হয় প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ (রাঙামাটি) নগরের বিনাশের পরে কঙ্কগ্রামই কালক্রমে আপন ক্ষুদ্র মর্যাদা নিয়ে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের স্থান অধিকার করেছিল। আর, এই কঙ্কগ্রামভুক্তি প্রধানত প্রাচীন গৌড়ভূমি নিয়েই গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

৩

গৌড় নামের অর্থবিস্তারের বিষয়টাও বিবেচনার যোগ্য। কোনো স্থানীয় নামের অর্থবিস্তার ও গৌরববৃদ্ধি ঘটে সাধারণত রাজনৈতিক কারণে। গৌড় নামের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার ফলেই গৌড়ের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেননা শশাঙ্কস্থাপিত এই গৌড়সাম্রাজ্যই বাংলা দেশের প্রথম সাম্রাজ্য। এক সময়ে কান্যকুব্জের খ্যাতি এবং আরও পরে দিল্লির খ্যাতি যেমন সমস্ত আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, শশাঙ্কের পরে গৌড়ের খ্যাতিও তেমনি সমস্ত পূর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহোদয়শ্রী (অর্থাৎ কান্যকুব্জশ্রী) অথবা দিল্লির মসনদ অধিকারের জন্য যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল তেমনি গৌড়াধিকারের গৌরব লাভের জন্য পূর্বভারতীয় নৃপতিবৃন্দের মধ্যেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। গৌড়সম্রাট্ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গৌড়বিজয়ের গৌরবের অধিকারী হন। আবার হাতবদলের ফলে জয়নাগ কর্ণসুবর্ণ অধিকারের গৌরব প্রাপ্ত হন। অতঃপর বঙ্গপতি ধর্মপাল গৌড় অধিকার করেন এবং তৎপুত্র দেবপাল গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে পালবংশের সব রাজারাই নিজেদের এই গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণের একমাত্র অধিকারী মনে করতেন। দ্বাদশ শতকে কর্ণাটাগত সেনরাজারা গৌড়শ্রী অধিকারের জন্য পালরাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম

২২ আইন-ই-আকবরীতে রামৌতির উল্লেখ আছে। তার থেকে মনে হয় যোড়শ শতকেও রামাবতীর অস্তিত্ব হয়তো একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

২৩ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড পৃ ২২-২৪, ২৭-২৮।

সেনরাজা বিজয়সেন গৌড়েন্দ্রকে পরাভূত করার গৌরব দাবী করলেও গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেননি। বল্লালসেনের লিপিতেও এই উপাধি দেখা যায় না। সেনরাজাদের মধ্যে সম্ভবত লক্ষ্মণসেনই প্রথম গৌড়েশ্বর। কিন্তু সেনবংশের এই সৌভাগ্যগর্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই গৌড়েশ্বরত্বের মর্যাদা তুর্কি বিজেতৃগণের আয়ত্ত হল।[২৪]

এইভাবে গৌড়রাজ্যের মর্যাদা- ও পরিধি-বৃদ্ধির সঙ্গে গৌড় নামেরও অর্থবিস্তার ঘটতে লাগল। পূর্বে দেখেছি বৃহৎসংহিতা, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব ও ভবিষ্যপুরাণের মতে বর্ধমান গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বর্ধমান গৌড়েরই অন্যতম প্রধান নগর বলে গণ্য হল। বেতালপঞ্চবিংশতির একস্থানে বর্ধমান নামে গৌড়নগর ও তার রাজা গুণশেখরের উল্লেখ আছে।[২৫] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকর্তৃক অনূদিত বেতালপঞ্চবিংশতির দশম উপাখ্যানেও সেকথা আছে।—

"গৌড়দেশে বর্ধমান নামে এক নগর আছে। তথায়, গুণশেখর নামে, অশেষগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন।"

—গ্রন্থাবলী (সাহিত্যপরিষৎ সং) পৃ ৬৫

ভবিষ্যপুরাণের বেতালপঞ্চবিংশতি উপাখ্যানেও এই কথা প্রায় অবিকল ভাবেই পাওয়া যায়।—

গৌড়দেশে মহারাজ বর্ধনং নাম বৈ পুরম্।
গুণশেখর আখ্যাতো ভূপালস্তত্র ধর্মবান্॥

—ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গপর্ব, ২।১০।১-২ পৃ ২৬৫

বলা বাহুল্য এই বর্ধন নামটি বর্ধমান নামেরই রূপান্তর। শুধু বর্ধমান নগরটি নয়, সমস্ত রাঢ় বিভাগটিই কালক্রমে গৌড়ের অংশ বলে স্বীকৃত হয়ে যায়। বাৎস্যায়নকামসূত্রের টীকাকার যশোধর লিখেছেন—

কলিঙ্গা গৌড়বিষয়াদ্ দক্ষিণেন।[২৬]

—কামসূত্র ৫।৬।৪১ টীকা

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মূল গৌড়ভূমি (অর্থাৎ মুরশিদাবাদ অঞ্চল) থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ (অর্থাৎ রাঢ়ভূমি) কালক্রমে গৌড়বিষয়ের অন্তর্গত বলেই স্বীকৃত হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়।—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো

—প্রবোধচন্দ্রোদয়, দ্বিতীয় অঙ্ক

অথচ বৃহৎসংহিতায় গৌড়ক জনপদ বর্ধমান তাম্রলিপ্তক সুহ্ম এবং উৎকল থেকে পৃথক্ বলে গণ্য হয়েছে।

---

২৪ 'গৌড়েশ্বর' উপাধিটি পরবর্তী কালের 'দিল্লীশ্বর'দের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

২৫ C. H. Tawney-কৃত 'কথাসরিৎসাগর'এর ইংরেজি অনুবাদ, সপ্তম খণ্ড পৃ ২০৪।

২৬ এটি হচ্ছে চৌখম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালায় প্রকাশিত কামসূত্রে (কাশী, দ্বিতীয় সং, খ্রী ১৯২৯, পৃ ২৬৯) ধৃত পাঠ। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদসম্পাদিত সংস্করণ (জয়পুর খ্রী ১৮৯১ পৃ ৩০২) এবং মহেশচন্দ্র পাল-সম্পাদিত সংস্করণের (কলিকাতা খ্রী ১৯০৭ পৃ ৪৪৫) পাঠ কিন্তু অন্যরকম। এই দুই সংস্করণেরই পাঠ হচ্ছে—"গৌড়বিষয়াদ্ দক্ষিণেন (বঙ্গঃ)"। বলা প্রয়োজন যে, প্রাচ্য ভারতের ভৌগোলিক বিবরণের জন্য কামসূত্রের টীকাকার যশোধরের (ত্রয়োদশ শতক, A. B. Keithএর *History of Sanskrit Literature* পৃ ৪৬৯) উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। যেমন, গৌড় জনপদের পরিচয় দান উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, "গৌড়াঃ কামরূপকাঃ প্রাচ্যবিশেষাঃ" (কামসূত্র ৫।৬।৩৮ টীকা)। বলা বাহুল্য এই উক্তি গ্রহণীয় নয়।

পূর্বে দেখেছি দিগ্‌বিজয়প্রকাশেও গৌড় ও রাঢ়ের পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থের বচনেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়।—

প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রগৌড়রাঢ়কাঃ।

—জ্যোতিস্তত্ত্ব, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৪২৩

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের উদ্ধৃত বাক্যটির 'রাষ্ট্রম্‌' কথাটি লক্ষ্য করার যোগ্য। গৌড়ের রাষ্ট্রাধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে গৌড় নামেরও বিস্তৃতি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সাম্রাজ্য যে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ আছে। সুতরাং কলিঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত রাঢ়ভূমিই কালক্রমে গৌড়ের অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

গৌড়ের রাষ্ট্রাধিকারবৃদ্ধির ফলে পুণ্ড্র- বা বরেন্দ্র-ভূমি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গও ক্রমে গৌড় নামের এলাকাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের জৈন লেখকদের মতে লক্ষ্মণাবতী নগরী (মালদহ জেলা) গৌড়দেশেরই অন্তর্গত ছিল।[২৭] মুসলমান রাজত্বকালে এই লক্ষ্মণাবতীই গৌড় নামে পরিচিত হয়। এটা নিঃসন্দেহই উত্তরবঙ্গে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় প্রভাববিস্তারের ফল। এরকম প্রভাবের অন্য প্রমাণও আছে। হিতোপদেশ নামক কথাগ্রন্থের (আনুমানিক দশম শতক) এক জায়গায় আছে—

অস্তি গৌড়দেশে কৌশাম্বীনামনগরী।

—হিতোপদেশ, মিত্রলাভ

বলা বাহুল্য এই কৌশাম্বী বৎস জনপদের প্রধান নগরী কৌশাম্বী (প্রয়াগের নিকটবর্তী কোসাম) নয়। হিতোপদেশের রচয়িতা সম্ভবত বাঙালি ছিলেন।[২৮] সুতরাং গৌড়ের ভৌগোলিক বিবরণে তাঁর ভুল না হবারই কথা। ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসনে ও সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এক কৌশাম্বীর উল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই কৌশাম্বী হচ্ছে রাজশাহি জেলার কুসুম্ব কিংবা বগুড়া জেলার কুসুম্বি নামক স্থান।[২৯] হিতোপদেশের কৌশাম্বীও সম্ভবত বেলাব তাম্রশাসন ও রামচরিতের কৌশাম্বী থেকে অভিন্ন। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে শুধু মালদহ (লক্ষ্মণাবতী) নয়, রাজশাহি বা বগুড়া জেলাও গৌড়দেশের অংশ বলেই স্বীকৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পুরুষোত্তমদেবকৃত ত্রিকাণ্ডশেষ নামক অভিধানগ্রন্থে (২।১।৭) স্পষ্টতই বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তরবঙ্গকে 'গৌড়দেশ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩০] এটা যে মূলত পালবংশীয় গৌড়েশ্বরদের রাজ্যবিস্তারের অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং দেখা গেল মূল গৌড়ের (মধ্যবঙ্গের) রাষ্ট্রীয় প্রভাবের ফলে রাঢ় এবং বরেন্দ্রী অর্থাৎ পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গও কালক্রমে গৌড় নামেই পরিচিত হয়ে গেল। বাকি রইল দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ। বাংলা দেশের এই দুটি অংশের সাধারণ নাম ছিল 'বঙ্গ'। এইজন্যই আধুনিক বাংলা দেশ প্রাচীন যুগে

২৭ *Journal of the Asiatic Society of Bengal* খ্রী ১৯০৮ মে পৃ ২৮১ পাদটীকা ৫।

২৮ A. B. Keith -এর *History of Sanskrit Literature* পৃ ২৬৩।

২৯ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ তৃতীয় সং পৃ ২৯৬; *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড পৃ ২৫ এবং ১৫৮ পাদটীকা ৩।

৩০ 'বরেন্দ্রী গৌড়দেশঃ। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ॥' —শব্দকল্পদ্রুম, চতুর্থ কাণ্ড পৃ ২৭৬। বাচস্পত্য অভিধান, মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌এর অভিধান এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয়শব্দকোষে 'বরেন্দ্রী' শব্দ দ্রষ্টব্য।

অনেক সময়ই গৌড় ও বঙ্গ এই দুই নামের যোগে পরিচিত হত। গৌড় নামের এই ব্যাপকার্থ এবং বাংলা দেশের এই দুই বিভাগের কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় শক্তিসংগমতন্ত্রের একটি উক্তি থেকে।[৩১]

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

—শক্তিসংগমতন্ত্র, সপ্তম পটল

এই ভুবনেশ হচ্ছে উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর। এই প্রসঙ্গে কামসূত্রের টীকাকার যশোধরের (ত্রয়োদশ শতক) উক্তি 'কলিঙ্গা গৌড়বিষয়াদ্ দক্ষিণেন' তথা প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 'গৌড়ং রাষ্ট্রম্ অনুত্তমং' ইত্যাদি উক্তি স্মরণীয়।

গৌড় নামের অর্থপ্রসার এখানেই নিরস্ত হয়নি। মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অধিকার সমাপ্ত করে গৌড় নামের প্রভাব দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকেও অগ্রসর হতে থাকে। গৌড় নামের এই অর্থব্যাপ্তির পথ সুগম করে দেয় সমস্ত দেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য। গৌড়ের গৌরব ও মর্যাদা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় শশাঙ্কের দ্বারা। অতঃপর বঙ্গপতি ধর্মপাল ও দেবপাল সমগ্র বাংলাদেশের আধিপত্য লাভ করে গৌড়েশ্বর হন। এই সময় থেকেই অখণ্ড বাংলার অধীশ্বরগণ গৌড়েশ্বর বলে পরিচিত হতে থাকেন। এমন কি সমগ্র বাংলার আধিপত্য থেকে বিচ্যুত হলেও উক্ত আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেও গৌড়েশ্বর উপাধি ব্যবহৃত হত। তার প্রমাণ পরবর্তীকালীন হীনগৌরব পাল-রাজগণ। সেনরাজাদের একটি রাজধানী ছিল বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে। তাঁরাও সমগ্র বাংলা অধিকার করে গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী রাজা বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন মূল গৌড়ভূমিতে আধিপত্য করেননি, তাঁদের রাজ্য শুধু বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব বাংলাতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁরাও সমগ্র বাংলার আধিপত্যের দাবি ছাড়েননি, তাই গৌড়েশ্বর উপাধিও ত্যাগ করেননি। এইভাবে সমগ্র বাংলায় রাষ্ট্রীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠার তথা গৌড়েশ্বর উপাধির বহুল প্রয়োগের ফলে সমস্ত দেশটাই ক্রমে গৌড় নামে পরিচিত হতে লাগল। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ফলেই বঙ্গ নামেরও অর্থপ্রসার ঘটতে লাগল এবং বঙ্গ বলতে সমস্ত দেশটাকে বোঝাবার পথে কোনো অন্তরায় থাকল না। এইভাবে মধ্য যুগে (তুর্কি রাজত্বকালে) গৌড় ও বঙ্গ নামের যে-কোনো একটি সমগ্র দেশের পরিচায়ক হয়ে উঠল। কিন্তু শশাঙ্ক ধর্মপাল দেবপাল লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি রাজাদের বীরত্বকীর্তির ফলে গৌড় নামের ঐতিহ্য ছিল অধিকতর গৌরবময়। তাই দেশের অধিবাসীরা সমগ্র দেশকে সাধারণত গৌড় নামেই অভিহিত করত এবং বঙ্গ বলতে অনেক সময় শুধু পূর্ববঙ্গই বুঝত। যেমন কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ে আছে—

বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥

বলা বাহুল্য এখানে বঙ্গদেশ মানে পূর্ববঙ্গ। গঙ্গাতীর (এখানে গঙ্গা মানে ভাগীরথী) অঞ্চল গৌড় নামেই পরিচিত ছিল। 'গৌড়দেশে গঙ্গায়াঃ কূলে' ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তি স্মরণীয়। নবাগত তুর্কিরা গৌড়ের গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না, যদিও তাদের আমলে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে পরিচিত

৩১ শব্দকল্পদ্রুম দ্বিতীয় কাণ্ডে (পৃ ৩৭০) 'গৌড়' শব্দের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত।

হয়েছিল। তাই তারা সাধারণত সমগ্র দেশকে 'বাঙ্গালা' নামেই জানত। তাদের দলিলপত্রেও এই নামের ব্যবহারই সাধারণত দেখা যায়। এইভাবে সুবা বাঙ্গালা নামটারই অধিকতর প্রচলন ঘটে। কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে গৌড় নামের ব্যবহারও একেবারে উঠে যায়নি। মোগলসম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের সময়কার বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর শাসনকালের একটি দলিলে সুবা বাঙ্গালাকে বলা হয়েছে 'গৌড়মণ্ডল'।[৩২] পোর্তুগীজ ও ইংরেজরা মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে 'বাঙ্গালা' নামটাই শিখেছে, 'গৌড়' নামটা শেখেনি। তাই ইংরেজিতে 'বেঙ্গল' কথাটাই চলেছে। তারই ফলে আমরা ক্রমে ক্রমে 'গৌড়' নাম ছেড়ে দিয়ে 'বাঙ্গালা' বা 'বাংলা' নামটাকেই স্বীকার করে নিয়েছি। সে অত্যন্ত হাল আমলের কথা। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে রাজা রামমোহন রায় বাংলা ব্যাকরণ লিখে তার নাম দিলেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (খ্রী ১৮৩৩), যদিও এই বইএরই ইংরেজি নাম হল 'Grammar of the Bengali Language'।[৩৩] আরও পরবর্তী কালে (খ্রী ১৮৬১) মধুসূদন লিখলেন—

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।

কিন্তু গৌড় নামটি ক্রমে অচল হয়ে গিয়ে 'বাংলা'কে স্থান ছেড়ে দিয়েছে। তথাপি তার প্রত্নমহিমা অব্যাহত আছে। যদি সাহিত্যে কখনও বাংলাদেশের নামগত প্রত্নভাবকে জাগাবার প্রয়োজন হয় তাহলে গৌড় নামের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যথা—

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা,
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।···
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

এই প্রত্নরসটুকু বহন করার দায়িত্ব নিয়েই গৌড় নামটা এখনও বেঁচে রয়েছে।

৪

এবার গৌড় ও গৌড়জন সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে যেসব সংবাদ পাওয়া যায় তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। আশা করি তা অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।১৩) 'গৌড়িকং রূপ্যম্'এর উল্লেখ আছে। তাতে মনে হয় অর্থশাস্ত্র রচনাকালে (আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক) গৌড়ের রুপো বাংলা দেশের বাইরেও কিছু খ্যাতি অর্জন করেছিল। মল্লনাগ বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে জানা যায় তৎকালে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) গৌড়ের পুরুষরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী দীর্ঘ নখ রাখত।—

দীর্ঘাণি হস্তশোভীন্যালোকে চ যোষিতাং চিত্তগ্রাহীণি চ গৌড়ানাং নখানি স্যুঃ।

—কামসূত্র ৬।৪।৯

গৌড়নারীরা মৃদুভাষী অনুরাগবতী ও কোমলাঙ্গী ছিল বলে বাৎস্যায়ন বর্ণনা করেছেন।—

৩২ *History of Bengal D. U.* প্রথম খণ্ড পৃ ১৪।

৩৩ ইতিপূর্বে (খ্রী ১৮২৬) রামমোহন রায় বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ লিখেছিলেন ইংরেজিতে। তার নাম 'Bengalee Grammar in the English Language'।

মৃদুভাষিণ্যোঽনুরাগবত্যো মৃদ্বঙ্গ্যশ্চ গৌড়্যঃ।

—কামসূত্র ৬।৫।৩৩

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) আছে—

অবন্তিযুবতীনাং তু শিরঃ সালককুন্তলম্।
গৌড়ীনামলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেণিকম্॥

—নাট্যশাস্ত্র ২৩।৬৪

অর্থাৎ গৌড়নারীদের মাথায় সাধারণত কুঞ্চিত কেশ থাকত, আর তারা যে চুলের বেণী বাঁধত তার শেষাংশ থাকত শিখার মতো মুক্ত। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে তৎকালীন বাঙালির গায়ের রং সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা যায়। নাট্যাভিনয়ের সময় কার গায়ের কেমন রং করতে হবে সে সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—

শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বাহ্লিকাদয়ঃ
প্রায়েণ গৌরাঃ কর্তব্যা উত্তরাং যে শ্রিতা দিশম্॥
পাঞ্চালাঃ শূরসেনাশ্চ তথা চৈবোড্রমাগধাঃ।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাস্তু শ্যামাঃ কার্যাস্তু বর্ণতঃ॥

—নাট্যশাস্ত্র ২৩।১০৩-৪

শক যবন (গ্রীক) পহ্লব বহ্লিক (হিন্দুকুশের উত্তরে বাল্‌খ্‌দেশের অধিবাসী) প্রভৃতি যেসব জাতি উত্তরদেশবাসী তাদের রং সাধারণত গৌর করতে হবে। আর, পঞ্চাল (আধুনিক যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশ), শূরসেন (মথুরা), উড্র, মগধ এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ জনপদবাসীদের রং করতে হবে শ্যাম। এই তালিকায় গৌড়ের নাম নেই। কিন্তু গৌড়ের বর্ণ বঙ্গের বর্ণ থেকে পৃথক্ হবার কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ গৌড়ের অধিবাসীরাও গৌরবর্ণ ছিল না।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে (দশম শতক)।—

তত্র পৌরস্ত্যানাং শ্যামো বর্ণঃ, দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণঃ, পাশ্চাত্যানাং পাণ্ডুঃ, উদীচ্যানাং গৌরঃ, মধ্যদেশ্যানাং কৃষ্ণঃ শ্যামো গৌরশ্চ।

—কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায়

পৌরস্ত্য অর্থাৎ প্রাচ্য ভারতীয়দের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু এই শ্যাম দক্ষিণীদের মতো কালো নয়। প্রাচ্য[৩৪] ভারত বলতে তৎকালে প্রধানত গৌড়কেই বোঝাত।[৩৫] তাই পৌরস্ত্যশ্যামতার বর্ণনা উপলক্ষ্যে রাজশেখর গৌড়াঙ্গনারই বর্ণনা দিয়েছেন—

৩৪ বারাণস্যাঃ পুরতঃ পূর্বদেশঃ (কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায়)। অর্থাৎ বারাণসীর পূর্বদিক্‌বর্তী সমস্ত ভূখণ্ডই প্রাচ্যদেশ।

৩৫ কাব্যমীমাংসার তৃতীয় ও সপ্তদশ অধ্যায়ের দুটি উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় রাজশেখরের সময়ে অর্থাৎ নবম-দশম শতকেই বারাণসীর পুরোবর্তী সমগ্র পূর্বভারত গৌড় নামে পরিচিত হয়েছিল এবং অঙ্গবঙ্গ-সুহ্মব্রহ্ম-পুণ্ড্রাদি জনপদ গৌড়ভূমির বিভিন্ন বিভাগ বলে গণ্য হত। গৌড় নামের এই অর্থবিস্তার স্পষ্টতই সমগ্র পূর্বভারতব্যাপী পালসাম্রাজ্যের খ্যাতিপ্রতিপত্তির প্রত্যক্ষ ফল। পালসম্রাটদের উপাধি ছিল 'গৌড়েশ্বর'।

শ্যামেষঙ্গেষু গৌড়ীনাং সূত্রহারৈকহারিষু।
চক্রীকৃত্য ধনুঃ পৌষ্পমনঙ্গো বল্গু বল্গতি ॥

—কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায়

অন্যত্রও অঙ্গবঙ্গ সুহ্মব্রহ্ম পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদবাসীর বেষের বর্ণনা উপলক্ষ্যে রাজশেখর গৌড়াঙ্গনার বেষবর্ণনাই করেছেন।[৩৫]

আর্দ্রার্দ্রচন্দনকুচার্পিতসূত্রহারঃ
সীমন্তচুম্বিসিচয়ঃ স্ফুটবাহুমূলঃ।
দূর্বাপ্রকাণ্ডরুচিরাস্বগুরূপভোগাদ্
গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্তু বেষঃ ॥

—কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন গৌড়নারীদের বেষ হচ্ছে এরকম— গলায় সুতোর হার, কেশপ্রান্ত পর্যন্ত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, বক্ষে আর্দ্রচন্দন এবং অঙ্গে অগুরুচর্চা। আর, গৌড়াঙ্গনাদের অঙ্গ হচ্ছে 'দূর্বাকাণ্ডরুচির' অর্থাৎ শ্যামবর্ণ।

নাট্যশাস্ত্র এবং কাব্যমীমাংসার উক্তি থেকে মনে হয় গৌড়ীয় অর্থাৎ প্রাচ্য জনগণের গায়ের রং ছিল সাধারণত শ্যাম। কিন্তু তার ব্যতিক্রমের প্রমাণও আছে। কাব্যমীমাংসাতেই আছে—

বিশেষস্তু পূর্বদেশে রাজপুত্র্যাদীনাং গৌরঃ পাণ্ডুর্বা বর্ণঃ। এবং দক্ষিণদেশেঽপি।

—কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায়

এর থেকে মনে হয় রাজপরিবার তথা অন্যান্য অভিজাত বংশের নারীপুরুষের গায়ের রং শ্যাম না হয়ে অনেক সময়ই গৌর বা পাণ্ডু হত।

কালিদাসের (পঞ্চম শতক) রচনায় নানা উপলক্ষ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জনপদেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা উপলক্ষ্যে তিনি বাংলার জনপদগুলির মধ্যে শুধু সুহ্ম ও বঙ্গের উল্লেখ করেছেন, গৌড়ের নাম করেননি। রঘুর বঙ্গবিজয়-বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতেঽন্তরেষু সঃ ॥

—রঘুবংশ ৪।৩৬

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বঙ্গজাতি নৌযুদ্ধে নিপুণ ছিল এবং তারা গঙ্গাবক্ষ থেকেই নৌযুদ্ধ চালাত। পূর্বোল্লিখিত হরাহালিপির 'সমুদ্রাশ্রয়' এবং গুরগিলিপির 'জলনিধিজলদুর্গ' কথা থেকে মনে হয় বঙ্গদের ন্যায় গৌড়রাও নৌযুদ্ধনিপুণ ছিল। আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলেই গৌড়রাজারা সমুদ্রের অর্থাৎ গঙ্গাস্রোতের আশ্রয় গ্রহণ করত। পূর্বে যে জলদুর্গ বা সমুদ্রদুর্গের কথা বলেছি সেটিকে রক্ষা করতেও নিশ্চয়ই রণতরী ও নৌরণনৈপুণ্যের প্রয়োজন হত। সমুদ্রদুর্গ বা সমুদ্রগড় নামে কোনো প্রাচীন স্থানের অস্তিত্ব যদি স্বীকার নাও করা যায় তাহলেও একথা মানতেই হবে যে গৌড়দের পক্ষে সমুদ্র বা

গঙ্গাস্রোতের জলটাই ছিল দুর্গ বা আশ্রয়-স্বরূপ। অতএব বঙ্গের ন্যায় গৌড়েরও নৌবিদ্যানৈপুণ্য অনস্বীকার্য।[৩৬]

শুধু নৌযুদ্ধ নয়, স্থলযুদ্ধেও গৌড়বীরগণ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। কান্যকুব্জবিজয়ী গৌড়পতি শশাঙ্কের সময় থেকেই এই খ্যাতির সূচনা হয়। গৌড়েশ্বর ধর্মপাল ও দেবপালের উত্তরভারতব্যাপী সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ফলে সে খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয়। রাজতরঙ্গিণী (খ্রী ১১৪৯-৫০) রচয়িতা কহ্লণ দ্বাদশ শতকেও সুদূর কাশ্মীর থেকে গৌড়ীয় বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্‌যদ্‌ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা।...
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥

—রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৩২-২

'গৌড়গণ তখন যা করেছিলেন স্বয়ং বিধাতারও তা অসাধ্য।... আজও ব্রহ্মাণ্ড গৌড়বীরগণের যশে পরিপূর্ণ রয়েছে।' এরকম অকুণ্ঠ প্রশংসা (বিশেষত তা যদি শত্রুপক্ষীয় দেশের ঐতিহাসিকের লেখনীপ্রসূত হয়) যে-কোনো দেশের বীরগণের পক্ষেই পরম শ্লাঘার বিষয় বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কিন্তু কেবল যুদ্ধবিদ্যায় নয়, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও গৌড়গণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই (খ্রী ৬৩৮) হিউএন্‌সাঙ তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগর দর্শন করেন। হিউএন্‌সাঙের গ্রন্থে এই নগরের ও গৌড়রাজ্যের যে বিবরণ[৩৭] আছে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই। কর্ণসুবর্ণ খুবই জনবহুল নগর আর তার অধিবাসীরাও বিশেষ ঐশ্বর্যশালী। এই রাজ্যে কৃষিকাজ নিয়মিতভাবেই চলে এবং এখানে প্রচুর ফুল উৎপন্ন হয়। রাজ্যের অধিবাসীরা সৎস্বভাব ও অমায়িক। তারা সকলেই বিশেষভাবে জ্ঞানানুরাগী এবং সাগ্রহে বিদ্যাচর্চা করে থাকে। এই প্রসঙ্গে শক্তিসংগমতন্ত্রোক্ত 'গৌড়দেশঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ' কথাটি স্মরণীয়। গৌড়বাসীদের এই বিদ্যানুরাগের অন্য প্রমাণও আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যরচনার গুণাভাব বা ত্রুটি দেখানো উপলক্ষ্যে বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিত গ্রন্থে বলেছেন—

শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম্‌।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ॥
নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্টঃ স্ফুটো রসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুষ্করম্‌॥

—হর্ষচরিত ১।৭-৮

বোঝা যাচ্ছে উত্তর প্রান্তে শ্লেষ, প্রতীচ্যে অর্থ, দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষা এবং গৌড়ে (অর্থাৎ প্রাচ্যে)[৩৮]

৩৬ গুরগিলিপির গৌড় শব্দটিকে ব্যাপকার্থেও গ্রহণ করা যায়। কেননা একাদশ শতকের পূর্বেই গৌড় নামের অর্থপ্রসার ঘটেছিল। সুতরাং উক্ত লিপির গৌড় শব্দের দ্বারা বঙ্গদের কথাও বোঝাতে পারে। হরাহালিপির সময়ে (ষষ্ঠ শতক) গৌড় কথার অর্থবিস্তার হয়নি। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, সে সময়েই বঙ্গজনপদ অন্তত আংশিকভাবে গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩৭ Samuel Bealএর *Si-Yu-Ki*, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২০১-২০৪।

৩৮ লক্ষ্য করবার বিষয়, শুধু রাজশেখরের রচনায় নয়, বাণভট্টের রচনাতেও প্রাচ্যভারত অর্থে গৌড় কথার প্রয়োগ দেখা যায়। এটা শশাঙ্কের পূর্বভারতব্যাপী সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ফল বলেই মনে হয়। ৩৫নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শব্দাড়ম্বরই সাধারণত দেখা যেত। প্রত্যেক প্রান্তেই একটিমাত্র গুণ ছাড়া অন্য গুণের অভাব ছিল। বস্তুত নব অর্থ, অগ্রাম্য জাতি (রচনাপ্রকৃতি), অক্লিষ্ট শ্লেষ, স্ফুট রস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ এই সকল গুণের একত্র সমাবেশ দুষ্কর। বাণভট্টের এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে সপ্তম শতকে শুধু সমরপ্রতিভায় নয়, সাহিত্যপ্রতিভায়ও প্রাচ্য ভারতে গৌড়রা যথেষ্ট বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। তাদের সাহিত্যরচনার প্রধান গুণ ছিল শব্দপ্রয়োগগত ধ্বনিসমারোহ। এই ধ্বনিগৌরব একটা সাহিত্যিক গুণ, এই গুণটিকেই বলা হয়েছে 'বিকটাক্ষরবন্ধ' (বিকট মানে প্রকট, টীকাকারের মতে 'উদারতালক্ষণযুক্ত', বিকৃত বা উৎকট নয়)।

বাণভট্টের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় দণ্ডীর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে (সপ্তম-অষ্টম শতক)। দণ্ডীর মতে তৎকালে ভারতবর্ষে যে কয়টি বিশিষ্ট সাহিত্যিক রীতি বা মার্গ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতিই প্রধান (১।৪০)। এটা তৎকালীন গৌড়জনের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। দণ্ডীর মতে গৌড়ী রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং বন্ধগৌরব অর্থাৎ রচনার গাঢ়তা (১।৪৪)। এ হচ্ছে প্রধানত শব্দ বা ধ্বনির আড়ম্বর। অর্থ এবং অলংকারের প্রাচুর্যও (অর্থালংকারডম্বরৌ) গৌড়ীয় রচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছিল (কাব্যাদর্শ ১।৫০)। সুতরাং দেখা গেল শব্দ অর্থ এবং অলংকারের প্রাচুর্য গৌড়ীয় রীতিকে বৈদর্ভী রীতি থেকে 'বিপর্যয়' অর্থাৎ পার্থক্য দান করেছিল। বৈদর্ভী রীতির প্রধান গুণ শ্লেষ প্রসাদ মাধুর্য সুকুমারতা ইত্যাদি। তৎকালে গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতির আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। দণ্ডী ছিলেন বৈদর্ভী রীতিরই পক্ষপাতী। কিন্তু ভামহ (এক মতে দণ্ডীর কিছু পরবর্তী, অন্য মতে পূর্ববর্তী)[৩৯] স্পষ্টতই গৌড়ী রীতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন (১।৩১-৩২)।

অতঃপর গৌড়দের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাই রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা (দশম শতক) থেকে। এই গ্রন্থে আছে—

গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেশ্যাঃ।

—কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায়

বোঝা যাচ্ছে গৌড়ে সংস্কৃতের চর্চা খুবই ছিল, প্রাকৃতের চর্চা তেমন ছিল না। তৎকালে গৌড়ীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণও ভালো ছিল।

পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠাঃ প্রাকৃত বাচি তে।
বাণারসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন্ মগধাদয়ঃ॥

—কাব্যমীমাংসা, সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক কালে বাঙালির সংস্কৃত-উচ্চারণ বিদ্রূপের বিষয়। কিন্তু সেকালের গৌড়বাসীরা সংস্কৃত-উচ্চারণেও খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু তাদের প্রাকৃত-উচ্চারণ বিশেষ ভাবেই নিন্দাভাজন ছিল। দেবী সরস্বতী গৌড়বাসীর প্রাকৃত-উচ্চারণে অতিষ্ঠ হয়ে স্বাধিকার ত্যাগ করতেই ইচ্ছুক হলেন এবং ব্রহ্মাকে গিয়ে বললেন—

৩৯ সুশীলকুমার দে-প্রণীত *Sanskrit Poetics* প্রথম খণ্ড পৃ ৪৫-৪৯, ৬৯-৭০ ; A. B. Keith-প্রণীত *History of Sanskrit Literature* পৃ ৩৭৫-৭৬।

ব্রহ্মন্ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং স্বাধিকারজিহাসয়া।
গৌড়স্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাঽস্তু সরস্বতী ॥[৪০]

—কাব্যমীমাংসা, সপ্তম অধ্যায়

হয় গৌড়রা প্রাকৃত ছাড়ুক, নাহয় অন্য সরস্বতী হোক। বলা বাহুল্য, এই উক্তি তৎকালীন গৌড়বাসীর পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়। কিন্তু তৎপরেই গৌড়বাসীর পাঠপ্রণালীর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয় না হলেও একেবারে নিন্দনীয়ও নয়।

নাতিস্পষ্টো ন চাশ্লিষ্টো ন রুক্ষো নাতিকোমলঃ।
ন মন্দ্রো নাতিতারশ্চ পাঠী গৌড়েষু বাড়বঃ ॥

—কাব্যমীমাংসা, সপ্তম অধ্যায়

অর্থাৎ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের পাঠ অতিস্পষ্টও নয় অস্পষ্টও নয়, রুক্ষও নয় অতিকোমলও নয়, গম্ভীরও নয় অতিতীব্রও নয়। এরকম উচ্চারণকে পুরস্কৃত করা না গেলেও তিরস্কৃত করা চলে কি?

৪০ মালবের পরমারবংশীয় রাজা ভোজ (আনুমানিক খ্রী ১০১০-৫৫) ‘সরস্বতীকণ্ঠাভরণং’-নামক স্বীয় গ্রন্থে (২।১৪) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। এই গ্রন্থের টীকাকার রত্নেশ্বর শ্লোকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন, “ব্রহ্মন্নিত্যাদিনা নিন্দার্থানুবাদেন গৌড়েষু প্রাকৃতানৌচিত্যং রাজশেখরেণ ব্যঞ্জিতম্” (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, কাব্যমালা সং, পৃ ১২২)। A. B. Keith-এর *History of Sanskrit Literature* পৃ ৩৮৫ দ্রষ্টব্য।

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

মহাকাব্য হচ্ছে সেই কাব্য যা কোন জাতিকে যুগযুগান্তর ধরে বিভিন্নমুখী অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে। সাহিত্যিক, শিল্পী, সাধক সকলেই তা থেকে তাঁদের মনের খোরাক আহরণ করতে পারেন। সেই কারণেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য, আর এক তৃতীয় মহাকাব্য ছিল গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা" যা বিস্মৃতির অন্তঃস্থলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কাব্য আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও লাকোৎ নামক একজন ফরাসী অধ্যাপক তার সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন (Lacote: Essai sur Guṇāḍhya et la Bṛhatkatha) তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৃহৎকথা পুনরুদ্ধারের আশা আর দুরাশা নয়। বৃহৎকথা যে মহাকাব্য ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সোমদেবের "কথাসরিৎসাগর"। কথাসরিৎ-সাগর বৃহৎকথার আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও যে সেই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছিল তাতে এখন আর কারো সন্দেহ নাই। সোমদেব তাঁর কাব্য রচনা করেন খৃস্টীয় একাদশ শতকের শেষপাদে। আর তার অল্পকাল পূর্বেই একাদশ শতকের মধ্যভাগে ঐ বৃহৎকথা অবলম্বন করেই ক্ষেমেন্দ্র রচনা করেন তাঁর "বৃহৎ-কথামঞ্জরী"। ক্ষেমেন্দ্রের পূর্বেও গুণাঢ্যের বৃহৎকথা অবলম্বনে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল— বুধস্বামীর "বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ"। বুধস্বামীর সঠিক তারিখ জানবার উপায় না থাকলেও অনুমান করা যায় তিনি খৃস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে জীবিত ছিলেন। এ ছাড়া বৃহৎকথার বিভিন্ন গল্প নানা নাটক ও কাব্যগ্রন্থের আধার হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প ছিল তার মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয়। সংস্কৃত ছাড়া আরও অন্যান্য ভাষায় বৃহৎকথার গল্পাংশ প্রচলিত ছিল। তামিল ভাষায় বৃহৎকথার গল্পাংশের অনুবাদ করা হয়েছিল। পারস্য ভাষাতেও যে বৃহৎকথার অনুবাদ প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় কাশ্মীরী ঐতিহাসিক শ্রীবরের তৃতীয় রাজতরঙ্গিণীতে। এই অনুবাদ এখন পাওয়া যায় না, তবে তার একখানি খণ্ডিত পত্রের সন্ধান মেলে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুঁথিশালায়।

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা যে মহাকাব্য ছিল তার উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল নয়। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বলেছেন—

কথাপি সর্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।
ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাং ॥

'কথা রচনা যেমন সংস্কৃতে হয় অন্যান্য সমস্ত ভাষাতেও হয়। অদ্ভুতার্থ বৃহৎকথা ভূতভাষায় লেখা হয়েছিল।' বাণভট্ট কাদম্বরীতে উজ্জয়িনীর লোকদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে তারা মহাভারত, পুরাণ, রামায়ণ ও বৃহৎকথার প্রগাঢ় ভক্ত ছিল। হর্ষচরিতের ভূমিকাতেও তিনি বৃহৎকথাকে একখানি অপূর্ব কাব্য বলে স্বীকার করেছেন—

সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরীপ্রসাধনা।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা ॥

এ ছাড়া নানা পরবর্তী গ্রন্থ, দশরূপ, তিলকমঞ্জরী, নলচম্পূ প্রভৃতিতে বৃহৎকথা এবং গুণাঢ্যের উল্লেখ রয়েছে। গুণাঢ্য ব্যাস ও বাল্মীকির সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। কোন কোন কবি তাঁকে ব্যাসের অবতার বলেও সম্মানিত করেছেন।

গুণাঢ্যের খ্যাতি বৃহত্তর ভারতেও পৌঁছেছিল। খৃস্টীয় নবম শতকে কম্বুজের রাজা যশোবর্মন তাঁর এক শিলালেখে গুণাঢ্যের উল্লেখ করেছেন—

পারদঃ স্থিরকল্যাণো গুণাঢ্যঃ প্রাকৃতপ্রিয়ঃ।
অনীতির্থো বিশালাক্ষঃ শূরো ন্যক্কৃতভীমকঃ॥

একই শিলালেখের অন্যত্র বলা হয়েছে—

গুণান্বিতস্তিষ্ঠতু দূষিতোঽপি
স্থানার্পিতো যেন পুনর্গুণাঢ্যঃ।
গদ্যোঽপ্যলঙ্কারবিভূষণায়
হরপ্রযুক্তঃ কিমুতামৃতাংশুঃ॥

এই সকল উল্লেখ থেকে এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পৈশাচীপ্রাকৃতে রচিত বৃহৎকথা বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব একাদশ শতকে কাশ্মীরে যে পৈশাচী বৃহৎকথা দেখেছিলেন সে গ্রন্থ গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থ কি তার সংস্করণবিশেষ তা নিঃসন্দেহে স্থির করা সম্ভব নয়। সোমদেব যে এই প্রাচীন কাশ্মীরী বৃহৎকথার সংস্কৃতানুবাদ করেছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বৃহৎকথায়াঃ সারস্য সংগ্রহম্ রচয়াম্যহম্। 'আমি বৃহৎকথার সারসংগ্রহ রচনা করব।' তিনি অন্যত্র বলেছেন—

নানা কথামৃতময়স্য বৃহৎকথায়াঃ।
সারস্য সজ্জনমনোম্বুধিপূর্ণচন্দ্রঃ।
সোমেন বিপ্রবরভূরিগুণাভিরাম-
রামাত্মজেন বিহিত খলু সংগ্রহোঽয়ম্॥

অম্বুধিপূর্ণচন্দ্রের উল্লেখে গ্রন্থের নামের ইঙ্গিত রয়েছে। অম্বুধিপূর্ণচন্দ্র = সাগরসার। সোমদেব এই সাগরসারের সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে কাশ্মীরী বৃহৎকথার সম্পূর্ণ নাম ছিল "বৃহৎকথাসরিৎসাগর" আর সোমদেবের গ্রন্থের নাম ছিল "বৃহৎকথাসরিৎসাগরসারসংগ্রহ"— সংক্ষেপে "কথাসরিৎসাগর"। কাব্যাদর্শের একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের এ কথা জানা ছিল, কেননা গুণাঢ্যের বৃহৎকথার উল্লেখে তিনি বলেছেন—

পৈশাচ্যাশ্চাপভ্রংশরূপত্বাদপভ্রংশকাব্যং
বৃহৎকথেতি জ্ঞেয়ম্ যথা বৃহৎকথাসরিৎসাগরঃ।
বৃহৎকথাসরিৎসাগরসারস্তু সংস্কৃতেন তস্যানুবাদরূপঃ।

সুতরাং তাঁর মতে পৈশাচী ও অপভ্রংশ ভাষা একই ভাষা। বৃহৎকথা অপভ্রংশকাব্য, আর তার অন্য নাম বৃহৎকথাসরিৎসাগর। এই গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদই হচ্ছে বৃহৎকথাসরিৎসাগরসার।

কথাসরিৎসাগর যে বৃহৎকথার অনুবাদ তা সোমদেব নিজেও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—

যথা মূলং তথৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ।

গ্রন্থবিস্তরসংক্ষেপমাত্রং ভাষা চ ভিদ্যতে॥

অর্থাৎ, মূল ও এই গ্রন্থ একই রকম। মূল থেকে এতটুকু ব্যতিক্রমও নাই। স্থানে স্থানে সংক্ষেপ করা হয়েছে মাত্র। প্রভেদ শুধু ভাষার।

ঔচিত্যান্বয়রক্ষা চ যথাশক্তি বিধীয়তে।

কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজনা।

অর্থাৎ, মূলকাব্যের ঔচিত্য ও ঘটনাপারম্পর্য যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। কথারস অব্যাহত রেখে কাব্যাংশগুলির অনুযোজনা করা হয়েছে।

সুতরাং সোমদেবের এ কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কথাসরিৎসাগর মূল বৃহৎকথার অনুগামী। সে গ্রন্থে যে শুধু মূলের গল্পাংশই রয়েছে তা নয়! মূল গ্রন্থের কাব্যরস ও ঔচিত্যগুণও অব্যাহত রাখা হয়েছে। মূল বৃহৎকথার শুধু ভাষাই রূপান্তরিত হয়েছে আর কোন কোন স্থানে কথাবস্তু সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

যে উদ্দেশ্যে সোমদেব এ কাজে হাতে দিয়েছিলেন তা অতি মহৎ। মহাকবির খ্যাতি অর্জন করবার জন্য তিনি তা করেন নি। বৃহৎকথার কথাজাল সহজে স্মরণ রাখবার সহায়তা হতে পারে মনে করেই তিনি এই কাব্য রচনা করেন—

বৈদগ্ধ্যখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুদ্যমঃ।

কিংতু নানা কথাজালস্মৃতিসৌকর্যসিদ্ধয়ে॥

বৃহৎকথার মূলগ্রন্থ যদি কোনদিন উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে সোমদেবের এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

২

গুণাঢ্যের এই কাব্যরচনার ইতিহাস পাওয়া যায় উপাখ্যানে, আর সে উপাখ্যান খুব সম্ভব তাঁরই স্বকপোলকল্পিত। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদের উভয়েই ঐ উপাখ্যান পেয়েছিলেন প্রাচীন বৃহৎকথা হতে। কাব্যে অপ্রাকৃত রস অবতারণার জন্যই এই অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি। পার্বতী এক সময়ে পুরাণ, ধর্মকথা প্রভৃতি শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে শিবের কাছে জেদ ধরলেন নূতন ধরনের গল্প শোনবার। শিব পার্বতীকে বিদ্যাধরদের গল্প বললেন আর সেই গল্প লুকিয়ে শুনলেন পুষ্পদন্ত। পুষ্পদন্ত স্ত্রী জয়াকে সে গল্প বললেন। জয়া ভুলক্রমে সে কথা শোনালেন পার্বতীকে। পার্বতী ক্রোধে অভিভূত হয়ে পুষ্পদন্তকে অভিশাপ দিলেন যে সে যেন মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। গণ মাল্যবান পুষ্পদন্তকে রক্ষা করতে এসে নিজেও হলেন বিপদগ্রস্ত। পার্বতী তাঁকেও ওই একই অভিশাপ দিলেন। শুধু এইটুকু ভরসা দিলেন যে পুষ্পদন্ত বিন্ধ্যপর্বতে কাণভূতি-নামক পিশাচকে যখন এই গল্প শোনাতে পারবে, তখন সে শাপমুক্ত হবে। কুবেরের অভিশাপে সুপ্রতীক-নামক এক যক্ষ ঐ পিশাচ হয়ে জন্মাবে। মাল্যবান্ শাপমুক্ত হবে যখন সে কাণভূতির নিকট ঐ গল্প শুনতে পাবে। ফলে পুষ্পদন্ত

জন্মগ্রহণ করলেন কৌশাম্বীতে, তাঁর নাম হল বররুচি বা কাত্যায়ন; আর মাল্যবান জন্মগ্রহণ করলেন প্রতিষ্ঠানপুরে, তাঁর নাম হল গুণাঢ্য। বররুচি নন্দরাজার মন্ত্রী হলেন। স্বপ্নে তিনি আগেকার জন্মের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে কাণভূতির সন্ধান পেলেন আর তাঁকে বিদ্যাধরদের সাত রাজার গল্প শুনিয়ে শাপমুক্ত হলেন।

ওদিকে গুণাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে নানা বিদ্যা অধিগত করলেন। রাজা সাতবাহন তাঁর গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করলেন। সাতবাহন রাজা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানতেন না। রানী একদিন জলক্রীড়ার সময় বললেন "জল ছিটিও না।" (মোদকং দেহি)। রাজা বুঝলেন "মোদক দাও"। রানী বেশ একটু হাসলেন। রাজা লজ্জিত হয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে মনস্থ করলেন। গুণাঢ্য বললেন ব্যাকরণ শিখতে ছ' বছর লাগবে। মন্ত্রী শর্ববর্মণ বললেন ছ' মাস লাগবে। গুণাঢ্য প্রতিজ্ঞা করলেন যে যদি তা সম্ভব হয় তাহলে তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কোন ভাষাই ব্যবহার করবেন না, এক কথায় বোবা হয়ে থাকবেন। শর্ববর্মণ "কাতন্ত্র" রচনা করে ছ' মাসে রাজাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিয়ে দিলেন। গুণাঢ্যের হার হল; তিনি প্রতিজ্ঞামত কথা বন্ধ করে বিন্ধ্যপর্বতে চলে গেলেন।

বিন্ধ্যপর্বতে পিশাচদের বাস। গুণাঢ্য তাদের থেকে পৈশাচী ভাষা শিখে নিলেন। এই সময়ে তাঁর দেখা হল পিশাচ কাণভূতির সঙ্গে। কাণভূতি তাঁকে শোনালেন পুষ্পদন্ত বা বররুচির থেকে শেখা বিদ্যাধরদের অপূর্ব গল্প। গুণাঢ্য নিজের রক্ত দিয়ে সাতলক্ষ শ্লোকে এই অদ্ভুত গল্প ছন্দোবদ্ধ করলেন ও তাঁর দুই শিষ্যের হাতে এই কাব্যগ্রন্থ পাঠালেন সাতবাহন রাজার নিকট। কিন্তু পিশাচদের ভাষায় রচিত এ কাব্যগ্রন্থ রাজা গ্রহণ করলেন না। গুণাঢ্য মনের দুঃখে তাঁর এই কাব্য পুড়িয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন। তারপর এক অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে বনের পশুপক্ষীদের কাছে তাঁর কাব্যের এক এক পাতা পড়ে শোনাতে লাগলেন আর তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পশুপক্ষীরা পরস্পরে হিংসা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে এই কাব্য শুনতে লাগল। এই অদ্ভুত ব্যাপার রাজার শ্রুতিগোচর হল। তিনি বনে এলেন গুণাঢ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। তিনি তাঁর মহাকাব্যের শেষ অংশ রক্ষা করলেন। তখন সমগ্র কাব্যের মাত্র সপ্তমাংশ অবশিষ্ট ছিল। এই শেষাংশই হচ্ছে নরবাহনদত্তের গল্প, আমাদের বৃহৎকথা।

এই উপাখ্যানের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। গুণাঢ্য জন্মেছিলেন প্রতিষ্ঠানে আর সাতবাহন রাজাদের সময়। প্রতিষ্ঠান অবস্থিত ছিল গোদাবরীর তীরে, অন্ধ্র রাজাদের রাজধানী। অন্ধ্র রাজাদের বংশগত নাম ছিল সাতবাহন বা শালিবাহন। কোন্ সাতবাহনের সময় গুণাঢ্য জন্মেছিলেন তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই বংশের রাজা হাল প্রাকৃতভাষায় রচিত কাব্যের আদর করতেন এবং নিজে সপ্তশতী নামে প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন। সাতবাহনবংশের এই রাজা খুব সম্ভব খৃস্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা হয়ত তাঁর দ্বারাই প্রচারিত হয়েছিল। পুষ্পদন্ত বা বররুচির সঙ্গে গুণাঢ্যের সম্পর্ক কল্পিত বলেই মনে হয়। বররুচি প্রথম প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন; তাঁর গ্রন্থের নাম প্রাকৃতপ্রকাশ। বৃহৎকথার ভাষা পৈশাচীও ছিল প্রাকৃত ভাষা, সেই কারণেই গুণাঢ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। "কাতন্ত্র" ব্যাকরণের রচয়িতা শর্ববর্মণও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনিও খুব সম্ভব রাজা হালের সময়েই জীবিত

ছিলেন। "কাতন্ত্র" ও "ইন্দ্রব্যাকরণ" একই সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ। কাতন্ত্রের খণ্ডিত অংশ খৃস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের পুঁথিতে মধ্যএশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে।

উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছিল খুব সম্ভব কাশ্মীরে, যখন শৈব ধর্মের বিশেষ প্রচলন হয়। পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থই শিব ও পার্বতীর মধ্যে গুহ্য আলাপ-আলোচনারূপে বর্ণিত হয়েছে। পার্বতী প্রশ্ন করেন, শিব তার উত্তর দেন। এ সব আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তির শোনবার অধিকার নাই! তন্ত্রশাস্ত্রে শিব-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা এইরূপ লুকিয়ে শোনবার আরও দু'একটি উদহরণ পাওয়া যায়। হয়ত পৈশাচী ভাষায় রচিত বৃহৎকথার মর্যাদা বাড়াবার জন্যই গুণাঢ্য তা শিবমুখনিস্থত কাব্যরূপে উল্লেখ করেছিলেন। সেই সূত্র অবলম্বন করে পরে উপাখ্যান রচিত হয়। আর সে উপাখ্যান হয়ত খুব প্রাচীন নয়। সুবন্ধুর বাসবদত্তার টীকাকার জগদ্ধর লিখেছেন—

গুণাঢ্যঃ তেন কিল ভগবতো ভবানীপতের্মুখকমলাদুপশ্রুত্য বৃহৎকথা নিবদ্ধেতি বার্তা।

এতে বিদ্যাধরদের উপাখ্যানের কোন ইঙ্গিত নাই। শিব যখন পার্বতীকে গল্প বলছিলেন গুণাঢ্য তা লুকিয়ে শোনেন আর বৃহৎকথা কাব্য রচনা করেন।

৩

যে ভাষায় বৃহৎকথা রচিত হয়েছিল তার নাম পৈশাচী, পিশাচদের ভাষা। গুণাঢ্যের সময়ে সে ভাষা সাহিত্যের বাহন হয় নি বলেই তাঁর কাব্য তাঁর জীবদ্দশায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করতে পারে নাই। পৈশাচী ছিল মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতির মতই একটি প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু সে প্রাকৃত কোন্ অঞ্চলের কথ্য ভাষা ছিল তা জানা যায় নি। পৈশাচী ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি বলেই তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র, ত্রিবিক্রম, মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র প্রভৃতি পৈশাচীর উল্লেখ করেছেন। এঁরা পৈশাচী প্রাকৃতের অন্তর্গত নানা উপভাষার নাম করেছেন—যেমন চূলিকা-পৈশাচী, কৈকেয়-পৈশাচী, বাহ্লীক-পৈশাচী, গান্ধার-পৈশাচী ইত্যাদি। এই সব বৈয়াকরণিকদের মধ্যে যাঁরা অর্বাচীন তাঁরা পাণ্ড্য, নেপাল, কুন্তল প্রভৃতি অন্যান্য দেশের পৈশাচী উপভাষারও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা পৈশাচীর প্রকৃত রূপ না জানাতে। বস্তুতঃ চূলিকা-পৈশাচী এবং কৈকেয়, বাহ্লীক ও গান্ধার প্রদেশের পৈশাচীই পৈশাচী-প্রাকৃতের সত্যকার উপভাষা ছিল।

চূলিক ও শূলিক নাম অভিন্ন। পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে নানা দেশ ও জাতির নামের মধ্যে ঐ দুই নাম অভিন্নভাবেই পাওয়া যায়। এই অভিন্নত্বের উদাহরণস্বরূপ চালুক্য-শোলঙ্কির উল্লেখ করা যেতে পারে। চালুক্যদের একটি শাখাই শোলঙ্কি নামে পরিচিত ছিল। চালুক্য ও শোলঙ্কি উভয়ে একই নামের বিভিন্ন রূপ। শূলিক নামে যে জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় সে জাতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। সমরকন্দ অঞ্চলে যে ইরানী জাতি বাস করত তাদের নাম ছিল সুগ্ধ বা সুগ্‌-দিক্ আর এই সুগ্‌-দিক্ নামই কালক্রমে সুলিক্ বা শূলিক্ রূপ গ্রহণ করে। মধ্যএশিয়ায় সুগ্ধজাতি শূলিক্ নামেই পরিচিত ছিল। তিব্বতী সাহিত্যেও তারা ঐ নামেই উল্লিখিত হয়েছে। শূলিকরা ছিল বণিক্ এবং বাণিজ্যব্যপদেশে তারা দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে পঞ্জাব

অঞ্চলেও তাদের ছোটোখাটো উপনিবেশ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শক ও কুষাণদের সঙ্গেই তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কথ্য ভাষা তাদের মুখে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাকেই খুব সম্ভব শূলিক-পৈশাচী বা চূলিক-পৈশাচী বলা হত। কৈকেয়, গান্ধার, বাহ্লীক প্রভৃতি দেশও ছিল ঐ অঞ্চলে অবস্থিত। অতএব ঐ অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষাই ছিল মুখ্যতঃ পৈশাচী।

পৈশাচীকে ভূতভাষাও বলা হয়েছে। সে ভাষা যদি মুখ্যতঃ উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের কথ্য ভাষাই হয় তাহলে পিশাচ বা ভূত নামের সার্থকতা কি? খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হতে আরম্ভ করে প্রায় তিন-চার শতাব্দী ধ'রে মধ্যএশিয়ার নানা যাযাবর জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে বসবাস করতে থাকে। এদের আচার ব্যবহার যে শিষ্টাচার ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, উপরন্তু তাদের কোন সাহিত্যও ছিল না। সুতরাং এই সব বিদেশী জাতিকে পিশাচ বা ভূত বলে উল্লেখ করা কিছু বিচিত্র নয়।

পৈশাচী প্রাকৃতের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হেমচন্দ্র করেছেন। বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণের স্থানে পৈশাচীতে প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ হয় যথা—

গ, ঘ = ক, খ	**জ, ঝ = চ, ছ**	**ড, ঢ = ট, ঠ**	**ব, ভ = প, ফ**
গিরিতটম্ = কিরিতটম্	জীমূতঃ = চীমূতো	ডমরুকঃ = টমরুকো	বালকঃ = পালকো
নগরম্ = নকরম্	রাজা = রাচা	তড়াগম্ = তটাকম্	রভসঃ = রফসো
ঘর্ম = খম্মো	ঝর্ঝরঃ = চচ্ছরো	ঢক্কা = ঠক্কা	ভগবতী = ফকবতী
মেঘঃ = মেখো	নির্ঝরঃ = নিচ্ছরো।	গাঢ়ম = কাঠম্	ডিম্বম্ = টিম্পম্ ইত্যাদি।

এই সকল বৈশিষ্ট্য উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের কথ্য ভাষায় পাওয়া যায়। শাহ্‌বাজগড়ীতে অশোকের যে খরোষ্ঠী লেখ পাওয়া গিয়েছে তার ভাষায় এই সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সে ভাষাতেও 'গ' স্থানে 'ক', 'জ' স্থানে 'চ', 'ব' স্থানে 'প' প্রভৃতি পাওয়া যায়। উদাহরণে এ কথা স্পষ্ট হবে। গ্রীক রাজা মেগাস ও এন্তিগোনসের নাম 'মক' ও 'অংতিকিন' রূপে, 'কম্বোজ' 'কম্বোচ' রূপে, 'বাঢ়ম্' 'পঢ়ম' রূপে পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের এখনকার কথ্য ভাষা, যাকে গ্রীয়ার্সন Dardic বা 'দরদ' আখ্যা দিয়েছেন বাস্‌গলি, পাশাই, কাশ্মিরী প্রভৃতিতেও ঐ সব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই সব কারণেই গ্রীয়ার্সন সাহেব মনে করেন যে পৈশাচী ছিল এই অঞ্চলের প্রাচীন কথ্য ভাষা। এমন কি তিনি মনে করেন যে প্রাচীন নাম 'পৈশাচী' ও বর্তমান 'পাশাই' অভিন্ন। মধ্যএশিয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের ভাষার প্রচলন হয়েছিল। খোটান ও তার নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রাচীন যুগের যে সব সরকারী নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তার ভাষাও হচ্ছে এই প্রাকৃত। এই ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদের একখানি খণ্ডিত পুঁথিও খোটান অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং গুণাঢ্যের বৃহৎকথা যে এই ভাষাতেই রচিত হয়েছিল তা মনে করা অসঙ্গত নয়। কাশ্মিরী এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে বৃহৎকথা মুখ্যতঃ প্রচলিত ছিল কাশ্মীরে। খৃস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সে কাব্যগ্রন্থ কাশ্মীরে সংরক্ষিত ছিল। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব উভয়েই সে গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁদের কাব্যরচনায় তার প্রভূত ব্যবহার করেছিলেন।

বৃহৎকথামঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগরের মধ্যে একই নামের বিভিন্ন রূপ (যথা, দীপকর্ণ, দ্বীপিকর্ণি ; বেদগর্ভ, বেদকুম্ভ) থেকে অনুমান করা যায় যে ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব পৈশাচী নামেরই সংস্কৃত অনুবাদ করতে গিয়ে এই বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন। হেমচন্দ্র পৈশাচীর উদাহরণ দিতে গিয়ে পৈশাচী গ্রন্থবিশেষ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এ সব শ্লোক যে কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া তা তাঁদের রচনাভঙ্গী থেকেই বোঝা যায়।—

পুধুমতংসনে সব্বস্স যোব সম্মানম্ কীরতে—

প্রথম দর্শনে সর্বস্যৈব সম্মানম্ ক্রিয়তে।

এতিসম্ অতিট্ঠপুরবম্ মহাধনম্ তথূনা—

ঈদৃশম্ অদৃষ্টপূর্বম্ মহাধনম্ দৃষ্ট্বা।

পনমথ পনয়পকুপ্পিতগোলীচলনগ্‌গলগ্‌গপটিবিম্বম।
তস্সু নখতপ্পনেসুম্ একাতসতনুথলম্ লুদ্দম্॥
নচ্চংতস্স য লীলাপাতুক্খেবেন কংপিতা বসুথা।
উচ্ছলংতি সমুদ্দা সৈলা নিপতন্তি তং হলং নমথ॥—

প্রণমত প্রণয়প্রকোপিতগৌরীচরণাপ্রলগ্নপ্রতিবিম্বম্।
দশসু নখদর্পণেষু একাদশতনুস্থলম্ রুদ্রম্॥
নৃত্যতশ্চ লীলাপাদোৎক্ষেপেণ কম্পিতা বসুধা।
উচ্ছলন্তি সমুদ্রাঃ শৈলা নিপতন্তি তং হরং নমত॥

অনুরূপ ঘটনাপরম্পরা কথাসরিৎসাগরে পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে উক্ত পৈশাচী শ্লোকগুলি মূল বৃহৎকথার। হেমচন্দ্র সে গ্রন্থ, হয় নিজে দেখেছিলেন, নাহয় শ্লোকগুলি অন্য গ্রন্থ থেকে পেয়েছিলেন।

কোল-জাতির সংস্কৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কয়েকটী বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতির নিজ নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল। ভারতের অধুনাতন অধিবাসীদের পূর্ব-পুরুষ বিভিন্ন প্রকারের মানব, বিভিন্ন যুগে বাহির হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল ;—ভারতের মধ্যে কোনও প্রকার মানব উদ্ভূত হইবার প্রমাণ এ-তাবৎ পাওয়া যায় নাই। যে-যে বিভিন্ন জাতির জনগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে নবীনতম মতবাদ, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগের নৃতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের রচিত ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান্ পুস্তক The Racial Elements in the Indian Population (Oxford Pamphlets on Indian Affairs, no. 22) মধ্যে পাওয়া যাইবে। দৈহিক গঠন ধরিয়া আলোচনা করিয়া আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, ভারতে ছয়টী বিভিন্ন জাতির মানুষ তাহাদের নয়টী শাখায় বিভিন্ন কালে ভারতে আসিয়াছে ; এবং ইহাদেরই মিশ্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণ-ক্রিয়া কোথাও বা গভীর-ভাবে হইয়াছে, কোথাও বা উপর-উপর হইয়াছে। এই ছয়টী জাতি হইতেছে এই : [১] কৃষ্ণবর্ণ হ্রস্বকায় দীর্ঘকপাল ঊর্ণাকেশ পৃথুনাসিক উচ্চহনু স্থূলাধর Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতি—উষঃপ্রস্তর যুগে আফ্রিকা হইতে স্থলপথে আরবদেশ হইয়া ইহাদের ভারতে আগমন ঘটে ; এই জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে ছিল, পরবর্তী জাতিদের আগমনে ইহারা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ভারতে ক্বচিৎ ইহাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহাদের ভাষা এখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। [২] Proto-Australoid "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতি—ইহারা মধ্যমাকার, শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, পৃথুনাসিক, দীর্ঘকপাল জাতি—পশ্চিম-এশিয়া হইতে ইহারা আসে, এবং সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহাদের প্রসার হয়। ভারতের মধ্যেই এই জাতির মানুষ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করে, এবং পরে ভারত হইতে অতি প্রাচীন কালে ইহাদের এক দল, দক্ষিণের মহাদ্বীপ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া উপনীত হয়, এবং তদনন্তর অন্য দল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ও Indonesia বা দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, Melanesia বা কৃষ্ণদ্বীপপুঞ্জে এবং Polynesia বা পুরুদ্বীপপুঞ্জে প্রসৃত হয়, ও নানা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ-সমস্ত অঞ্চলের আধুনিক অধিবাসী-রূপে পরিণত হয়। এই Proto-Australoid বা "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" মানব ভারতের প্রায় সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর জনসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, এবং বহুশঃ ইহারা পরে আগত নানাজাতির মানুষের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভাষায় ইহারা কি ছিল তাহা জানা যায় না ; তবে অনুমান হয়, ইহাদের ভাষা (এই ভাষাকে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ" ভাষা নাম দেওয়া যায়) ভারতখণ্ডে আধুনিক কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হইয়াছে,—যে ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, কোর্‌কু, কোরবা, শবর, গদব প্রভৃতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং আসামে মোন্-খ্মের শ্রেণীর ভাষা খাসিয়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ইহাদের ভাষা, মোন্-খ্মের, ইন্দোনেসীয় বা মালাই শ্রেণীর ভাষা, এবং মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় ভাষা রূপে বিদ্যমান। কোল-জাতি অন্য জাতির লোকেদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর মিশ্রিত হইলেও

মুখ্যতঃ এই "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির বংশধর; এই কোলদিগের সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রবন্ধে করা যাইতেছে। [৩] "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির পরে আসে শ্যাম- বা শ্বেতাভ-বর্ণ মধ্যমাকার দীর্ঘকপাল সরলনাসিক Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোক। ইহাদের আদি বাসভূমি হইতেছে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দেশ—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও পালেস্তীন, মিসর, গ্রীস ও Ægean ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। দৈহিক সমাবেশে কিঞ্চিৎ পৃথক্ ইহাদের তিনটী শাখা ভারতে আসে। ইহারাই ভারতে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে; এবং অনুমান হয়, দ্রামিড় বা দ্রাবিড় ভাষা ভারতে ইহাদের দ্বারাই আনীত হয়। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা, যাহার সূত্রপাত সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০ বৎসর হইতে, তাহা ইহাদেরই কীর্তি বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে, হিন্দুধর্মের রূপ-গ্রহণে, দ্রাবিড়দের আনীত উপাদান বিশেষ মূল্যবান্। [৪] চতুর্থ জাতির মানব যেটী ভারতে আসে সেটী হইতেছে Western Brachycephals অর্থাৎ "পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল" জাতি; ইহাদেরও তিনটী শাখা; অনুমান হয়, ইহারা, এবং [৫] Nordic বা "উদীচ্য" নামে বৈজ্ঞানিকগণ-কর্তৃক আখ্যাত একটী জাতির মানবগণ, আর্য্য-ভাষা লইয়া ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরে ঈরান ও আফগানিস্থানের পথ ধরিয়া এশিয়া-মাইনর ও মেসোপোতামিয়া হইতে ভারতে আগমন করে। ভাষা ইহাদের এক ছিল; কিন্তু জাতি-হিসাবে এই "পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল" জাতি ও "উদীচ্য" জাতি ছিল একেবারে পৃথক্; সম্ভবতঃ আর্য্য-ভাষা ছিল উদীচ্যদেরই ভাষা, উদীচ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া হ্রস্বকপালগণ পরে এই ভাষা গ্রহণ করে। উদীচ্যগণ ছিল দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ ঋজুনাসিক হিরণ্যকেশ ও নীলচক্ষু। বৈদিক সভ্যতার ও ধর্মের এবং বৈদিক সাহিত্যের মূলসূত্র ইহারাই এদেশে আনয়ন করে, এবং পরবর্তী কালে ইহাদের ভাষাই সংস্কৃত প্রাকৃত ও "ভাষা" রূপে ভারতীয় মিশ্র সভ্যতার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়ায়। উপরের এই পাঁচ প্রকার মৌলিক জাতির মানুষদের সকলেই পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল; পরে পূর্ব ও উত্তর হইতে, আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের পথে এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া আসে [৬] Mongoloid বা "মোঙ্গোলাকার" জাতির মানুষ; ইহারা পীতবর্ণ, পৃথুনাসিক, উচ্চহনু, সূক্ষ্মনেত্র, কৃষ্ণকেশ; দীর্ঘকপাল, হ্রস্বকপাল ও বিশিষ্ট-মোঙ্গোল বা ভোট-মোঙ্গোল ভেদে, ইহারা তিনটী শাখায় পড়ে। এই মোঙ্গোলাকার বা মোঙ্গোল শ্রেণীর মানুষ কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে ও দক্ষিণ হিমবন্ত প্রদেশেই মিলে, এবং ঐ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে এই উপাদান বেশী করিয়া পাওয়া যায়। আর্য্যগণ কর্তৃক পর্বতবাসী মোঙ্গোল-জাতীয় মানব প্রথম-প্রথম "কিরাত" নামে অভিহিত হয়।

ভারতীয় জনগণের মধ্যে অধিকতর [২], [৩], [৪] ও [৫] জাতির মানবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে; ভারতের সভ্যতা—বাস্তব বা ভৌতিক সভ্যতা, মানসিক প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক বোধ বা বিচার —এ সমস্তই হইতেছে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ" (অথবা সংক্ষেপে Austric বা "দাক্ষিণ"), দ্রাবিড় ও আর্য্য ভাষীদের সম্মিলিত জীবনের ফল। উত্তর ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গার দেশে যাহারা পাশাপাশি বাস করিতে থাকে এমন দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও আর্য্য ভাষী জনগণ, রক্তে ও সভ্যতায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। দ্রাবিড়দের আগমনের পর হইতেই মনে হয় এই মিশ্রণ দ্রাবিড় ও দাক্ষিণদের মধ্যে আরব্ধ হয়; এবং পরে আর্য্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেও এই মিশ্রীকরণ বা জাতীয় সমীকরণ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, ও খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বার্ধেই এই সমীকরণ নিজ বিশিষ্ট পথে চালিত হয়,

আর্য্যভাষী হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি তখন দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও আর্য্যের মিশ্রণের ফলে প্রথম নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

পূর্ব-ঈরানে—পূর্ব-পারস্যে ও আফগানিস্থানে—এবং পাঞ্জাব প্রদেশে যে দ্রাবিড় জনগণের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও মেসোপোতামিয়া হইতে আগত আর্য্যদের সংঘাত ঘটে, তাহাদের দুইটী জাতীয় নাম ছিল—"দাস" ও "দস্যু"। সম্ভবতঃ এই দুইটী নাম একই পর্য্যায়ের, এই দুইটীর মূলে একই অজ্ঞাতার্থ "দস্" শব্দ বা ধাতু বিদ্যমান। ঋগ্বেদে এই "দাস" ও "দস্যু" শব্দদ্বয় জাতিবাচক নাম-হিসাবে পাওয়া যায়। আর্য্য ও দ্রাবিড়ের প্রথম সংঘাতের যুগে, বিদেশী শত্রু আর্য্যের কাছে প্রতিরোধ-পরায়ণ অনার্য্য দস্যুর আর্য্য-সম্বন্ধে বৈরি-ভাব মনে করিয়া, "দস্যু" এই নামটী 'লুণ্ঠনকারী' অর্থে আর্য্যের ভাষায় রূঢ়ি হইয়া যায়; তেমনি বিজিত "দাস" জাতির নর-নারী আর্য্যের ঘরে কেনা-গোলামের কাজে বহুশঃ অবনমিত হওয়ায়, "দাস" নামটী 'ক্রীতদাস' বা 'ভৃত্য' অর্থ গ্রহণ করে। ইউরোপেও তেমনি Slav শ্লাব জাতির লোকেরা একসময়ে জরমানিক জাতির লোকেদের দ্বারা বিজিত হইয়া এত অধিক পরিমাণে ক্রীতদাস পর্য্যায়ে নীত হইত যে, জর্‌মান প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় জাতিবাচক নাম Slav বা Sklav হইতে 'দাস'-বাচক slave, Sklav শব্দ উদ্ভূত হয়। "দাস"-জাতির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ, "দস্যু-হত্যা" বা যুদ্ধে "দস্যু"-জাতির হনন—এ-সমস্ত ঋগ্বেদের যুগের লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। এই প্রথম সংঘাতের পরে, আর্য্য ও দ্রাবিড়ের মিলন ক্রমে অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটিতে থাকে।

Austric-ভাষী Proto-Australoid বা দাক্ষিণ জাতির লোকদের আর্য্যগণ প্রথম হইতেই "নিষাদ" নামে অভিহিত করিত বলিয়া অনুমান হয়; "শবর" ও "পুলিন্দ" এই নাম দুইটীও ইহাদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত। অস্ট্রিক বা দাক্ষিণ বা নিষাদ জাতির লোক নগরিয়া সভ্যতার ধার ধারিত না বলিয়াই মনে হয়, ইহাদের হাতে ভারতের কৃষিমূলক ও গ্রামনিবদ্ধ সভ্যতাই গড়িয়া উঠে। নাগরিক সভ্যতার পত্তন ঘটে দ্রাবিড়দের হাতে। আর্য্যেরা প্রথমতঃ যাযাবর ছিল—শর্য্যাত মানব প্রভৃতি তাহাদের গোত্রপতি "গ্রামেণ চচার"—অর্থাৎ নিজ-নিজ "গ্রাম" বা কুল বা গোত্র (ইংরেজীতে যাহাকে tribe বা clan বলে তাহা) লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; অনেকগুলি "গ্রাম", সাধারণ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার জন্য যখন একত্র হইত, তখন হইত "সংগ্রাম"—বিভিন্ন গোত্রের যুদ্ধার্থ মিলিত হওয়া। আর্য্যদের পশ্চিম এশিয়ায় ও মেসোপোতামিয়ায় উপনিবিষ্ট হওয়ার পরে, পশু (অর্থাৎ গো মেষ অশ্ব ও উষ্ট্র)-পালনের সঙ্গে-সঙ্গে যব গোধুম ও ব্রীহির কর্ষণ আরম্ভ হয়। এই কৃষিও তাহারা ভারতে আরও বেশী করিয়া আশ্রয় করিতে থাকে। নগরের পত্তন দাস-দস্যু বা দ্রাবিড়দের দেখাদেখি আর্য্যদের মধ্যে আরম্ভ হয়; আর্য্যভাষার "পুর্, পুর, পুরী" শব্দ মূলে নগর-বাচক ছিল না, ইহার মৌলিক অর্থ হইতেছে 'গড়' বা 'সুরক্ষিত স্থান'; এবং সংস্কৃত "নগর" শব্দ যে মূলে দ্রাবিড় শব্দ, ইহার প্রথম অর্থ প্রাচীন তমিল্ প্রভৃতি ভাষায় ছিল 'বাসভূমি, প্রাসাদ', এই শব্দের এইরূপ নিরুক্তিও সম্প্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে [দ্রষ্টব্য, T. Burrow, Some Dravidian Words in Sanskrit, *Transactions of the Philological Society* for 1945, London 1946, pp. 107-108]।

নিষাদ বা দাক্ষিণ জাতি, সাঁওতাল প্রভৃতি আধুনিক কোল জাতির পূর্ব্বপুরুষ, এক সময়ে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল, ইহা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। দ্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ উপনিবিষ্ট হয় পশ্চিম ও

দক্ষিণ ভারতে—এই-সব অঞ্চলে ইহাদের ঘন বসতি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, এবং সেইজন্য এখানে ইহাদের ভাষা প্রবল হইয়াছিল। ধীরে-ধীরে আর্য্য-ভাষার প্রসারের ফলে, পাঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে দ্রাবিড় ও দাক্ষিণ উভয় শ্রেণীর ভাষার লোপ ঘটে ; কেবল বেলুচিস্থানে বাহুইদের মধ্যে এই দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রের এক অবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট অন্ধ্রদেশ দ্রাবিড়দেশ বা তমিল্‌নাড়ু এবং কেরলে এখনও অবিচ্ছিন্নভাবে দ্রাবিড়-ভাষার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিদ্যমান। রাজপুতানায় ও মালবে দ্রাবিড়দের অপেক্ষা দাক্ষিণদেরই প্রসার বা বাস অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়—এই অঞ্চলের ভীল-জাতি (মধ্য-যুগের আর্য্য-ভাষায়, প্রাকৃতে, যাহাদের "ভিল্ল" বলিয়া অভিহিত করা হইত) এখন আর্য্য গুজরাটী রাজস্থানী ও মালবী বুলী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা কোল-শ্রেণীর অনার্য্যই ছিল—বহ্রাড় বা বেরার প্রদেশের কোর্‌কুগণ এখন এই অঞ্চলের দাক্ষিণ অধিবাসীদের একটী অবশেষ-রূপে বাঁচিয়া আছে। পাঞ্জাবে ও গঙ্গার উপত্যকায়, আফগানিস্থান হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম পর্য্যন্ত, প্রথম আগত দাক্ষিণদের পাশে-পাশে নবাগত দ্রাবিড়দেরও বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজপুতানা-মালব হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ পর্য্যন্ত, গঙ্গার দেশের দক্ষিণে অরণ্য ও গিরিসঙ্কুল কৃষিবিরল অঞ্চলে, মধ্য-ভারতে, ছোট-নাগপুরে, উড়িষ্যায় ও মধ্য-দাক্ষিণাত্যে, দাক্ষিণ কোল জাতিরই প্রসার বেশী হইয়াছিল—যদিও ইহাদের প্রতিবেশী-রূপে অনুরূপ আরণ্য শবর বা ব্যাধ সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড় জনগণও বাস করিত। এই হেতু, আমরা এই অঞ্চলে এখন যেমন কোর্‌কু, কোররা, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, বিরহড়, সাওঁতাল, গদব, শবর প্রভৃতি কোল-ভাষী গণসমূহকে দেখিতে পাই, তেমনি গোণ্ড, কন্ধ বা কুই, কুড়ুঁখ বা ওরাওঁ এবং মালের্ বা মাল-পাহাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষী আরণ্য জাতির লোকেদেরও পাই।

গঙ্গার তীরের কৃষি-প্রধান সমতলক্ষেত্রের অধিবাসী দাক্ষিণ জাতির লোক এবং তাহাদের প্রতিবেশী দ্রাবিড় জাতির লোক—হয় তো ইহাদের মধ্যে, অর্থাৎ প্রাচীন কালের দাস-দস্যু-দ্রমিড় এবং নিষাদ-ভিল্ল-কোল্ল-শবর-পুলিন্দগণের মধ্যে, প্রথমটায় সংঘাত ঘটিয়াছিল ; পরে ইহাদের পাশাপাশি অবস্থান শান্তিপূর্ণ ভাবেই হইয়াছিল, যেমন আমরা ছোট-নাগপুরে ওরাওঁ ও মুণ্ডাদের দেখি। তবে একসঙ্গে দুই বিভিন্ন জাতির এবং ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ গঙ্গার দেশে পাশাপাশি থাকায়, তৃতীয় জাতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতির, অর্থাৎ আর্য্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে, স্থান করিয়া লওয়া ও এই দুই প্রকার অনার্য্য ভাষাকে কোণঠেষা করিয়া ক্রমে তাহাদের স্থান দখল করিয়া লওয়া, সহজ হইয়াছিল। ক্রমে উত্তর ভারতে আর্য্যের সঙ্গে দাক্ষিণ ও দ্রাবিড় ভাষী মিলিয়া, ভাষায় এক হইয়া গেল; কোল-ভাষী দাক্ষিণ জনগণ উত্তর ভারতের আর্য্য-ভাষী জনগণে পরিণত হইল।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা এই দাক্ষিণ কোল-জাতির সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতায় ইহাদের দ্বারা আনীত উপাদানের, কিছু-কিছু পরিচয় আমরা পাইতে পারি। এই জাতির লোকেরা প্রথমটায় 'জুম'-চাষের মত চাষ করিত—সূক্ষ্মাগ্র বৃহদাকার যষ্টিখণ্ড দ্বারা ভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ দিয়া চাষ করিত। নেপালের নেবার জাতির মত কোদালি দিয়া মাটি কোপাইয়া চাষ করাও সম্ভবতঃ তাহাদের রীতি ছিল। পরে, খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-ভাষীদের কাছে, তাহারা লাঙ্গলে গোরু মহিষ জুড়িয়া রীতিমত ধান চাষ করিতে শিখে। কেবল নদীমাতৃক অঞ্চলেই, কৃষি দাঁড়াইয়াছিল ইহাদের সংস্কৃতির মুখ্য আধার বা প্রতিষ্ঠাভূমি। অরণ্যময় পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ শবর বা ব্যাধের জীবন যাপন করিত। পরে চাষও সেখানে

অল্প-স্বল্প করিত। সমতল নদীমাতৃক দেশে ও অন্যত্র ইহারা কতকগুলি স্থানীয় ফল ও শাক তরকারীর চাষও করিত—যেমন কলা, নারিকেল, লাউ, কুমড়া, বেগুন, লেবু। পান ও সুপারীর ব্যবহার ইহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় সভ্যতায় গৃহীত হয়। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহারাই ভারতের অরণ্যাবৃত দেশে হাতীকে পোষ মানায়। তুলার কাপড় প্রথমতঃ এই দাক্ষিণ জাতির মানুষেই তৈয়ারী করে। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুক প্রধান ছিল।

দাক্ষিণ জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন প্রমাণ তেমন কিছুই নাই। বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-যুগ পর্য্যন্ত সংস্কৃতাদি সাহিত্যে ক্বচিৎ কখন দুই-চারিটী কথা বা আভাস যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়া বিচার তো করিতেই হয়; এতদ্ভিন্ন ভারতের ও ভারতের বাহিরের দাক্ষিণ-ভাষা-ভাষী জনসমূহের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও অনুষ্ঠান, মানসিক প্রবণতা ও ধর্ম-বিশ্বাস—এই-সবেরও আলোচনা করিতে হয়।

দাক্ষিণ শ্রেণীর ভাষাগুলিকে এই ভাবে শ্রেণী-বদ্ধ করা হয়। এগুলি দুইটী প্রধান বিভাগে পড়ে—(১) Austro-Asiatic বা দক্ষিণ-আসিয়া-স্থিত, ও (২) Austronesian বা দক্ষিণ-দ্বীপপুঞ্জাশ্রয়ী।

এই দুই বিভাগের অন্তর্গত ভাষাগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ ও এগুলির অবস্থান নীচে দেওয়া দুইটী বংশলতিকা দ্বারা দেখানো যাইতেছে।
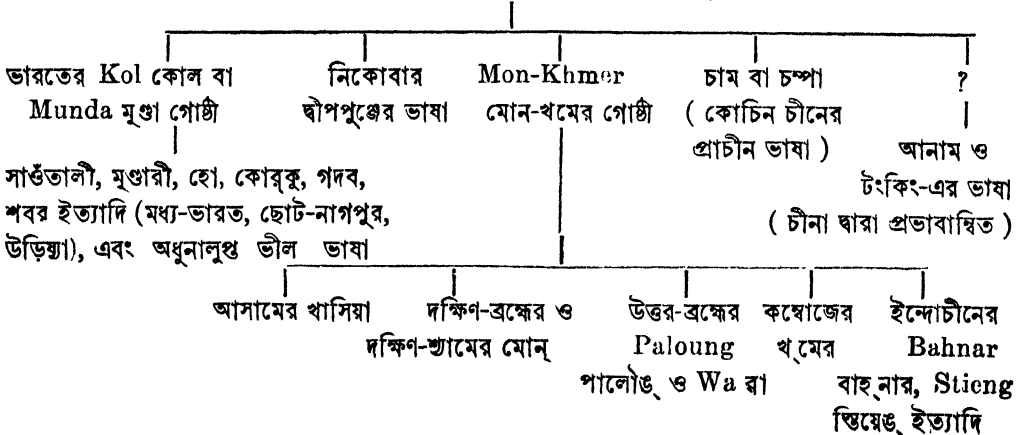
(২) Austronesian দক্ষিণ-

Indonesian দ্বীপময়-ভারতীয় বা ভারতদ্বীপীয় ভাষাসমূহ	Melanesian কৃষ্ণদ্বীপীয়	Polynesian পুরুদ্বীপীয়
মালাই (মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা), সুন্দা, যবদ্বীপীয়, মদুরী, বলিদ্বীপীয়, লম্বকদ্বীপীয়, সেলেবেস্, সুমাত্রার ভাষাবলী, ফিলিপ্পীন দ্বীপের তাগালগ্ বিষয় প্রভৃতি, মাদাগাস্কারের মালাগাসি	Fiji বা Viti ফিজি (ভিতি), New Caledonian নিউ-কালিডোনীয়, New Hebridean নিউ-হেব্রিডিয়ান, Solomon Islands Speech সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের ভাষা প্রভৃতি	Samoa সামোআ, Tonga তোঙ্গা, Marquesas মার্কেসা, Paumotu পাউমোতু প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা ; নিউজিলাণ্ডের Maori মাওরি ও Hawaii হাওয়ায়ি দ্বীপের ভাষা

এই-সমস্ত বিভিন্ন ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির আলোচনার আধারে, আদিযুগের দাক্ষিণ সংস্কৃতি ভারতবর্ষে কি ভাবের ছিল তাহার বিচার ও অনুমান করা চলে। তবে মোটামুটি বলা চলে যে, ধর্ম-জগতে লিঙ্গ-প্রতীকে পূজা আংশিক ভাবে দাক্ষিণ জাতির দান। পুনর্জন্মবাদ দ্রাবিড়দের নিকট হইতে না হইয়া দাক্ষিণদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়—আর্য্যদের মধ্যে পুনর্জন্মবাদ উদ্ভূত হয় নাই বলিয়াই মনে হয় ; আর্য্য মতে, মৃতব্যক্তি পিতৃলোকে বা এক অনির্দিষ্ট পরলোকে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হইত ; এই প্রকার আবছা-আবছা ধারণাই তাহাদের সম্বল ছিল। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ধার্মিক নিষেধ—taboo—দাক্ষিণদের মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিল। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা দাক্ষিণদের নিকট হইতেই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বপ্রপঞ্চকে অণ্ডবৎ (ব্রহ্মাণ্ড-বৎ) কল্পনা, এবং মৎস্য কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারের কল্পনা, মূলতঃ ইহাদেরই বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের তিথি ধরিয়া কাল নিরূপণও সম্ভবতঃ ইহাদেরই রীতি ছিল। কতকগুলি উপাখ্যান (যেমন মৎস্যগন্ধার উপাখ্যান) মূলে দাক্ষিণ জাতির। Totemism বা কোনও মানবেতর প্রাণীকে মানববংশ-বিশেষের আদিপুরুষ-রূপে কল্পনা ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মৃতের বৃক্ষসমাধি (মহাভারতে যাহার উল্লেখ আছে), এবং মৃতের উপর স্তূপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ছিল। পূর্ব ভারতে হিন্দু বিবাহে 'স্ত্রী-আচার', এবং সিন্দুর হরিদ্রা প্রভৃতির ব্যবহার, দাক্ষিণ জাতিরই রীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালাদেশে (বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে) যে ধর্মপূজা প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোনও যোগ নাই ; অনুমিত হয় যে, এই ধর্মপূজা হইতেছে বঙ্গদেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মের বিকৃত অবশেষ। এই ধর্মের দুইটী প্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে লুইয়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করা এবং ধর্মের গাজন—এই দুইটী বস্তু প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির বিশিষ্ট বস্তু ; প্রচলিত ধর্মপূজার সঙ্গে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক কিছু মিলিয়া গিয়া জিনিসটীকে সম্পূর্ণ মিশ্রিত বা হিন্দু-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। [এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত প্রবন্ধ, India and Polynesia : Austric Bases of Indian Civilisation and Thought—*Bharata-Kaumudi* (Studies in Indology in honour of Dr Radha Kumud Mookerji) Part I, Allahabad 1945, pp. 193-208]।

ইহা তো হইল মিশ্র ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীন নিষাদ বা দাক্ষিণ-জাতির আহৃত উপাদানের কথা। নিষাদ বা প্রাচীন দাক্ষিণ-জাতির ভাষার—প্রাচীন যুগের কোল ও মোন-খ্‌মের গোষ্ঠীদ্বয়ের দাক্ষিণ ভাষার—শব্দ, কি ভাবে প্রাকৃত সংস্কৃত ও আধুনিক আর্য্য ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারও আলোচনা কিছু-কিছু হইয়াছে। [লক্ষণীয়—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীর Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India : Calcutta University, 1929 : Jean Przyluski ঝাঁ প্‌শিলুস্কি, Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক্ ও Sylvain Levi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি কর্তৃক লিখিত কতকগুলি ফরাসী প্রবন্ধের অনুবাদ, ও তৎসঙ্গে মুদ্রিত অন্য কতকগুলি প্রবন্ধ; এবং মৎপ্রণীত প্রবন্ধ Two New Indo-Aryan Etymologies, *Zeitschrift fuer Indologie*, Berlin, 1932, এবং Non-Aryan Elements in Indo-Aryan, *Journal of the Greater India Society*, 1936, Vol. III, pp. 43 ff ; দ্রাবিড় ভাষায় আগত দাক্ষিণ ভাষার শব্দের আলোচনা কোচিন এরনাকুলম্-এর অধ্যাপক ল-ব রামস্বামী অয়্যর্ তাঁহার একটী প্রবন্ধে ইতিপূর্বে করিয়াছেন।]

ভারতের কোল-বংশীয় দাক্ষিণ-জাতির ও কোল-ভাষার সম্বন্ধে হুঙ্গেরীয় লেখক Vilmos Hevesy ভিল্‌মশ্ হেভেশি কিছুকাল হইল একটী নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোল-ভাষা Ural উরাল (অথবা Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়) গোষ্ঠীর সহিত সম্বদ্ধ—ভারতের বাহিরের মোন-খ্‌মের ও Austronesian দক্ষিণ-দ্বীপাশ্রয়ী ভাষাগুলির সঙ্গে নহে। হেভেশির মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়-ভাষী কোনও জাতি নিজ ভাষা লইয়া ভারতে আসে, এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কোল-জাতিতে পরিণত হয়। ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা-গোষ্ঠীতে আসে—Hungarian হুঙ্গেরীয় বা Magyar মজর, Finn ফিন, Esth এস্ত্, Lapp লাপ, এবং রুষ-দেশের কতকগুলি স্বল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত আদিম-জাতীয় ভাষা, যথা Vogul ভোগুল্, Ostyak ওস্ত্যাক্, Mordvin মোর্দ্‌ভিন, Cheremis চেরেমিস্, Siryen সিরয়েন প্রভৃতি; এবং এই গোষ্ঠী, Altaic আলতাই-গোষ্ঠীর ভাষা তুর্কী মোঙ্গোল মাঞ্চু প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত। হেভেশির এই মত এখনও ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই—তবে মনে হয়, এই মত যুক্তি- বা বিচার-সহ নহে; দাক্ষিণ ভাষাসমূহের যে বংশচিত্র পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই এখন মানিতে হয়,—ফিন্নো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর সহিত কোল ভাষার সংযোগ এখনও প্রমাণিত হয় নাই-ই বলিতে হয়

আধুনিক কোল-জাতি, সুপ্রাচীন দাক্ষিণ বা নিষাদ-জাতির বংশধর। ভাষাগত অল্প-বিস্তর পার্থক্য ধরিয়া এই জাতির গণ-সমূহকে কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব প্রধান হইতেছে এই কয়টী: [১] সাঁওতাল, সংখ্যায় প্রায় ২৭ লাখ; দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও মোঙ্গোল নির্বিশেষে ভারতের Aborigines আদিবাসী বা ভূমিপুত্র গণ-সমূহের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচেয়ে অধিক। সাঁওতাল পরগণায়, মানভূমে, সিংহভূমে, বাঙ্গালাদেশে, উড়িষ্যায় এবং আসামের চা-বাগানসমূহে সাঁওতালদের বাস; [২] মুণ্ডারী-ভাষী মুণ্ডাজাতি, সংখ্যায় ৬॥০ লাখ, রাঁচীকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের বাস; [৩] হো, সংখ্যায় ৪॥০ লাখ, চাঁইবাসার আশে-পাশে ইহাদের অধিষ্ঠান-ভূমি; [৪] খাড়িয়া, ১ লাখ ৮০ হাজার; [৫] ভূমিজ, ১ লাখ ১৩ হাজার; [৬] কোর্‌কু—বহ্বাড় (বেরার) ও মধ্য-প্রদেশ, ১ লাখ ৬০ হাজার; এবং উড়িষ্যায় [৭] শবর, ১ লাখ, ১৬ হাজার ও [৮] গদব, ৪৪ হাজার।

ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের পরিভাষায়, Austric অর্থাৎ দাক্ষিণ ভাষার অন্তর্গত Austro-Asiatic বা দক্ষিণ-আসিয়া-স্থিত বিভাগের এই কোল-শাখাকে Munda "মুণ্ডা" নামে সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়। কিন্তু "মুণ্ডা" নামটী তেমন উপযোগী নহে। ভারতবর্ষে ইহা কেবল কোল-জাতির একটী বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়—রাঁচীর আশ-পাশের কোল জাতীয়দের জন্য সীমিত এই নামকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের কোনও আবশ্যকতা নাই। Kol "কোল" এই নামটী ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারীরা "কোল" বলিলে, দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁ, কন্ধ এবং মাল-পাহাড়ীদের বাদ দিয়া, মুণ্ডা, হো, সাওঁতাল, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোর্‌কু প্রভৃতিদেরই বুঝে; সুতরাং এই ব্যাপক সংজ্ঞা ব্যবহার করাই ভাল। কোলদের নাম হইতে ছোট-নাগপুরের একটী অঞ্চলের নাম হইয়াছে "কোল্‌হান" অর্থাৎ কোলদের দেশ (যেমন "ভোটান"=ভোটদের দেশ, "গোণ্ডৱানা"= গোণ্ডদের দেশ, "রাজপুতানা"=রাজপুতদের দেশ, "ঈরান" বা "এরান"=আর্য্যদের দেশ)। আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য ভাষার এই "কোল" শব্দটী, মধ্য-যুগের ভারতীয়-আর্য্য ভাষার (প্রাকৃতের) "কোল্ল" শব্দ হইতে উদ্ভূত। মধ্যভারতের অরণ্যপর্বতবাসী অনার্য্য নিষাদগণকে এখন হইতে দেড় হাজার বছর আগে "ভিল্ল" ও "কোল্ল" বলিয়া উল্লেখ করা হইত। "কোল" শব্দটী অর্বাচীন সংস্কৃতেও পাওয়া যায়—ইহার অর্থ হইতেছে 'শূকর'—এটী একটী জাতিবাচক নামের ঘৃণাপ্রকাশক অপপ্রয়োগ মাত্র। সাওঁতালেরা নিজেদের "হড়্" বলে, মুণ্ডারা বলে "হোড়ো", হো-রা বলে "হোও" বা "হো" (হো-ভাষায় ড়-ধ্বনি লোপ পায়), এবং কোরকু-রা বলে "কোরো"; উহাদের ভাষায় এই শব্দের অর্থ হইতেছে—'মানব বা মানুষ'। বহু জাতির মধ্যে স্বকীয় নাম হিসাবে তাহার ভাষার মানব-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত, "কোল" জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কোল-জাতির দৃষ্টিতে, সমগ্র মানব-জাতি দুইটী বিভাগে বিভক্ত—এক, সত্যকার মানব, "হোড়ো, হড়, কোরো", যাহাদের ভাষা বুঝি, ও যাহারা আমাদের আপন জন; এবং দুই, যাহাদের ভাষা বুঝি না, যাহারা পর, তাহারা হইতেছে Diku "দিকু"। ইহা যেন প্রাচীন আর্য্যদের বা হিন্দুদের "আর্য্য" ও "ম্লেচ্ছ" বা "বর্বর", গ্রীকদের Hellenes ও Barbaroi, ইহুদীদের Benim Israel ও Goyim বা Gentiles অর্থাৎ 'জাতি-সমূহ', জরমানিক জাতির Thiudiskoz ও Walhoz, শ্লাবদের Slavŭ ও Nyemetsu, আরবদের "আরব" ও "আজম"—এইরূপ 'স্বজাতি' ও 'বিজাতি' এই দুই ভাগে মানব-জাতিকে বিভক্ত করার মত। এখন, ইহা অনুমিত হয় যে আধুনিক কোল-ভাষীদের "হোড়ো, হড়, কোরো" প্রভৃতি শব্দের একটী প্রাচীন রূপ, দেড়-হাজার দুই-হাজার বৎসর পূর্বে আর্য্য-ভাষীদের কানে যেরূপ শুনাইয়াছিল, তাহারই আধারে প্রাকৃতের "কোল্ল" শব্দ গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ "কোল্ল" শব্দকে, প্রাচীন কোল-ভাষায় মানব-বাচক শব্দ বলিয়া ধরিতে পারি; তাহারই আধুনিক রূপ, এই জাতির স্বকীয় নামের অন্যতম প্রাচীন রূপ বলিয়া, এই জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী নাম। Kolarian বলিয়া একটী নাম ইংরেজীতে ইহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু অর্থহীন বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কোলদের জ্ঞাতি, সমতল নদীমাতৃক পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির নানা গণ, দেশের অন্য জাতীয় অধিবাসী দ্রাবিড় ও আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া এখন উত্তর ভারতের হিন্দু (অথবা মুসলমান-ধর্মান্তরিত) জনসমূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বন ও পাহাড়ের দেশ মধ্য ভারত ও ছোটনাগপুরে ইহাদের সংস্কৃতি একটু অন্য ধরণের হইতে বাধ্য হয়—কৃষি ও

পশু (গো, মহিষ, শূকর)-পালনের সঙ্গে-সঙ্গে মৃগয়া ইহাদের আজীবিকার একটী প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কৃষিকে (বিশেষতঃ গো-মহিষ ও লাঙ্গল যোগে) ধান চাষকে ইহারা সভ্য জীবনের ও উন্নত জীবনের প্রথম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। ইহারা ধীরে-ধীরে মধ্য-ভারতের ও ছোট-নাগপুর ঝাড়খণ্ডের অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছিল। ইহাদের আদিম সংস্কৃতি, ধর্মমত প্রভৃতি, নানা দিকে পরিবর্তিত হইয়া যায় ; Bir-Buru "বির-বুরু", অর্থাৎ অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে বাস করার দরুন, Ote-Serma "অতে-সেরমা" অর্থাৎ ধরিত্রী ও আকাশ, অথবা দ্যাবা-পৃথিবী, আসমান-জমীন বা স্বর্গ-মর্ত্য সম্বন্ধে ইহাদের ধারণাও পরিবর্তিত হয়—বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইহারা একটী স্বকীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। কোলদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি তাহাদের অধুনা-অধ্যুষিত দেশ ছোট-নাগপুরের অরণ্য ও পর্বত-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রত্যন্ত বা সীমান্ত প্রদেশে এই দেশ ; বাঙ্গালার "সামন্ত" বা "সমন্ত" অর্থাৎ সীমা-সংলগ্ন ভূখণ্ডে যে কোল জনগণ বাস করিত, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালা দেশের আর্য্য-ভাষীরা তাহাদের নাম দেয় "সামন্ত-পাল", এবং প্রাকৃত "সাঁবন্তআল" শব্দের মধ্য দিয়া ইহা আধুনিক বাঙ্গালায় "সাঁওতাল" এই শব্দের রূপ ধরিয়াছে। "মুণ্ডা" শব্দ তাহাদের পশ্চিমে অবস্থিত কোল জনগণের নাম--ইহা আর্য্যভাষার শব্দ—মূলে অনার্য্য হওয়া সম্ভব— কিন্তু ইহা এই জাতির লোকেদের প্রধানদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালদের মধ্যে সম্মানসূচক পদবী হইতেছে "মাঝি", ইহাও আর্য্যভাষার শব্দ—"মধ্য-মধ্যিক" হইতে উৎপন্ন ; অনুরূপ অর্থের শব্দ হইতেছে ভদ্রব্যক্তি-বাচক বাঙ্গালা মুসলমান পদবী "মিয়াঁ" যাহার অর্থ ফারসী ভাষায় হইতেছে 'মধ্য' বা 'মধ্যস্থ'।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা উড়িয়া বিহারী বা হিন্দী সাহিত্যে কোলদের কোনও উল্লেখ নাই। আর্য্য-ভাষার প্রসার ধীরে ধীরে কোল-অধ্যুষিত প্রদেশকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু এই ভাষা-সংঘাতের কোনও ইতিহাস নাই। আর্য্য-ভাষীর সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রায় সর্বত্র হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের জাতিগুলিতে পরিণত হইতেছিল। হয়তো ক্বচিৎ ইহাদের রাজা বা স্থানীয় ভূম্যধিকারী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছিল—কিন্তু ভাষা-ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে, সাংস্কৃতিক অধঃপতনই হইতেছে ইহাদের অতি আধুনিক ইতিহাস।

প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী কোলেদের সম্বন্ধে, অর্থাৎ ভিল্ল-কোল্ল-নিষাদ-শবর-পুলিন্দদের সম্বন্ধে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ খুব বেশী কৌতূহল দেখান নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাণভট্ট তাঁহার "শ্রীহর্ষচরিত" গ্রন্থের অষ্টম উচ্ছ্বাসে জনৈক শবর-যুবকের বর্ণনা খুঁটিনাটির সহিত করিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলের শবরগণ স্থানীয় দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর উদ্দেশে নরবলিদানের সময়ে উপস্থিত হইয়াছে—হয় তো বা ইহার বর্ণনা "গউড়বহ" নামে নবম শতকের প্রাকৃত-কাব্যে পাওয়া গেল ; হয় তো কোনও পুরাণে কেবল ইহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হইল। পুরাণে নানা স্থানে পুলিন্দ শবর প্রভৃতিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে মধ্যভারতবাসী পুলিন্দদের সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। "বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ" পুস্তকে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

সাঁওতালী জীবন

বাসন্তী
শিল্পী শ্রীরামকিংকর বেইজ

হাটের পথে
শিল্পী শ্রীরামকিংকর বেইজ

মা ও ছেলে
শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অন্ধ গায়ক
শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনের কৌতূহল ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রথম নূতন করিয়া সচেতন করিয়া দিল, বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে। ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ার কিছু পরেই, ছোট-নাগপুরে ইহাদের সংস্পর্শে ইংরেজ রাজপুরুষদের আসিতে হইল, এবং তৎপরে বিগত শতকের দ্বিতীয় অর্ধ হইতে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণও ইহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তখন ইহাদের ভাষা রীতি-নীতি ধর্ম প্রভৃতির চর্চা আরম্ভ হইল। মিশনারিরা বাঙ্গালা ও দেবনাগরী এবং রোমান অক্ষরে ইহাদের ভাষা লিখিয়া এবং ইহাদের ভাষায় বাইবেল আদির অনুবাদ করিয়া, এবং ইহাদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক পুরাণ-কাহিনী গান ছড়া প্রভৃতি ধীরে-ধীরে সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করিলেন, এবং খ্রীষ্টান ধর্মের সাহায্যে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে ইহাদের বিলীন হইয়া যাওয়া অনেক অংশে বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে বিদেশী মিশনারিদের দলের বাহিরে, আমাদের মধ্য হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে দরদী অনুসন্ধিৎসু ও ইহাদের অকৃত্রিম বন্ধু বাহির হইলেন; কোল ও অন্য বন্য জাতিদের এইরূপ উদারহৃদয় প্রেমীদের মধ্যে রাঁচীর স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুণ্য নাম প্রথম করিতে হয়। ইঁহার পূর্বে বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের কেহ-কেহ ইহাদের সম্বন্ধে সহানুভূতির দৃষ্টিতে আলোচনা করেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কোলদের বর্ণনা করিয়া লেখা ইঁহার সরস ভ্রমণ-কথা "পালামৌ" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাহির হয়। তাহার পরে সাওঁতালদের ও ক্বচিৎ অন্য কোল জনগণের জীবনকথা লইয়া বাঙ্গালী লেখকের ছোট গল্প বাহির হইয়াছে, সাওঁতাল রূপকথার সংগ্রহ এবং ক্বচিৎ কবিতার অনুবাদও বাঙ্গালায় বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালী শিল্পী সাওঁতাল ও অন্য কোলদের সংস্পর্শে আসিয়া বিশেষ প্রীতির সঙ্গে তাহাদের জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মত শিল্পীর কথা বলিতে হয়—নন্দলালের আঁকা রঙ্গীন ও একরঙ্গা বহু চিত্র ও রেখাঙ্কন সাওঁতালী জীবন ও সাওঁতালী মেয়ে পুরুষদের লইয়া, এই জাতির সম্বন্ধে তাঁহার অসীম স্নেহভাবের পরিচায়ক। শান্তি-নিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবনের শিল্পীরা এ বিষয়ে তাঁহাদের গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন,—তাঁহাদের তুলিকায় সাওঁতালী জীবনের ছবি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। নন্দলাল ও তৎশিষ্যগণের বহু বহু প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিত্রে সাওঁতাল জীবনের নানা দিক্ প্রদর্শিত হইয়াছে—বেশীর ভাগ ইহাদের ঘরোয়া জীবন; যেমন সাওঁতাল যুবক বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার স্ত্রী বা প্রণয়িনী; সাওঁতাল রাখাল বালক; সাওঁতাল শিশু ও মাতা; সাওঁতাল মেয়েদের সারি দিয়া গমন; নাচের দৃশ্য; ধান রোয়া ও ধান কাটার দৃশ্য; সাওঁতাল ঘরবাড়ী, গ্রাম; ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য নন্দলালের বৃহৎ চিত্র, মাদল-বাদকের সঙ্গে কয়েকটী সাওঁতাল কন্যার নৃত্য—ইহা তাঁহার এক মহনীয় কৃতি। শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ও সাওঁতালকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—বহু পূর্বে আঁকা তাঁহার একখানি ছোট ছবি উল্লেখযোগ্য—পাহাড়ে নদীর জল জমিয়া একটী ছোট ও স্থির জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, মাথায় পলাশ ফুল গুঁজিয়া প্রসাধন কার্যে নিরত একটী সাওঁতাল মেয়ে আরশীর মতন তাহাতে নিজের মুখ দেখিতেছে; সাওঁতালী নাচের দৃশ্যও তিনি তাঁহার নিজ বিশিষ্টতাময় রেখাপাতের দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন। মোট কথা, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে সাওঁতাল বা কোল জীবন তাহার আদিম সারল্য লইয়া একটী আদরের বস্তু, এমন কি কতকটা যেন আদর্শ জগতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক; সাওঁতালী ও অন্য কোল ভাষার মৌখিক সাহিত্য, এবং কোল জীবন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি

প্রভৃতি লইয়া যে-সব বই ও প্রবন্ধ ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য অসাধারণ, সেগুলি নানা তথ্যের ভাণ্ডার; এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনায় দুই-চারিজন ভারতীয়ের—বাঙ্গালীর—দানও আছে।

পরম্পরাগত আদিম জীবনের ধারা যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছে বলিয়া কোল-ভাষী জনগণকে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন জাতি বলা চলে। প্রাচীন জাতি ও বনচারী জাতি বটে—কিন্তু ইহারা অতি পরিচ্ছন্ন জাতি, নানা নৈতিক গুণে মণ্ডিত জাতি, সম্পূর্ণরূপে ভালবাসার যোগ্য জাতি। তাহাদের আদিম এবং অস্ত্র বনবাসী অবস্থায় তাহাদিগকে শিশু-মনোবৃত্ত বলা চলে—সরল, সত্যবাদী, সৎ, এবং সব বিষয়ে সোজা-ভাবে তাহারা বিচার করিতে ও চলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের ধনমূলক 'সভ্যতা' এখন তাহাদের সারল্য নষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের নূতন অভাব দেখা যাইতেছে; ভারতের অন্য অংশ হইতে অর্থনৈতিক ও অন্য দিকে তাহারা আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবে না। তাহাদের সারল্যের ও অজ্ঞানের সুবিধা লইয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ভারতীয় এবং রোমান-কাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট অথবা জরমান-বেলজীয়-ইংরেজ-নির্বিশেষে বিদেশীয় "দিকু"রা তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা হানি করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহারা কোমল প্রকৃতির এবং শান্তিপ্রিয় মানবই রহিয়াছে; তাহারা কঠোর পরিশ্রমী, নিজেদের সামান্য অভাব-মোচনে নিজেরাই তৎপর, এবং তদুপরি সদানন্দ জাতি; তাহারা সকলেই মাদল-বাজানো, নাচ ও গান ভালবাসে, এবং সময় পাইলেই তাহার দ্বারা চিত্তবিনোদন করে। তাহাদের পারিবারিক জীবন সাধারণতঃ নিষ্পাপ, প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা স্বস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। নর-নারীর প্রেম ইহাদের কবিতায় ও রূপকথায় একটা লক্ষণীয় অংশ জুড়িয়া আছে,—ইহাদিগের দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া ইহাদিগকে romantic বা রমন্যাসপ্রিয় জাতি বলিতে পারা যায়। আমাদের আধুনিক নগরিয়া সভ্যতার নানা পঙ্কিলতা ও আবর্জনার পাশে ইহাদের এই সরল বন্য বা গ্রাম্য জীবন পবিত্র ও কাব্যময় বলিয়া মনে হয়। বিহারের সুপরিচিত সিভিলিয়ান আদিবাসীদের দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত W. G. Archer আর্চার সাহেব ওরাওঁ-দের কথা লইয়া রচিত তাঁহার অতি সুন্দর পুস্তক *The Blue Grove* (London, 1940)-এ দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এক-ই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত কোলদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য : A few notes should be added on Uraon 'character'. To the earliest observers, a capacity for cheerful hard work was the most notable character of the Uraons; and a sturdy gaiety, an exultation in bodily physique and a sense of fun are still their most obvious qualities. These are linked to a fundamental simplicity—a tendency to see an emotion as an action, and not to complicate it by postponement or obligation······the final picture is of a kindly simplicity and smiling energy.

কোলদের ধর্মকে আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় Animism অর্থাৎ "অজ্ঞাত-দেবশক্তি-বাদ" পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। এই মত বা বাদ বা বিশ্বাস অনুসারে, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক অদৃষ্ট অজ্ঞাত দৈবী শক্তি বা আত্মা কার্য্যকর হইয়া সদা-বিদ্যমান আছে। সেই শক্তি কখনও মানুষের শত্রু, কখনও মিত্র; নানা ভাবে পূজা-উপচারের দ্বারা, সেই শক্তিকে, শত্রু হইলে দূর করা বা শান্ত রাখা, এবং মিত্র হইলে

তাহাকে পরিপোষক করিয়া রাখা, এই ধর্মের অনুষ্ঠান রূপে দেখা দেয়।' কোলেরা পর্বত, নদী, বৃক্ষ, প্রভৃতিতে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত দেবশক্তি বা দেবতাত্মা বা দেবপ্রাণের বিভিন্ন প্রকাশ বা মূর্তিকে, Bonga "বোঙ্গা" বা "বঙ্গা" নামে অভিহিত করে। আকাশ পাহাড় ভূমি নদী বন গ্রাম বাড়ী মাঠ—সবই অদৃশ্য বোঙ্গাদের অধিষ্ঠান-ভূমি; আবার বিশেষ করিয়া পাহাড়ে বনে গিরিগুহায় গাছের মধ্যে, পাহাড়িয়া নদী বা ঝরনার মধ্যে, এবং মাটীর ভিতরেও দেবতারূপে কল্পিত এই বোঙ্গাদের বাস। সকল বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পরম বোঙ্গা, প্রধান দেবতা বা পরমেশ্বর আছেন, Singi-Bonga "সিঙি-বোঙ্গা", Sin-Bonga "সিঞ্-বঙ্গা" বা Sing-Bonga "সিং-বোঙ্গা"; ইহাঁকে আর্য্যভাষীদের ভাষায় সাওঁতালেরা কখনও-কখনও "ঠাকুর বাবা" বলিয়াও অভিহিত করে। ইহার কাছে সাওঁতাল ও অন্য কোলদের চরম আবেদন উদ্দিষ্ট হয়। সিঙ্-বোঙ্গা হইতেছেন সমস্ত বিশ্বের অদৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা, সকলের পালক, পোষক ও শাসক, সকলের চেয়ে মহান্ প্রধান দেবতা, মানুষের পাপ-পুণ্যের, সকল কাজের দ্রষ্টা ও সাক্ষী; মানুষ দুঃখ-কষ্টে তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়া আরাম বা স্বস্তি পায়, এবং তিনি আপৎকালে মানুষকে প্রতীকারের উপায় জানাইয়া দেন। এই পরমেশ্বর পরমাত্মা হইতেছেন, কোলদের ভাষায়, "মারাঙ্-উতের্নি"—'সকলের চেয়ে মহান্'; তাঁহাকে "হানী" অর্থাৎ 'উনি, ঐ পুরুষ' বলিয়া অনেক সময়ে অভিহিত করা হয়। এই পরমাত্মার প্রচলিত নাম "সিঙ্-বোঙ্গা" শব্দের "সিঙ"-অর্থে দিন, বা সূর্য্য; ইহাঁকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা আলোকের দেব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আলোর সঙ্গে ইহাঁর যোগ স্মরণ করিয়া কোল-জাতীয় "সোকা" বা "দেওঁড়া" অর্থাৎ পুরোহিত ও ভবিষ্যদ্বক্তারা কখনও-কখনও সিঙ্-বোঙ্গার উদ্দেশ্যে সাদা মোরগ বা পাঁঠা বলি দিয়া থাকে। সিঙ্-বোঙ্গা আর সমস্ত বোঙ্গার স্রষ্টা। "বোঙ্গা" শব্দ আজকাল সাধারণতঃ দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু Korwa কোর্‌বা প্রভৃতি দুই-একটী ভাষার নজীরে এবং মুণ্ডারী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, "বোঙ্গা" শব্দের মূল অর্থ ছিল 'চাঁদ'। আজকাল সাওঁতালী মুণ্ডারী প্রভৃতিতে 'চাঁদ' ও 'সূর্য্য' উভয়কেই বুঝাইবার জন্য আর্য্যভাষার শব্দ "চান্দো, চান্দুক্" শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং চাঁদের জন্য "বোঙ্গা" শব্দ ব্যতিরেকে অন্য দুইটী শুদ্ধ কোল শব্দ আছে—খাড়িয়া ও জুয়াঙ্, "লেরাঙ্" শবর "আঙাই", গদব "আঙ্গায়িতা"। "সিং" অর্থে 'দিন বা সূর্য্য'; "ঞিন্দা, নিদা" অর্থে 'রাত্রি'; এইজন্য চাঁদ অর্থে "ঞিন্দা চান্দো" বা "ঞিন্দা বোঙ্গা" শব্দও কোল-ভাষায় (সাওঁতালী ও মুণ্ডারীতে) পাওয়া যায়। "সিং-বোঙ্গা" (অথবা "সিং-চান্দো"—"চান্দো" এখানে 'সূর্য্য' অর্থে) অর্থাৎ 'দিনের বা আলোর দেবতা', যেন পরমেশ্বর বা দেবরাজ, এবং "ঞিন্দা চান্দো" অর্থাৎ 'রাত্রির দেবতা' চন্দ্রদেবী হইতেছে দেবতাদের রাণী, সিং-বোঙ্গার স্ত্রী—সাওঁতালী ও অন্য কোল পুরাণে এইরূপ কল্পনা আজকাল পাওয়া যায়। "সিঞ্"='আলো, বা দিন, বা সূর্য্য', "ঞিন্দা"='আঁধার, বা রাত'; এই দুইটী শব্দের এই প্রাচীন অর্থ এখনও সাওঁতাল সমস্ত পদ "সিঞ্-ঞিন্দা"-তে ও মুণ্ডারী "ঞিন্দা-সিঙি"-তে মিলে—"সিঞ্-ঞিন্দা" ও "ঞিন্দা-সিঙি" মানে 'দিন-রাত', 'অনবরত'। মূল কোল-জাতির কল্পনায়, আমাদের 'আলো ও ছায়া শিব-শিবানী'র মত ঐশী শক্তির দুইটী বিকাশ রূপেই জ্যোতিঃ ও তমঃ অনুভূত হইয়াছিল, ইহা এই শব্দ দুইটী হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। যাহা হউক, সিং-বোঙ্গার কল্পনায়, যে-কোন সভ্য সমাজের মানুষের উপযোগী একটী দেব-কল্পনায় কোল-জাতি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রধান দেবতা সিং-বোঙ্গা এবং নানা

অপ্রধান বোঙ্গা বা দেবতা ব্যতীত, কোলদের মধ্যে পিতৃপুরুষ বা প্রেতগণের সম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে, এবং এই পিতৃপুরুষদের পূজার অনুষ্ঠানে কবিত্বময় বা কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কোলদের মধ্যে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে নানা হিন্দু ভাব ও অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়া গিয়াছে, এবং এখন ইহাদের মধ্যে খাঁটী কোল জিনিস ও হিন্দু জিনিস পৃথক্ করিয়া বিশ্লেষ করা কঠিন। লৌকিক বা গ্রাম্য হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কোল (বা প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির) জগৎ হইতে লব্ধ বহু ব্যাপার যে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সভ্যতা' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, অর্থাৎ পার্থিব-বস্তু-নিষ্ঠ যান্ত্রিক সভ্যতা, যাহার ফলে বড়-বড় বাড়ী-ঘর, মন্দির-ইমারত, উচ্চ কোটির শিল্প, সাহিত্য, নাট্য, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি—তাহা কোলদের নাই; কিন্তু স্বকীয় প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শান্তিতে ও মনের সুখে বাস করিবার উপযোগী মানসিক সংস্কৃতি তাহাদের আছে, তদুপযোগী সাধনও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ভাষার সঙ্গে ও সমবেত জীবনের সঙ্গে এই সংস্কৃতি জড়িত। কোল জীবনে বিভিন্ন ঋতুতে পর্ব ও অন্য অনুষ্ঠান, তাহাদের হাট ও মেলা, তাহাদের নাচের রীতি, তাহাদের বাঁশী ও মাদল বাজানো এবং গান, তাহাদের সরল এবং আদিম মণ্ডন-শিল্প, তাহাদের ফুল ও রঙের প্রতি প্রীতি, বংশানুক্রমে প্রবাহিত তাহাদের গান কবিতা ছড়া ও রূপকথা এবং পুরাণকথার ধারা, এবং চারিদিকের আরণ্য প্রকৃতির সম্বন্ধে তাহাদের মনঃকল্পিত ভাবজগৎ ও চিত্তের রসানুভূতি—এই-সমস্তের মাধ্যমে এই-সংস্কৃতি সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই-সমস্ত জীবনধারা ও ভাবধারাই ইহাদের জীবনকে ইহাদের নিকটে শোভন ও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্তকে নষ্ট করিয়া দিয়া, যদি কেবল ভৌতিক বা পার্থিব 'সভ্যতা', যাহার মুখ্য আবেদন হইতেছে দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি, তাহা আসিয়া যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সভ্যতার মধ্যেও মানুষ বর্বর হইয়া পড়ে। এরূপ 'সুসভ্য বর্বর' ইউরোপে ও আমেরিকায় দুর্লভ নহে, ভারতেও দুর্লভ নহে; এই বর্বরেরা ধন এবং ধনায়ত্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না। কিন্তু কোলদের জীবন আর তাহার সেই আদিম অবস্থায় থাকিতে পারিতেছে না। বাহিরের জগৎ—তাহাদের দেশে অর্থগৃধ্নু হিন্দু ও মুসলমান দিকুদের দলে-দলে আগমন এবং খ্রীষ্টান মিশনারিদের বহুস্থলে অজ্ঞ এবং অন্ধ ধর্মপ্রচারের তাগিদ—তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে।

বিশেষ ভাবে সজ্ঞান এবং দলগতস্বার্থ-প্রণোদিত সক্রিয় চেষ্টা না থাকিলেও, হিন্দু ভাবধারা সহজ ভাবে ধীরে-ধীরে কোলদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—হিন্দু প্রতিবেশীদের দেখাদেখি কোলেরা তাহাদের অনেক কিছু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে কোল-জীবনের প্রতিষ্ঠায় বা বুনিয়াদে আঘাত পড়ে নাই। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের আগমনে তাহা হয় নাই। বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে (এই শ্রেণীর সমস্ত ধর্মমতেই এটী দেখা যায়) একটী বর্বরোচিত মনোভাব বিদ্যমান—পারমার্থিক সত্য তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি, পরমেশ্বর কেবল তাহাদেরই হাতে নিজেকে ধরা দিয়াছেন। সুতরাং অন্য কোনও প্রকার ধার্মিক অনুভূতি তাহারা বুঝিবে না, বুঝিতে চেষ্টাও করিবে না, এবং নির্মম ভাবে তাহার ধ্বংস করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হয় (ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় তাহা কেবল তাহারাই জানে, আর কেহ নহে), পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে আছে—ইউরোপীয় পার্থিব সভ্যতার দম্ভ, কোল প্রভৃতি আদিম আরণ্য সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণাভাব। ইহার ফলে, অন্য নানা পশ্চাৎপদ জাতির মত কোলদের

সমূহ হানি হইয়াছে। হয়তো তাহারা পার্থিব জগতে কতকগুলি সুখ ও সুবিধা পাইয়াছে; কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাদের দুরপনেয় আত্মদৈন্য ঘটিয়াছে; এবং এই আত্মদৈন্যের অর্থ ই হইতেছে আত্মাবনতি। আদিম জাতির মনোভাব যাহারা বুঝে না, সম্পূর্ণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উদ্ভূত অন্য প্রকারের ভাবজগৎ বা চিন্তাজগৎ এবং জীবন-পদ্ধতির কোনও-কোনও অংশ যাহারা একটী আদিম জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের হাতে কোলদের মত জাতিকে ছাড়িয়া দেওয়া একটী অমার্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।

আমি নর-দেব বা ব্রহ্ম-নারায়ণ রূপে পূজিত মহাপুরুষ যীশু-খ্রীষ্টের শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতেছি না। Skrefsrud (স্ক্রেফ্‌স্রুড্‌), Hoffmann (হফমান্‌), Bodding (বডিং), Nottrott (নোট্‌রোট্‌) প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিত পাদরিরা কোলদের ভাষা চর্চায় ও তাহাদের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সংরক্ষণে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা চিরকাল কোলদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন, কোলদের বন্ধুরাও তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহাদের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, প্রথম যুগে খ্রীষ্টান সভ্যতার প্রসার' যে রীতিতে হইতেছিল, তাহাতে, যাহাদের মধ্যে এই সভ্যতার প্রসার ঘটিত তাহারা আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইত, নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসহায়, ইউরোপীয়দের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়াই ভাবিত; এবং তাহাদের মধ্যে এই ধারণা আসিত যে, সাহেবদের আগমনের পূর্বে তাহাদের ইতিহাস হইতেছে আত্মঘাতী অজ্ঞতার ইতিহাস। সুখের বিষয়, মিশনারিদের অনেকে এখন স্থানীয় কোল পারিপার্শ্বিকের মূল্য উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার ফলে, নিজ ভাষা ও নিজ কোল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং নিজ গ্রামীণ সরল জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন এবং গৌরবভাব-পোষণকারী খ্রীষ্টান কোল, এবং নিজধর্মে প্রতিষ্ঠিত অখ্রীষ্টান ও অহিন্দু কোলও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আত্মদৈন্য-মুক্ত কোল পুরুষ ও স্ত্রী, সকল সমাজের মানব কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দনের পাত্র।

উচ্চ কোটির মানসিক সংস্কৃতির পথে চলা কোলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহারা নিজে হইতে কোনও লিপিবিদ্যার উদ্ভাবন করে নাই, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের পূর্বে প্রতিবেশী হিন্দুদের কাছ থেকেও গ্রহণ করে নাই। সেই হেতু তাহাদের সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন ব্যাহত হইয়াই ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারিরা প্রথমটায় বাঙ্গালা ও নাগরী এবং উড়িয়া লিপিতে ও পরে রোমান লিপিতে তাহাদের ভাষা লিখিয়া তাহাতে সাহিত্য সৃজন ও সাহিত্য সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। সজ্ঞান বা সচেতন ভাবে সাহিত্য-সর্জনার পথে তাহাদের সংস্কৃতি এখনও চালিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গান-বাঁধা ও গল্প-বলার রীতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষ মাদল ("তুমাং") ও উন্মাদনাকর বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া নাচ ও গান ইহাদের জীবনের এক সুন্দর রীতি। পাদ্রি নোটরোট্‌, পাদ্রি হফমান, এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের মুণ্ডারী গীতির সংগ্রহ ও অনুবাদের সাহায্যে বাহিরের জগতের কাছে এই আদিম ও সুমধুর প্রকৃতি-বিষয়ক এবং প্রেম-বিষয়ক কবিতার উৎসমুখ উন্মোচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার রস আস্বাদন করা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর হইয়াছে। W. G. Archer আর্চার সাহেবের চেষ্টায় মুণ্ডারী খাড়িয়া সাঁওতালী ও হো ভাষায় চারি খণ্ডে যে কোল-জাতির কয়েকটী বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত গীতি-কবিতার সংগ্রহ বিহার প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রাচীন ভারতের আর্য্যদের গীতি-

কবিতার ও ছড়ার সংগ্রহ ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সহিত তুলিত করা যায়; এই ভাবে সংগৃহীত অভিনব সমগ্র 'কোল্ল-বেদ-সংহিতা'-র ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইলে, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটী মূল্যবান্ কার্য্য সাধিত হইবে। সাঁওতালীদের অনুরাগী বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দ্বারাও দুই-দশটী সাঁওতালী গান সংগৃহীত ও অনূদিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঁওতালের চিত্ত সঙ্গীত-রস-রসিক বটে, কিন্তু সাঁওতাল নিজের মানসিক প্রকাশ, গান বা কবিতা অপেক্ষা মনে হয় যেন কথা ও কাহিনীতেই বেশী করিয়া করিয়াছে। এ হিসাবে মুণ্ডারা গীতি-কবিতার রাজা। মুণ্ডারী-ভাষায় রচিত কতকগুলি গান, সরল ও আদিম কবিতার অতি মনোহর নিদর্শন রূপে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। চীনাদের ও জাপানীদের মধ্যে যে ধরণের প্রকৃতির সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা দেখা যায়, ইহাদের কবিতাতেও সেইরূপ ভাব বিরল নহে। ভারতীয় কাব্যোদ্যানে ইহাদের কতকগুলি প্রেমের কবিতা হইতেছে কোমলবর্ণময় ও সুমধুর-সৌরভযুক্ত পুষ্প। এইগুলির মধ্যে কথোপকথন-মূলক দুই-পাঁচটী কবিতা আছে, সেগুলির মধ্যে নিহিত বন ও পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের অশিক্ষিত কলাকৌশল এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্বভাবজাত কারুকার্য্য, ভাবের সারল্য ও শুদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলি কোল (মুণ্ডারী) ভাষার পদ দেওয়া যাইতেছে।

১। চিকান্ বাহা বাহা-লেনা-ম্ মাইঁ ?
বাহা বাহা সোআনাম্।
চিকান্ দাণ্ডিঃদ্ দাণ্ডিঃদ্ লেনা-ম্ মাইঁ ?
দাইলি দাইলি সিরিন্‌জাম্।

২। বাহাতে চি উম্বেন্-তানা-ম্ ?
বাহা বাহা সোআনাম্।
দাণ্ডিঃদ্-তে চি রেআরান্-তানা-ম্ ?
দাইলি দাইলি সিরিন্‌জাম্।

(পাদরি হফমানের সংগ্রহ হইতে)

১। কোন্ ফুলে তুমি ফুটে উঠেছ, কন্যা ?
তুমি যে ফুলের মতন সৌরভময়।
কোন্ ফুলের গোছায় তুমি বড় হ'য়ে উঠেছ, কন্যা ?
ফুলের গোছার মত তুমি সৌরভে ভ'রে উঠেছ।

২। (কি বা) তুমি কি ফুলের মধ্যে স্নান ক'রে থাকো, কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের মতন সৌরভময় ?
(কি বা) তুমি কি ফুলের গোছার মধ্যে নেয়ে থাকো কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের গোছার মত সৌরভে ভ'রে উঠেছ ?

আর একটী কবিতায় মুণ্ডা প্রেমিক যুবা তার প্রেমের পাত্রী কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—কবিতাটী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় সংগ্রহ করেন ও ইংরেজী কবিতায় ইহার অনুবাদ করেন—

বো তামা রিসা রিসা
সুপিদ্-কেদাম্ রাঙ্গা নাচা,
ক্রিন্দা-সিডি, বাগে-ম্ গুতুতানা,
নামা নাগেন্ জিগে জিতানা।
আন্দু তাদা-ম্, সাকোম্ তাদা-ম্,
হোতোরে দো হিসির্-মেনা,
পোলা-তা-ম্ দো চিল্কা সারিতানা,
নামা নাগেন্ জিগে লোতানা।

ঢেউ-খেলানো চুলের ভারে তোমার মাথা কি সুন্দর,
লাল দড়ীতে মাথার চুল কেমন গোল খোঁপায় বাঁধা!
রাত-দিন, তুমি ফুলের মালা গাঁথো—
তোমার তরে আমার মন পোড়ে, আমার হৃদয় কাঁপে।
তোমার হাতে কাঁকন আর তাড় কেমন সুন্দর দেখায়,
তোমার গলা বেড়ে আছে কি সুন্দর হাঁসুলি!
তোমার পায়ে "পোলা" কি সুন্দর ঝুমঝুম করে,
তোমার তরে আমার মন দহে, ভয়ে কাঁপে!

নীচের মুণ্ডারী কবিতাটীতে প্রথম অংশ কুমারী কন্যা তাহার প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, এবং দ্বিতীয় অংশ হইতেছে যুবকের উত্তর—

(কুড়ি) নাতা-মাতা বির্-কো তালারে, নালোহোম্ নির্জা বাগিঙ্গা,
রামেকান্ মারেচারে, নালোহোম্ নজর রারাইঙ্গা।
কাচিহোম ঞেলে লেদিঙ্গা, সেঙ্গেল্-লে কাইঙ্ জুলেতান্‌রে?
কাচিহোম্ চিনা লেদিঙ্গা, দাঃক্-লে কাইঙ্ লিঙ্গিতান্‌রে?
(কোড়া) কাগে চোআইঙ্ ঞেলেজাদ্‌মে, নোতে-রে দো নোতে দুদ্‌গার্
কাগে চোআইঙ্ চিনাজাদ্‌মে—সিঙ্-মা-রে দো সিঙ-মা কোর্মাসি।

(কুমারী) গহন বনের মধ্যে, কুমার, তুমি পালিয়ে যেও না, আমাকে ফেলে যেও না;
এই বিশাল তেপান্তর মাঠের মাঝে, কুমার, আমাকে ফেলে পালিয়ে যেও না।
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, যখন আমি আগুনের মত জ্ব'লে উঠি?
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, যখন আমি জলের মত গ'লে যাই?
(কুমার) সত্যই আমি তোমায় দেখি নি, কারণ তখন পৃথিবী জুড়ে' ছিল ধূলা আর আঁধি;
সত্যই আমি তোমায় দেখি নি, কারণ আকাশে তখন ছিল মেঘের মত কোয়াসা॥

শিকারের আনন্দ নীচের কবিতাটীতে সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে (শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদ হইতে)—

ঐ মহুআ গাছের তলায় ঐ রে ঐ হরিণ-শিশু চরে ;
বন-পথ দিয়ে নীচু হ'য়ে ব্যাধ যুবক চলে, হেঁট হ'য়ে চলে।
মহুয়ার মিষ্টি ফলের লোভে হরিণ হোথায় আসে, হরিণ ঘোরে ;
হরিণের গায়ে বাণ বিঁধবার তরে ব্যাধ হঠাৎ দাঁড়ায় খাড়া হ'য়ে, হাতে ধনুক নিয়ে ;
মহুয়ার ছায়ার তলে যায় প'ড়ে হরিণ-শিশু, হঠাৎ পড়ে ;
ঐ শোনো, ব্যাধ খুশী গলায় আনন্দের ধ্বনি করে, খুশীর রা কাড়ে।

আনন্দের মধ্যেও যে দুঃখের বীজ আছে, হরিষে বিষাদের ভাব এই রূপে মুণ্ডা কবি প্রকাশ করিতেছে—

একাসি-কো পিরি-রে দো রুতু-তেকো সেসেন্‌তানা, রুতুতেকো সেসেন্‌তানা,
তেরাসি-কো বাদিরে দো বানাম্‌-তেকো তুদাঙ্‌তানা, বানাম্‌তেকো তুদাঙ্‌তানা।
রুতু-তেকো সেসেন্‌তানা, রুতু চুটিহুলাংক্‌ জানা, রুতু চুটিহুলাংক্‌ জানা,
বানাম্‌-তেকো তুদাঙ্‌তানা—বানাম্‌-দাণ্ডি দোরাঙ্‌জানা, বানাম্‌-দাণ্ডি দোরাঙ্‌জানা।

একাশির টিলা-ভুঁইয়ে পথিকেরা যায় বাঁশীর সুরে, বাঁশীর সুরে ;
তিরাশির নামাল-ভুঁইয়ে পথিকেরা যায় দোতারার তালে, দোতারার তালে।
বাঁশীর সুরে চলে তারা, হায়, বাঁশীর মুখ গেছে ভেঙে, বাঁশীর মুখ গেছে ভেঙে ;
দোতারার তালে যায় গো তারা, হায় দাণ্ডী তার হ'য়েছে চুর, হ'য়েছে চুর।

বিবাহের কন্যার মুখ দিয়া মুণ্ডা কবি বলিতেছে—

বা-তৈঙ্‌-মে গা নেআঙ্‌ বা-তৈঙ্‌-মে হো।
ডালি-তৈঙ্‌-মে গা নাপাঙ, ডালি-তৈঙ্‌-মে।
সারজোম্‌-বা-তে নে-আঙ্‌, বা-তৈঙ্‌-মে হো।
সুড়া-সাংগেন্‌-তে গা নাপাঙ্‌ ডালি-তৈঙ্‌-মে।

ওগো মা, ফুল দিয়ে আমায় সাজাও, ফুল দিয়ে সাজাও ;
বাবা গো, মাথায় দাও ফুলের মুকুট, মাথায় ফুলের মুকুট।
শালের ফুলে, মা গো, আমায় দাও সাজিয়ে ;
শালের কচি ডালে, বাবা গো, মুকুট বানাও আমার তরে, মুকুট আমার তরে।

নাচের আহ্বান করিয়া যখন মাদলে ঘা পড়ে, তখন কোল যুবক-যুবতীদের দেহে মনে যে সাড়া পড়িয়া যায়, বহু পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "পালামৌ"-য়ে তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাটী এই নাচের আনন্দের রসে পরিপূর্ণ—

কোট-কারাম্বুতে মাদল বাজে ;
আমার হৃদয় নাচে, ঐ আওয়াজে—ঐ আওয়াজে।

বারিগারায় করতাল ঝম্‌ঝম্‌ করে—
আনন্দে আমার হৃদয় যেন লাফ দেয়, যেন লাফ দেয়।
কোট-কারাম্বুতে মাদল বাজে—
ত্বরা করো, প্রিয়া আমার, চলো যাই নাচে, চলো যাই নাচে।
বারিগারায় খরতাল খন্‌খন্‌ করে—
ওঠো, প্রিয়া আমার, ছাড়ো উদাস ভাব, চলো যাই নাচে ॥

সাওঁতাল যুবকও অনুরূপ ভাবে গায়—

(মাদলের) বাজনা শুনে,
মন আমার যেন তাওয়ার তাপে তাতে ॥

মুণ্ডারীর মত সুন্দর-সুন্দর কবিতা সাওঁতালীতে তত বেশী পাওয়া যায় না। ছয়-সাত ছত্রের কবিতা মুণ্ডারীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সাওঁতালী কবিতা দুই ছত্র, বড় জোর চারি ছত্রেরই বেশী; পাঁচ-ছয় ছত্রের অবশ্য দুর্লভ নয়। আজকাল মুণ্ডা ও সাওঁতাল কবিরা বড়-বড় কবিতা ও গান লিখিতেছেন। মালাই জাতির Pantum "পান্তুম্‌" কবিতার মত, জাপানী Tanka "তান্কা" আর Uta "উতা"র মত, সাওঁতালীদের সাহিত্যিক বোধ বা অনুভূতি, এই-রূপ ছোট কবিতার মধ্যেই সীমিত। শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই-রূপ সাওঁতালী কতকগুলি কবিতার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলির বাঙ্গালা অনুবাদও করিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি এই সংখ্যায় ছাপা হইল। রবীন্দ্রনাথকেও এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য্য খুশী করিয়াছিল, এবং Visva-bharati Quarterly-র ১৯২৫ এপ্রিল সংখ্যায় সন্তোষ-বাবুর সংগ্রহ হইতে কতকগুলি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চারুলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ বি-এল্‌ মহাশয় "দেশ" পত্রিকাতে কতকগুলি সুন্দর সাওঁতাল কবিতার বঙ্গানুবাদ মূলের সহিত প্রকাশিত করেন। W. G. Archer আর্চর সাহেবের প্রকাশিত সংগ্রহও ইংরেজী অনুবাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটী সাওঁতালী কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে; এগুলিতে ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখের কথা বিশেষ নিষ্কপট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী বলিতেছে—

আমি ভাত রাঁধি, আমি বেন্নন রাঁধি, ওর পাতে খুব ঢেলে ঢেলে দিই।
তবুও ও বলে, এ বউ আমি ঘরে রাখ্‌বো না ॥

মাতৃহারা পুত্র মায়ের জন্য খেদ করিতেছে—

হায় হায়, আগেকার দিনে
কোথাও থেকে আমরা ঘরে ফিরে আসার সময়ে
দোয়ারের ধারে মা থাক্‌ত ব'সে—
বাচ্ছা ময়নার মত আমাদের পেয়ে আদর ক'র্‌ত ॥

শ্রীযুক্ত চারু-বাবুর সংগ্রহ হইতে দুইটী সাওঁতালী গান—

বুরুরে নাতাল-বাহা, দলপ্‌-দলপ্‌ নাতাল-বাহা।
আহা লেকাতেইঞ্‌ তিরকগিয়া হরিঞ্‌ চিপিরেঃ সুভন কচেরেঃ
আহা লেকারেইঞ্‌ বাহাইগিয়া।

পাহাড়ের উপরে নাতাল ফুল, দুল্‌ছে নাচ্‌ছে নাতাল ফুল।
আমি সুন্দরী নই, খোঁপার দুই ধারে ফুল দোলে—
আমি সুন্দরী নই, কিন্তু ঐ ফুল চুলে আমি গুঁজ্‌বো॥

নাম্‌-দ কিসাঁড়্‌-হপন্‌ নিঞ্‌-দ রেঙ্গেঃচ্‌
হপন্‌ চেকা লেকাতে-ম্‌ বুলাও।
কিদিঞ্‌ নালো সারিম্‌ রাগ, সারিনালো,
সারিম হমরা, বানা হড়্‌-গে চংলাং সমান্‌গিয়॥

কন্যা। ধনীর ছেলে তুমি, গরীবের মেয়ে আমি, কি ক'রে আমায় ভোলালে?
তরুণ। কেঁদো না, মনে ব্যথা পেয়ো না, আমরা দুজনে দুজনার সাথী।

মনে হয়, জীবনের সব দিক্‌ লইয়া টুকরা-টাকরা অভিজ্ঞতা বা চিত্রাঙ্কন সাওঁতালদের কবিতায় অধিক করিয়া পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ্‌ বা গাথা ছন্দে রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতায়, প্রাচীন তমিল্‌ পদে, হিন্দীর দোহায়, অনেক সময়ে এই-রূপ বাচংযমতার সঙ্গে প্রেম বা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবির দর্শন বা উপলব্ধির যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, সাওঁতালী, মুণ্ডারী প্রভৃতি কোল-ভাষার এই-সব ছোট-ছোট কবিতা যেন সেই পর্য্যায়ের।

আজকালকার বিভিন্ন গণের কোল ছেলেমেয়েরা (কি মুণ্ডারী, কি সাওঁতাল, কি হো) তাহাদের প্রাচীন গানগুলি ভুলিতে বসিয়াছে। তবে কোল-সমাজের বাহিরের—ভারতীয় ও ইউরোপীয়—সাহিত্য-রসিকদের আলোচনার ফলে, শিক্ষিত কোল দুই-চারিজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে দরদ আসিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়ে আবশ্যক বা প্রার্থিত হইতেছে এমন ব্যবস্থা, যাহাতে অশিক্ষিত কোল জনসাধারণ নিজেদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত এই রিক্‌থ হেলায় হারাইয়া না ফেলে। এজন্য আবশ্যক, তাহাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং শান্তিময় জীবনযাত্রা। কিন্তু এই দুইটী বস্তু এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

কোল জাতির পুরাণ-কথা ও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত গল্প ও কাহিনী আংশিক ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। সাওঁতালদের মধ্য হইতেই বেশী করিয়া এই-সব কথা ও কাহিনী পাওয়া গিয়াছে, এবং দুমকার স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারিদের চেষ্টাতেই কয়েক খণ্ডে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০-৭১ সালে স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি Rev. L. O. Skrefsrud স্ক্রেফ্‌স্রুড সাহেব, কলেয়ান (কল্যাণ) নামে একজন বৃদ্ধ সাওঁতাল গুরু অর্থাৎ পুরোহিতকে পান, এবং তাহার নিকট হইতে সাওঁতালদের পুরাণ-কথা ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি এবং সামাজিক রীতিনীতির কথা যাহা শুনেন তাহা লিখিয়া লন, ও ১৮৮৭ সালে মূল সাওঁতালী ভাষায় রোমান অক্ষরে এই বই প্রকাশিত করেন—এই বইয়ের নাম দেন "হড়্‌কো-রেন্‌ মারে-হাপ্‌ড়াম্‌-কো রেআঃক্‌ কথা"

অর্থাৎ 'সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের কথা'। এই বইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, ইহা শুদ্ধ সাঁওতালীর মূল্যবান্ নিদর্শন, এবং ইহা একাধারে সাঁওতাল পুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থ। এই বই ছাড়া স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি পরলোকগত Rev. P. O. Bodding বডিং সাহেব, Oslo অস্‌লো এবং Copenhagen কোপেনহেগেন্ হইতে কয়েক খণ্ডে সাঁওতালী উপাখ্যান, মূল সাঁওতালী ও ইংরেজী অনুবাদ সমেত প্রকাশিত করিয়াছেন। বডিং সাহেব সাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধও লিখেন। মুণ্ডাদের কথা লইয়া রোমান কাথলিক পাদরি Hoffmann হফমান সাহেব ১৪ খণ্ডে বিরাট্ এক মুণ্ডারী বিশ্বকোষ Encyclopaedia Mundarica পাটনা হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯৩০-৩২ সাল)।

এ সম্পর্কে সব-চেয়ে লক্ষণীয় হইতেছে সিংহভূম (চাইবাসা) জেলার ঘাটশিলার অন্তর্গত কাড়ুয়াকাটা গ্রামের অধিবাসী রামদাস মাঝি টুডু মহাশয়ের সঙ্কলিত বই "খেরওয়াল-বংশা-ধরম-পুথি"—বহু বৎসর পূর্বে ৬৮ পৃষ্ঠার বড় আকারের এই বইখানি, সাঁওতালি ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়া তিনি প্রকাশিত করেন। ইহাতে নিজ হইতে তিনি সাঁওতাল পুরাণের সৃষ্টি ও অন্য বিষয় সংক্রান্ত কতকগুলি গল্প এবং কতকগুলি পুরাতন ও স্বরচিত গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কাঠে-খোদাই ছবি কতকগুলিও দিয়াছেন, তাহা হইতে দেবতা-সম্বন্ধে সাঁওতালদের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক কালে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখা যায়। এই বই এখন প্রায় অপ্রাপ্য—কিন্তু ইহা নিজ সংস্কৃতির প্রতি বর্ণজ্ঞানযুক্ত কোলের শ্রদ্ধার প্রথম নিদর্শন।

বডিং সাহেবের সাঁওতাল গল্পের সংগ্রহের কতক অংশের ইংরেজী অনুবাদ ১৯০৯ সালে সিভিলিয়ান Cecil Henry Bompas কর্তৃক Folklore of the Santals নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। Rev. Dr. Campbell ক্যাম্প্‌বেল নামে আর একজন মিশনারি ১৮৯১ সালে কতকগুলি সাঁওতালী কাহিনী প্রকাশ করেন। এই-সব সংগ্রহের সব গল্পগুলিই কিছু লক্ষণীয় নহে। কতকগুলি গল্প ভারতের সাধারণ সম্পত্তি—জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের মত পশুপক্ষীকে অবলম্বন করিয়া নীতিকথা; কতকগুলি আবার সাধারণ রূপকথা, যাহা বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি আর্য্য-ভাষাতেও পাওয়া যায়। কতকগুলি গল্প বিশেষ ভাবে সাঁওতালদের জীবন লইয়া। এই-সমস্ত গল্পের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় এবং চিত্তগ্রাহী হইতেছে বোঙ্গাদের লইয়া কতকগুলি গল্প, যেগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক। এই ধরণের গল্প বেশী সংখ্যায় মিলে—একদিকে মানব তরুণ বা তরুণী, অন্যদিকে "বোঙ্গা-কুড়ি" বা "বোঙ্গা-কোড়া"—দেবকন্যা বা দেবকুমার—এবং ইহাদের মধ্যে ভালবাসার কথা লইয়া গল্প। এইরূপ গল্পের কাঠামো বা মূল কথাবস্তু মাত্র দুই-চারি প্রকারের পাওয়া যায়। একটী সাধারণ কথাবস্তু হইতেছে এই ধরণের— সখীদের সঙ্গে সাঁওতাল-কন্যা বনে গিয়াছে শাকপাতা তুলিতে; সেখানে এক তরুণ বোঙ্গার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, এই বোঙ্গা-কোড়া বাস করে পাহাড়ের গুহায়, কন্যা তাহার পত্নীরূপে সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে থাকে; কিন্তু তাহার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে এই বোঙ্গা-সঙ্গ প্রীতিকর না লাগায় তাহাদের চেষ্টা হয়, যাহাতে বোঙ্গাকে মারিয়া ফেলিয়া বা তাহাকে ঠকাইয়া, কন্যাটীকে আবার ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারে; কখনও-কখনও তাহারা কৃতকার্য্যও হয়; কিন্তু বোঙ্গা তাহার মানবী স্ত্রীকে ছাড়িবে না—কন্যা বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত হয় ও প্রাণত্যাগ করে, এবং এইরূপে বোঙ্গা-লোকে গিয়া তাহার বোঙ্গা-পতির সহিত মিলিত হয়। আবার

এই ধরণের গল্পও কতকগুলি পাওয়া যায়—তরুণ সাঁওতাল রাখাল, পাহাড়ের কোলে বনে গোরু মহিষ চরাইতেছে; জ্যোৎস্নার রাত্রে বনের মধ্যে সে বাঁশী বাজাইতেছে; বোঙ্গা-কন্যা তাহাকে দেখিয়া, তাহার প্রেমে পড়িয়া সুন্দরী মানব-কন্যার রূপে আসিয়া তাহাকে দেখা দেয়। ইহা যেন প্রাচীন বৈদিক উর্বশী ও পুরূরবাঃ, গ্রীক পুরাণ-কথার দেবী Aphrodite আফ্রোদিতে ও রাখাল রাজপুত্র Ankhises আঙ্খিসেস্, এবং টিউটনিক জাতির Valkyrie বা রণদেবী Alvit আলভিট্ ও তরুণ কারু-শিল্পী Weland বেলাণ্ড-এর কাহিনীর অনুরূপ সুন্দর ও কাব্যময় কাহিনী। সাঁওতালী উপাখ্যানের বোঙ্গা-কন্যা একটী পাহাড়িয়া নদীর উৎসের মধ্যে বাস করে; সাঁওতালী কথাকার উৎসটীর ছোট একটুখানি বর্ণনাময় চিত্র দিয়াছেন—'বোঙ্গা-কন্যার বাসস্থান উৎস-মুখের তীরে গাছে প্র র লালরঙ্গের সুগন্ধি আকাড় ফুল ফুটিয়া আছে।' রাখাল তরুণ জলে নামে, গাছ হইতে কন্যার জন্য ফুল তুলিবার উদ্দেশ্যে; জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই রাখাল বোঙ্গা-কন্যার শক্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে—কন্যা যেন কোনও যাদুমন্ত্রে তাহার প্রেমিককে সম্মোহিত করিয়া জলের ভিতরে লইয়া যায় ও নিজেদের বোঙ্গা-লোকে আনিয়া উপস্থিত করে। সেখানে বোঙ্গাদের বসিবার আসন হইতেছে কুণ্ডলী-পাকানো বড়-বড় সাপ, এবং থাবা পাতিয়া বসা বাঘ আর চিতা হইতেছে বোঙ্গাদের শিকারের কুকুর। বোঙ্গারা মাঝে-মাঝে এই-সব কুকুর লইয়া বনে শিকার করিতে যায়, তাহাদের শিকারের পশু হইতেছে বনের ভিতরের কাঠুরিয়া মানুষ। ক্বচিৎ সাঁওতাল তরুণ বোঙ্গা-লোক হইতে মানব-লোকে ফিরিয়া আসে, এবং সাধারণ মানুষের মত আর পাঁচজনের সঙ্গে বাস করে, বিবাহও করে, কিন্তু তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর সহিত মাঝে-মাঝে সে বনের ভিতরে অথবা পাহাড়িয়া নদী বা পুষ্করিণীর তলে গিয়া মিলিত হয়। তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে সেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ হয়, এবং সে জনসমাজে সম্মানিত "জান-গুরু" বা ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া দাঁড়ায়, ও সকলের সম্মানের পাত্র হয়, অর্থশালী হয়। প্রাচীন রোমের পুরাণ-কথায় উৎস-বাসিনী দেবী Egeria এগেরিয়ার উপাখ্যান আছে, ইনি রোমের রাজা Numa নুমার পত্নী হন, এবং ইঁহারই প্রসাদে নুমা ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন—এই সাঁওতালী উপাখ্যানও ঐ ধরণের।

বোঙ্গাদের কখনও-কখনও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে-ছোকরার ভাবে দেখা হয়—ইহারা নানাভাবে মানুষকে বিপদে ফেলিয়া বা অপদস্থ করিয়া আনন্দ পায়; কিন্তু মানুষেও কখনও-কখনও ইহাদিগকে নিজ বুদ্ধিবলে কায়দায় আনিতে পারে। মধ্য-যুগের উত্তর-ইউরোপে বামন দেবযোনির সম্বন্ধে যে-সমস্ত গল্প আছে, এই সাঁওতালী গল্পগুলি তদনুরূপ। বোঙ্গাদের এই প্রকারের চরিত্র-কল্পনার পিছনে, হয়তো সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন Austric বা দাক্ষিণ জাতির আগমনের পূর্বে ভারতে যে বামনাকার Negroid নিগ্রোবটু জাতি বাস করিত, তাহাদের স্মৃতি বিদ্যমান আছে। ভারতে বৈদিকযুগে আর্য্যগণ বনের অধিষ্ঠাত্রী "অরণ্যানী দেবী"কে দেখিয়াছিলেন; এখন সুন্দরবন অঞ্চলের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কাঠুরিয়া ও কৃষক "বনবিবি"র কল্পনা করে। বৈদিক আর্য্যের কল্পনায়, বন, পর্বত, হ্রদ সমস্ত ছিল দেবতাদের অধ্যুষিত, অপ্সরা ও গন্ধর্বদের বিচরণভূমি। প্রাচীন গ্রীকেরা Dryad বা বৃক্ষকাদেবী, Naiad অর্থাৎ অপ্সরা বা জলদেবী এবং Nereid বা সাগরদেবীর অধিষ্ঠান সর্বত্র দেখিত; তাহাদের চোখে, বনের মধ্যে Pan পান্-দেব এবং Dionusos দিওনুসস্ ও তাঁহার গণ, Satyr "সাতির" নামে আরণ্য অর্ধ-পশু-অর্ধ-মানব দেবযোনি ও Bacchanate দিব্যোন্মাদযুক্ত রমণীবৃন্দ বিচরণ করিত। কোন

জাতীয় লোকেরা তেমনি বনে, পাহাড়ে, নদীতে, জলাশয়ে, বোঙ্গা-কোড়া ও বোঙ্গা-কুড়িদের দেখিত, এখনও দেখিয়া থাকে; তাহাদের ছোট-ছোট গ্রাম ঘিরিয়া, মধ্য- ও পূর্ব-ভারতের অনাদিকালের অরণ্যে এখনও এই-সব দেবযোনির বাস তাহারা দেখে। মুণ্ডা দেবলোকে এই-সমস্ত দেবতার খবর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় দিয়াছেন,—"বুরু-বোঙ্গা"—ইনি পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা বোঙ্গা (ইঁহার এক সাধারণ নাম "মারাঙ-বুরু" অর্থাৎ 'মহাগিরি'—আজকাল কোনও কোনও অঞ্চলে সাঁওতালেরা "মারাঙ-বুরু-কে শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে); "ইকির্-বোঙ্গা"—গভীর জলের মধ্যে ইঁহার বাস; "নাগা-বোঙ্গা"—টিলাভূমি ও পাহাড়ের খদ ইঁহার বিচরণ-স্থান; "দেসৌলি-বোঙ্গা"—ছায়াশীতল তরুবহুল সুন্দর বনভূমি ইঁহার বাস; "চন্দর-ইকির-বোঙ্গা"—ইঁহার নিবাস স্ফটিকোজ্জ্বল জলময় ঝরণার তীরে; এবং "চান্দি-বোঙ্গা"—ইঁহার বেদি হইত কুঞ্জবনে, খোলা মাঠে ও পাহাড়ের মাথায়।

সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপযোগী করিয়া, কোল ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে একটী discipline অর্থাৎ বিশেষ ধরণের মানসিক কসরৎ বা ব্যায়াম, অথবা শ্রমসাপেক্ষ শিক্ষা রূপে ধরা যায়। নূতন মানবিকতার বা মানব-প্রীতির দৃষ্টি লইয়া আমাদের দেশের Aborigines অর্থাৎ আদিবাসী বা ভূমিপুত্রদের জীবনের প্রতি অবলোকন করা আরম্ভ হইয়াছে—নৃতত্ত্ববিদ্যার আলোচনার ইহা এই যুগের একটী লক্ষণীয় সুফল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, Verrier Elwin ভেরিয়ার এল্‌উইন, শ্যামরাও হিবলে, W. G. Archer আর্চর, ইঁহারা এই কাজে পথপ্রদর্শক বা পথিকৃৎ। ভারতের আদিম জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনও অংশ এই অবলোকন এবং আলোচনা হইতে বাদ দিলে চলিবে না। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী—ইহাদের ভাষার মাধ্যমেই প্রধান বা মুখ্য প্রকাশ লাভ করে। কোল-জাতিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় ইহাদের ভাষায়; মানুষের চিন্তার ধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে ইহাতে প্রবাহিত দেখা যায়—কোল-ভাষার গতি-ধারা, আর্য্য বা দ্রাবিড় ভাষার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের একটী আদিম বা প্রাচীন জাতির মনোভাবের পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। কোল-ভাষার কতকগুলি রীতি মৈথিলী, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষাতেও সংক্রামিত হইয়াছে; তাহার বিচার করিতে গেলে, এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, কোল-জগতের খবর লওয়া অপরিহার্য্য॥

সাঁওতালী গান

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সংকলিত

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের পূর্বতন ছাত্র ও অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার তাঁহার অচিরস্থায়ী জীবনে নানা কল্যাণকার্যের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন ; প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ তাহার অন্যতম। ১৯২৬ সালে মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘকাল তিনি সাঁওতালী গানের সংগ্রহে ও অনুবাদকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন ; অকালমৃত্যু তাঁহাকে এগুলি সুগ্রথিত করিয়া প্রকাশের সুযোগ দেয় নাই। সম্প্রতি সন্তোষচন্দ্রের পুত্রগণের নিকট হইতে গানের খাতাগুলি আমরা প্রকাশের জন্য পাইয়াছি ; তাহার একটি অংশ আপাতত মুদ্রিত হইল ; ইহার সম্পাদনকার্যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ ঘাগু মাঝি বি. এ. আমাদের সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।— প্রবাসী পত্রে সাঁওতাল-প্রসঙ্গের 'আলোচনা' উপলক্ষে (শ্রাবণ ১৩৩২) সাঁওতালী গীতিগুচ্ছের ভূমিকায় সন্তোষচন্দ্র যে মন্তব্য করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

আমাদের আশে-পাশে অনেক সাঁওতালের বাস। ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশার এবং ইহাদের ছোটোবড় সুখদুঃখের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আমাদের সর্ব্বদাই ঘটে। সাঁওতাল কুলী এবং প্রজা না থাকিলে এ-অঞ্চলের চাষবাস একদিনও চলিতে পারে না, অথচ জমিদার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মহাজনদের অত্যাচার ইহাদের উপর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাত বৎসরের মধ্যে জমিদার নানা অছিলায় জমা পাঁচ টাকা হইতে চল্লিশ টাকায় লইয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহারা অনুর্ব্বর কঙ্করময় অসমতল উচ্চভূমি বহু পরিশ্রমে ইহাদের দ্বারা উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত করাইয়া লন, এবং তাহার পর নানা জবরদস্তি-জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে সেই জমি ইহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া উচ্চহারে অন্যকে বিলি করেন। তথাপি ইহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সংযম, যে শান্তি, যে সৌন্দর্য্য এবং অনাবিলতা আছে, সভ্যতাভিমানী খুব অল্প মানব-সমাজেই তাহা সুলভ। ইহারা দরিদ্র, কিন্তু বর্ব্বর নহে।

কিছুকাল হইতে সাঁওতালি প্রেমের এবং বিবাহের গান আমি সংগ্রহ করিতেছি। সংগৃহীত চার পাঁচ শত গানের মধ্যে এমন-কিছু পাই নাই যাহাকে অশ্লীল অথবা ইতর বলা চলে। সব ভাষাতেই অল্পাধিক-পরিমাণে অশ্লীল গান প্রচলিত থাকে, সাঁওতালি ভাষাতেও আছে।— এই শ্রেণীর গান "বীরগান" নামে পরিচিত। সাঁওতালি ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল— বৎসরের মধ্যে দুই-একবার যখন ইহারা শিকারে যায়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে পুরুষেরা তখন এইসকল গান গাহিয়া থাকে। এদলে মেয়েরা কখনও থাকে না। অল্পবয়স্ক ছেলেদেরও এখানে প্রবেশ নিষেধ।··· বস্তুতঃ পক্ষে মদ্যপানে বিহ্বল কোনো সাঁওতালও এধরণের কোনো গান গ্রামের কাছাকাছি গাহিলে কঠিন সামাজিক দণ্ড ভোগ করে এবং এ-অপরাধে আটদশ বছরের মধ্যে গ্রামে দুই-এক জনকেও অপরাধী হইতে শোনা যায় না।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

গাডা নাড়ে নাড়েতে, তিরিয়ো বদন রে নাদম্ নরং,
ধীরি-মাগাড় রে, দাঃকদ বদন রে নালম বডে।

ওরে বদন, নদীর ধারে বাঁশি বাজিও না, পাথরের তলায় রয়েছে যে জল তাকে ঘুলিয়ে তোলা কি উচিত, বদন!

২

গাডা নাড়ে নাড়েতে
সুই-উড় সুই-উড় কোড়াম্ গোগলকানা ;
হড়ম রে সাজবাজীঞ চেকায় তামা,
ওড়াঃক্ রে অন্ধন্ বাঁনুঃকতামা।

নদীর পাড়ে পাড়ে সুপুরুষটি ত বেশ শিস দিয়ে দিয়ে ফিরছ! শরীরের সাজ দেখে আর কী করব! ঘরে তোমার না আছে ধন, না আছে অন্ন!

৩

দাঃকমাঞ চোঁদাকেঃৎ সাহান গে বাঙ,
তালেবির তালে সাহান্ দাড়ে গে বাঙ।
দাকা মাঞ দাকা ক্যেবট্ উতু গে বাঙ,
জোলারে জিয়াল হাকু ঝালিগে বাঙ।

ভাতের জল চাপিয়েছি, কাঠ নেই ; তালের বনে অথচ কত কাঠ! ভাতটা ত কোনও রকমে রান্না করলুম, তরকারি ত নেই ; নদীর দ'এ জিয়াল মাছ কত আছে, জাল ত নেই।

৪

সেতাঃক্ রেগে গ দাঃক্লোয়িঞ চালাওলেন্
তাইনম্‌তেঞ ব্যঙ্গ্যেঃট্ লেঃট্
নেরা-ডম্ ডগ্‌দকো টুঙ্গাওকেদা।
ধীরি চাটাইনি রে উমকাতে
নাড়কাকাতে মুমুলিঞ এালেঃট্
কুড়ি বয়েস দ বানুঃক্ তিঁঞী।

ভোরে জল আনতে গিয়েছিলুম, মা— পিছন ফিরে দেখলুম, রেড়িগাছের ডগাগুলো কে ভেঙে দিয়েছে। বড় পাথরের চাতালটার উপর স্নান করে মাথা ঘসে নিজের ছায়ার দিকে চাইলুম। যৌবন ত আর আমার নেই!

কুলহি মুচাঃট্ রে বাবাম্ বাঁধ কেদা
বাবাম্ পুখ্‌রি কেদা

তোয়া বাহা বাবাম রহয় কেদা।
ইঞ্‌মা বাবাঞ্‌ হারায়েন্‌
বাহা মা বাবা মোসঃট্‌ এন
হড়মো লিকির লিকির তো আ বাহাঃ।

(গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে যে পথ) সেই কুলহির মুখেতে, বাবা, তুমি বাঁধ বেঁধেছ, পুকুর খুঁড়েছ। তার পাড়ে টগরফুল লাগিয়েছ। আমি ত, বাবা, তোমার ডাগর হয়েছি, এদিকে দোলায়মান টগরগাছের ফুলগুলি শুকিয়ে গেছে।

গতেঞাঃ সাজদ সোনাগে সাজ—
রূপাগে আব্‌রান্‌
নোঁয়াকো সাজবাজ চেকাতেঞ হিড়িঞা।
নালে বাচারে মারাঙ অকঃচ্‌ জজদারে
জজ দারেরেঞ্‌ রাকাঃপ্‌ কাদা
রাচা জঃক্‌ জঃক্‌ তেঞ হিড়িঞ কেদা।

আমার ভাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তার আভরণ ছিল রুপার, সে-সব সাজগোজ কী করে ভুলব! আমাদের উঠানে ওই প্রকাণ্ড বড় তেঁতুল গাছ। তেঁতুল গাছের উপর তোলা রইল সে-সব! উঠান ঝাঁট দিতে দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে সব।

৭

জজ-দ জইনা ঝামকা ঝাকুর
হুলে-দ জইনা থোপা থোপা ;
হুলে জমদ পেড়া সেন্‌নালেপেঃ,
নাপে-মা ঞেল্‌তে ডাডিমা ঘাট্‌ রে,
পেরেঃচ্‌ কাস্তাপেড়াঞ বাগিয়াদাঃ।

তেঁতুল ফল ঝামকা-ঝুকুর-ঝুকুর ঝুলছে, থোকায় থোকায় আম ফলেছে— আম খেতে আমাদের ওদিকে যেও, বন্ধু! তোমাদের দেখে জল নেবার বালু-খোঁড়া ডোবার ঘাটে ভরা কল্‌সি ফেলে দিয়ে এসেছি, সখা!

৮

গাডা নাড়ে নাড়েতে, বুগিতে তালে রেঠে জান্থম।
দেজঃ তালাংমে রাটাপাটাঃ
রুকুই তালাংমে দালায় দালায়
হহয় তালাংমে দিলায় দিলায়
জজম্‌ সানাঞ-কান্‌ লুচুর লুচুর।

নদীর ধারে ধারে আমাদের অনেক বেঁটে বেঁটে কুলগাছ।—হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তুমি একরকম করে

পথের বাঁশি

শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বিবাহ-উৎসব

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

সাঁওতালী জীবন-চিত্র

গাছে চোড়ো, গাছটাকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দোলা দিও তুমি, 'এসো এসো' বলে ডেকো আমাকে। খেতে ইচ্ছা ক'রে এখনই আমার মুখে জল আসছে!

৯

নত হয়ে বিন্দিম্ তল কেদা,
দারে হয়ে বিন্দিম্ তল কেদা,
নিঞরেন জুরিঃ বিন্দিম্ ত-ল লেখান,
দেনে বানার তীরে রূপা টডর।

মাটিও বাঁধলে মাকড়সা-রানী, গাছও বাঁধলে। আমার জুড়িটিকে আমার সঙ্গে যদি বেঁধে দিতে পার, মাকড়সা, ত তোমার দুই হাতে দুটি রুপোর বালা পরিয়ে দিই!

১০

বানাম্ রেগে রড় মেনাঃক্ লান্দা মেনাঃক্ কাথা
মেনাঃক্ মুনিরে, তিরিয়ো রেগে মুনি মনদো মেনাঃক্
আমাঃক্ মনে মুনি ইঞ্‌রে, ইঞাঃক্ মনে মুনি আমরে
মনে মনে মুনি, তড়ে সুতামতে, তল্ ইনারে।

বেহালাতে ভাষা আছে, হাসি আছে, কথা আছে, মুনি, বাঁশিতে মন আছে— মুনি, তোমার মনে আমি, আমার মনে তুমি, আকাশ-ভাসা (সুরের) সুতোয় বাঁধা পড়ে গেল সব!

১১

আলে দিসোম দ বগেতে মাতকম্ দারি,
তিকিন তারাসিং ঞুর আকানা।
হয়মা হিঁসালিয়ে সিতুং ঢিমালিয়ে
হয়ললঃ দিন দুলাড় আলোম্ হালাং।

আমাদের দেশে ত মহুয়াগাছের অভাব নেই, দুপুরে বিকালে সব সময়েই ত মহুয়া ঝরে পড়ছে। বাতাস হিংসুটে, রোদ্দুরটা অলস— প্রিয়, গরম বাতাসের দিনে আজ মহুয়া না-ই কুড়লে!

১২

হর হেসাঃক্দ হর বাড়ে, নমন-আকান্
হ কাঁড়ের আকান্।
হড়দকো মেনা ফালনা হপন্ নেরা হারাওয়াকান
হয় জারগো ওয়াকান।
হারা ওয়াকান রেহঞ জারগো ওয়াকান রেহঞ
নাপাবারে ধন গেথঞ জজম্ কানা।

রাস্তার বট অশথ যেমন বড় হয়ে উঠছে ডালপালা ছড়িয়ে, লোকে বলে, অমুক লোকের মেয়ে তেমনি বেড়ে উঠছে, লো, আইবুড় থেকে বুড়িয়ে যাচ্ছে। বড় হয়ে উঠেছি ত উঠেছি, আইবুড় আছি ত আছি, আমার বাপ-মায়েরই সম্পত্তি ত খাই (তাদের ত খাচ্ছি নে)।

১৩

অৎরেমা ধিরী দলান
সেরমা য়েমা সনা দালান
হিহিড়ি সনা দলান বার দুয়ার।
চেকাতেঞ্ ঝিজা চেকাতেঞ্ বলা
হিহিড়ি সনা দলান বার দুয়ার।

মাটিতে পাথরের দালান, আকাশে সোনার দালান, হিহিড়ির সোনার দালানে বারোটি দরজা। কী করেই বা খুলব, কী করেই বা ঢুকব, বারোদুয়ারী হিহিড়ির সোনার দালানে!

১৪

কুড়ি কুড়ি লে রিয়াও এনা,
বাইহাড় বাইহাড় তে গেঁঠা হালাঞ।
গাতেকুড়ি দকো মিতাঞ কানা,
নাম দ কারাম ডারেম[১] জারগোয়েনা।

মেয়েতে মেয়েতে আমরা সব এসে জুটেছি, মাঠে মাঠে ঘুঁটে কুড়তে। সখীরা বলছে, হাঁ ভাই কারাম-ডাল[১] তুই যে আইবুড় হয়ে রইলি।

১৫

ইং জুরি কুড়ি হঁ বান্নুঃক্ কোয়া
ইংদ কুঁয়ারিয়া
ইঞ্‌দং অডং চালাঃক্ এট্টাদিসাম!
দারেরে জাপাঃক্ কাতে
চান্দোসেঃ সামাংকাতে।
চান্দো কয়েমে দিনি জুরিঃ।

আমার সমবয়সী মেয়ে ত আর নেই, আজও কুমারী থেকে গেলুম! বেরিয়ে চলে যাবই আমি অন্য কোনও দেশে!

(আহা তা কেন!) গাছে ঠেস্ দিয়ে, চাঁদের দিকে মুখ ক'রে চাঁদকে বল্, ওগো, আমার জুড়িটি জুটিয়ে দাও!

১৬

নায়ঞো হয় গুরেন্ বাবা হঁয় গুরেন্
অকয় মিতাঞা দেমাই দুড়ুঃপ্।

১ কারাম ডারেম। সই পাতানোর মতো 'কারাম ডারেম' পাতানোর রীতি আছে। অগ্রহায়ণ মাসে সর্দারের বাড়ির সামনে কারাম গাছের জোড়া ডাল পুঁতে নাচ হয়। এই দুই ডালে যেমন বিচ্ছেদ নেই, তেমনি দুই সখীতে যেন কখনও বিচ্ছেদ না থাকে, 'কারাম-ডাল' পাতানোর সময় এই কামনা করা হয়।

নালে রাচারে কায়রা দারেঃ
কায়রা গে নিঙ্গাঞ কায়রা গে না-পুঁঞ,
কায়রা গেই মিতাঁ-ঞা দেমাই দুড়ুঃপ্‌।

মাও মরে গেল, বাবাও মরে গেল, কে আর আমাকে বল্‌বে, মা এসে বোস্‌!— আমাদের উঠোনের সেই কলাগাছটি! ঐ কলাগাছই আমাদের মা, ঐ কলাগাছই আমাদের বাবা। ঐ আজ বলছে, মা, আয় বোস্‌!

১৭

নালে ছটকারে জানম দারে,
জানুম দারেরে পুলু-লুমাং।
নায়ো ইঁয় গুরেন বাবা ইঁয় ভিন্দাড়েন
তকয় যতন বেন পুলুই-লুমাং।

আমাদের বাড়ির সামনে কুলগাছ, কুলগাছে পলু পোকা। মাও মারা গেল, বাবাও পড়ল, কে আর তোমাদের যত্ন করবে, পলু পোকা!

১৮

হড়মো হপনবাবু লেংক্‌ লেকা,
ডানডা হপনবাবু চাঁমুক লেকাঃ,
চেকাতে বাং বাবুম্‌ রহড়ঃ কান্‌?
নিঞ্‌তেমা বাং সারে চান্দোগে
বেনাও লিদিং, যিসুমাসি কিন টিলাও কিদিঞ।

গাটি তোমার, ভাইটি, ছিল চক্‌চকে, পিছ্‌লে যাবার মতো, কোমরটি ছিল ছিপ্‌ছিপে চাবুকের মতো! শরীর এখন অমন শুকিয়ে যাচ্চে কেন?

আমার আপনা থেকে তো নয়, বউ (-দিদি), চান্দো (বিধাতা) গড়ে তুলেছিল আমাকে, যিশু মুসাতে জুটে দুরবস্থা ঘটালে!

১৯

আলে বয়হা-দ আঁডিলে সাঙ্গেয়া
ওড়াংক্‌ রেগে তালে তুম্‌-দাঃ টামাক্‌।
জমক্‌লে রুইয়া জমক্‌লে হিলাংক্‌আ,
হবর আকান গিদরাম দহ কেয়া।

আমরা ভাই ক'জন সংখ্যায় অনেক, বাড়িতে আমাদের মাদল আর ঢোলক আছে। জমকালো রকম করে আমরা বাজাই, খুব জমিয়ে হেলে দুলে নাচি। কোলে আছে যে ছেলে তাকেও নামিয়ে লোককে এসে জুটতে হয় সে নাচে!

২০

পুরুব খনূচ দাই পাছিম খনূচ,
হিঁসিদে হিঁসিদেই হয় লেদারে
ছুপি চাতম ওটাং এন
তালে সাকাম কেঞ্চড়্ এন্
হিঁসিদে হিঁসিদেই হয় লেদারে।

দিদি, পুবদিক থেকে পশ্চিমদিক থেকে সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে— তালপাতাগুলো সব ফড়্ ফড়্ করছে ; মাথার মাথালি, ছাতা সব উড়ে যাচ্ছে ; সোঁ সোঁ করছে হাওয়া।

২১

হেন্দে ছাতাঃ চাতম্ দোচঃট্, দাহড়ি
পানে নিমামদয় তকয় কানা ?
দাঃক্‌-হিলি তাঙমে গাওহিলি বেল্‌মে
তায়নম্ তেঞ লী-ইয়ামা
তায়নম্ রেদো হিলিই বোকম কানা।

কালো কাপড়ের ছাতা মাথায়, মোরগের চুড়োর মতো পাগ্‌ড়ি পরা, যে তোকে পান দিচ্ছিল সে কে, রে ?

জল, বউদিদি, তুমি দাও ত, পিঁড়িটা পাত ত, তারপরে বলছি !—

শীগগির, ও যে তোমার ভাই হতে যাচ্ছে, বউদিদি !

২২

নিন্‌গাঞ না পুঞ না তোরে
তুন্দাঃক্ টামাক্ সাডে কানদো বাবা-গ
ওনা আনজোম্ আনজোমতে
ওনা আতেন্ আতেন্‌তে
পোরাইনি সাকাম্ লেকাঞ টলমল্ আ।

মা-বাবার গ্রামে নাগড়া আর মাদলের শব্দ হচ্ছে ! তাই শুনে শুনে, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পদ্মের পাতার মতো টলমল করছে (আমার গা) !

২৩

ইঞ্-গাঁঞ আহ্‌ঞদ চান্দোলেকা
হিলিঞদাদাদ ইপিল্ লেকা
ইঞদঞ জানাম্‌লেন্ সুরগুজাবুটারে
ইঞাঃক্ ঞুতুমদ সুরুজমুনি।

মা বাবা আমার চাঁদের মতো, আমার বউদিদি আর দাদা যেন দুটি তারা, আমি জন্মেছিলুম সুরগুজিয়া ফুলের মধ্যে— আর আমার নামটি হচ্ছে সূর্যমণি !

২৪

গাডা নাড়ে নাড়েতে কাম্বিড় বাহাঃ
দেজঃক্ তেগি সীরি বেন্নাই হাস্থরেন্
সিঃটু গোছাই তেগি গাতে সারাসীতি
গুতুগালাং তেগি গাতে বেন্নায় রাকাঃপ্।

নদীর পাড়ে পাড়ে কাম্বিড় ফুল। গাছে চড়তেই বেলা ডুবে গেল, সই! আঁচলে ফুল ভরতে ভরতেই নিশুতি রাত হয়ে এল! মালা গাঁথতে গাঁথতেই আবার সূর্য উঠল!

২৫

হেন্দা বাবুগুপি কোড়া
চেকাতে বাংএম্ রহড় এনা?
গাই গুপিতে, তিরিয়ো নরংতে,
বানাম তিউইংতেঞ্ রহড়্এনা।

ওগো আমার রাখাল, কি করেই বা এমন শুকিয়ে গেলে তুমি?
এই, গরু চরিয়ে চরিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে, বেহালা বয়ে বয়ে, কাহিল হয়ে যাচ্ছি আর-কি?

২৬

নাই নাই তালারে তালা নাই তালারে কারাম দারে
কারাম বুটারে সিরীম্ গ্যেলে
সিরীম গ্যেলে রে টিরীম চেঁ্যড়ে
টিরীম্ চেঁ্যড়েদয় ম্যেনাঃ
রাজদ রাপাজদ নিঞরেন নেঙ্গানাপা
সাহেব স্থবীদ নাপাবারে।

দামোদর নদীর মাঝখানে, মাঝ দামোদরের মাঝে, চাকলদা গাছ। কারাম গাছের তলায় বেনা গাছের শিষ। তার শিষে শিষে নীল রঙের পাখি। তাদের ভাবখানা হচ্ছে, রাজা-রাজড়ারা ত তাদের বাপ মা, সাহেব-স্থবারা হ'ল তাদের ভাই-বেরাদার।

২৭

হেন্দাবাবু মীন্দীড়িয়া, নাবেনাঃক্ রীস্কীবেন্ তোকাকেদা?
নীলিঞাঃক্ রীস্কীদ নোড়াঃক্রে মেনাঃক্-আ
পিতল তল তিরিয়া পিটারিরে।

ওহে বাপু মাদল-বাজিয়ে, তোমাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সব গেল কোথায়?
আমাদের আনন্দ বাড়িতে রয়ে গেছে, পিতল-বাঁধানো বাঁশিটি পেটারিতে (ফেলে এসেছি)।

২৮

হাটেম চালাঃক্গ বাটেম চালাঃক্
সোনা ছাতার গু কিরিঞ্যাঞ্ মে!

হাটিঃঞে চালাঃক্ বীবু বাটিঞ্‌ চালাঃক্
সোনা ছাতার বীবু বাঞ কিরিঞ্যা—
নেরাঞ্‌ কিরিঞাম্ তীরে যুগেঃ।

হাটে যাচ্ছ, মা, তুমি পথে বেরুচ্ছ, আমার জন্যে একটা সোনার ছাতা কিনে দিও!

পথেই ত, বাছা, আমি বেরুচ্ছি, হাটেই ত চলেছি। সোনার ছাতা ত কিনব না, মেয়ে একটি কিনে আনব, সে হবে তোর চিরযুগের!

২৯

রাসি মা বাসতি টোলা মা প্যে টোলা
বারেয়া গেয়াকিন্ রাসিকা দ
রাসিকা এ্যালতে অলঙ্কার এ্যালতে,
হড়ম রেনাঃক্ গামছা হাঁসরেনা।

ভারি বসতিওয়ালা গ্রাম, তার তিন তিনটে টোলা। বাজিয়ে দু'জনেই রসিক বটে! মাদল-বাজিয়ে (রসিক) দুটিকে দেখে, তাদের অলঙ্কার আর রঙ্গভঙ্গ দেখে, গায়ের গামছা আমার আর গায়ে থাকছে না!

৩০

সেদায় দ আইয়ো আর বাবা দকিন ম্যেনা
দোবাবু কামিমে, রাজান্-ভাজান্ লিঞ্‌ বাহুওয়া মা।
তেহিংদো আইয়ো আর বাবা দকিন
গুনিয়েন ভাবিয়েন্ ধারতি টুন্‌ডাং তেকিন বাহুয়াঞকান্!

জন্মাবধি মা আর বাবা বলে বলে পাঠিয়েছে, যা, বাছা, কাজ কর্, ধুমধাম বাজনা বাজিয়ে পালকি করে বউ এনে দেব! (আর কি না) আজ বাবা আর মা অনেক ভেবে চিন্তে পায়ে হাঁটিয়ে (আমার) বিয়ে দিচ্ছে।

৩১

বেনাও য়াঞমে কামার বেনাওয়াঞমে
তিরেনাঃক্ লীলমুঠি কাজরাটি।
সাজাওয়াঞমে নায়োগ সাজাওয়াঞমে
বাহুতুল দাউড়া সিন্দুর সাড়ি।

গড়ে দিও, কামার, গড়ে দিও হাতের নীলমুটি কাজললতা। সাজিয়ে দিস্, মা, সাজিসে দিস্ বউ-তোলবার চাঙারিতে সিঁদুর আর শাড়ি।

৩২

হলা তিকিন রে মাণ্ডোওয়া, তেহেঞ তিকিন তেগে
সানাম্ মাণ্ডোওয়া সাকাম রহঃড়েনা।

নিঞহচ মারাং হিলিহোলা তিকিন মাজান্ জম্

রহড়েনা সেঞ গসয়েনা।

কাল দুপুরবেলার বিয়ের পাতার মণ্ডপ, আজকের দুপুর হতেই শুকিয়ে গেছে! আমিও, বড় বউদিদি, কাল সেই দুপুরে খেয়েছিলুম, শুকিয়ে গেছি না ঝিমিয়ে আছি (বুঝতে পারছি নে)।

৩৩

ইউমিন মারাং নোড়াঃ করে

অকয় রায়বার লেদা রায় বতরলেন

ডুড়ুঃপ আকানদঞ লুটুগে লুটুগে

তেঙ্গো আকানদঞ লিকিদে লিকিদে

বতঃরঃক্ কামদঞ কেটেল্ কেটেল্।

এত বড় ঘরে কে ঘটকালি করেছিল? ভয় করে নি তার! বসে থাকলে গা ছম্‌ছম্ করে, দাঁড়ালে গাছের মতো গা কাঁপতে থাকে, ভয়ে শরীর শিউরে শিউরে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে!

৩৪

তোকো বুরুরেন চোঁড়ে কানাই

সাঙ্গে সার্জোম সাকাম দারেই এ্যামকান্।

তকয় হাপন কানাই নলঃক্ নলঃ কোড়া,

সাঙ্গে বৈহাকুড়ি বাহুই এ্যামকান্।

কোন পাহাড়ের পাখি এই কানাই যে অনেক-পাতা-ওয়ালা শালগাছ চায়? কাদের ছেলে হচ্ছেন এই কানাইটি যাঁর লেখাপড়া জানা আছে, (আর) যিনি অনেক-বোন-ওয়ালী বউ চান ?—

৩৫

নীলিঞগে বয়হা নীলিঞগে এ্যাতেয়া

নাড়া সাকাম দ বালিং জমা।

গুড়লীঞ দু-লা তোয়াতিলিং লহ দা

দাহে সেদের বেদের বালিঞ জমাঃ।

আমরা দুই বোন, আমরা দুটি জা, শাকপাতা খাই না। গুড় ঢালি, তারপর তাকে দুধ দিয়ে আমরা দুজনে ভিজাই। ঘাঁটাঘাঁটি-করা দই-টই আমরা খাই না!

৩৬

গাতে গাতেলাঙ তাঁহেকানা,

উরুনি বীরলাং বলয়েনা

গাতে গাতেলাঙ বালা-য়া-য়েন।

সখীতে সখীতে আমরা দুটিতে ছিলুম, গহন অন্ধকার বনে ঢুকে কখন হারিয়ে গিয়েছিলুম, আজ আবার সখীতে সখীতে আমরা বেয়ান হয়েছি!

৩৭

সেদায় দ নিঙ্গেন দ কামি রেয়াঙ গে র‍ঁড়েঁইঞা
তিহিঞ দ নিঙ্গীঞ দ বিদায়িঙ্গি রড়িঞ আঞ্জম্।

আগে মা আমাকে কাজের কথাই বলেছে, আজ শুধু বিদায়ের কথাই শুনছি !

৩৮

সড়ক সড়ক তেং চালাঃক্ কানা
তালা সড়ক রেঞ তেঙ্গোয়েনা
নিয়ে করে জীবন মেনামমে থান
পিতল তল তিরিয়ো জীবন নরগুলেতাম্।

পথে পথে চলেছি, মাঝ সড়কে এসে দাঁড়ালুম। এর আশে পাশে কোথাও থাক যদি তবে তোমার পিতল-বাঁধানো বাঁশিটি একবার বাজাও ত, জীবন !

৩৯

সিন চান্দো সেওয়া কাতে
বাহা মান্দার মূলিং রহয়লেদাঃ
কুঁয়ারি ডোরগেঞ্ বাহাঃ লেদাঃ
হায় রে মন্দরমূলিম্ বোঙ্গাহাড়েম্ !

সূর্যদেবের পূজার জন্যে মন্দারমূলী ফুল পুঁতেছিলুম। যতদিন কুমারী ছিলুম মাথায় ফুল গুঁজেছি। চললুম, হায় রে মন্দারমূলী, এখন যক্ষের ধন হয়ে রইলে !

পেনিসিলিন ও পলিপরিন

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জীবাণু-আবিষ্কার

১৮৫৭ সাল বিজ্ঞানেরও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তখন সবেমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। লুই পাস্তুর রসায়নবিদ্যার আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার এক খেয়াল ছিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে চক্ষুর অগোচর পদার্থ নিরীক্ষণ করা। পূর্বে পাস্তুর লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে চিনি যখন গাঁজিয়া উঠে তখন উহা হইতে এমাইল (amyl)-সুরা নামক রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ভূত হয়। কেন এরূপ হয়? চিনি কি আপনা হইতে এইরূপে ভাঙিয়া যায়। তিনি অনুমান করিলেন যে চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবপদার্থ এই পরিবর্তন আনয়ন করে। অণুবীক্ষণ লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে পাস্তুর তাঁহার কল্পিত জীবাণুগুলি নিরীক্ষণ করিলেন। পরীক্ষা চলিতে লাগিল। তিনি উহাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেন, দেখিলেন চিনির ন্যায় মিষ্ট পদার্থে উহারা হুহু করিয়া বাড়িয়া চলে, কিন্তু অম্ল পদার্থে উহারা কাবু হইয়া পড়ে। এই কিন্ব (ferment)—পদার্থকে গাঁজাইয়া তুলিবার এই মূলবস্তু—যেদিন অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিল, বর্তমান চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি সেই দিন স্থাপিত হইল। পাস্তুরের পূর্বেও কেহ কেহ দৃষ্টির অগোচর জীবাণুর অস্তিত্বের কথা অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন উহা কল্পনাতেই পর্যবসিত ছিল। ১৮৫৭ সালে সর্বপ্রথম মানব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাদের দেখা পাইল।

কিন্তু এই অদৃশ্য জীবাণুর উৎপত্তি কোথা হইতে? উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে জড়পদার্থ হইতেই ঐসকল জীবাণুর উৎপত্তি, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তদানীন্তন বিজ্ঞানীরাও এ-কথায় সায় দিয়া আসিতেছিলেন। পাস্তুর এখন জীবাণুদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে পচবার কারণ, গাঁজিয়া উঠিবার কারণ, এই হাওয়ার মধ্যেই আছে; কোটী কোটী জীবাণু বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছে, উপযুক্ত আধারে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাহারা দ্রুত বাড়িয়া চলে। তিনি বলিলেন, জড় হইতে জীবের উৎপত্তি কদাচ হয় না, একমাত্র জীব হইতেই জীব জন্মায়। একটি পচা জিনিসকে বহুক্ষণ উত্তপ্ত করিয়া উহাকে নির্বীজিত (sterilized) করা হইল, উহার অভ্যন্তরস্থ জীবাণু-সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। পাস্তুর দেখাইলেন যে এখন বাহির হইতে জীবাণুর আগমন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিলে উহাতে আর জীবাণু জন্মিবে না। এইবার কথা উঠিল, মানবদেহে যে ক্ষত হয়, জীবন্ত পেশীতে যে পচ্ ধরে, উহার কারণ কি? পাস্তুর তাহারও উত্তর দিলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, ইহাও অদৃশ্য জীবাণুর ক্রিয়া।

এইবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু গবেষক মানবের এই অদৃশ্য শত্রুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিলেন। কি তাহাদের আকৃতি ও গঠন, কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ অনুকূল অবস্থায় তাহারা দ্রুত বাড়িয়া চলে, তাহাদের প্রতিষেধক কি, কি উপায়ে তাহাদিগকে ধ্বংস করা যায়?

একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার অধীনস্থ অনুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, নিজ অপেক্ষা শত্রু-গণকে ভালো করিয়া জানিও, যুদ্ধজয়ের অর্ধেক সেইখানেই। ব্যাধিকে দূর করিবার নিমিত্ত যে চিকিৎসক নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন তাঁহার নিকটও এই উক্তি সমান মূল্যবান। মানবের সকল শত্রুর মধ্যে প্রবলতম হইল তাহার এই অদৃশ্য শত্রু, সে থাকে চক্ষুর অন্তরালে, বহু অনুসন্ধানে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, তাহার রীতি নীতির পরিচয় পাইতে হয়, তাহার ধ্বংসের উপায় নির্ধারণ করিতে হয়। আজ বিজ্ঞানী সফলতার সহিত এই সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন।

জীবাণুর আকৃতি

বিজ্ঞানী বিভিন্ন জীবাণুর সন্ধানে অগ্রসর হইলেন। প্রতি পদেই নব নব বাধা আসিতে লাগিল, তিনি তাহাদের সমাধান করিয়া চলিলেন। জীবাণুরা বর্ণহীন, সেইজন্য অণুবীক্ষণে তাহাদিগকে ধরা সুকঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দেখা গেল, জীবাণুগণের মধ্যে এক এক শ্রেণীর জীবাণু এক এক রকমের রঙ গ্রহণ করে। প্রতি শ্রেণীর জীবাণুকে তাহার গ্রহণীয় রঙে রঞ্জিত করিলে অণুবীক্ষণে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, চেনা যায়। অবশ্য কতক শ্রেণীর জীবাণু কোনো রঙই গ্রহণ করিতে চায় না। তাহাদিগের উপর জবরদস্তি চালাইতে হয়, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিতে হয়, তখন তাহারা বিশিষ্ট রঙ গ্রহণ করে।

প্রথমে আমাদের জানিতে কৌতূহল হয়, এই জীবাণুরা আকারে কতো বড়ো। মাপজোখ হইল। কিন্তু চক্ষুর অগোচর যাহারা তাহাদিগকে ইঞ্চি সেন্টিমিটার দিয়া তো মাপা চলিবে না। এক নূতন মাপকাঠি ব্যবহৃত হইল। এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগকে একক ধরা হইল, তাহার নাম দেওয়া হইল মাইক্রন। দেখা গেল, সাধারণত জীবাণুর ব্যাস এক দুই তিন বা তাহার কিছু অধিক মাইক্রন, কাহারও কাহারও ব্যাস একেরও কম। অন্য দিকে ১০০ বা তাহারও বেশি মাইক্রন ব্যাসের জীবাণু দেখা গিয়াছে।

জীবাণুদের আকৃতিও বিভিন্ন। মোটামুটি তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বেশির ভাগ জীবাণু গোলাকার, একটি ফুটবলের মতো। তাহারা আবার বিভিন্ন ভাবে অবস্থান করে। কেহ একা একা থাকিয়া মানুষের পেশীর সহিত যুদ্ধ করে। ইহাদিগকে শুধু ককাই (cocci) বলা হয়। নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, গনোরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির জীবাণু সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ইহাদিগকে বলা হয় ডিপ্লোককাই (diplococci)। আবার আঙুরের থোলোর মতো দল বাঁধিয়া কতকগুলি থাকে, তাহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে স্ট্যাফিলককাই (staphylococci) এবং মুক্তামালার মুক্তার ন্যায় কাহারও কাহারও অবস্থিতি; ইহাদিগের নাম স্ট্রেপ্টোককাই (streptococci)। এই শ্রেণীর সকল জীবাণুই গোলাকার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবাণুগুলি সরু সরু দণ্ডের মতো। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের জীবাণুগুলি এই শ্রেণীর। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদিগকে ব্যাসিলি (bacilli) বলা হয়। এই শ্রেণীর জীবাণু সাধারণত রঙ লইতে চাহে না।

তৃতীয় শ্রেণীর জীবাণুরা পেঁচাল ধরণের, ইস্‌ক্রুপের প্যাঁচের মতো পাক খাইয়া খাইয়া থাকে।

ইহাদিগকে স্পাইরিলি (spirille) বলা হয়। মোটামুটি এই তিনটি শ্রেণী থাকিলেও দুই শ্রেণীর মিশ্রিত জীবাণুও দেখা যায়। অনেক সময় জীবাণুদিগকে রঙ না করিয়া যে কাচ খণ্ডের উপর রাখিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হয় তাহার তলা হইতে সুতীব্র আলো ফেলিয়া উহাদিগকে বেশ চেনা যায়।

সাধারণত, একটি জীবাণু ভাঙিয়া গিয়া দুইটিতে পরিণত হয়, এবং এইরূপে ভাঙিতে ভাঙিতে সংখ্যা বাড়িয়া চলে। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এই বৃদ্ধি যে কতো দ্রুত ঘটিতে থাকে ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এমনও হয় যে ২৪ ঘণ্টায় একটিমাত্র জীবাণু হইতে এক কোটী ৭০ লক্ষ জীবাণু জন্মগ্রহণ করে। বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিসের মধ্যে এই বৃদ্ধি দ্রুততর হয় এবং কাহার মধ্যেই বা ইহা মন্দীভূত হইয়া আসে, আর কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য কোন্ জীবাণুকে ধ্বংস করে।

মানবের অদৃশ্য শত্রুর তালিকা এখানেই শেষ হইল না। যাহাদের কথা বলা হইল তাহাদিগকে চোখে দেখা যায় না, উহারা অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে। কিন্তু ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণেও দৃশ্যমান নয় এমন জীবাণুর কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধি এই শ্রেণীর জীবাণু দ্বারা ঘটিয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীবাণুকে বলা হয় 'ভাইরস' (virus)।

এখানেও শেষ নয়। ৩/৪ দিনের বাসি রুটি, কাটা আলু, ফল প্রভৃতিতে ছাতা (fungus) পড়িতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর কয়েকটি দল মানবদেহে বিশিষ্ট রকম ব্যাধি ঘটায়। দেহের চামড়ার উপর যে চুলকণা দাদ প্রভৃতি হয় তাহা এই শ্রেণীর জীবাণুর দ্বারাই হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্য কয়েকটি দল আছে যাহারা মানবের শত্রু তো নয়ই, পরম মিত্র। তাহাদের বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

পূর্বকথিত জীবাণু ও ছত্রক ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণীর ক্ষুদ্র জীব আছে। ইহাদের একদল বিশিষ্ট রকমের আমাশয় রোগ উৎপন্ন করে। অন্য একদল ম্যালেরিয়ার কারণ।

ব্যাধির সহিত সংগ্রামের অর্থ হইল এই সব মানবশত্রু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা, তাহাদের বৃদ্ধি বন্ধ করা, তাহাদিগকে ধ্বংস করা।

অদৃশ্য শত্রুর সহিত সংগ্রাম

ব্যাধি ঘটাইতে হইলে জীবাণুকে সর্বপ্রথম মানবদেহে আড্ডা গাড়িতে হইবে। এবং শুধু আস্তানা পাইলেই চলিবে না, পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রও তাহার পক্ষে এমন সুবিধাজনক হওয়া চাই যেন সে তাহাতে হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতে পারে। জীবাণুর শক্তি তো তাহার সংখ্যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মানবদেহ গোড়া হইতে হার স্বীকার করিয়া চুপচাপ থাকে না, সেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যে জীবাণু আসিবে প্রথমত তাহার খুব জোরালো হওয়া চাই, তাহার পর তাহাকে বেশ দল ভারি করিয়া আসিতে হইবে, তবেই তাহার জয়ী হইবার সম্ভাবনা। অন্য দিকে মানবদেহের ত্বক এবং দেহাভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মঝিল্লী (mucus membrane) আত্মরক্ষার প্রথম সারিতে এই অভিযানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। জীবাণু যদি বেশি জোরালো না হয় তবে এই প্রথম বাধাতেই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। জীবাণু কোন্ পথ দিয়া দেহে প্রবেশ করিতেছে সেটাও একটা প্রধান ব্যাপার। ত্বকের উপর না আসিয়া যদি সোজাসুজি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তবে তাহার অনিষ্ট করিবার শক্তি খুব বেশি হইবে। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। ত্বকের সামান্য আঁচড়ের মধ্যে যদি স্ট্রেপ্টোককস্ জীবাণু আসিয়া

পৌঁছায় তবে সেখানে বড়জোর একটা ফোড়া হইবে। পক্ষান্তরে স্ট্রেপ্টোককস্ একেবারে সোজাসুজি যদি রক্তস্রোতের মধ্যে পৌঁছিতে পারে তবে সেপ্টিসিমিয়া নামক মারাত্মক রোগ জন্মায়। প্রসবের পর অনেক রমণীকে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে।

যে জীবাণু মানবদেহে আসিয়া জাঁকিয়া বসে সে বিভিন্ন উপায়ে দেহকে আক্রমণ করে। দেহতন্তু (tissue)-কে, রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে, আবার এমন সব বিষ প্রস্তুত করে যাহা দেহতন্তু ক্ষয় করিতে থাকে।

অন্যদিকে মানবদেহও বেশ সজাগ আছে। বাহির হইতে জীবাণু যেই দেহমধ্যে প্রবেশ করিল অমনি রক্তের লক্ষ লক্ষ শ্বেতকণিকা তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিল—যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একটি আক্রান্ত তন্তু অণুবীক্ষণে লক্ষ্য করিলে এই যুদ্ধের পদ্ধতি ভালো করিয়া অবলোকন করা যায়। শ্বেতকণিকা জীবাণুর নিকট ছুটিয়া আসিল, উহাকে গ্রাস করিল, ধ্বংস করিল। আর একটা মজার ব্যাপার আছে। জীবাণু যে-বিষ তৈয়ারি করিল রক্তমধ্যে তাহার প্রতিষেধক বিষ সৃষ্ট হইতে থাকিল। কথক ঠাকুরের মুখে শোনা গিয়াছিল, রাবণ যেই অগ্নিবাণ ছুঁড়িলেন অমনি রামচন্দ্র বরুণ বাণ ছাড়িয়া অগ্নি নির্বাপিত করিলেন। এখানকার যুদ্ধও সেইরূপ।

এ-যুদ্ধের আর একটা বিশেষত্ব আছে, এখানে সন্ধি বলিয়া কিছুই নাই। একপক্ষের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর যুদ্ধের অবসান, হয় জীবাণু মরিবে না হয় মানুষ মরিবে—এ ভিন্ন শেষ নাই, রফার কথা কিছুই নাই। এ যুদ্ধে বিজ্ঞানই পার্থসারথি হইয়া মানবকে যুদ্ধজয়ের উপায় নির্দেশ করিতেছেন; শত্রুকে নিস্তেজ করিবার, মারিয়া ফেলিবার পন্থা তিনি আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বিজ্ঞানীর আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে তো মানব পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া আসিতেছে। চারিদিকে তো অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করিতেছে। ইহার মধ্যে কিরূপে তাহার পক্ষে প্রাণধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। এখানে একটা বড়ো ব্যাপার আছে। সাধারণত প্রতি মানবের জীবাণু প্রতিরোধ করিবার একটা সহজাত শক্তি থাকে। সুস্থ সবল অবস্থায় সে অধিকাংশ জীবাণুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয়। তবে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, মাদক দ্রব্য সেবনে, রৌদ্রে ঘুরিয়া, জলে ভিজিয়া, অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া যখন তাহার দেহ দুর্বল হইয়া আসে তখন তাহার এই রোধশক্তি হ্রাস পায়; তখন জীবাণুরা তাহার দেহমধ্যে জাঁকিয়া বসে, তাহাদের আক্রমণ চালাইতে সুবিধা পায়। তাহা ছাড়া সকলের মধ্যে সকল জীবাণুর সবল প্রতিরোধ-শক্তি থাকে না।

বিজ্ঞানী বাহির হইতে মানবকে এই রোধশক্তি দিবার বিবিধ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সিরম (serum), ভ্যাক্‌সিন (vaccine) আবিষ্কৃত হইল। রক্তের মধ্যে নির্দিষ্ট রোগের সিরম বা ভ্যাক্‌সিন প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। সিরম বাহির হইতে প্রতিরোধক বস্তু লইয়া আসিল, ভ্যাক্‌সিন রক্তের মধ্যে প্রতিরোধক দ্রব্য প্রস্তুত করিল এবং বাহির হইতে যখন জীবাণুর আক্রমণ আসিল উহারা বাধা দিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সিরমের দ্বারা ডিপ্‌থিরিয়া ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগের আক্রমণ সে ব্যাহত করিল, এবং নির্দিষ্ট ভ্যাক্‌সিন দিয়া বসন্ত কলেরা প্রভৃতির আক্রমণ রোধ করিল। এই ব্যবস্থায় আর এক সুবিধা হইল এই সিরম বা ভ্যাকসিনের জন্য দেহমধ্যে যে প্রতিরোধক বস্তু আসিল উহা দেহমধ্যে বহুদিন সক্রিয় রহিয়া গেল এবং ততদিন ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া গেল।

পেনিসিলিন আবিষ্কার

ঢিল দিয়া ঢিল ভাঙার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধকালে রাজনীতিজ্ঞেরা তো এই নীতিই অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধরা যাক নিউমোনিয়া রোগ। এক রকম বিশিষ্ট জীবাণু হইল এই রোগের উৎপাদক। আচ্ছা, হরেক রকম জীবাণুর মধ্যে অনুসন্ধান করা যাক, কে এই নিউমোনিয়া জীবাণুর শত্রু আছে, যদি থাকে তবে তাহাকেই লাগাইয়া দেওয়া যাইবে নিউমোনিয়া জীবাণুর বধকার্যে। রাজনীতিক্ষেত্রে এই উপায় অবলম্বনে আমরা সফলকাম হইয়াছি, এখানে পারিব না? কাঠে কাঠে লাগিয়া যাক, আমরা মজা দেখি—অবশ্য দূরে দাঁড়াইয়া নয়, কারণ আমাদের দেহই হইল এই যুদ্ধক্ষেত্র।

যে-সকল স্ট্যাফিলোকক্‌স্ মানবদেহে চর্মরোগ ও ফোড়া প্রভৃতি উৎপাদন করে তাহাদের সম্বন্ধে সেণ্ট্‌মেরি হাঁসপাতালে ফ্লেমিং অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একটা ফোড়া হইতে কিছু পুঁজ লইয়া ফ্লেমিং একটা কাচের পাত্রের উপর রাখিয়া দিলেন। জীবাণুদের পুষ্টির জন্য 'আগার' নামক জেলির উপর উহা বিস্তৃত রহিল। জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল। এক এক স্থানে কিরূপে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করে ফ্লেমিং মাঝে মাঝে তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। পাত্রে নানা স্থানে জীবাণুরা দলবদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তিনি দেখিলেন একটা স্থানে একটা সবুজ বর্ণের ছাতা পড়িয়াছে। নিশ্চয়ই ঐ স্থানটা ততো পরিষ্কার ছিল না, সাধারণত এই রূপই মনে হইবার কথা। কিন্তু ফ্লেমিং উহাকে ফেলিয়া না দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিলেন, ভবিষ্যতে লক্ষ্য করিবেন উহাতে আর কি ঘটে। এইখানে রহিল ভবিষ্যৎকালের চিকিৎসা-জগতের এক যুগান্তরকারী আবিষ্কার। কেবলমাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া ফ্লেমিং উহাকে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু এই কৌতূহলই ভবিষ্যতে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিল।

ফ্লেমিং দেখিলেন যে, যে-স্থানে ঐ সবুজ বর্ণের ছাতা পড়িয়াছে তাহার চারিধারের জীবাণুগুলি পাত্রের অন্য স্থানের জীবাণুর মতো সবল ও সতেজ নাই। মনে হইল, যেন ছত্রক ঐ স্থানের জীবাণু ভাঙিতেছে, গলাইতেছে। ফ্লেমিং চিন্তা করিতে লাগিলেন। তবে কি ঐ ছত্রক বা ছত্রক হইতে উৎপন্ন কোনো বস্তু যে জীবাণু উহার সংস্পর্শে আসিতেছে তাহাকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে। তাহা যদি হয় তবে শুধু কি 'আগার'পূর্ণ ঐ পাত্রেই এইরূপ হইবে, মনুষ্যদেহে কি এরূপ ঘটিবে না? ফ্লেমিং-এর নিকট যেন ইহা স্বপ্ন! তিনি এক নূতন আলো পাইলেন। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। স্ট্যাফিলককসের পরিবর্তে এক এক করিয়া অন্য শ্রেণীর জীবাণু আনা হইতে লাগিল, কেহ স্ট্যাফিলককসের মতো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, কাহারো কাহারো বৃদ্ধি মন্দীভূত হইয়া আসিল, আবার অন্য দল পূর্বের মতো সুস্থ ও সবল রহিল, তাহাদের কিছুই হইল না। অতএব, দেখা গেল, এই ছত্রক সকল জীবাণুর শত্রু নয়, শুধু একদল জীবাণুকে উহা ধ্বংস করে। কিন্তু একশ্রেণীর শত্রুকেও যদি ইহা বিনাশ করিতে পারে তবে তো ইহা মানবের এক অচিন্ত্যনীয় পরম মিত্র।

এইবার ছত্রক হইতে বিশুদ্ধ আকারে উহা পাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই কার্যে ফ্লেমিং-এর সহিত বিশিষ্ট রাসায়নিকেরাও যোগদান করিলেন। কিছুদিন পরীক্ষা চলিতে লাগিল কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আকারে উহা পাওয়া গেল না। যে শ্রেণীর ছত্রক লইয়া ফ্লেমিং পরীক্ষা করিতেছিলেন তাহা পেনিসিলিয়ম নোটেটম (Penicillium notatum) জাতীয়। ফ্লেমিং উহা হইতে লব্ধ ঐ পদার্থের নাম দিলেন 'পেনিসিলিন' (penicillin)।

১৯২৮ সালে সেন্ট্‌মেরি হাঁসপাতালে এই যে যুগান্তরকারী আবিষ্ক্রিয়া সংসাধিত হইল ঘটনাচক্রে তাহা আর বেশি দূর অগ্রসর হইল না। ইহা লইয়া লোকের বেশি মাথা না ঘামাইবার কারণ হইল, সেই সময় জার্মানিতে 'প্রন্টোসিল' নামক এক নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই প্রন্টোসিলের কার্যকরী শক্তি দেখিয়া পৃথিবীর চিকিৎসকগণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। এই প্রন্টোসিল একটি অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য এবং পশমী কাপড় রঙ করিবার জন্য যে এনিলিন জাতীয় রঙ ব্যবহার করা হইত তাহা হইতে উহা লব্ধ। দেখা গেল এই ঔষধের ককাই (Cocci)-জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অসামান্য। আরো সুবিধার কথা এই যে, ইহা একটি সাংযৌগিক ঔষধ, কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত করা যায়, তজ্জন্য দামেও খুব সস্তা। জার্মানির এই আবিষ্কারের পর ইংলণ্ডের রসায়নবিদ্‌গণ এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাদের চেষ্টায় 'সলফনামাইড' (Sulphonamide) নামে এই শ্রেণীর বহু রকমের কার্যকারী ঔষধ বাজার ছাইয়া গেল। এই কারণে পেনিসিলিনের কথা লোকে ভুলিয়া গেল, উহা পাওয়া এত শ্রমসাধ্য এবং উহার দাম এত বেশি। একেবারে-ই ভুলিয়া যাইত যদি না নবাবিষ্কৃত ঐ ঔষধগুলির কিছু কিছু অনিষ্টকর ক্রিয়া দেখা দিত। যাহা হোক দশ বৎসর পরে বিজ্ঞানীরা আবার পেনিসিলিন সম্বন্ধে সজাগ হইলেন। এখন ফ্লেমিংএর সহিত অন্য বিজ্ঞানীরাও যুক্ত রহিলেন। এইবার সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আকারে পেনিসিলিন মিলিল। এ অবধি তো একরূপ চলিল, কিন্তু বৃহৎ পরিমাণে কিরূপে ইহা পাওয়া যায়। পেনসিলিন ছত্রক জন্মাইতে হইবে এবং বহু কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় উহা হইতে পেনিসিলিন বাহির করিতে হইবে।

১৯৪০ সালে পেনিসিলিনের ক্রিয়াকলাপ দেখাইবার জন্য ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীরা আমেরিকায় আহূত হইলেন। এইবার আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এ কাজে হাত দিলেন—আর আমেরিকার তো বিরাট অর্থবল, লোকবল। ইহার জন্য বড়ো বড়ো কারখানা স্থাপিত হইল, প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু পেনিসিলিনের দাম খুব বেশিই রহিয়া গেল। হিসাবে দেখা গেল এক পাউণ্ড পেনিসিলিন প্রস্তুত করিতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ পড়ে। তবে সুবিধার কথা এই, একটি রোগ সারাইতে খুব অল্প পরিমাণ পেনিসিলিনে কাজ হয়। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। ৫০০ গ্যালন জলে মাত্র এক ফোঁটা খাঁটি পেনিসিলিন দিলে সেই জলের অল্প একটু পরিমাণ ক্ষতিকর জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করে।

পেনিসিলিনের ক্রিয়া

পাত্রের উপর যখন পেনিসিলিনের জীবাণুরোধকারী ক্ষমতা প্রথম লক্ষিত হয় তখন এই কথাটা উঠে যে মানবদেহে প্রবেশ করিয়া উহা মানবের দেহতন্তুও ধ্বংস করিবে কি না। দেখা গেল করে না। আরও দেখা গেল, পেনিসিলিন একেবারে খাঁটি না হইলেও উহার সহিত যে সব পদার্থ মিশিয়া থাকে তাহারাও দেহের পক্ষে অনিষ্টকর নয়।

দেহমধ্যে পেনিসিলিনের কি হয়, ঐরূপই থাকে না ভাঙিয়া গিয়া অন্য পদার্থে পরিণত হয়? দেখা গেল, ইহা অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া মূত্রের মধ্য দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

আর একটা ব্যাপার লক্ষিত হইল। পেনিসিলিন সোজাসুজি জীবাণুকে মারিয়া ফেলে না, সে কাজ শেষ অবধি রক্তের শ্বেতকণিকার উপর রহিয়া গেল। শ্বেতকণিকারা পারিয়া উঠিতেছিল না,

কারণ জীবাণুরা দ্রুত বাড়িয়া গিয়া দলে খুব ভারি হইতেছিল। এখন পেনিসিলিন ও শ্বেতকণিকা বন্ধুভাবে মিলিত হইল। পেনিসিলিন জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করিল, উহাদিগকে নিস্তেজ করিল, তখন শ্বেতকণিকারা সহজেই উহাদিগকে ধ্বংস করিল।

পেনিসিলিন মুখ দিয়া খাওয়া চলিবে না। পাকস্থলীর অম্লরস উহাকে ধ্বংস করিবে। দেহের উপরকার ক্ষতে সোজাসুজি লাগাইলে উহা আশ্চর্যজনক ফল দেয়। যুদ্ধে আহত বহুসৈন্য এইরূপ পেনিসিলিন প্রয়োগে একেবারে সারিয়া গিয়াছে, পেনিসিলিন আবিষ্কৃত না হইলে তাহারা চিরদিনের মতো পঙ্গু খঞ্জ হইয়া থাকিত। দেহে কোনো স্থানে গ্যাংগ্রিন হইলে ঐ অংশকে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় জানা ছিল না। পেনিসিলিন গ্যাংগ্রিনের প্রসার আশ্চর্যরকম রোধ করিল। আর ইন্‌জেক্‌সন দিয়া মেনিন্‌জাইটিস নিউমোনিয়া গনোরিয়া রোগে তো বিস্ময়কর ফল পাওয়া গেল।

দেখা গেল, অপরিষ্কৃত পেনিসিলিয়ম নোটেটমও ত্বকের উপরকার ক্ষত সারায়। উহার উদ্ভব-কাহিনী আর একবার স্মরণ করা যাক। পাত্রে আগার রাখা হইয়াছিল, উহাতে সবুজ ছাতা ধরিল, উহাই তো পেনিসিলিয়ম নোটেটম। তবে তো ইহার প্রস্তুত প্রণালী খুবই সহজ। প্রতি চিকিৎসকই তো তাঁহার ডাক্তারখানায় অতি সহজে পেনিসিলিয়ম নোটেটম প্রস্তুত করিতে পারেন, আর কিছু না হোক নিজের রুগীদের ব্যবহারের জন্য। নিশ্চয়ই পারেন, এবং অন্য দেশের অনেক চিকিৎসক এইরূপ করিতেছেনও। বেশি কিছু নয়, একটি ফ্লাস্ককে নির্বীজিত (sterilized) করিয়া তাহার ভিতর কিছু আগার বা মাংসের সুপ রাখিয়া দেওয়া হইল। কয়েকদিন পরে দেখা যাইবে খানিকটা স্থান সবুজ হইয়া গিয়াছে। ঐখানেই তো পেনিসিলিয়ম নোটেটম জন্মিল। ঐ রকমই থাকুক। ফোড়া, কাটা দেহ, পোড়া ঘা লইয়া রুগী আসিল। ব্যস্, ফিলটার কাগজ দিয়া ফ্লাস্কের তরল খাদ্য দ্রব্য হইতে সবুজ ছত্রক পৃথক করা হইল। এইবার জলের সহিত মিশাইয়া উহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু খুব সাবধান, এই অপরিষ্কৃত দ্রব্য ইন্‌জেক্‌সনে দেহের রক্তের মধ্যে কদাচ দেওয়া চলিবে না।

পেনিসিলিনের গুণগানে আমরা মুখর হইলাম। কিন্তু এই মানববন্ধুর দোষত্রুটির কথা ভুলিলে আমাদিগকে ঠকিতে হইবে। ইহা মুখ দিয়া খাওয়ান চলে না, পাকস্থলীর পাচকরস ইহাকে নষ্ট করে, ইন্‌জেক্‌সনে দেহের রক্তের মধ্যে ইহাকে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। কিন্তু ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ইন্‌জেক্‌সন এক কষ্টকর ব্যাপার। কাজের দিক দিয়াও অসুবিধা আছে। গরমে ইহা নষ্ট হয়, সুতরাং খুব ঠাণ্ডায়, রেফ্রিজিরেটারের মধ্যে, ইহাকে রাখিতে হয়, অতএব সুদূর পল্লীবাসীর নিকট ইহা অনধিগম্য। অবশ্য সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, (crystalline) আকারে উহা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে এ-সকল অসুবিধা দূর হইতে চলিল। কিন্তু ইহার বড়ো অন্তরায় হইল ইহার মূল্য। তাহা ছাড়া, ইহা কি কি পারে দেখা গেল, কিন্তু কি কি পারে না তাহাও মনে রাখিতে হইবে। টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণুর উপর ইহার কোনো ক্রিয়া নাই।

পলিপরিন

ছত্রক বহু প্রকারের আছে। এক রকম হইল পেনিসিলিয়ম নোটেটম ; ইহা হইতে পেনিসিলিন পাওয়া গেল। অন্য ছত্রক হইতেও পেনিসিলিন্ জাতীয় জীবাণুরোধকারী পদার্থ পাওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে

অনুসন্ধান চলিল। পেনিসিলিয়ম নোটেটমের এক জুড়িদার হইল পেনিসিলিয়ম ক্লাভিফরম (claviforme); উহা হইতে ক্লাভিফরমিন (claviformin) বাহির করা হইল। পেনিসিলিয়ম সাইট্রিনম (citrinum) হইতে সাইট্রিনিন (citrinin) পাওয়া গেল। দেখা গেল, ইহারাও পেনিসিলিনের ন্যায় জীবাণুধ্বংসকারী। কিন্তু সর্বনাশ, মানবদেহে প্রবেশ করিয়া উহারা যে দেহের তন্তুও ধ্বংস করে। উহারা মানবের কাজে আসিল না। ডুবো (Dubos) এবং ওয়াকস্‌ম্যান (Waksman) মাটিতে বর্ধিত ছত্রক হইতে গ্র্যামিসিডিন (gramicidin) এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycine) নামক জীবাণুনাশকারী ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। এই স্ট্রেপ্টোমাইসিন টাইফয়েড যক্ষ্মারোগের প্রকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলাদেশেও একটি সাফল্যের কাহিনী আছে। অধ্যাপক সহায়রাম বসু কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ছত্রক সম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ নানা গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন। বিশেষভাবে পলিস্টিক্টস স্যান্‌গুইনিয়স (Polystictus Sanguineus) নামক ছত্রক তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর ১৯৪৪ সাল হইতে, তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন পেনিসিলিনের গুণযুক্ত পদার্থ ঐ ছত্রক হইতে মিলে কিনা। পচা কাঠ ও বাঁশ হইতে তিনি এই ছত্রক সংগ্রহ করিলেন। ইহার রং টক্‌টকে লাল। অনেক পরীক্ষার পর তিনি উহা হইতে পেনিসিলিনের ন্যায়ই দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার নাম দিলেন পলিপরিন (polyporin)। দেখা গেল পলিপরিনের জীবাণুরোধশক্তি খুবই প্রবল—পেনিসিলিনেরও অনেকগুণ বেশি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আকারে ঐ দ্রব্য পাওয়া সম্ভব হইল না। এদেশে এমন কোনো উচ্চশ্রেণীর রসায়নাগার নাই যেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে উহাকে অবিমিশ্ররূপে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই অবিশুদ্ধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা চলিল। দেখা গেল, ইহার উপর পাকস্থলীর রস, পেপ্‌সিন বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কোনো ক্রিয়া নাই। পেনিসিলিনের উপর ক্রিয়া থাকায় পেনিসিলিন খাওয়া চলে না। সুতরাং পেনিসিলিন ব্যবহারে যে এক মহা অসুবিধা ছিল এখানে তাহা আর রহিল না, ফোঁড়াফুঁড়িটা চলিয়া গেল। তাহার পর, পেনিসিলিনকে সব সময় রেফ্রিজিরেটারের মধ্যে খুব ঠাণ্ডায় রাখিতে হয়, পলিপরিন সম্বন্ধে এসব কিছু করিতে হয় না। দেখা গিয়াছে ১২০.C উষ্ণতায়ও উহার শক্তি অটুট থাকে। এইবার ইহার কার্য! পেনিসিলিন মোটামুটি ভাবে কক্‌স্ জাতীয় জীবাণুর উপর সক্রিয়। কিন্তু পলিপরিনের এই শ্রেণীর কতক জীবাণুর উপর ক্রিয়া তো আছেই, তদ্ব্যতীত স্ট্রেপ্টোককস জাতীয় জীবাণু, টাইফয়েড, কোলাই, কলেরা প্রভৃতি জীবাণুর আক্রমণকে ইহা রোধ করে।

এ সম্বন্ধে এখনও অনেক পরীক্ষা চাই এবং তজ্জন্য প্রচুর পরিমাণে উহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তবেই ইহা চিকিৎসা-জগতে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে। অধ্যাপক বসুর পরীক্ষাগারে প্রত্যহ যেটুকু পরিমাণ পলিপরিন প্রস্তুত হইতেছে তাহা ১০।১২টি রুগীর পক্ষেও যথেষ্ট নয়। এদেশের বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হইয়াও পৃথিবীবাসীর চাহিদা যোগান দিতে পারিবে না। এ ব্যাপারে পেনিসিলিন প্রস্তুতের কথা মনে রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডের সহিত যখন আমেরিকা যোগ দিল এবং যুদ্ধের চাহিদা চলিয়া গেল শুধু তখনই ইহা সাধারণের নিকট পৌঁছিল। পলিপরিন প্রস্তুত ব্যাপারে সেইরূপ কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। বিজ্ঞান কোনোদিন স্থান ও কালের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না।

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে পুরাতন ও নবীন বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যেকার যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গেল। নিছক বয়সের কৌলীন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাবসূত্রে তিনি নবীন ও প্রবীণগণকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রবীণতর আজিও যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের সাহিত্যজীবন শেষ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। চৌধুরী মহাশয়ের কলম শেষ পর্যন্ত সচল ছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বয়ঃকৌলীন্যের কথা তুলিব না। যে-ভাবসূত্রটি বাংলা সাহিত্যের দুই পুরুষের লেখকগণকে সংযুক্ত করিয়াছিল তাহার গ্রন্থি পড়িয়াছিল প্রমথ চৌধুরীর জীবনে।

পুরাতন ও নবীন বাঙালী লেখকদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, নবীনদের কলম ক্রমশ অধিক মাত্রায় বুদ্ধির বাহন হইয়া উঠিতেছে। সকলেই যে প্রখর মননশীল লেখক এমন কথা বলি না, কিন্তু হাওয়াটা বুদ্ধিবৃত্ত। বাংলাসাহিত্যের গাঙে আজ যে-হাওয়া দিয়াছে সেটা বহিতেছে বুদ্ধির তীর হইতে। সেই বাতাসে ছোট বড় মাঝারি কত রকমের কত নৌকাই না নোঙর খুলিয়া পাল তুলিয়া দিয়াছে। কতক নৌকা ধীরে চলিতেছে, কতক জোরে; কতক চলিতেছে লক্ষ্যের বিপরীতে, আবার বানচালের সংখ্যাও অল্প নয়। পুরাতন বঙ্গসাহিত্যের হাওয়াটা ছিল ভাবাবেগের উপকূল হইতে ছুটিয়া-আসা। নবীন হাওয়াকে যদি বলি বুদ্ধিপ্রসূত, প্রবীণ কালের হাওয়াকে বলা যায় বোধপ্রসূত। অবশ্য, এই দুই কালকে আচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্বকালপতি রবীন্দ্রনাথ আছেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথকে প্রসঙ্গক্রমেও আনিয়া ফেলিলে তাঁহাকে লইয়াই আলোচনা করিতে হয়।

প্রবীণ সাহিত্যের আরও একটি সুবিধা ছিল। সেখানে যখন বুদ্ধির হাওয়া বহিত তখন ক্ষেত্র-বিশেষে বহিত, অন্য ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ সে কদাচিৎ করিত। যেমন বলা যাইতে পারে বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে আর প্রবন্ধাবলীতে ও কৃষ্ণচরিত্রে হাওয়া এক নয়। তাঁহার উপন্যাস বোধপ্রসূত, আর শেষোক্ত গ্রন্থগুলি বুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু, সাধারণ লক্ষণ হিসাবে নবীন সাহিত্যকে মোটের উপরে বুদ্ধিপ্রসূত বলা যাইতে পারে। আধুনিক উপন্যাস ও গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক, এমন-কি কবিতা, বিশেষতঃ গদ্যকবিতা, সমস্তই বুদ্ধির ভূমি হইতে উদ্ভূত। বরঞ্চ, যাঁহাদের রচনায় এই রসের কিছু কম্‌তি, বর্তমান সাহিত্যিক সমাজে তাঁহারা অকুলীন। ইহা ভালো কি মন্দ সে আলোচনা নিরর্থক। ইহাই যুগধর্ম, এবং খুব সম্ভব, জগতের যুগধর্ম। এবং যুগধর্মের প্রভাবে এ পরিবর্তন বাংলাসাহিত্যেও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছিল— প্রমথ চৌধুরীর কলম এবং তৎ-সম্পাদিত সবুজপত্রের প্রকাশ তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। সবুজপত্র নবীন ও প্রবীণ বাংলাসাহিত্যের সংযোগসীমা, যেমন বঙ্গদর্শন ছিল আর-এক যুগসন্ধির সময়।

প্রমথ চৌধুরীর প্রধান কীর্তি সবুজপত্র-সম্পাদনা। যুগধর্মের সমস্ত বিক্ষিপ্ত রশ্মিকে আপন প্রতিভার দ্বারা সংহত করিয়া সবুজপত্রের মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যের পুরাতন ইন্ধনে তিনি নূতন

অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। এই কার্যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সহায়রূপে পাইয়াছিলেন। এই নূতন যজ্ঞবেদীতলে নবীন সাহিত্যিকগণ আসিয়া সমবেত হইলেন, এই নূতন বহ্নির শিখাতেই তাঁহারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া লইলেন। এত বড় যুগলক্ষণাক্রান্ত ব্যাপার ঘটানো সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। ইহা যে তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন স্বভাবতঃ বুদ্ধিবৃত্ত লেখক। বাংলার নব্যন্যায়স্রষ্টাদের তিনি আধুনিকতম সাহিত্যিক বংশধর।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গদ্য-পদ্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং কবিতা, সমস্ত রচনাই প্রধানতঃ বুদ্ধিবৃত্তি-সমুদ্ভূত। অন্যান্য বাঙালী গল্পলেখকদের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার বিশিষ্ট প্রভেদ। এই কারণে তাঁহার গল্পগুলি অনেকটা প্রবন্ধাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই তাঁহার গল্পের টেক্‌নিক। তাঁহার কলমে প্রবন্ধের গল্প হইয়া উঠিতে এবং গল্পের প্রবন্ধে পরিণত হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। অনেক সময়ে প্রথম দৃষ্টিতে পাঠক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না, রচনাটি কি— গল্প না প্রবন্ধ। রচনার এই দ্বৈজাত্যরীতিতে, আর pun বা শ্লেষের ব্যবহারে ধর্ম-রসিক চেস্টার্টন তাঁহার গুরু। চেস্টার্টনের গল্প ও প্রবন্ধ এক ছাঁচে ঢালা। ইহাদের দুজনেরই সংবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।

কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বোধকরি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের। বাল্যকালে বহুদিন কৃষ্ণনগরে বাস করিবার ফলে চৌধুরী মহাশয় নিজেকে কৃষ্ণনাগরিক বলিতেন। কৃষ্ণনগরের ভাষা ও ভারতচন্দ্রের কাব্য তাঁহার বুদ্ধিবৃত্ত স্বভাবকে দিগ্‌দর্শন করাইয়াছিল; কারণ, প্রাচীন বাংলা কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র নিজেও বুদ্ধিবৃত্ত লেখক ছিলেন। এ কথা একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, চৌধুরী মহাশয় ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মিলে রায়গুণাকরের গোষ্ঠীর কবি হইতেন আবার ভারতচন্দ্র বর্তমানযুগে জন্মিলে সবুজপত্রের লেখকরূপে সাহিত্যে অমরকীর্তি স্থাপন করিয়া যাইতেন।

ভারতচন্দ্রের পরেই উল্লেখ করা যাইতে পারে ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রভাব। ফরাসী গদ্য-সাহিত্যের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা প্রমথ চৌধুরী অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। ফরাসী গদ্যের সহিত পরিচিত না হইলে তাঁহার গদ্যরচনা এমন মার্জিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ। ফলতঃ দাঁড়াইতেছে এই যে, ভারতচন্দ্রের কাব্য ও ফরাসী-গদ্যের প্রভাবে তাঁহার প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে বিংশ শতাব্দীর লোক হইলেও ভাবজীবনে অষ্টাদশ শতকের অধিবাসী ছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক বলিতে ভাবের একটি বিশিষ্ট রূপ বোঝায়। হৃদয়াবেগনির্মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতকের প্রধান লেখকেরা জীবনকে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন— ভল্‌টেয়ার, সুইফ্‌ট্‌, পোপ প্রভৃতি। আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যদিচ ইউরোপের তৎকালীন ইতিহাসের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তথাপি কি গূঢ় কার্যকারণের ইঙ্গিতে ভারতচন্দ্রও সেই ইউরোপীয় দৃষ্টির অধিকার যেন লাভ করিয়াছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর অভ্যুদয় কি অষ্টাদশ-শতকীয় মনোবৃত্তির জের মাত্র না বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে পৃথিবীর ইতিহাসে আবার বুদ্ধিবৃত্ত শিল্পের যে পুনরভ্যুদয় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বীরবলী সাহিত্য তাহারই একটা পূর্বাভাস মাত্র? ইহার আলোচনার স্থান বর্তমান ক্ষেত্র নয়। আর, সে শক্তিও আমাদের নাই, তবে প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক বলিয়াই উত্থাপন করিলাম।

যোগ্যতর ব্যক্তি প্রশস্ততর পরিধিতে, বিশ্বভারতীপত্রিকার প্রমথ চৌধুরীর স্মরণ-সংখ্যায় তাঁহার

সাহিত্যের আলোচনা করিবেন। আমরা কেবল তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত মাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তাঁহার মৃত্যুতে যে একজন প্রতিভাবান্ সাহিত্যিককে হারাইলাম মাত্র তাহাই নয়। আমরা একজন গুরুস্থানীয় বান্ধবের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম। সে ক্ষতি কেবল আমাদের ব্যক্তিগত খাতায় হিসাবেই থাকিবে। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন, সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর অপেক্ষাও বড় ছিল প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব। নিজের জীবনকালেই তিনি একটি ইন্‌স্টিট্যুশনে পরিণত হইয়াছিলেন — বাঙালী সাহিত্যিক অথচ প্রমথ চৌধুরীকে জানিতেন না, তাঁহার সহিত কথনো আলাপ করেন নাই, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অগৌরবের ছিল। তাঁহার স্নেহসান্নিধ্য লাভের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল— সেই কথা স্মরণ করিয়া এই স্মৃতিনিবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

স্বরলিপি

কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি** : শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী

দেশ। পঞ্চম সওয়ারি

আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি!
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে!
গাহিবারে সুর ভুলে গেছি রে!

II ^ধপা -ধা পমা -গা | -রা -া মা পা | না -া -া -র্সা | র্সা র্সা -া I
মো ০ র০ ০ | ০ ০ দ্বা রে | কা ০ ০ ০ | হা র ০

I র্সর্রা -ণা -া -ধা | ^ধপা -ধা পমা- গা | ^গরা -গা ^রসা রা | -^রণা -ধা র্সণধা II
মু০ ০ ০ ০ | থ ০ হে০ ০ | রে ০ ছি "আ | ০ ০ জি০০"

I { [র্রা র্সা র্রর্সা না]
মা মা পা পা | না না র্সা -া | র্সা -া -মা -পা | নর্সা -র্রা [র্রর্সা] র্রজ্জা } I
জা গি উ ঠে | প্রা ণে গান্ ০ | ক ০ ০ ০ত | ০ ০ যে ০

I না না -া না | -র্সনা র্সা -া -া | না -র্সনা র্সা -া | নর্সা -না র্সর্রা I
গা হি ০ বা | ০ ০ রে ০ ০ | সু ০ ০ র ০ | ভু০ ০ লেগে

I র্সর্রা -র্সণা -ধপা -মা | পা -া -া -া | -া -া মা -পা | পর্সা -ণা -ধা IIII
ছি ০ ০০ ০০ ০ | রে ০ ০ ০ | ০ ০ "আ ০ | জি০" ০ ০

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী

জন্ম : ১৩ জুলাই ১৮৬৯   মৃত্যু : ৭ নবেম্বর ১৯২৯

১। **ধর্ম্মের অভিব্যক্তি এবং ব্রাহ্ম সমাজ।** পৃ. ১৪

২। **দোলা** (কাব্য)। ১৩০৩ সাল (ইং ১২ আগষ্ট ১৮৯৬)। পৃ. ৫১

৩। **মঞ্জুষা** (গল্প)। ২৮ ভাদ্র ১৩১০ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ১৪৭

স্থচী : সোরাব ও রোস্তম, রসভঙ্গ, বুড়ী খ্রীষ্টানের আত্মকথা, জলাঞ্জলি, সহধর্ম্মিণী, লাঠির কথা, পুরাতন ভৃত্য, সেবিকা, পাগল, অনুতাপ, অগ্নিপরীক্ষা, সন্তোষিণীর ডায়েরী।

৪। **মায়ার বন্ধন** (উপন্যাস)। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ (২ জুলাই ১৯০৪)। পৃ ৯৭

৫। **দাসী** (কবিতা)। ১৩১১ সাল (ইং ১৯০৫) পৃ. ৮

৬। **চিত্ররেখা** (ছোট গল্প)। ১২ বৈশাখ ১৩১৭ (১৯ এপ্রিল ১৯১০)। পৃ. ৯৩

স্থচী : স্নেহের জয়, রাজপুতানী, পরিণাম, পিতা ও পুত্র, দুঃখের বোঝা, দাদা।

৭। **বৈতানিক** (কাব্য)। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (২২ মে ১৯১২)। পৃ. ৪৮

৮। **করঙ্ক** (গল্প)। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (২৮ মে ১৯১২)। পৃ. ১০৪

স্থচী : মিতে, কাসিমের মুরগী, ঠাকুর দেখা, পাড়াগেঁয়ে, কুকুরের মূল্য, ঋণশোধ, বিজয়বাবুর বদান্যতা, স্নেহের নির্ঝর।

৯। **প্রসঙ্গ**। ১ আষাঢ় ১৩১৯ (২৯ জুন ১৯১২)। পৃ. ১২১

স্থচী : ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, আনন্দ, ধর্ম্মে বণিক্‌বৃত্তি, ভক্ত ও তাঁহার নেশা, শিশু-জীবন, সমাজের ভিত্তি, সারাপট্টন, কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা, সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, বুনিয়াদি জমিদারদিগের অধঃপতন, সংগ্রহ, স্বাধীনতা, প্রার্থনার সফলতা।

১০। **চিত্রালি** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১৮৭

স্থচী : পোড়ারমুখী, রসভঙ্গ, লাঠির কথা, পুরাতন ভৃত্য, পাগল, অগ্নিপরীক্ষা, মা ও ছেলে, বুড়ী, সহধর্ম্মিণী, সেবিকা, সোরাব ও রোস্তম, জুতার কথা, সন্তোষিণীর ডায়ারি, খ্রীষ্টানের আত্মকথা, অনুতাপ, জলাঞ্জলি।

'সাধনা' সম্পাদন। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে সুধীন্দ্রনাথ 'সাধনা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। প্রথম তিন বৎসরের (অগ্রহায়ণ ১২৯৮—কার্ত্তিক ১৩০১) পত্রিকা তিনি সম্পাদন করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১ বন্ধনীমধ্যে ইংরেজি তারিখগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা হইতে গৃহীত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

ওঁ

গগন

তোমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা থেকে নাম খারিজ করে নিতে চাও নি বলে আশু ভারি দুঃখ করে আমাকে চিঠি লিখেছেন। উক্ত সভা মুনিসিপাল বিল সম্বন্ধে সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে যে রকম দাঁড়িয়েচেন তাতে সে সভা থেকে অনেকে মিলে নাম তুলে নেওয়া উচিত। একমাত্র ম্যুনিসিপালিটিতে আমাদের আত্মকর্তৃত্ব ছিল— সে আমাদের শিক্ষা এবং গৌরবের জায়গা; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা যে কি বুদ্ধিতে দেশের লোকের আত্মসম্মানে এমনতর গুরুতর আঘাত দিতে উদ্যত হতে পারলে বুঝতে পারিনে। এই ঘটনায় দেশের লোকেরও সভাকে শাসন করা উচিত। অবশ্য আত্মীয়তাস্থলে একটু সঙ্কোচ হতে পারে কিন্তু আত্মীয়তার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা যে জড়িত এটা কি ধরে নেওয়া চাই? আদিব্রাহ্মসমাজে যতীন্দ্রমোহন যোগ না দিলে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করব? আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তাও রাখ্‌ব অথচ নিজের মতের স্বাধীনতা এবং কর্তব্য রক্ষা করে চল্‌ব এ দুটোর মধ্যে কোন অবশ্য-বিরোধ নেই।[১]

আজকাল দেখ্‌চি বিরোধের আর শেষ নেই। সঙ্গীতসভাতেও খুব ঝড় চল্‌চে। তোমাদের পরে পরে উত্তেজনার আর শেষ নেই। নানা প্রকার মীটিং, তর্কবিতর্ক, বোঝাপড়া, রাগারাগি লেগেই আছে। প্লেগ ত গেল কিন্তু এগুলিও কম নয়।

ইতিমধ্যে তোমরা আশুর ওখানে গিয়ে তাকে একটু ঠাণ্ডা করে রেখো।

১ যতীন্দ্রমোহন—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। আশু—আশুতোষ চৌধুরী। ম্যুনিসিপাল বিল—ম্যাকেঞ্জি বিল নামে পরিচিত ১৮৯৮ সালের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল; ইহা দ্বারা কলিকাতা পৌরসভায় সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা অপহরণ করা হয়। ইহার বিপক্ষে কলিকাতায় যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তাহাতে যোগদান করেন নাই; আশুতোষ চৌধুরী এই আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; বিলের প্রতিবাদ করিয়া কলিকাতা টাউন হলে যে সভা (৩১ আগষ্ট, ১৮৯৮) হয় তাহাতে "Mr. A. Chaudhuri, Barrister-at-Law, delivered a powerful speech in support of the resolution protesting against the Calcutta Municipal Bill. He bitterly attacked the British Indian Association for not joining the meeting. He asked the meeting "to show by passing the resolution unanimously the estimate in which you hold the British Indian Association" (hisses, a voice: "Down with that body")."

এই বিলের প্রবর্তক বাংলার ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিলাতে কোনো ভোজসভায় কলিকাতা পৌরসভা ও বাঙালি কমিশনারদের সম্বন্ধে যে দুর্বাক্য প্রয়োগ করেন সে সম্বন্ধে ১৩০৫ সালের আশ্বিনের ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গকথা'য় (রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত) আলোচনা করেন।

কার্ত্তিকের ভারতীতে "আলট্রাকন্সার্ভেটিভ" বলে একটা প্রবন্ধে আমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ দলকে বেশ একটু গরম রকমে গাল দিয়েছি— তাদের পক্ষে সুখের বিষয় এই যে, তারা কেউ বাঙ্গলা পড়তে পারে না— ইংরাজিও যে ভাল করে বোঝে তাও বোধ হয় না।[২]

এখানে পর্শু রাত থেকে মেঘ বাদ্‌লা বৃষ্টি চল্‌চে। আশা করি এইবার পরিষ্কার হয়ে গেলে কিছুদিন ছুটি নেবে।

রবিকাকা

গগন

...অবনের লেখা পড়ে খুব খুসি হয়েছি। কেবল একটা ঐতিহাসিক সত্য বলবার আছে আমাদের দেবমূর্ত্তিগুলি আর্য্য কিনা সন্দেহ— বেদে চারমুখ, চার হাতের উল্লেখ দেখা যায় না—বৈদিক দেবতারা বেশ সহজ রকমের। দেবমূর্ত্তির বৈচিত্র্য, মূর্ত্তি গঠন, মন্দির নির্ম্মাণ এ সমস্ত আমরা দ্রাবিড় জাতির কাছ থেকে পেয়েছি। তুমি দেখ্‌বে যে সকল দেবতার মূর্ত্তি কল্পিত হয় তারা প্রায়ই পৌরাণিক দেবতা এবং তাদের মধ্যে বিষ্ণু প্রভৃতি দুই একটি যে প্রাচীন দেবতা আছে তাদের মূর্ত্তিভাবনা বৈদিক নয়— অতএব দেবমূর্ত্তির মধ্যে যে কারুশিল্পের প্রতিভা প্রকাশ পাচ্চে সে ঠিক আমাদের আর্য্য পিতামহদের নয়— এর মধ্যে যে সমস্ত বিকৃতি আছে সেগুলি যথার্থই অনার্য্য। আমরা যদি ঠিক অবিকৃতভাবে আমাদের শিল্পপ্রতিভা বিকাশ করতুম ত আমরাও গ্রীকদের লাইনে যেতুম— কিন্তু মিশ্রিত হয়ে গিয়েই অন্য পথে বিক্ষিপ্ত হয়েছি।

তোমরা ভাল আছ ত? তোমার মেয়ের বিয়ের আয়োজন চল্‌চে? কবে দিন স্থির করলে?

রবিকাকা

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গগন, তোমরা কবে ঘর থেকে একবার বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়বে? তোমাকে তোমার নামের সার্থকতা করা উচিত। কিন্তু তোমাদের তাড়া দেওয়া মিথ্যে। শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে টাইক্বানের[৩] পরামর্শে আরাই[৪] নামক একটি আর্টিষ্টকে তোমাদের ওখানে পাঠাচ্চি। এঁর ইচ্ছা বছর দুয়েক ভারতবর্ষে থেকে ভারতবর্ষীয় আর্ট চিনবেন এবং ভারতবর্ষীয় ছবি আঁকবেন। অন্তত ছমাস যদি ইনি আমাদের বাড়িতে থেকে তোমাদের শেখান তাহলে অনেক উপকার হবে। বাইরে থেকে একটা নতুন আঘাত পেলে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে জেগে ওঠে— এই আর্টিষ্টের সংসর্গে অন্তত তোমাদের সেই উপকার হবে। এঁকে রথীরা রাখতে পারবে কিন্তু মাসে অন্তত একশো টাকা মাইনের ব্যবস্থা করা চাই— এদের ইচ্ছে দেড়শো টাকা— কিন্তু একশো হলেই চল্‌বে। জাপানী তুলি টানার বিদ্যেয় তোমাদের ছেলেদের হাত পাকানো দরকার। লোকটি খুব ভালমানুষ ও সচ্চরিত্র— টাইক্বানের মত অত বড় আর্টিষ্ট নয়, অথচ নিতান্ত খেলোদরের লোকও নয়। শেখাবার কাজে এর কাছ থেকে বিশেষ সুবিধে পাবে। এখানে তোমরা যদি আসতে একটা জিনিস দেখে খুসি হতে এবং কাজে লাগাতে পারতে— এখানকার সমস্ত ব্যবহারের জিনিস

২ প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৩ জাপানের বিখ্যাত শিল্পী।

৪ জাপানী শিল্পী আরাই সান ভারতবর্ষে আসিয়া জোড়াসাঁকোস্থ বিচিত্রা ক্লাবে যোগ দিয়াছিলেন।

ভারি সুন্দর এবং আমাদের দেশের চমৎকার উপযোগী। আমি যদি এখান থেকেই দেশে ফিরতুম তাহলে এখানকার সমস্ত জিনিস ঝেঁটিয়ে নিয়ে যেতুম। জীবনটা সকল রকমে এরা সুন্দর করে তুলেচে—নিতান্ত ছোটখাটো বিষয়েও এদের লেশমাত্র অনাদর নেই— আমাদের সঙ্গে এইখানেই এদের সবচেয়ে তফাৎ। বাড়ির মধ্যে কোথাও এদের কোনো আবর্জ্জনা দেখ্‌তে পাইনে— সে সমস্ত এরা যে কোথায় সরিয়ে ফেলে কে জানে। ছেলেরা সবাই জিনিসপত্রের যত্ন করতে শেখে এবং চালচলনে কোনো অসংযম ঘটতে দেয় না। মেয়েরা যা কিছু কাজ করে এমন সুন্দর শ্রী রক্ষা কোরে করে, এমন পরিপাটি করে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় যে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওকাকুরার[৫] বাগানবাড়িতে দুদিন ছিলুম আজ এখন যাচ্চি টোকিয়ো হয়ে য়োকোহামায়। তারপরে আমেরিকায়। ইতি ৮ই অগষ্ট ১৩২৩।

রবিকাকা

"UTTARAYANA"
Santiniketan
Bengal

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গগন, তোমাদের একটা কুসংস্কার আছে যে রাঁচি প্রভৃতি নামজাদা জায়গায় না গেলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। মিছিমিছি যাতায়াতের দুঃখ ভোগ করতে হয়। যদি শান্তিনিকেতনে আসতে, দেখতে যদি চ এর খ্যাতি নেই, তবু এর গুণ রাঁচির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ সব উপদেশ তোমাদের দেওয়া মিথ্যে।

আমার ছবির নেশা আজও কাটল না। ভয় ধরিয়ে দিয়েচে। ক্রমে ক্রমে ছবিগুলোর চেহারা বদ্‌লে আসচে। তোমরা কাছে থাকলে ভরসা পেতুম, কোন্ রাস্তায় চলচি সেটা তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারতুম। আমার হয়েচে, কম্পাস নেই, জাহাজ চালাতে বসেছি— হাস্যসমুদ্রের তলায় কোন্ দিন সমস্তটা যাবে তলিয়ে। নন্দলাল বলচে কলকাতায় কোনো একসময়ে স্বতন্ত্র এক্‌জিবিশন করাবে। আমার সে সাহস নেই— আমার দেশবাসী যারা, তারা অত্যন্ত দস্তুর মেনে চলে— আমার সমস্তই বেদস্তুর— তারা হয় মুরুব্বির ভাবে বল্‌বে চেষ্টা করলে কিছু হতেও পারবে, নয় বল্‌বে, যাচ্ছেতাই— দুটোই ভালো নয়। রাঁচি থেকে ফেরবার পথে একবার এদিকে উঁকি দিয়ে যেয়ো— বর্দ্ধমান থেকে দুঘণ্টার রাস্তা।

আশীর্ব্বাদ। ইতি শুক্লাদ্বাদশী কার্ত্তিক ১৩৩৫

রবিকাকা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অবন, এখানে এসে অবধি তোমাদের লিখি নি। তার মুখ্য কারণ কুঁড়েমি, গৌণ কারণ ব্যস্ততা। যখন দেশ ছেড়ে বেরিয়েচি তখন তার মায়া কাটিয়ে বেরনই ভাল। ক্ষণে ক্ষণে পিছনের দিকে তাকাতে

৫ "Asia is one" মন্ত্রের প্রচারক জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজো

থাকলে এখানকার সঙ্গে যোগের ব্যাঘাত হয়। বিধাতা আমাকে আমার পুরোনো ভিত থেকে ক্রমে ক্রমে নানা ঝাঁকানির দ্বারা নড়িয়ে দিচ্চেন— এবার তিনি আমাকে আর বদ্ধ হতে দেবেন না। সেই জন্যেই এবার দেশ থেকে চিঠিপত্র পাইও নি সেখানে বড় একটা লিখিও নি। এণ্ড্রুজ দেশে ফিরচে, এর হাতে তোমাদের জন্যে গোটাকতক লাইন তাড়াতাড়ি লিখে দিচ্চি— এর পরে প্রশান্ত সাগর পার হয়ে আর বোধ হয় চিঠিপত্র লেখা হয়ে উঠ্‌বেনা।

জাপানে যতই ঘুরলুম দেখ্‌লুম ক্রমাগতই বারবার এইটে মনে হল যে আমার সঙ্গে তোমাদের আসা খুবই উচিত ছিল। আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্যে এখানকার সজীব আর্টের সংস্রব যে কত দরকার সে তোমরা তোমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখনই বুঝতে পারবেনা। আমাদের দেশে আর্টের হাওয়া বয় নি, সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ির যোগ নেই—ওটা একটা উপ্‌রি জিনিস, হলেও হয় না হলেও হয়; সেইজন্যে ওখানকার মাটি থেকে কখনই তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবেনা। একবার এখানে এলে বুঝতে পারতে এরা সমস্ত জাত এই আর্টের কোলে মানুষ— এদের সমস্ত জীবনটা এই আর্টের মধ্যে দিয়ে কথা কচ্চে। এখানে এলে তোমাদের চোখের উপর থেকে একটা মস্ত পর্দ্দা খুলে যেত; তোমাদের অন্তর্যামিনী কলাসরস্বতী তাঁর যথার্থ নৈবেদ্য পেতে পারতেন। এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে তোমাদের আর্ট ষোলো আনা সত্য হতে পারে নি।[৬] কি করব বল তোমরা ত কিছুতেই বেরবে না, তাই মুকুলকে এখানে রেখে গেলুম— সকলেই আশা দিচ্চে ও মানুষ হয়ে উঠ্‌বে। তোমাদের বিচিত্রা কি ভাবে চল্‌চে কি জানি। কোনো খবর না পাওয়াই ভাল— অনেকদিন পরে যদি দেশে ফিরি তাহলে হঠাৎ দেখ্‌তে পাব, জিনিষটা হয়ে আছে নয় নেই নয় মাঝামাঝি। ইতি ৮ই ভাদ্র ১৩২৩

রবিকাকা

*Glen Eden
Darjeeling

৩

অবন,

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইনফ্লুয়েঞ্জার আবেশ ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়বার চেষ্টায় আছি। তবুও বিছানার ধারে ধারেই আমার দিনযাত্রার খেয়া বেয়ে চলেছি। বৌমা আজকাল ভালোই— রথীর কোনো উপসর্গ নেই। আরো বহুদূরে পালাতে পারলে আমি খুসি হতুম। কিন্তু সেই নিরাপদ দূর পদার্থটি পৃথিবীর ভূগোলখণ্ডে দুর্লভ। বস্তুত এই যে পালাবার ইচ্ছে এটা কেবল নিজের সমস্ত খুচ্‌রো দায়িত্বের নিরন্তর উল্কাবর্ষণ থেকে। যেখানেই যাবো এই ঝাঁক আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। পিছন ফিরে এক দৌড়ে বালককালে পৌঁছতে পারলে তবেই নিষ্কৃতি পেতুম। সেইজন্যেই আজকাল যখন তখন মনের জানলা খুলে সেই কালটির দিকে তাকিয়ে থাকি। তখন কোনো পরীক্ষা পাস করিনি, কোনো প্রাইজ পাইনি, রবি নামটা নিরুপাধিক, তার পশ্চাদ্বর্ত্তী ঠাকুরটা পর্য্যন্ত বর্জ্জিত। যা খুসি তাই করলে কিম্বা কোনো কিছু না করলে তার জবাবদিহী নেই। কর্ত্তব্যবিহীন দেবলোকে দেবতারা যেমন থাকেন সেই রকম। সবাই

৬ এই প্রসঙ্গে 'চিঠিপত্র' চতুর্থ খণ্ডে ১৭ আশ্বিন ১৩২৩ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

জিজ্ঞাসা করে কী করচ, যদি বলি, বেঁচে যে আছি কেবলমাত্র এইটি ভালো করে অনুভব করবার চেষ্টা করচি, তাহলে ও পাড়ার সবাই বলবে লোকটা বড়ো হাল্কা। সর্ব্বদা যথোচিত গাম্ভীর্য্য রাখবার চেষ্টায় ও আয়োজনে বুড়োত্ব মনটাকে কষে চেপে ধরেচে— সেই আরব্য উপন্যাসের ঘাড়ে চড়া দাড়িওয়ালা মানুষটার মতো। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩৮

রবিকাকা

*Glen Eden
Darjeeling

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অবন, শয্যাগত ছিলুম। আজ উঠেছি। ডাক্তারের শাসনাধীনে আছি।

বৃটিশ এসোসিয়েশন বলতে ঠিক কী বোঝায় বুঝলুম না। হয়তো শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে শাসয়িতাদের মেলামেশার একটা সেতু। আজকের দিনে এই সেতুটা নির্ম্মাণ করা সুকঠিন হয়েচে। এত দুঃখ চারদিকে, মনে ধৈর্য্য রাখা শক্ত— কর্ত্তৃপক্ষের তরফে আপোষের বিরুদ্ধে এত দুর্নমনীয় জেদ, পরস্পর মেলবার কথা উত্থাপন করতে গেলেও নিজের কাছে ও সকলের কাছে ধিক্কারভাজন হতে হবে। এ অবস্থায় সেতু বাঁধবার মতো আবহাওয়া এবং অন্তঃকরণ জুটবে না— এবং চেষ্টামাত্র করতে গেলেও নিজেকে একঘরে করা হবে।

কাল এখানে শ্রীমতীর নাচ। আশা করচি কালকের পূর্ব্বে শরীরের অবস্থা এত ভালো হবে যে এই ব্যাপারে আমার যেটুকু কর্ত্তব্য আছে পালন করতে পারব। ইতি ৮ জুন ১৯৩৩

রবিকাকা

ওঁ

* "St. Marks"
Almora, U.P.

অবন

রংমহলে [রংমশালে] তোমার লেখাটা পড়ে ভারি মজা লাগল। এ রকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরবার জো নেই। আমরা চেষ্টা করলে তার মধ্যে ঠাণ্ডা মাথার হাওয়া লেগে সমস্ত জুড়িয়ে দেয়। তুমি তো ছেলেদের জন্যে অনেক গুলো রামায়ণ মহাভারতের পালা বানিয়েছ, দোহাই তোমার ওগুলো ছাপিয়ে দাও না। ছাপাখানাকে তো বাতে ধরে নি। যদি নগদ ব্যয়বাহুল্যের ভয় করো কিশোরীকে[৭] দিলে সে ছাপিয়ে দেবে, তোমার কোনো লোকসান্ হবে না। এখানে ভালোই চলচে— কুসুম কুসুম ঠাণ্ডা বলা যেতে পারে। ইতি ২৭ মে ১৯৩৭

রবিকাকা

৭ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের তৎকালীন সহকারী অধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সাঁতরা।

উদারতার সৃষ্টিশক্তি

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

দেহ ও আত্মা দুই লইয়াই মানুষ। ইহার মধ্যে কোনোটাই বাদ দেওয়া চলে না। দেহের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া মানুষে মানুষে প্রায়ই যে সব বিরোধ ঘটে আত্মার দিক দিয়া সেই সব বিরোধের অবসান হয়। তাই আমাদের রাষ্ট্র ও অন্নবস্ত্রের তাগিদে মানুষে-মানুষে যে বিরোধ জাগে ধর্মেই তাহা শান্ত হইবার কথা। এখানেই ধর্মের একটা বড় সার্থকতা।

পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিরই জন্ম এসিয়াতে। প্যালেস্টাইন হইতেই খ্রীষ্টধর্ম য়ুরোপে ও আমেরিকায় গিয়াছে, এবং আরবদেশ হইতে মুসলমানধর্ম এসিয়ায় ও আফ্রিকায় ছড়াইয়াছে। পারস্যদেশের জরথুস্ত্র-ধর্ম আপন পুরাতন মণ্ডলী ছাড়াইয়া বাহিরে বিস্তৃত হয় নাই। চীন ও ভারত ধর্ম বিষয়ে খুব উদার। চীনদেশে কনফুসীয় ও 'তাও' ধর্ম ছিল। বৌদ্ধধর্ম পরে ভারতবর্ষ হইতে গেল। এই সূত্রে দীর্ঘকাল ভারতের সঙ্গে চীনের গভীর মৈত্রীবন্ধন ছিল। বৌদ্ধসাধকদের যাতায়াত মধ্য-এসিয়ায় স্থলপথেই বেশি চলিত। সেই সব পথের দুই ধারে পূর্বে বৌদ্ধধর্মই ছিল। যখন পারস্য পার হইয়া সেই সব জায়গায় ও তুর্কিস্থানে মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল তখন ভারত ও চীনের মধ্যে বৌদ্ধদের যাতায়াত ব্যাহত হওয়ায় চীনের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সম্বন্ধটা ক্রমে ছিন্ন হইয়া গেল।[১]

ধর্ম সম্বন্ধে ভারতের ইতিহাস একটু বিচিত্র। যাহা বৈদিক ধর্ম তাহাই যে ঠিক হিন্দুধর্ম এ কথা সত্য নহে। এদেশে অবৈদিক বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল। সেই সব লইয়াই হিন্দুধর্ম। বৈদিক ধর্ম কর্মকাণ্ডপ্রধান, দ্রবিড় ধর্ম ভক্তিপ্রধান। এই সব নানা সংস্কৃতির ও ধর্মের পলিমাটির স্তর পড়িয়া ভারতের ধর্মভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই খ্রীষ্ট হইতে যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম, এমন করিয়া কোনো ব্যক্তি-বিশেষ বা দল-বিশেষের নামে ভারতের ধর্মকে চিহ্নিত করা যায় না। ভারতে যত ধর্ম আসিয়াছে সকলেরই সাধনা সমন্বিত হইয়া ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দুধর্ম হইয়াছে। হিন্দু অর্থ যাহা হিন্দের অর্থাৎ ভারতের।

শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি ভাগবত ধর্মে বৈদিক কর্মকাণ্ড বিশেষ কিছুই নাই। ভাগবতধর্মের প্রাণই হইল প্রেম ভক্তি ও পূজা। বাহির হইতে আগত গ্রীক, হূণ, শক প্রভৃতির দল বৈদিক দলে ঢুকিতে না পারিলেও ভক্তিপ্রধান ভাগবত ধর্মে সকলে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন।

জৈন বৌদ্ধাদি ধর্মও বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। নানা ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় আর্যদের মন উপনিষৎ ও নানাবিধ জ্ঞানপন্থার দিকে ধাবিত হয়। তাহাতেই ক্রমে বেদান্তবাদ গড়িয়া ওঠে। বহু সংস্কৃতির যোগে বহুপ্রকারের দর্শন ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের চিন্তার ধারাকে উদার করিয়া দেয়। সবই এখানকার সর্বজনীন হিন্দু নামেই পরিচিত। উদারতাই এই ধর্মের প্রাণ।

উপনিষৎ বলিলেন, যাহা ধর্ম তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই ধর্ম (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ,

---

১ *China* by G. P. Fitzgerald, 1942, p. 359.

১, ৪, ১৪)। সত্যের মধ্যেই অমৃত নিহিত (ঐ, ১, ৬, ৩)। হৃদয়ের দ্বারাই সেই সত্য জানা যায়, কারণ মানবের হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত (ঐ, ৩, ৯, ২৩)। সেই সত্যই ব্রহ্ম (ঐ, ৫, ৪, ১)। দিব্য লোকের পথ সত্যের দ্বারাই বিস্তৃত (মুণ্ডক উ, ৩, ১, ৫)। সেই সত্য সর্ব বন্ধন হইতে মুক্ত, সর্ব মলিনতা হইতে মুক্ত (নৃ, উ, ৩, ৯)।

মহাভারতে তো উদার ধর্মের কথাই আগাগোড়া। তাহার মধ্যে শুধু দুই-একটার কথা এখানে বলা যাইতে পারে।

সত্যের সমান তপস্যা নাই, "নাস্তি সত্যসমং তপঃ" (শান্তি, ৩২৯, ৬)। সহস্র যজ্ঞ হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ, "অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে" (আদি, ৭৪, ১০৩)। শান্তিপর্বে তুলাধারের উপদেশ (২৬১ অধ্যায়) এই সার্বভৌম ধর্মেরই বিষয়ে— "সর্বভূত হিতং মৈত্রম্" (ঐ, ৫)।

কোনো ধর্ম যদি অন্য ধর্মকে বাধা ও পীড়া দেয় তবে তাহা অন্যায় পথ।

ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ ॥ বন, ১৩১, ১১

যে ধর্মে কোনো ধর্মেরই বিরোধ নাই সেই ধর্মই সত্যবিক্রম।

অবিরোধাৎ তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ঐ

ধর্ম লইয়া যদি কেহ কিছু সুবিধা আদায় করিতে চাহে তাহাকে ধর্মবাণিজ্য বলা যায়। তাহা অতি হীন ও জঘন্য।

ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্ ॥ বন, ৩১, ৫

ধর্ম হইল আপনার জীবনটি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই ধর্মকে ধ্বজার মত ব্যবহার করিয়া কোনো বিরোধ ঘোষণা করা বা কোনো সুবিধা আদায় করার চেষ্টা অতিশয় অন্যায়। ধর্মের দ্বারা সুখ সুবিধা আদায়ের চেষ্টাই ধর্মবাণিজ্য।

এক এব চরেদ্ ধর্মং ন ধর্মধ্বজিকো ভবেৎ।

ধর্মবাণিজ্যকা হ্যেতে যে ধর্মমুপভুঞ্জতে ॥ অনুশাসন, ১৬২, ৬২

দস্যুদেরও তখন যে মনুষ্যত্ব দেখা যায় তাহা এখনকার ধর্মধ্বজী ও ধর্মবাণিজ্যকদের মধ্যে দুর্লভ। দস্যু কায়ব্য বলেন, ভীরুকে স্ত্রীজনকে বধ করিবে না। বেচারা শিশু ও তপস্বীকে বধ করিবে না। যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত নহে তাহাকে বধ করিবে না। বলপূর্বক স্ত্রীলোকদের গ্রহণ করিবে না।

মা বধীস্ত্বং স্ত্রিয়ং ভীরুং মা শিশুং মা তপস্বিনম্।

নাযুধ্যমানো হন্তব্যো ন চ গ্রাহ্যা বলাৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ শান্তিপর্ব, ১৩৫, ১৩

এই অধ্যায়টির আগাগোড়াই দস্যুবীরের মানুষোচিত ধর্মের কথা। ব্যাধের ধর্মোপদেশও অপূর্ব বস্তু (বনপর্ব, ২০৬, ১৫)।

মহাভারতের কথা ছাড়াও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী ও উদারতার কথা সকলেই জানেন।

ভাগবতদের ধর্মের বিষয়ে জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি দেখিলেই ভিতরের কথা বুঝা যায়। ভক্তেরা সকলে বিশ্বেরই হিত কামনা করিয়াছেন, আপনার বা দলবিশেষের সুখ সমৃদ্ধি কামনা ভগবদ্ভক্তের ধর্ম নয় (৭, ৯, ৪৪ ; ৯, ২১, ১২)। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন অন্নজল লাভের জন্য দেবপূজা করা বৃথা, প্রকৃতির ধর্মেই তো মেঘ বৃষ্টি হয়, তাহাতে অন্ন হয় (১০, ২৪, ২৩)। ভাগবতেরা বলেন, অন্যকে

অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টাই অধর্ম। তাহা যে না করে ধর্ম তাহারই (৭, ১১, ১০)। কাহারও ক্ষুধার অন্ন যে হরণ করিয়া ধনসঞ্চয় করে সে চোর, সে দণ্ডনীয় (৭, ১৪, ৮)। কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া সত্যে ও ভক্তিতে জীবন ধন্য করিয়া তোলাই ধর্ম। এই ধর্ম পাওয়া যায় আপনারই মধ্যে। বাহিরে শাস্ত্র বা সম্প্রদায়ের কাছে নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আপনিই আপনার গুরু— "আত্মনো গুরু রাত্মৈব" (১১, ৭, ২০)। সেই জ্ঞানের সহায়তার জন্য বিশ্বজগতের সকলকেই গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে (৭, ১১, ৭, ৩২-৩৪)। তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন, গুরুবুদ্ধিতে বিশ্বজগৎকে ও সর্বমানবকে নমস্কার করিবে।

গুরুবুদ্ধ্যা নমেৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

এই সার্বভৌম কল্যাণধর্মে সবারই সমান অধিকার। কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুম্হ, যবন, খস, সবারই ধর্মে সমান অধিকার।

কিরাত হূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কসা

আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ ॥ ২, ৪, ১৮

সর্ব মানুষ সর্ব জীবের সঙ্গে একসঙ্গে ভগবানের শরণ প্রার্থনা করিতে হইবে (৮, ৫, ২১)।

গীতার এই শ্লোকটি তো সবারই মুখে মুখে,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। ৪, ১১

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের শেষকালকার দোহাগুলির মধ্যেও দেখা যায় ধর্ম বাহিরে নয়, ধর্ম মানুষেরই মধ্যে। প্রেমে ও মৈত্রীতেই ধর্ম। ধর্ম সবার আনন্দে ও কল্যাণে। এই বিষয়ে রামমুনি কৃত পাহুড় দোহা ও বৌদ্ধ দোহাগুলি দর্শনীয়। রামমুনির জন্ম জৈনকুলে।

ভারতে এই সব ধর্মতত্ত্ব শুধু কথার কথা ছিল না। ইহা ছিল জীবনের সামগ্রী।

বাহির হইতেও ভারতে পরে যে সব ধর্ম আসিয়াছে তাহারাও এখানে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই ধর্মসাধনা করিয়াছে। ধর্মের সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব ও আত্মসীমাবদ্ধ ভাবটা (exclusiveness) হইল হালের আমদানি। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দিন দিন তাহাকে ক্রমেই উগ্র করিয়া যে তোলা হইতেছে তাহা এই দেশের চিরদিনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

সমুদ্রে নদীর মত আগত সব ধর্মই ভারতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বকেই ভারত বাধা দেয় নাই বা নষ্ট করে নাই। সকলে মিলিয়া পাশাপাশি সাধনা করিয়াছে। Inquisitionএর ইতিহাস আমাদের নয়। তাহা পশ্চিম দেশের। পশ্চিমই আমাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার হইতে শিখাইয়াছে। উৎপীড়িত একদল খ্রীষ্টান প্রথম শতাব্দীতেই দেশ ছাড়িয়া এখানে আসেন ও সাদরে গৃহীত হন। রাজারা তাঁহাদের ভূবৃত্তি দেন। উৎপীড়িত পার্সীরা এখানে আদর ও আশ্রয় লাভ করেন। মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বেই দেখা যায় মুসলমান সাধকের দল ভারতে আসিয়া সমাদর ও আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। জৈনদের পুরাতন প্রবন্ধে পাই অনুপমা দেবী নিজের ব্যয়ে ভারতের নানা স্থানে মুসলমান উপাসকদের জন্য আশিটি মসজিদ তৈয়ারি করাইয়া দেন।

পাঞ্জাবের সাধক হুজবেরী, আজমেরে মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী, পাকপত্তনের ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ সাধনার্থই ভারতবর্ষে আসেন। নিজামুদ্দীন ঔলিয়ার তো এদেশেই জন্ম। তিনি শকরগঞ্জের শিষ্য। সাধক সুরবর্দী সম্প্রদায়ের গুরু বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার জন্ম মূলতানে এবং শিক্ষা বগদাদে। বোখারায়

সাধক জালালুদ্দীন সুর্খপোষ এদেশে আসিয়া এই জাকারিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চিশ্‌তী ও সুরবর্দী সাধক সম্প্রদায় ছাড়া কাদিরী ও নক্‌শ্‌বন্দী মতের বহু সূফীসাধক ভারতকেই তাঁহাদের সাধনা-ভূমি করিয়া লয়েন। এই সব সূফীরা প্রেম-প্রধান ও অতিশয় উদার ছিলেন। কিন্তু সেই দিন আজ গেল কোথায় ?

ইহুদীয়দের ধর্ম হইতেই খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্মের উদয়। এই ধর্মগুলি যেই সব জাতির মধ্যে প্রথমে প্রবর্তিত তাহাদের সেমেটিক বলে। সেমেটিকেরা স্বভাবত আপনাদের মধ্যেই আপনারা বদ্ধ। তবু পুরাতন বাইবেলের মধ্যে ইহুদী-ভক্তদের বাণীতে যথেষ্ট প্রেম ও উদারতা দেখা যায়। খ্রীষ্ট তো প্রেম-ভক্তিরই অবতার। আরবদেশেও বহুকাল ধরিয়া যে মারামারি হানাহানি নীতিহীনতা চলিতেছিল, হজরত মহম্মদ তাঁহার উদার ধর্মোপদেশের দ্বারা তাহা যথাসাধ্য দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই যুগ ও সেই দেশের কথা ভাবিলে তাঁহার উপদেশের মহত্ত্বে ও উদারতায় বিস্মিত হইতে হয়। চারিদিকে মারামারি হানাহানি, তিনি তাহার মধ্যে প্রচার করিলেন যে মৈত্রী ও শান্তি সাধনাই (ইসলামই) যথার্থ ধর্ম। ইসলাম কথার মূল হইল সলম্। তাহার অর্থ শান্তি, মৈত্রী, আত্মসমর্পণ, পাপমুক্তি, নমস্কার ইত্যাদি। কুরান বলেন, "ভগবান বিপদবারণ ও শান্তিস্বরূপ" (৫৯, ২৩)। "মৈত্রী ও শান্তিধামই ইসলামের লক্ষ্য" (ঐ, ১০, ২৫)। "পরস্পরের অভিবাদন সময়ে সকলে এই মৈত্রী ও শান্তিই উচ্চারণ করিবেন" (ঐ, ১০, ১০)। "এই শান্তিমন্ত্র ছাড়া পরস্পরে যেন আর কিছু না কানে শোনেন, কেননা বৃথা বাক্য ও দুষ্ট তর্কজাল যেন মানুষের কর্ণকে দূষিত না করেন" (ঐ, ৫৬, ২৬)। "স্বর্গেও এই পরমাশান্তির ধ্বনিই শোনা যায়" (ঐ, ১০, ১০)। কুরাণ আরও বলেন, "হজরতের পূর্বে যে সব মহাপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সেই সব সত্যও বিশ্বাস করিতে হইবে" (২, ৪)।

"পূর্ববর্তী সব সত্যকে আরও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করাই হইল কুরাণের কাজ" (ঐ, ৩, ৩)। কাজেই কুরান সব যুগের সব ভক্তদের প্রতিই শ্রদ্ধাবান হইতে উপদেশ দেন। কুরাণ আরও বলেন, "এমন দেশ বা জাতি নাই যাহাতে ভগবান তাহাদের জন্য কোনো ধর্মগুরুকে পাঠান নাই" (৩৫, ২৪)।* "পূর্ববর্তী সকল ধর্মপ্রবর্তকদের নামও হয়তো এখন সকলে জানে না" (ঐ, ৪০, ৭৮)। "ভগবান যখন যেখানে যে কোনো ভক্তের কাছে যে সত্য ঘোষণা করিয়াছেন," হজরত মহম্মদ বলেন, "সেই সবই ইসলামপন্থীর পক্ষে মান্য। তাহার মধ্যে কোনোটাকে মান্য করিয়া কোনোটাকে অমান্য করা অনুচিত" (ঐ, ২, ২৮৫)। "ভগবান যে প্রকৃতি ও মানব-স্বভাব রচনা করিয়াছেন তাহাই সত্য ধর্ম" (ঐ, ৩০, ২৯)। কাজেই ভগবদ্‌বিশ্বাসী মাত্রেই ভাই-ভাই। সকল নরনারী সর্ব জাতি তাঁরই সৃষ্টি। যিনি "তাঁহাদের মধ্যে বেশি ধার্মিক ও সত্যব্রত তিনিই অধিক ধন্য" (ঐ, ৪৯, ১৩)। হজরত মহম্মদ বলেন, যত দিন আমরা আমাদের সব মানবভ্রাতাকে না ভালবাসিতে পারি, ততদিন আমাদের ভগবদ্‌ভক্তি মিথ্যা।

কাজেই কুরাণ বলেন, "কেহ যদি তোমার প্রতি অকল্যাণ ও অসাধু আচরণ করে, তবে তাহাকে কল্যাণ ও সাধু আচরণই ফিরাইয়া দিবে। ইহাতে যে আজ শত্রু সে কাল বন্ধু হইয়া যাইবে" (ঐ, ৪১, ৩৪)। "আত্মীয়-স্বজন, অনাথ, দীনদরিদ্র প্রতিবেশীর কল্যাণ করিতে হইবে" (ঐ, ৪, ৩৬)। হজরত

* এই মহাবাণীকে আশ্রয় করিয়াই নিজামুদ্দীন ঔলিয়ার দর্গার হাফিজ হসন নিজামী এক পুস্তক লেখেন—"হিন্দুস্থান কে দো পয়গম্বর রাম ঔর কৃষ্ণ। সলাম্ অল্লাহী অলয়হিম।"

বলেন, "যে ছোটকে স্নেহ ও বড়কে শ্রদ্ধা না করে সে আমাদের কেহ নহে" (মিশকাত-অল-মসাবী, বাব অশাফকাত, পৃঃ ৪২৩)। যে ইসলামের নাম করিয়া অন্যায় ও অত্যাচার করে সে ইসলামের কেহ নয়, সে ইসলামের শত্রু। তাহার ব্যবহারের দ্বারা সে হজরতকে অসম্মানিত করে। লোকে মনে করিতে পারে এই রকমই বুঝি হজরতের উপদেশ।

অনেক সময় মহাপুরুষদের আপন আদর্শ যেরূপ উদার থাকে তাঁহাদের পরবর্তীরা সেরূপ উদার থাকিতে পারেন না। সাধারণত ধর্মসাধনার তিন ধারা। আচার, জ্ঞান ও প্রেমভক্তি। আচারবাদীরা প্রায়ই আচার-বিচারের খুঁটিনাটিগুলি কঠিনভাবে ধরিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে উদার হওয়া কঠিন। জ্ঞানপন্থীরা বিচারের ফলে অনেকটা মুক্ত থাকেন। প্রেমভক্তির পক্ষে মুক্ত থাকা তো খুবই স্বাভাবিক। হজরতের বাণী ছিল জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বিশ্বজগৎকে আত্মীয় মনে করিতে হইবে। ছেলেমেয়ে বিচার না করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জন করিতে হইবে। সেই বিদ্যা ও জ্ঞান যদি চীনদেশেও থাকে তবে তাহাও সংগ্রহ করিয়া আন— উৎলে বুলে ইলম্ বল উকাল বিস্‌সীন্। তবু শাস্ত্রপন্থীর দলও দিনে দিনে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। তাই আরবদেশে একটি প্রবাদ আছে, গ্রন্থজীবী হইতেও মূর্খ— অহমক মিন মুয়ল্লিম অল কুত্তাব। তথাপি জ্ঞানালোচনা ইসলামকে প্রভূত উদারতা দিয়াছিল।

নানা জনে কুরাণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতাদের ইমাম বলে। এই ব্যাখ্যানে হজরত প্রত্যেককেই প্রভূত স্বাধীনতা দিয়াছেন। তাঁহার নিজেরই কথা আছে যে তাঁহার ধর্মে নানা যুক্তি অনুসারে ৭৩টি দল হইবে। তিনি বলিয়াছেন, আমার দলে যে মতের ভেদ হয় তাহা ভগবানেরই দয়া— ইখতিলাফু উম্মতি রহমতুন।

হজরতের পর ইমাম আবু হানিফা (জন্ম ৭০২ খ্রীঃ), ইমাম মালিক (জন্ম ৭১৪), ইমাম শাফি-ঈ (জন্ম ৭৬৭), ইমাম অহমক অর্থাৎ ইব্‌ন হম্বল (জন্ম ৭৮০ খ্রীঃ) পর পর জন্মগ্রহণ করিয়া চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। ইহা ছাড়াও ধর্মব্যাখ্যাতা আরও অনেকে আছেন।

প্রাচীনকালে মুসলমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা এত বেশি যে তাঁহাদের নাম করা অসম্ভব। প্রথমেই মনে আসে বূ অলী-সিনা বা Avicenna (জন্ম ৯৮০।৯৮১ খ্রীঃ)। ভারতীয় গণিতে ও গ্রীকদর্শনে তাঁহার অদ্ভুত অধিকার ছিল। ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনদেশে করদোভায় ইব্‌ন্ রুশ্‌দের (Averros) জন্ম। তাঁহার রচিত গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটলের টীকা বিখ্যাত গ্রন্থ। ১১১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি স্পেনের গ্রানাডার উত্তর পশ্চিমে সম্ভ্রান্ত আরব বংশে ইব্‌ন্ তুফেলের জন্ম। জ্ঞানপন্থী অল গজ্জালী (১০৫৮-১১১১ খ্রীঃ) প্রথমে সংশয়বাদী ছিলেন। পরে সূফী হন। মধ্যযুগের টমাস একাইনস প্রভৃতি লেখক ইঁহার চিন্তাধারার কাছে ঋণী। জ্ঞানপন্থী জাহিজ, ইব্‌ন্ খল্লিকান, ইব্‌ন্ তৈমিয়া, ইব্‌ন্ খলদূনের নাম মাত্র করা গেল। পবিত্রতা ও উদারতার প্রচারকল্পে দশম শতাব্দীতে ইখ্‌ৱান্-উস্-সফা বা পবিত্রতার ভ্রাতৃমণ্ডলী নামে সম্প্রদায়ের নামও এইখানে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অবু অল আলা মু অর্‌রীর নাম না করিলে অন্যায় হয়। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোরক্কো দেশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার স্বাধীন চিন্তার সীমা ছিল না। তিনি শাস্ত্রপন্থীদের কঠিন সমালোচনা করিতেন। বলিতেন, "পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছ বলিয়া তো গর্ব কর! ভাবিয়া দেখিয়াছ কি তুমি নিজে কতবড় পৌত্তলিক? বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ গ্রন্থ, বিশেষ ভাষা, বিশেষ দেশ, বিশেষ দিন ও বিশেষ দিককেই যদি

একমাত্র পবিত্র মান তবে তাহাও তো পৌত্তলিকতা। দেবপূজা ছাড়িয়া দেবালয় অর্থাৎ মসজিদের পূজা যদি কর তবেই বা কম পৌত্তলিকতা কি ?" তাঁহার মত এত বড় পণ্ডিত তখন আর কেহ ছিলেন না। তাই তাঁহার কাছে বহু ধনরত্ন উপহার আসিত। তিনি সব বিলাইয়া দিয়া দীনভাবে গুহাতে বাস করিতেন। অহিংসা তাঁহার ধর্ম ছিল। সম্প্রদায়বদ্ধ ধর্মকে তিনি ভণ্ডামী ও মিথ্যাচার বলিতেন ও পুণ্যার্থীদের দারুণ বৈষয়িক মনে করিতেন।

জিন্দিক নামে এক দল ছিলেন। তাঁহারা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী। তাঁহারা ভিক্ষুপরিব্রাজক হইয়া জীবে মৈত্রী করেন। সত্যতা, শুদ্ধতা, সাধুতা ও অকিঞ্চনতা এই চারি শীল তাঁহাদের পালনীয়। সম্প্রদায়ীরা জিন্দিকদের নাস্তিকের মধ্যে ধরিয়াছেন।

প্রেমভক্তিপন্থী স্থফী সাধক এত হইয়া গিয়াছেন যে, এখানে তাঁহাদের নাম করা সম্ভব নহে। ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের দক্ষিণ ভাগে অরাবীর জন্ম। তাঁহার "তরজুমান অল অশ্বাক"কে অনেকে অসংযত প্রেমের কবিতা বলেন। তিনি ছিলেন নবপ্লাটনিক মতে অনুপ্রাণিত বিশ্বব্রহ্মবাদী। মৌলানা রুমীর (১২০৭-৭৩) নাম তো জগদ্বিখ্যাত। তাঁহার লেখা দেখিলে মনে হয় আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের কোনো পুস্তক পড়িতেছি। তাঁহার কবিতায় (দফ্‌তার আউয়ল, ১ম কবিতা) আছে। "ছিলাম পাষাণ, মরিয়া হইলাম বৃক্ষ ; বৃক্ষজীবন ছাড়িয়া হইলাম পশু ; পশু হইতে হইলাম মানুষ ; মানব হইতে হইব দিব্যধামবাসী। তাহার পর কি হইব তাহা চিন্তারও অতীত। চরমে বিলীন হইব শূন্যে, শূন্যে হইব শূন্যময়।"

রুমীর পরেই হাফেজের নাম (জন্ম ১৩২০ খ্রীঃ)। তিনি বিশ্বের কবি। তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার নামই যথেষ্ট। ওমর খয়্যাম প্রভৃতি আরও কত যে স্থফী কবি আছেন তাঁহাদের নাম আর কত করিতে পারি ?

সঙ্গীত ও চিত্রাদি কলাতেও মুসলমানদের দান অপরিমেয়। কলাবিতেরা আপন-পর মানেন না। কাজেই সেকালে কলারসিকেরা ছিলেন স্বভাবত উদার। হজরতের যে একটি চিত্র প্রকাশ করার অপরাধে কলিকাতার ভোলানাথ সেন সেদিন প্রাণ দিলেন, সেই চিত্রটি সেকালের একটি মুসলমান শিল্পীর অঙ্কিত এবং তাহা ছিল বিলাতের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত। তাহা প্রকাশ করাতেই একজনের প্রাণ গেল। ধর্মকে ব্যবহার করিয়া কাজ করাইতে গেলে এইসব কুৎসিত ব্যাপার ঘটিবেই। হউক নিষিদ্ধ, বহু পূর্বকালেও যে হজরতের চিত্র আঁকা হইত তাহার খবর পাই আমরা চীনদেশ হইতে। কাজেই কলাতে এই অনুদারতা দিনে দিনে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

ভারত ও চীন চিরদিনই খুব উদার। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচারই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভারতে সব ধর্ম হইতে মিলিত হইয়া যে একটি সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে খ্রীষ্ট বুদ্ধ প্রভৃতি কোনো একজন প্রবর্তকের নামে খ্রীষ্টীয় বা বৌদ্ধ বলা চলে না বলিয়াই তাহা ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু। হিন্দু অর্থই ভারতীয়। কবীর প্রভৃতি তাই তাঁহাদের উদার পন্থকে ভারতপন্থ নাম দিয়াছেন। হিন্দু সংস্কৃতিতে ভারতে আগত সব রকমের সাধকেরই সাধনা আছে। চীনের কথা বলিতে ছিলাম। চীনের সম্রাট ইত্‌সুংগের (I Tsung, ৮৭২ খ্রীঃ) সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া বসরার আরব ভ্রমণকারী ইব্‌ন্ ওয়াহাব যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ ইরাকে আসিয়া আবুজৈদকে বলিয়াছিলেন।

ইব্‌ন্ ওয়াহাব বলিতেছেন, সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

'যদি তোমার হজরতকে দেখ তবে কি তাঁকে চিনিতে পার ?' আমি বলিলাম, 'তিনি এখন স্বর্গে ভগবানের কাছে। কেমন করিয়া তাঁহার দেখা পাইব ?' সম্রাট বলিলেন, 'না, আমি তাঁহার চিত্রের কথা বলিতেছি।' আমি বলিলাম, 'আচ্ছা দেখাই যাউক। হয়তো পারিব।' সম্রাট চিত্র আনাইয়া দোভাষীকে দিয়া বলিলেন, 'এই ব্যক্তিকে তাঁহার ধর্মগুরুর চিত্রখানি দেখাও দেখি।'

ধর্মগুরুদের অনেকের চিত্র দেখিলাম ও তাঁহাদের চিনিতেও পারিলাম। তাঁহাদের দেখিয়া ধীরে ধীরে 'দুয়া' (কল্যাণ-প্রশস্তি মন্ত্র) উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সম্রাট বলিলেন, 'কি মন্ত্র পড়িতেছ ?' আমি বলিলাম, 'এইসব মহাপুরুষদের জন্য "দুয়া"র মন্ত্র পড়িতেছি।'

সম্রাট আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ধর্মগুরুদের (prophet) চিনিলে কি করিয়া ?' আমি বলিলাম, 'তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া। নোয়াকে চিনিতেছি তাঁহার নৌকা দেখিয়া। এই নৌকাই তাঁহাকে ভগবানের বিধানে বন্যার সময়ে সপরিজনে রক্ষা করিয়াছিল।' সম্রাট হাসিয়া বলিলেন, 'ঠিক, নোয়াকে চিনিয়াছ বটে। বন্যার কথা যদিও আমরা মানি না, কারণ বন্যা ভারতে বা চীনে পৌঁছে নাই তো।' আমি বলিলাম, 'মুসাকে চিনিতেছি তাঁহার দণ্ডের দ্বারা।' সম্রাট বলিলেন, 'ঠিক। কিন্তু মুসার অনুচরদের সংখ্যা বেশি নহে।' আমি বলিলাম, 'গাধার উপর বসিয়া আছেন খ্রীষ্ট, চারিদিকে তাঁহার সব শিষ্য।' সম্রাট বলিলেন, 'ঠিক। বড় অল্পদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন। মাস ত্রিশেক মাত্র তিনি প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন।' তাহার পর আমি দেখিলাম হজরত মহম্মদ উটের উপরে আসীন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দও উটের পিঠে বসিয়া তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া আছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ের আবেগে আমার কান্না পাইল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাঁদিতেছ কেন ?' আমি কহিলাম, 'হজরত যে আমার ধর্মগুরু, এবং আমার পূর্বপুরুষ' (ইব্‌ন্ ওয়াহাবও আরবের কোরেশ জাতীয় ছিলেন)। সম্রাট বলিলেন, 'ঠিক। ইনি হজরতই বটেন। ইনি ও ইঁহার পরবর্তী পুরুষেরা এক গৌরবময় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। হজরত তাহার সমাপ্তি দেখেন নাই। তাঁহার অনুবর্তীরাই তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন।' প্রত্যেক চিত্রের উপরই চীনা ভাষায় কিছু লিখিত ছিল। খুব সম্ভব তাহা চিত্রগুলির বিবরণ। আরও অনেক চিত্র দেখিলাম, কিন্তু আমি সেই সব চিত্রের লোকদের চিনি নাই। দোভাষী বলিলেন, 'সেই সব চিত্র ভারত ও চীনের ধর্মগুরুদের (prophet)।'

এই বিবরণ ৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের। সেই সময়েও চীনা সম্রাটেরা পৃথিবীর কত ধর্মের খবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখিতেন ও কতদূর উদার দৃষ্টিতে সব বুঝিতে পারিতেন তাহা এই বিবরণ হইতেই বুঝা যায়। আরবের কোরেশ জাতীয় এবং বসরাবাসী আবু ওয়াহাব এই বিবরণ ইরাকের আবু জৈদকে দিতেছেন।* সুতরাং বুঝা যায় তখন মুসলমানদের মন চিত্র ও কলা সম্বন্ধে এখনকার দিন হইতে কতদূর উদার ছিল।

ধর্মের বিষয়ে চীনের এতদূর উদারতা ছিল যে পিকিনের জুম্মা মসজিদের মধ্যে সম্রাট চিয়েনলুঙ্গের প্রদত্ত একটি শিলাশাসন আছে। তাহাতে তুর্কী মাঞ্চু ও চীনা ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি। এই ঘটনা প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বেকার।

* *China* by G. P. Fitzgerald, pp. 335-336.

ভারতবর্ষে আসিয়াও বহুকাল পর্যন্ত মুসলমান সাধকদের অনেকে হিন্দু-সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহাদের প্রচার চালাইয়াছেন। বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে ইশ্‌মাইলী গুরুরা ধর্মপ্রচার করিলেন। তখন তাঁহারা পুরা হিন্দু থাকিয়াও মুসলমান সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইলেন। তাঁহাদের ঘরে হিন্দু আচার, রামনবমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পালিত হয়। ইঁহারাই খোজা নামে খ্যাত। এখন আগাখাঁ ইঁহাদের গুরু। ইঁহাদের নামও এত দিন মাধবজী-প্রেমজী-ফুলজী প্রভৃতি ছিল: এখন তাঁহারা অনেকে মুসলমানী নাম নিতেছেন। তবু এখনও বাপের নাম তাঁহাদের অনেকেরই হিন্দু দেখা যায়। তাই এখন খোজাদের এমন নাম দেখা যায় যথা ইব্রাহিম কান্‌জী। অর্থাৎ ছেলে ইব্রাহিম, বাপের নাম কান্‌ অর্থাৎ কৃষ্ণজী। বোম্বাইর বহু মান্য লোকের নাম মুসলমান তাঁহাদের পিতার নাম হিন্দু। এই রকম ইশ্‌মাইলীসাধনাসংসৃষ্ট হিন্দুবংশীয়ের সন্তানই মিঃ জিন্না। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে সর্ববিধ গোঁড়ামিবর্জিত এবং খুবই উদার। নহিলে তিনি আপন কন্যা পারসী জামাতার কাছে বিবাহ দিবেন কেন? তাঁহাব স্ত্রীও পাবসীরই কন্যা। তবে এমন উদার লোকের মুখে এমন সব অনুদার গোঁড়া ধর্মমতের দারুণ ঘোষণা কেন? এইরূপ গোঁড়ামি তো হজরতের উদার ও শান্তিময় ধর্মেরও বিরোধী।

গুজরাত প্রদেশের খোজা, কাকাপন্থী, ইমামশাহী, মৌল ইসলাম, মতিয়া, সংঘর, প্রভৃতিরা এইরূপ যুক্ত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। রাজপুতানার মেও (Meo) এবং মিরাশিরাও এইরূপ। তাঁহারা দেবী-মন্দিরের গায়ক, বহু গোত্রে বিভক্ত, অথচ মুসলমান বলিয়া তাঁহাদিগকে সেনসাসে লেখাইতে হইতেছে। লবানা ও সখীসরবরের উপাসকেরাও এইরূপ। সামসী সম্প্রদায়ের লোকেরা গীতাও মানেন, মুসলমান গুরুদেরও ভক্তি করেন। রসুলসাহীরা তান্ত্রিক যোগসাধন করেন। গঞ্জামের আরুবারা, দক্ষিণের দুদেকুলেরা ও মায়াকায়্যারা, তৈলঙ্গের কাটিকেবা ঠিক একই শ্রেণীর। বোহরারা তো ব্রাহ্মণই ছিলেন, এখনও তাঁহাদের অনেক বাছবিচার আছে। ডফালী ও ঘোসীরাও আধা হিন্দু আধা মুসলমান, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের হুসেনী ব্রাহ্মণ বলে। তাঁহারা আজমেরে মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর দরগায় পাণ্ডার কাজ করেন। কাশী প্রদেশের ভর্তরীরা যোগী। তাঁহারা গেরুয়া ধারণ করেন, হিন্দু আচার পালন করেন। হিন্দুর ঘরে ক্রিয়াকর্মে ভর্তরীদের গান না হইলেই চলে না। তবু তাঁহাদের গুরু মুসলমান। এখানেও যুক্তসাধনাই দেখিতে পাই। এই সব আধা-হিন্দু শ্রেণীকে এতদিন সকলে হিন্দু বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু রাজনীতিগত কারণে ইঁহাদিগকে গভর্মেণ্টের সেনসাস কিছুদিন যাবৎ মুসলমানই লেখাইতেই হুকুম দিয়াছেন। ইঁহারা হিন্দু লেখাইতে চাহিলেও গভর্মেণ্ট তাহা মঞ্জুর করেন নাই।

এই আধা হিন্দু আধা মুসলমানেরাও এতকাল খুবই উদার ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ এখন রাজনীতিগত কারণে ও স্বার্থবশে কেহ কেহ উদারতা ত্যাগ করিতেছেন। সেই দোষ কি তাঁহাদের স্বীকৃত মুসলমান ধর্মের, না তাঁহাদের শোণিতে প্রবাহিত হিন্দু রক্তের? নদী যেরূপ ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় সেইরূপ ভূমির বর্ণে রঞ্জিত না হইয়া পারে না। হিন্দুধর্ম হইতে দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেই সংকীর্ণতা বেশি। সেই দোষ কি মুসলমানধর্মের না তাঁহাদের পুরাতন হিন্দু শোণিতের? অথবা এই দোষ তাঁহাদের আধুনিক যুগসুলভ নিজ সংকীর্ণ রাজনীতিগত স্বার্থের?

বার বার ভারত-আক্রমণকারী মহমুদ গজনীর নাম সকলেই জানেন। তাঁহার সভায় সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে কতখানি সম্মান ছিল তাহা বুঝি তাঁহার সভাপণ্ডিত সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ অলবিরুণীর

দ্বারা। ইহাতে তাঁহার সংস্কৃতিগত উদারতাই প্রমাণিত হয়। হয় তো সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্যই স্বার্থবশত মহমুদ গজনী ধর্মের দোহাই পাড়িয়াছেন। ধর্মের দোহাই দিয়া যাঁহারা কাজ উদ্ধার করেন তাঁহারা কি ধর্মের সম্মানই করেন না অসম্মানই করেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

এদেশে আসিয়াও মুসলমান রাজারা সংস্কৃত অক্ষরে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন। বহু বাদশা হিন্দু মঠ ও মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সে সব ইতিহাস দিন দিনই নূতন নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।

ভারতে যে-সব অত্যাচার মুসলমানদের নামে, তাহা আসলে তুর্কজাতির কৃত। ভারতীয়েরা হিন্দু বলিয়াই যে তুর্কেরা ভারতে অত্যাচার করিয়াছেন তাহা নহে। পারস্য প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যও তাঁহাদের হাতে কম নিগৃহীত হয় নাই। আরব ও পারসিকদের লেখাতে বরং ভারতের গৌরবের কথাই বেশি। কাজেই এই সব অপরাধের অভিযোগটা ধর্মের উপর না চাপাইয়া জাতির (race) উপর চাপান উচিত। পাঠানেরা মোগলদের বাধা দিতে হিন্দুর সঙ্গে সমানে দাঁড়াইয়াছে। মোগলদের সঙ্গে প্রতাপসিংহের যুদ্ধে প্রতাপের পক্ষে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান যোদ্ধা কম ছিলেন না। মোগলদের পক্ষেও মুসলমানের চেয়ে হিন্দু অল্প ছিলেন না। রাজপুতানার ইতিহাসে সে সব খবর মিলিবে। পলাসীর যুদ্ধে মুসলমান নবাবের জন্য হিন্দুরা কম করেন নাই।

ভারতের মধ্যযুগে যখন মোল্লা ও পণ্ডিতের দল তর্ক করিয়া মরিতেছেন তখন হিন্দুমুসলমান দুই সঙ্গীতবিজ্ঞান মিলাইয়া আমীর খুসরু প্রভৃতি নূতন ভারতীয় সঙ্গীতের পত্তন করিলেন।

ধর্মসাধনায় উদারতার ক্ষেত্রে সকলের সেরা হইলেন কবীর। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে মিলাইতে চাহিলেন। ফলে দুই দলই তাঁহার নামে বাদশার কাছে নালিশ করিলে দরবারে তাঁহার তলব হইল। একই অভিযোক্তার কাঠগড়ায় মোল্লা ও পণ্ডিতদের এক সঙ্গে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়, ইহাই তো আমি চাহিয়াছিলাম। তবে তোমরা ভুল করিলে কেন? বিশ্ব-বিধাতার সিংহাসনের তলে মিলিত হইবার জন্য তোমাদের ডাকিয়াছিলাম। সেখানে তোমাদের মিলিবার স্থান কুলাইল না? আর কুলাইল এই পৃথিবীর রাজার সিংহাসনের নিচে! বিধাতার সিংহাসনের তলায় স্থান কি এখানকার স্থান হইতে সংকীর্ণ? মিলাইতে চাহিয়াছিলাম প্রেমে ভক্তিতে, আর তোমরা আজ মিলিয়াছ বিদ্বেষে! বিদ্বেষ হইতে কি প্রেমভক্তির স্থান প্রশস্ত নয়?" সেই প্রশস্ত স্থান পণ্ডিত ও মোল্লাদের চোখে পড়িল না, পড়িল নিরক্ষর ভক্তদের চোখে।

নিরক্ষর কবীর প্রচার করিতেন সহজ কথিত ভাষায়। অথচ গভীর তাহার মধ্যে সব সত্য। পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি কি করিয়া এই সব সত্য পাও?" কবীর বলিতেন, "আমি সবার নিচে বলিয়াই সত্যকে পাই। উচ্চে যে জল দাঁড়ায় না, সেই জল দাঁড়ায় নিচে।"

উঁচে পানী না টিকে নীচে হী ঠহরায়।

"সম্প্রদায় না হইলে সাধনা সুরক্ষিত হয় না" এই কথা বলিলে কবীর বলিলেন, "বাহিরের ছাগল গরুর ভয়ে ক্ষেতে দিলাম বেড়া। দেখি বেড়াগুলিই ক্ষেত খাইয়া উজাড় করিয়া দিল।"

বেহ্রা দীন্হী খেতকো বেহ্রাহী খেত খায়।

হিন্দুর হিন্দুয়ানী মুসলমানের মুসলমানী দুইই দেখিলাম। ইহারা কেহই পথের সন্ধান পাইলেন না।

অরে ইন দুহু রাহ ন পাঈ।

হিন্দুকী হিন্দ্রাই দেখি তুর্কন কী তুর্কাঈ॥

এই দুই পথকে যুক্ত করিয়া মধ্য পথই পথ। দাস কবীর সেই পথই যুক্ত ও মুক্ত করিতে চাহেন।

দাস কবীর কাঢ়ী ভলী দোউ রাহ বিচ রাহ।

খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে বাকি জগৎটা কাঁহার? তীর্থে মূর্তিতেই যদি রাম রহেন তবে বাহিরকে দেখে কে?

জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ

ঔর মুলুক কেহি কেরা।

তীরথ মূরত রাম নিবাসী

বাহর করে কো হেরা॥

হিন্দুর দয়া ও মুসলমানের মিহ্‌র (প্রীতি) দুইই ঘর-ছাড়া হইয়া কোথায় পলাইল?

হিন্দুকী দয়া মিহ্‌র তুর্কনকী

দোনোঁ ঘরসে ভাগী।

ওরে নিরেট চণ্ডাল মহাপাপী অপরাধীর দল, দয়া বিনা এই দেহ অশুদ্ধ, আগে সেই মৈত্রীর সাধনা কর্।

অরে নিপট চংডাল মহাপাপী অপরাধী।

বিন দয়া অজ্ঞান কায়া কাহে নহিঁ সাধী॥

হিন্দু মনে করে মন্দিরে তাঁহাকে পাইবে, মুসলমান মনে করে তাঁহাকে পাইবে মসজিদে।

হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা মুসলমান মসীত।

ভগবান বলেন, আমাকে কেন বৃথা বাহিরে খুঁজিয়া মরিস? আমি তো তোর পাশেই আছি। আমি না থাকি দেবালয়ে, না থাকি মসজিদে, না থাকি কাবায়, না কৈলাসে আমার স্থান।

মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে

মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ।

না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ

না কাবে কৈলাস মেঁ॥

হিন্দু মুসলমানের এই মিলনের কথা নিরক্ষর সাধকের দল বলিলেন। পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না। কারণ পণ্ডিতেরা সব ইট-পাথর। দুই দিকের ইট-পাথরের ঠোকাঠুকিতে আগুন জ্বলে, মূর্খ সহজ কাদায় কাদায় যোগ লাগিয়া যায়।

ইটা ইটা আগ হৈ কাদো কাদো লাগ।

পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পড়িয়া নীরস দগ্ধ ঝামা বনিয়াছেন।

পঢ়ি পঢ়ি তো পত্থর ভরা লিখি লিখি ভয়া জো ইট।

তাহারা পারিবে না। পারিবে সহজ মূর্খের দল।

কবীরও বলিলেন, সকল আত্মা এক। দাদূও সেই কথাই ঘোষণা করিলেন (২৯, ১৫), যে-সাধক সম্প্রদায়ভেদ না মানেন সেই সাধকের মতই প্রশস্ত।

মতি মোটী উস সাধকী দ্বৈপখ রহিত সমান ॥ দাদূ, মধ্য, ৫

সম্প্রদায়বুদ্ধি রহিত হইয়া নির্ভয় হও।

নির্ভৈ নির্পখ হোই ॥ ঐ, ১৩

হিন্দু হইয়াই বা কি লাভ, মুসলমান হইয়াই বা কি লাভ? ভগবানকে পাওয়াই হইল কাজ।

হিংদূ তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাজ ॥ ঐ, ৪৪

দাদূ বলেন, আমি হিন্দু হইতেও চাই না, মুসলমান হইতেও চাই না, ষড়্দর্শনের পথও আমার নয়; আমি চাই দয়াময়কে।

না হম হিংদূ হোহিঁগে না হম মুসলমান।
ষটদর্শন মেঁ হম নহীঁ হম রাতে রহিমান ॥ ঐ, ৪৬

ভগবানের রাজ্যে হিন্দু দেবালয়ও নাই, মুসলমান মসজিদও নাই। দাদূ বলেন, সেখানে তিনি আপনিই বিরাজিত, সেখানে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই।

না তহঁা হিন্দু দেহুরা ন তহঁা তুরুক মসীতি।
দাদূ আপৈ আপ হৈ নহীঁ তহঁা রহ রীতি ॥ ঐ, ৫৩

হিন্দু মুসলমান দুই হাত। দুই হাত একত্র না হইলে কেমন করিয়া অমৃতের অঞ্জলি রচিত হইবে? কেমন করিয়া অমৃতরস পান করা যাইবে?

দূন্যুঁ হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়া ন জাই ॥ ঐ, ৫৫

পৃথিবী যদি আদর্শহীন ও ভাবহীন হয়,……তবে কেমন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবি?

ভাৱহীন জে পৃথমী……
তহঁা কৈসা পরবেশ ॥ ঐ, ৬৮

যে দিন হইতে আমি সম্প্রদায়বুদ্ধি ছাড়িলাম সেই দিন হইতে সবাই আমার উপর হইলেন রুষ্ট। কিন্তু সদ্গুরুর প্রসাদে আমার না আছে তাহাতে কোনো হর্ষ না আছে কোনো শোক।

জব থৈঁ হম নির্পখ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
সদ্গুরু কে পরসাদ থৈ মেরে হরখ ন সোক ॥ ঐ, ৫৯

কবীরও বলেন, আমাকে যদি হিন্দু বলিতে চাও তবে আমি হিন্দু নই, মুসলমানও আমি নই। তবে আমি কি? পাঁচ তত্ত্বের এই শরীর, তাহার মধ্যে অনির্বচনীয় নিগূঢ় পুরুষ করিতেছেন লীলা—

হিন্দু কহু তো মৈঁ নহীঁ মুসলমানভী নাহিঁ।
পাঁচ তত্বকী পূতলা গৈবী খেলে মাহিঁ ॥

দাদূ বলেন, হৃদয় হইতে হিংসার ছুরি ফেলিয়া দাও, ওরে মোল্লা, সবাই সেই পবিত্র স্বরূপেরই মূর্তি। অবোধদের মারিয়া ফল কি?

কালা মুহঁ করি করদকা দিল তেঁ দূর নিবার।
সবহী সূরত সুবহানকী মুল্লা মুগুধ ন মার ॥ ২৯, ৩৫

প্রত্যেক জীবে ভগবান বিরাজিত, জীবেই অজর-অমরের প্রতিষ্ঠা। প্রভুর প্রত্যক্ষ বিগ্রহ সেই জীবকে আঘাত কর কেমনে ?

দাদূ অরশ খুদায়কা অজরামর কা থান।
দাদূ সো কুঁ্য ঢাহিয়ে সাহিব কা নিশান ॥ ২৯, ৩০

দাদূর শিষ্য রজ্জবজী মুসলমান বংশে জাত। ১৫৫০ এর কাছাকাছি তাহার সময়। তাঁহার উদারতার তুলনা নাই। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সত্য বলিয়া কোনো সত্য নাই। জগতের সব সত্যের সহিত যে সত্য খাপ না খাইল, তাহা ঝুটা।

সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ
না মিলে সো ঝুঠ।

তিনি বলেন, যত জীব তত সম্প্রদায়। প্রত্যেক জীবের বৈচিত্র্যের মধ্যে ভগবানের বিশেষ বিশেষ বিচিত্র লীলা।

চৌরাশী লক্ষ সংপ্রদা করি বিশ্বম্ভর সোয়।
রজ্জব বৈচিত্র্য রচিয়া জন জন বৈচিত্র্য হোয় ॥

রজ্জবজী বলেন, হিন্দুর পথেই হিন্দু খুসি, তুরুকের পথে তুরুক খুসি। কিন্তু প্রেমময়ের কাছে কোনো পক্ষপাত নাই।

হিন্দু গতি হিন্দু খুসি তুরুক তুর্কী মাঁহি।
রজ্জব আশিক এক হৈ তিনকে দুন্যূঁ নাহীঁ।

রজ্জব বলেন, "বিশ্বই যথার্থ ধর্মশাস্ত্র, পণ্ডিত কাজীর দল কাগজে লেখা ধর্মশাস্ত্র লইয়া মরেন। বিধাতার নিত্য নবীন জীবন্ত এই ধর্মশাস্ত্র তাঁহারা দেখেন না। আমাদের অন্তরের কাগজে প্রভু নিত্যই তাঁর ধর্মশাস্ত্র লিখিতেছেন। তাহা কেউ চাহিয়া দেখে না। মানব-ইতিহাসে তাঁর অখণ্ড বেদ উচ্চারিত। বাইরের ঝুটা আলো নিবাইয়া দিয়া সেই বেদ-কোরান পড়। হিন্দু-মুসলমান সেই প্রাণপুস্তক দেখ পড়িয়া। সর্বত্র তবে দেখিবে একই বিদ্যা। যে তাহা পড়িয়াছে সে-ই সত্য পণ্ডিত।"

ইহাদের পরেও শত শত হিন্দু মুসলমান সাধক এই একই রকমের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কত আর নাম করা যায় ?

সাহিত্য-কলা-সঙ্গীতে সর্বত্র মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সাধনা। সঙ্গীতে তো বহুরাগরাগিণী খুসরুর। অমীর খুসরু (১২৫৩ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া তানসেন প্রভৃতির ধারা ধরিয়া সঙ্গীত-কলায় মুসলমান গুণীদেরই জয় জয়কার। এখনকার ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা ঠুংরী সবারই গুরু তাঁহারা।

সেতার যন্ত্রটি হিন্দু-মুসলমান দুই যন্ত্রের সমন্বয়ে। এসরাজ সুরবাহার সারেঙ্গী প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার ফল। তবলাও তাই। রামপুরের নবাব কলব অলী খাঁ সুরশৃঙ্গার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় মুসলমান ওস্তাদেরা এখন সুধু পারসী আরবী তুর্কী রাগ-রাগিণী লইয়া থাকিতে পারেন না। হিন্দু ও মুসলমানী রাগ-রাগিণী মিশাইয়া ভারতীয় সব রাগিণী রচিত।

ইমন ও ইমনযুক্ত সব রাগ মুসলমান গুরুদের প্রবর্তিত। তুরষ্কতোড়ি, তুরষ্কগৌড়ের নাম সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থেও দেখা যায়। বাহার, আলাইয়া, সরফরদা, সাজগিরি, সাহানা, আড়ানা, সোহিনী,

সুহা, সুঘরাই, জিল্‌ফ, মারু, পিলু, বারোয়া, লুম, ঝিঝোটি প্রভৃতি রাগ-রাগিণী মুসলমান গুরুদেরই গৌরব। মিঞা-সারঙ্গ, মিঞা-মল্লার প্রভৃতিও তাই। ঢিমা তেতালায় সেতারে মজিদখানের গৎ বিখ্যাত। সম্রাট আকবর নক্‌কাড়ায় অনেক গৎ প্রবর্তন করেন।

ভারতীয় রাগ হিন্দোল ও পারসী রাগ মোকাম মিলাইয়া আমীর খুসরু ইমন রাগের সৃষ্টি করেন। হিন্দু-মুসলমান রাগ মিলাইয়া এইরূপ বারোটি যুক্ত রাগ তাঁহার রচনা। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে Kauz-ul-Tulf (গুপ্ত ঐশ্বর্য) নামে গ্রন্থ ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কাশ্মীরের রাজা জৈন উল আবেদিন হইতে মোগল বাদশাহেরা সবাই এই যুক্ত সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছেন। তোমরবংশীয় রাজা মানসিংহ, গুজরাতের সুলতান বাহাদুর (১৫২৬-৩৬) ইসলাম শাহ প্রভৃতিও এই উৎসাহদাতাদের দলে। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁও ছিলেন মহাগুণী।

১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে "রাগদা-এ-হিন্দ" রচিত। আকবরের রাজত্বকালে কবি আলম "মাধব নাল কন্দলা" লেখেন। ইহা সঙ্গীতের রাগমালা। আইন-ই-অকবরী ভারতীয় সঙ্গীতেরও এক রত্নভাণ্ডার বিশেষ। আকবরের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের ৩৬ জন আচার্যের মধ্যে ৫ জন মাত্র ছিলেন হিন্দু। বাকি সব মুসলমান। এখানে তাঁহাদের নাম করা বাহুল্য। আওরংজেব বাদশাহ হিন্দী কবি ও সঙ্গীত রচয়িতাদের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহার জন্মদিনে প্রতিবৎসর যে সব নূতন নূতন সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহা আজও তাল-মান সহকারে সুরক্ষিত আছে। আওরংজেব যখন পৌত্র আজিম উস্‌শানকে ঢাকায় পাঠাইলেন তখন তিনি তাঁহার সভাকবি কালিদাস ত্রিবেদীকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে ইব্রাহিম আদিল শাহের "নবরস" (১৬০৮ খ্রীঃ), শাজাহানের সময়কার "সহসরস", ফকীর উল্লার রাগদর্পণ (১৬৫৮ খ্রীঃ, মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মতে ১৬৬৬ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মিফতা-উল-সরুরের নামও করা উচিত।

১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা খাঁ ইব্‌ন ফকরুদ্দীন ভারতের সঙ্গীত কাব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ তুহফতুল হিন্দ লেখেন। আওরংজেবের সময়কার ওস্তাদ মির্জা রোশন জমীর ১৭২৪ সালে সঙ্গীত পারিজাতকে আশ্রয় করিয়া পারসীতে গ্রন্থ লেখেন। মোহাম্মদ জাকিদ হকীমের—Ilham ud Tarab(আনন্দপ্রকাশ)'ও ভারতীয় সঙ্গীতের ভালো একখানি গ্রন্থ। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে উজির আসফের অনুরোধে পাটনার গুণী পণ্ডিত মহম্মদ রেজা নগমত-উল-অসাফী লেখেন। ইনিই এখানকার দেশের সঙ্গীতপদ্ধতি অর্থাৎ বেলাবল ঠাটে গাহিবার ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। ১৮৩৪ সালে কাশীর হকীম সলাবত অলী খাঁ তাঁহার ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লেখেন তাহাও এখন ওস্তাদদের মান্য।

ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ হইল মান তোমর ও আকবরের উৎসাহেই সৃষ্ট। ধ্রুপদ একসময় লোকগীত ছিল। ইঁহারাই ইহাকে ক্লাসিকাল বা শাস্ত্রীয় করিয়া তোলেন। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শির্কির (১৫শ শতক) উৎসাহে খয়রাবাদের লোকগীত হইতে খেয়াল পদ্ধতি সৃষ্ট হয়। মহম্মদ শাহের দরবারে নিয়ামত খাঁ, সদারং, অধারং, ইঙ্গাবরস সাঁই প্রভৃতি বড় বড় ওস্তাদ ছিলেন। টপ্পার প্রবর্তক হইলেন গোলাম নবী। ইহা পাঞ্জাবের ঝাং প্রদেশের লোকগীত ছিল। লক্ষ্ণৌর টপ্পা ও নবাব ওয়াজেদ আলি খাঁর কথা সকলেই জানেন। ইদানীং ভারতে গজলের আমদানিও উপেক্ষণীয় নহে।

সূফী ভক্তেরাও ভারতে বহু রাগরাগিণী ও সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন। কবীর, রবিদাস, দাদূ,

রজ্জবজী প্রভৃতি তো গানেই মনের কথা বলিয়াছেন। খোজা সম্প্রদায়ে হিন্দু মুসলমান তুই ভাবই যুক্তরূপে বিরাজিত। ইহাঁদের কীর্ত্তন ভজন আছে। সিন্ধুদেশের সূফীভক্ত শাহলতীফ, সচল, রোহল, কুতুব, বেদিল, বেকস প্রভৃতি সবাই গানের গুরু।

মোগল চিত্রকলায় ও স্থাপত্যকলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনাই যে যুক্ত হইয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ সকলেই জানেন। তাই এখানে তাহার উল্লেখ আর নাই করিলাম। বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যের মূলেও দেখা যায় মুসলমান রাজাদের উৎসাহ ও মুসলমান সাধকদেরই সাধনা। মালিক মহম্মদ জায়সী (১৫৪০) একেবারে ভারতীয় শাস্ত্রসম্মত মতে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ পদুমাবতী লেখেন। তিনি আরবী পারসী সংস্কৃতে সমান পণ্ডিত ছিলেন। জায়সী ছিলেন সাধক ফকীর। তাঁহার হিন্দু মুসলমান তুই সম্প্রদায়ের বন্ধুই ছিল। মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণ বন্ধু কথকতা ব্যবসায়ী গন্ধর্ব্বরাজের ছেলেদের ডাকাইয়া জায়সী বলিলেন, "আমি ফকীর। সন্তান আমার নাই। তোমরাই আমার সন্তান! আমার মালিক উপাধি তোমরাই বহন করিবে! যতদিন এই উপাধি বহন করিবে ততদিন তোমাদের সুকণ্ঠ থাকিবে।" এখনও এই বংশের লোকেরা মালিক উপাধিধারী ও অপূর্ব পুরাণ-পাঠক। পদুমাবতী গ্রন্থ আরাকানের মুসলমান রাজা মাংগন ঠাকুরের আজ্ঞায় বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এই গ্রন্থ পড়িলে মনে হয় ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রই পড়িতেছি। ইহাতে পদ্মিনী হইল আত্মা, ভীমসিংহ পরমাত্মা, আলাউদ্দীন হইল পাপ। এমন ভাবে আজিকার দিনে মুসলমান কবির লেখা সহজ নহে। পদুমাবতী একখানা উঁচুদরের সূফীগ্রন্থ। তুই শত বৎসর আগে নূরমহম্মদ লেখেন ইন্দ্রাবতী। আকবরের সেনাপতি ও অমাত্য আবদুর রহিম খানখানার সংস্কৃত ও হিন্দী লেখা দেখিয়া কে বলিবে তাহা হিন্দুর নয়।

মুসলমান কবিদের লেখা হিন্দী ও বাংলা রচনার খবর এখন সুপরিজ্ঞাত। চট্টগ্রামের শ্রদ্ধেয় আবদুল করীম মহাশয় বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয় দিয়াছেন।

অনুবাদ-সাহিত্যেও প্রাচীন আরবীয় ও পারসিক পণ্ডিতেরা কম কাজ করেন নাই। বহু সংস্কৃত শাস্ত্র ও গ্রন্থ আরব ও পারস্য দেশে পূর্বেই অনূদিত হইয়াছিল। তাহার পর আলবিরুণী ভারতের ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে চমৎকার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহার পরেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পারসী অনুবাদ হইয়াছে। আবদর রহীম, আজিম শাহ প্রভৃতি বিদগ্ধরা বৈষ্ণব সাহিত্যের বড় রসজ্ঞ ছিলেন। আকবরের সময় নাগোরী মুবারকের পুত্র আবুল ফজল ও ফৈজী অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সেই যুগে মহাভারত হইতে যোগবাশিষ্ঠ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থই ভাষান্তরিত হইয়াছে। মির্জা খাঁর তুহফতুল হিন্দের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দারাশিকোহ একটি মহনীয় নাম। ইহাঁর দরবারে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ধর্মের যেরূপ ঘনিষ্ঠ আলোচনা হইয়াছে সেরূপ আর কখনো হয় নাই। ইহাঁরই উপনিষদের অনুবাদ সির-ই-আকবর ভাষান্তরিত হইয়া য়ুরোপে প্রথম উপনিষদের পরিচয় দিয়াছে।

সাধনার দিক দিয়াও দেখি হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনা কী নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়াছে। সিন্ধুদেশীয় সূফীদের মধ্যে শাহ করীম শাহ ইনায়ত শাহ লতীফ প্রভৃতি ওঙ্কার মন্ত্রেরও সাধনা করিয়াছেন। দিল্লীর সূফী ধারাতে মুসলমানবংশীয়া মহিলা (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে) বাবরী সাহেব সাধনার গুরু হন। তাঁহার শিষ্য বীরু হিন্দু। তাঁহার শিষ্য য়ারী (১৬৭০) মুসলমান। তিনি শূন্যতত্ত্ব, আল্লা ও রামনাম একইভাবে শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন। য়ারীর শিষ্য বুল্লা, শেখন, হস্ত মুহম্মদ, কেশব দাস। বুল্লা জাতিতে কুনবী। বুল্লার

শিষ্য গুলাল। গুলালের শিষ্য ভীখা ছিলেন ব্রাহ্মণ (১৭২০)। ভীখার শিষ্য গোবিন্দ। গোবিন্দের শিষ্য মহাকবি পলটু (১৭৫৭-১৮২৫)। বিহারের দরিয়া সাহেবও (১৭০০-১৭৮০) হিন্দু-মুসলমান যুক্ত ভাবের সাধক। তাঁহার সম্প্রদায়েও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই উভয়কে দীক্ষা দিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমান সাধনা এদেশে এমন যুক্ত হইয়া গিয়াছে যে রচনা দেখিয়া লেখক হিন্দু কি মুসলমান তাহা বলা অসম্ভব। দরাফ খাঁর রচিত সংস্কৃত গঙ্গাস্তব তো অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরও নিত্যপাঠ্য। আবদর রহীম খানখানাঁ ছিলেন আরবী পার্সী তুর্কী, সংস্কৃত, হিন্দী পাঁচ ভাষায় সমান দক্ষ। তিনি ভক্ত বিট্ঠলের ও তুলসীদাসের বন্ধু ছিলেন। অপূর্ব তাঁহার রচনা—

জে গরীব কো আদরে তে রহীম বড় লোগ।
কহা সুদামা বাপুরো কৃষ্ণ মিতাই যোগ॥

"হে রহীম, যে গরীবকে আদর করে সেইতো বড় লোক। কোথায় দরিদ্র বেচারা সুদামা! সে কি কখনো কৃষ্ণের সখা হইবার যোগ্য? কৃষ্ণেরই ইহাতে মহত্ত্ব।"

ছিমা বড়েন কো চাহিয়ে ছোটেন কে উতপাত।
ক্যা রহীম হরি কো ঘট্যো জো ভৃগু মারী লাত॥

"বড়দের পক্ষেই ক্ষমা শোভন, ক্ষুদ্রদের পক্ষে ক্ষমা একটা উৎপাত মাত্র। হে রহীম, ভৃগু যে লাথি মারিলেন তাহাতে হরির কি ক্ষতি হইল?"

একদিন মজলিসে কথা হইতেছিল দেবী লক্ষ্মী কেন চঞ্চলা। পণ্ডিতের দলও ইহার কোনো ভাল উত্তর দিতে পারিলেন না। রহীম বলিলেন, লক্ষ্মী ব্রহ্মার বধূ। ব্রহ্মা তো পুরাতন-পুরুষ পিতামহ। বৃদ্ধের বধূ কেন চঞ্চলা না হইবেন?

পুরুষ পুরাতন কী বধূ ক্যোঁ ন চঞ্চলা হোয়।

জ্যোতিষ গ্রন্থ "খেট-কৌতুক" রহীমের রচনা। তাহাতে অনুষ্টুভ ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি নানা সংস্কৃত ছন্দে তিনি লিখিয়াছেন। সংস্কৃত ও হিন্দী মিশাইয়া তাঁহার লেখা মদনাষ্টক এখনও হোলীর দিনে ব্রাহ্মণেরও অবশ্যপাঠ্য।

শরদ নিশি নিশীথে চাঁদকী রোশনাঈ।
সঘন বন নিকুঞ্জে কান্হ বংশী বজাঈ॥ ইত্যাদি

কে বলিবে ইহা মুসলমানের লেখা। আবার তুলসী সাহেব হাথরসীর জন্ম (১৭৬০) বেদপরায়ণ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে। যৌবনেই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। তাঁহার লেখা দেখিয়া মনে হয় যেন মুসলমানেরই লেখা। একটু নমুনা দেওয়া যাউক।

রোজা নিমাজ বাংগ অংদর মাহীঁ
আশীক মাশূক মিহর দিদা সাঈঁ॥ ইত্যাদি

আবার

তনমন মহজিদ বীচ বাংগ নিমাজা।
বুঝো হরদম নিত উঠে অরাজা॥ ইত্যাদি

অথবা

অরে কিতাব কোরাণ খোজলে, অলখ অল্লাহ খুদা কহঁ ভাঈ।
কৌন মক্কান মহজিদ মসীত মেঁ, জমী আসমাঁ বীচ কৌন ঠাঈঁ।
হরবখত রোজা নিমাজ অরু বাংগ দে, খুদা দীদার নহিঁ খোজ পাঈ॥　ইত্যাদি

কিম্বা

তুলসী কহে সব খুদা ভরপূর হৈ
রূহ মেঁ নিরখ দিল দেখ জাঈ॥　ইত্যাদি

তুলসীর বিখ্যাত প্রার্থনা

দিল কা হুজরা সাফ কর জানাঁকে আনেকে লিয়ে।...

কুদরতী মশজিদ কা সাকিন দুঃখ উঠানে কে লিয়ে।
কুদরতী কাবে কী তূ মিহরাব মেঁ সুন গৌর সে।
মুর্শিদ এ কামিল সে মিল সিদক সবুরী সে তকী।
জো তুঝে দেগা ফহম শহরগ পানে কে লিয়ে।
যহ সদা তুলসীকী হৈ আমিল অমল পর ধ্যান দে
কুন কুরাঁ মে হৈ লিখা অল্লাহ অকবর কে লিয়ে।

ইহা হইল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশীয় সাধক তুলসীর ভাগবত বাণী। সেই উদারতা আজ কোথায়? কেন আজ আমরা আমাদের সেই পুরাতন মহাসম্পদ একেবারে হারাইতে বসিয়াছি?

বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমান সাধনার কম যোগ হয় নাই। বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি তো আছেনই। তাহা ছাড়াও মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে মুসলমান উৎসাহদাতার অভাব নাই। তাহার উপরে আউল বাউল দরবেশদিগের অপূর্ব সংগীত সাহিত্য। আগমনী প্রভৃতি গানেও গোলাম মৌলা প্রভৃতির সব অপূব গান আছে। বাউলদের মধ্যে তো হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদই নাই। লালন, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেকে জাতিতে মুসলমান। মদনের লেখা যেমন গভীর তেমন সুন্দর। তাঁহারই গান

(১) প্রেমের মোল প্রেমই রে বান্দা নারে দুখ নারে সুখ।
(২) ভবের হাটে আলি রে বান্দা দাম দিবি তুই কিসে।
(৩) রসের সাগর ডুব দিতে যে বড়ই ডর লাগে।
(৪) নিঠুর গরজী তুই কি মানুষ মুকুল ভাজবি আগুনে।
(৫) আমার আজব অতিথি।
(৬) মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ দিবে সে কি ধরা?

তাঁহার বিখ্যাত গান

যদি করিস মানা ওগো বন্ধু, মানি এমন সাধ্য নাই।
(কোনো) ফুলের নামাজ রংবাহারে, (কারও) গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই॥

বাউল গঙ্গারাম জাতিতে নমশূদ্র। বাউল মনাই শেখের শিষ্য কালাচাঁদ মিস্ত্রী, তাঁহার শিষ্য হারাই নমশূদ্র। তার শিষ্য দিনু জাতিতে নট। তাঁর শিষ্য ঈশান যুগী। তাঁর শিষ্য মদন। নিত্যনাথের শিষ্য বলা কৈবর্ত, তাঁর শিষ্য বিশা ভুঁইমালী, তাঁর শিষ্য জগা কৈবর্ত, তাঁর শিষ্য মাধা পাটিয়াল বা কাপালী, তাঁর শিষ্য গঙ্গারাম। গঙ্গারাম ও মদন তুই বন্ধু ছিলেন। গঙ্গারামের ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিলেন। গঙ্গারামের গানও অপূর্ব। তাঁহার

"ওগো মূলাধার, তুমি আপনে করো পার,
আমি চাহি না নিস্তার।"

কিম্বা "ধন্য আমি শূন্য কুম্ভ পূর্ণ কুম্ভ নই" প্রভৃতি গানের তুলনা নাই।

হিন্দু মুসলমান উভয় সাধনাতেই রসিক ও প্রেমিকেরা পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু যত বিপদ বাধাইয়াছেন ধর্মব্যবসায়ীর দল। কবীর বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবানও ধর্মব্যবসায়ীদের ডরান। তাই তিনি বলেন, "কীর্তনীয়াদের নিকট হইতে বিশ ক্রোশ দূরে থাকি, সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে রহি ত্রিশ ক্রোশ দূরে।"

কিরতনিয়া সে কোস বিস সন্ন্যাসী সোঁ তীস॥ পারখ অংগ, ২৪

যাহারা ধর্মব্যবসায়ী ধার্মিক তাঁহারা দারুণ। তাই কবীর বলেন, "বরং পাপী ভাল, নরক তাঁদের জন্য নয়। যত ধর্মীরাই যাইবেন নরকে। এই নরকতত্ত্ব বুঝিয়া সাবধান, কেহ ধর্মসঞ্চয় করিও না।"

পাপী কো দোজখ নহীঁ ধরমী দোজখ জায়।
য়হ পরমারথ বুঝি কে মতি কোই ধরম কমায়॥ বিপর্যয় অংগ, ২

সাংসারিক বা রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে যাহারা ধর্মকে ব্যবহার করেন সেই সব ধর্ম বাণিজ্যকদের কবীর প্রভৃতি সাধকেরা কি বলিতেন তাহা ভাবিতেও পারি না। সর্বশেষে বাউল মদনের গানের মধ্য দিয়াই আমাদের তুঃখ জানাইয়া দিই—

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই,
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।
ডুইব্যা যাতে অংগ জুড়ায়, তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়
বলতো গুরু কোথায় দাঁড়ায়, অভেদ সাধন মরলো ভেদে।
তোর তুয়ারেই নানান তালা, পুরাণ-কোরাণ তসবী-মালা,
ভেখ-পথই তো প্রধান জ্বালা, কাঁইদে মদন মরে খেদে।

আজ হিন্দু মুসলমানের উদারতার পথ আবার কোন্ সাধনায় মুক্ত হইবে?

বন্যা

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

কুশীতে বান আসিয়াছে ; একরকম নোটিস না দিয়াই।

নেপালের কোন্ পর্বতশিখরের বরফ গলিয়াছে, হিমালয়ের কোন্ অরণ্যময় উপত্যকায় বারিপাত হইয়াছে, তাহার খবর কুশীর তীরের লোকেরা রাখে না। তাহারা খুঁজিতে আরম্ভ করে, কোন্ পাপে ভগবান তাহাদের এই শাস্তি দিতেছেন!

রহিকপুরা গ্রামের নিয়মানুসারে মেয়েরা সকলেই শেষরাত্রেই ওঠে। তাহারা কেহই আঙিনার বাহিরে যাইতে পারে নাই ; কেহ কেহ আঙিনাতেও নামিতে পারে নাই।

তাহাদের চীৎকারে পুরুষেরা জাগে। কেহ লাঠি লইয়া ওঠে। কেহ বর্শা লইয়া আসে। সাপ বাঘ চোর, কত কি হইতে পারে। চোখের জড়তা ভাঙিবার পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণের সময়ের মত, ঢাক-ঢোল শাখ-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। দর্শন মড়র[১] চৌকীদারের মত হাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। বিপদ-আপদের সময়, গাঁয়ের মোড়লদের, প্রথমেই মোহন্ত রাঘোদাসের আস্তানের সম্মুখের আখড়ায় বিরাট লোহার গদাটি ঘিরিয়া বসিবার কথা।

কেরোসিন তেলের অভাব। কোনো বাড়িতে আলো ছিল না। কেবল একটি দুইটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে। মড়রেরা এতটা ভাবে নাই। আখড়ায় পৌছানো শক্ত। রাস্তা দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। খুঁটিতে বাঁধা গরুগুলি চীৎকার করিতেছে।

মেয়েরা আঙিনায় বলে, "ওমা, জল যে বারান্দায় উঠে আসছে।" চোখের উপর দেখিতেছে এই দাওয়ায় উঠিবার দ্বিতীয় সিঁড়ি ডুবিল। আরও এক আঙুল বাড়িয়াছে।

"মজা দেখছিস কি! ঘুঁটে কখান তোল্। কাঠগুলো উপরে ওঠা।"

ভূষির জালাগুলো কি করিয়া সরানো যায়। কাঁচা মাটির বিরাট বিরাট জালা। জল লাগিলেই গলিয়া যাইবে।

"ছাগলটি কোথায়?"

"গে মাই! তুলসী গাছটি যে এরই মধ্যে ডুবে গেল।"

"রান্নাঘরের উনুন যে গেল ডুবে। উখলীটা[২] ভেসে চলল। কি হবে গো!"

"আঃ! কি হল্লা কর! যত মেয়েছেলের কাণ্ড! সরো। মাচা বাঁধতে দাও।"

"তিন হাতের খুঁটি কাটবি। বেশি হ'লে ক্ষতি নেই— কম যেন না হয়।"

"কৌশিকী মাঈকি জয়!" মোহন্তজি প্রত্যহই প্রত্যুষে দুইবার এই জয়ধ্বনি করেন পূর্বাকাশের দিকে তাকাইয়া। খলিফা[৩] আর গ্রামের জোয়ানেরা ল্যাঙ্গোটা পরিয়া আখড়ায় আসিবার জন্য তৈরি হয়। আজ কাহারও উৎসাহ বা সময় নাই ; কিন্তু এই জয়ধ্বনি আজ নূতন ঝঙ্কারে সকলের কানে বাজে। ক্রুদ্ধা কৌশিকীমাতাকে শান্ত করিবার জন্য মোহন্তজি যেন মন্ত্র পড়িতেছেন। গ্রামের

১ মোড়ল   ২ উদূখল   ৩ পালোয়ান

আবালবৃদ্ধ সকলে এই সুরে সুর মিলায়।— "কে অস্বীকার করছে মা, তোমার ক্ষমতা। আমাদের উপর সদয় থেকো মা।"

কোনো বিশাল নৈসর্গিক বিপদের সময় ছাড়া রহিকপুরা গ্রামের সকলে একমত কখনও হয় নাই।

একটানা ঢোল বাজিতেছে মোহন্তের আস্তানে। ঢুলহা মাঝির ছেলে সাঁওতালটোলায় একটানা কাড়া বাজাইতেছে— ডুম্ ডুম্ ডুম্। মহরমের ঢোলের মত ফৌজী তাল। জাগো, জাগো; কেবল তাতেই চলবে না; সাজো সাজো; আর একমুহূর্তও দেরি করা নয়। চ'লে এস ঘরে, মকাই-খেতের মাচার উপর থেকে; চলে এস ঘরে, বীচদরিয়ার ডিঙির উপর থেকে। গরু মোষ শূয়োর ছাগল লইয়াই মুশকিল। জানের আগে মাল সামলাও।

একেবারে তছনছ কাণ্ড। একমুহূর্তে এই জগৎটির উপর কি করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল!

সবাই উঁচুতে থাকিতে চায়। আরও উঁচুতে উঠিতে চায়। উঁচুতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। আকাশে যদি শিকে ঝুলানো যাইত!

গ্রামে কাহারও নৌকা নাই। এরূপ বান এদিকে নিয়মিত হয় না। তাই কেহই ইহার জন্য তৈরি নয়। সাম্রতি তিয়রের কেবল একখানি ডিঙি আছে— ওপারের চর ও ভুখনাহা দিয়ারা হইতে গরুর খাইবার ঘাস আনিবার জন্য।

মুসহরটোলা গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে নিচু জায়গায়। মুসহরটোলার কুটিরগুলি প্রায় ডুবিল বলিয়া। তাহারা অন্য পাড়ায় এক-এক করিয়া আসিয়া জুটে। মাচা তৈরি করা সেখানে বৃথা। একটি ছাগল স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল। ধর্ ধর্! তাহাকে কোলপাঁজা করিয়া গেনুয়া মুসহর আগাইয়া আসে। তাহাদের জিনিসপত্রের মধ্যে তো হাঁড়িকুঁড়ি, উখলী সামাট্। কোন্ স্থানেই বা তাহারা এক-নাগাড়ে বেশি দিন থাকে? কোনোরকমে মাথা গুঁজিবার স্থান সেদিনটার মত হইলেই হইল। কথায় বলে, 'এক কাঠা ভুট্টার দানায় মুসহর রাজা।'

কতক লোক উঠিয়াছে নৌখে ঝার উঁচু দাওয়ায়, কতক সুমুৎ তিয়রের বৈঠকে। গনুয়া মুসহরের স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার পঙ্গু ছেলেটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গনুয়া আবার এক-কোমর জলে নামিয়া পড়ে ছেলে খুঁজিতে। বারান্দার অন্যান্য মুসহরেরা ভাবে, যাক ছাগলটা ভালোয় ভালোয় গনুয়া আনিয়া পৌঁছাইয়াছে।

একে একে দুইটি বাড়িই ভরিয়া গেল। তিলধারণের স্থান নাই। নৌখে ঝা আর সুমুৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে রেষারেষি ঝগড়া ফৌজদারি নিত্য লাগিয়াই আছে। প্রথমে ছিল দুইজনের পিতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত; পরে হইয়া দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ ও তিয়র দুই জাতির মধ্যে কলহ।

বহু বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুমুতের পিতা তাহার এক মৃগীরোগগ্রস্ত আধিয়াদারকে সামান্য প্রহার করিবার পর সে অজ্ঞান হইয়া যায়। তাহার মূর্ছাভঙ্গ আর হয় নাই। নৌখের বাবা থানায় খবর দিয়া নাকি আসামীকে ফাঁসি দেওয়াইবার চেষ্টা করে। দুই বৎসরের সাজা হয়। সেই সময় নৌখের বাবা যখনই সদরে যাইত, তখনই ভাঁড়ে করিয়া তাজা সরিষার তেল লইয়া আসিত। বলিত, "জেলখানার তেল।" গ্রামের লোকের সম্মুখে তেল মাখিবার পূর্বে, তিনবার অশ্বত্থামার নাম লইয়া শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিত আর বলিত, "বড় বাড় বেড়েছিল; তাই একটু একটু ক'রে তিয়রের তেল বের করছি।"

সেই হইতে আরম্ভ। এখনও চলিতেছে। এখনও দুই পরিবারের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। সুমৃৎকে দেখিলে নৌখে ঝা শব্দ করিয়া থুতু ফেলিয়া অন্য পথে চলিয়া যায়। সুমৃৎ দাঁত কড়্মড়্ করিয়া নিকটস্থ মহিষের পিঠে সজোরে লাঠি দিয়া মারে— "শালা পথ জুড়ে বসে আছে।"

কুশীর দুকূলভাঙা প্লাবনের মুখেও গ্রামের মাতব্বরদের কর্তব্য তো করিতেই হইবে। তাই নৌখে ঝা পুরুবটোলায় লোকদের অবস্থা তদারক করিতে গিয়াছেন— কোনো কাজের শৃঙ্খলা যদি থাকে এই পাড়ার লোকের! তুরিয়া বন্পর এই সময়েও মোটা সুতায় বাঁধা বঁড়শির সহিত প্রকাণ্ড একটি ছাল-ছাড়ানো সোনাব্যাঙ গাঁথিতেছে। নৌখে ঝা জিজ্ঞাসা করে, "কিরে তোরা জিনিসপত্র সামলেছিস ?"

"আমার পুতহু[৪] আছে সেয়ানা"। সে আর বেশি কথা খরচ না করিয়া সুতাটিকে একটি বাখারির সহিত বাঁধিতে থাকে।

পচ্ছিমটোলায় সুমৃৎ তিয়র একবুক জলে দাঁড়াইয়া চীৎকার করে— "মাল গেলে মাল আবার হবে ; জান গেলে কিন্তু জান আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ওরে পাত্রঙ্গী, তুই আবার চালের উপর উঠছিস কেন ? লাউ-কটা পাড়বি ? এখন আর লোভ করিস না। ও কি! আবার পুঁটুলি ওঠাচ্ছিস যে চালের ওপর। ছাগলটাকেও যে টেনে তুললি। মরবি, মরবি।"

পাতরঙ্গী জবাব দেয় না। শতছিন্ন শাড়ীটি মাথার উপর একটু টানিয়া দিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসে। ভাদ্দরের রোদবৃষ্টির মধ্যে, কি করিয়া চালের উপর তাহার দিন কাটিবে, সে-কথা সে ভাবে না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া সে এক পাও নড়িবে না।

'যা, সব গরুমোষগুলো নিয়ে রেল-লাইনের উপর যা। রেল-লাইনটা উঁচু আছে, এখনও ডোবে নি।'

সকলে একে একে গ্রামের উঁচু স্থানগুলিতে আসিয়া জুটে। উচ্চবর্ণেরা উঠিয়াছে নৌখে ঝার বাড়িতে। নিম্নবর্ণেরা উঠিয়াছে সুমৃৎ তিয়রের বাড়ি। মুসলমানেরা উঠিয়াছে মসজিদের বারান্দায়। বহুকালের পুরানো পাথরের মসজিদ, আগে নদীর ওপারে ছিল। নদী সরিয়া যাওয়ায়, এখন এপারে হইয়া গিয়াছে।

প্রথম আলোড়নের পর পরিস্থিতি থিতাইয়া আসিয়াছে। প্রাণে সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন থাকিয়া গেল প্রাণধারণ করিবার প্রশ্ন। তিয়রের বাড়ির মেয়েরা, অন্য ভদ্রপরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য উঠানে ভাত রাঁধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী সাহায্য করিতেছে। আঙিনার আর-এক স্থানে দুইটি মুসহর স্ত্রীলোক ইট দিয়া তৈরি উনুন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে। তিয়র-গিন্নী এক ঝুড়ি ভুট্টা আনিয়া সেখানে দিলেন। মুসহর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল "আমরাও বাড়িতে ভাত খাই। এখন ও চাল বাঁচাচ্ছে কার জন্যে বুঝি না। বাড়ির আঙিনায় যখন

৪ পুত্রবধূ

পেয়েছ, যত ইচ্ছে অপমান ক'রে নাও। নিজেদের কথা হলে ভাবতামও না। ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খাঁই খাঁই ক'রে জ্বালাতন করে, আর ঐ বেচারারাই বা করবে কি? পাশেই গেরস্তদের ছেলেদের ভাত খেতে দেখলে, তারা কি চুপ করে থাকতে পারে?"

ধাঙ্গড়, মুসহর, বন্‌পর, সকলেরই আলাদা আলাদা 'চৌকা' হইল। গেরস্ত বাড়ির লোকেরা খাইতে বসিল বাড়ির আঙিনায়। মুসহর ধাঙ্গড় বনপর তাৎমারা বাহিরের বৈঠকখানায়।

বেশ একটা চড়াইভাতির মনোভাব। তাহার পর চলে একটানা কুশীর বান দেখা। কালো জল— গঙ্গার জলের মত ঘোলাটে সাদা নয়। হুড়াহুড়ি করিয়া একসারি ঢেউ, আর-একসারিকে তাড়া করিয়াছে। তীব্রগতির তোড়ে একটি বিরাট গাছের গুঁড়ি, উষ্ট্রারোহীর মত সামনে পিছনে দুলিতে দুলিতে, চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গরু ভাসিয়া যাইতেছে— মরা না জ্যান্ত? নামব নাকি— জয় কৌশিকী মাঈকি জয়। না, নামা বৃথা। ওটি বোধ হয় নীলগাই। কুমীরে প্রকাণ্ড একটি মাছ ধরিয়াছে। জলের উপর হুটোপুটি করিতেছে। যাক, মাছটি পলাইয়াছে। ওটা কিন্তু আর বাঁচবে না— ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝামটায় নিশ্চয়ই ওটার হাড়টাড় ভেঙে দিয়েছে।

বন্যার জলের উতরোল কল্লোলধ্বনি সকলেরই কানে সহিয়া গিয়াছে। সূর্যের কিরণ ঢেউয়ের উপর পড়ায় সেদিকে তাকানো যায় না। একটি চালা ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার উপর তিনজন লোক পরিত্রাহি চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।— কি বলিতেছে বুঝা যায় না; না বুঝা গেলেও আন্দাজ করা যায়। চালার চতুর্দিকে সর্পিল ঢেউয়ের রাশি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; ফণা তুলিয়া সহস্রমুখ বাসুকি শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একরাশ সাদা আলোকময় বারিকণা চালাটিকে ভিজাইয়া দিল।

পিছনে একটি শবদেহ আসিতেছে তীব্রগতিতে। একটি কাক চোখমুখের উপর ঠুকরাইতেছে।

সুমৃৎ তিয়রের দাওয়ার নিচেও ঢেউ লাগিতেছে— ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল্ মধুর মনোরম ছন্দে। এ আঘাতে প্রচণ্ডতা নাই; মাটির চাপ ভাঙিয়া ফেলিবার, অশথগাছ ভাসাইয়া লইবার, উগ্র উদ্দণ্ডতা নাই। রণচণ্ডিকা কৌশিকী মাঈ, অভয়হস্ত বুলাইয়া তিয়র শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছেন। ও পাড়ে ভুখনাহা দিয়ারার দক্ষিণের পাহাড় অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। এর মধ্যেও আধেঙ্গা হাঁসের দল পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। এখানে বৌনী বনপরের আর মসজিদের বারান্দায় জুমরাতি মীরশিকারের হাত একই সঙ্গে নিশপিশ করিয়া উঠে।

দিনের পর রাত আসে, আর রাতের পর দিন। একগলা জল বহিয়া পশ্চিমের উঁচু ঘরের বারান্দা হইতে আধশুকনো মকাই লইয়া আসা হয়।

"দেবীস্থানের পশ্চিমের নিচু জমিটায় এবার সাড়ে তিন বিঘা অঘানী ধান লাগিয়েছিলাম। এই এক-একহাত হয়েছিল।"

"আমি তো বনপরটোলার পাশের দহের ধারের ধান, তৈরী ভাদই ধান তুলতেই পারলাম না। সারা বচ্ছর বালবাচ্চারা কি খাবে।"

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাওয়াবেন।" সকলেই শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলে; কিন্তু কথাটি যেন অন্তরের ভিতর হইতে আসে না; মন মানিতে চায় না।

"সুমৃতের সাত শো বিঘা ধানের খেত ডুবেছে, পাঁচ শো বিঘা ভুট্টার খেত।"

"নৌখে ঝার বারো শো বিঘা ধানের খেত, আর সতেরো শো বিঘা মকাইয়ের খেত।"

"নৌখের বেলায় ছোটকী বিঘা দিয়ে মাপছিস নাকি— সাড়ে চার হাতের লগার বিঘা?"

"প্রায় অর্ধেক মকাই কিন্তু আগেই ঘরে তোলা হয়েছিল।"

"তোলা হয়েছিল তো তোলাই থাকল।" সকলে হাসিয়া উঠে। "মকাই হয়েওছিল তো ভারি। বর্ষাতে জল বসে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম গাছগুলো কুটি-কেটে গরুকে খাওয়াব; তাও কৌশিকী মাঈয়ের দয়ায় হল না।" সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। কেহ বাধা দেয় না, বারণ করে না। একই ব্যথা সকলের। একজনের অশ্রুর ভিতর দিয়া সকলের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ পাইতে চায়।

জল কমিবার নাম নাই। এরূপ করিয়া আর কতদিন চলে। তিন দিন তো হইয়া গেল। আজ জেলে-ডিঙিতে করিয়া পাৎরঙ্গী ও তাহার ছাগলটিকে এখানে আনা হইয়াছে। সেই চালার উপর দুইটি সাপ উঠিয়াছিল। তাহারা মানুষ দেখিয়া নড়ে না; তাড়া দাও, হাততালি দাও, সরে না— কেবল পিট্ পিট্ করিয়া তাকায়। ভয়ে পাৎরঙ্গী চীৎকার করে।

ছেলেপিলের চ্যাঁ ভ্যাঁ। নৌখে ঝার বারান্দা ও আশপাশের সব জায়গাই নরক হইয়া উঠিয়াছে। ঘাসপাতা-পচার গন্ধও আকাশে বাতাসে সর্বত্র।

নদী দিয়া কোনো নৌকা গেলেই বারান্দার লোকেরা তাহাদের ডাকে— চীৎকার করিয়া, হাতছানি দিয়া, গামছা উড়াইয়া। কিন্তু গরু ছাগল ধান ছেলেমেয়ে ভরা নৌকাগুলি ফিরিয়াও তাকায় না। কোনোটিতেই তিলধারণের স্থান নাই।

হতাশার গ্লানিতে যখন লোকের মন ভরিয়া গিয়াছে সেই সময় হঠাৎ দেখা যায় একখানি হাজার-মণী নৌকা। "এই দিকেই তো আসিতেছে।" তাহা হইলে কি শেষ পর্যন্ত কৌশিকী মাঈয়ের দয়া হইল! জয় কৌশিকী মাঈকি জয়। ছেলেবুড়া সকলে উঠিয়া দাঁড়ায়। নৌকা হইতে গান্ধীটুপি-পরা ছেলে চ্যাঁচায়—"আগে বাচ্চারা আর মায়েরা। পরের দলে আসবে পুরুষেরা। যাবে গঞ্জের বাজারে। সেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বানের জল আবার বাড়বে। কাদার দেওয়াল ধ'সে পড়বে। তার আগেই সকলে চলে এসো, চলে এসো—দেরি কোরো না।"

মেয়েরা বলে, "আমরা একলা যাব নাকি? তার চেয়ে এখানে মরা ভালো।" বলে, আর যে যার আমসি আচার আর বড়ির পুঁটুলি গুছায়।

"আচ্ছা, তাহলে একজন দুজন বেটাছেলে আসুন।" একে একে নৌকায় লোক ওঠে। ছোট ছেলেরা মুখে আঙুল দিয়া হাসে। মেয়েরা চোখে আঙুল দিয়া জল মোছে। পুরুষেরা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকায় আর বলে, "ভাবিস না, আমরাও আসছি।"

"এটা নৌখে ঝার বাড়ি না? আসুন, আপনারাও আসুন।"

"নৌকায় কারা? মুসহর ধাঙ্গড়ের মেয়েরা? সুমুতের লোকেরা? আমাদের ব্রাহ্মণ মেয়েরা পরের নৌকায় যাবে। না না, ভয় পাচ্ছি না। আপনারা মহাৎমা। আপনাদের সঙ্গে পাঠানোতে আবার ভয় কিসের? কথাটা অন্য।"

গান্ধীটুপি-পরা ছেলেরা তাড়া দেয়। বচসা চলে। তাহার পর ব্রাহ্মণ-বাড়ির মেয়েরা একে একে নৌকায় ওঠে। মুসহর মেয়েরা সরিয়া তাহাদের জন্য আলাদা জায়গা করিয়া দেয়। সুমৃতের বাড়ির মেয়েরা কুশীর অন্য পাড়ের পাহাড়ের গাছগুলি গুণিবার চেষ্টা করে।

"পুরুষদের মধ্যে থেকেও দু-একজন আসতে পারেন; পরের ব্যাচে বাকি সকলে যাবেন। ততক্ষণ কিছু ভুট্টার ছাতু দিয়ে যাব নাকি?"

"চাল আছে নাকি? ভুট্টার দরকার নেই। কেরোসিন তেল আছে? পোকামাকড়ের মধ্যে রাত-বিরেতে দরকার হয়। সরষের তেল? নুন? দেশলাই? পাঁকুইএর ওষুধ? কিছুই নেই?"

"না, আমরা রিলিফ-পার্টির লোক না— রক্ষা-পার্টির লোক। রিলিফ দিতে আসি নি। লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এসেছি।"

"না না, ভুট্টার কথা বললেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চলে। চলিতে আর চায় না। হাওয়া থাকিলেও না-হয় পাল তুলিয়া দেওয়া যাইত।

"হরিণকোল সড়কের পাশ দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবি।" হরিণকোল সড়ক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। হরিণকোল পর্যন্ত গিয়াছে। রাস্তা কোথায় ছিল, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কেবল রহিকপুরার পশ্চিমে যেখানে ভীষণার নালী আসিয়া কুশীতে পড়িয়াছে, সেইখানে ভীষণার উপর একটি পুল ছিল। পুলের রেলিঙের উপরাংশ দেখা যাইতেছে।

গোবরাহর নিকট পৌঁছিতেই সাড়ে চার ঘণ্টা লাগিয়া গেল। এখানে জলে একটি প্রকাণ্ড ঘূর্ণী; বিরাট পরিধি লইয়া সাদা ফেনিল আবর্ত। নাম কালভৈরোকা কুণ্ডী। কালভৈরব দুধ দিয়া সিদ্ধির সরবৎ তৈয়ারি করিতেছেন; আঙুল দিয়া নিচের থিতানো চিনি আর সিদ্ধি-বাঁটা দুধের সহিত মিশাইতেছেন। নৌকার সকলেই তাহা জানে, এবং সেইজন্য এখানে প্রণাম করে— রক্ষা করো আমাদের কালভৈরব! এই জলের নাগরদোলায় অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে একটি কলাগাছের ডোঙা, কয়েকটি পোড়াকাঠ, একটি কলসী, আর ফেনার সহিত রাশীকৃত আবর্জনা।

"সাম্‌হালকে! বাঁয়ে দাব্ কর্ চলো।" হঠাৎ নৌকাটি অসম্ভব দুলিয়া উঠে। একদিকে কাত হইয়া যায়। মেয়েরা আর ছেলেপিলেরা চীৎকার করিয়া এ ওর গায়ে গিয়া পড়ে। তাহার পরই নৌকাটি অন্য দিকে কাত হয়। নৌকার ভিতর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মায়েরা ছেলেদের বুকে চাপিয়া ধরে। নৌথে ঝার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সুমৃৎ তিয়রের স্ত্রী ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ব্রাহ্মণদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে হঠাৎ নৌথে ঝার পুত্রবধূকে কাঁধ ধরিয়া বসায়। শাশুড়ী বৌ দুজনকেই বলে "ভয় কি! কৌশিকী মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" সেও পাশে বসিয়া নৌথের পুত্রবধূকে ধরিয়া থাকে— আহা, বৌটি এখনো ভয়ে কাঁপছে। মাঝিরা চীৎকার, করে, 'কালভৈরো কী জয়!'

"নৌকোর একদিকে সবাই কেন? মেয়েদের কি কোনো কালে আক্কেল হবে!"

আর-একজন মাঝি বলে, "হাজারমণী নৌকো ব'লে বেঁচেছে। না হ'লে এখনই কালভৈরোর ভাঙের গোলমরিচ হয়ে যেত।"

'আর খানিকটা !' 'জোরে !' 'দাঁড় বন্ধ কোরো না ভাইয়ো !' 'বাস্ ! আর এক কোশ !'

গঞ্জের বাজার। সেদিকটা উঁচু। তাই সেখানে জল পৌঁছায় নাই। সেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। চৌবেদের আমবাগানে বার্মা ইভ্যাকুঈদের জন্য যে ক্যাম্প হইয়াছিল, তাহারই অবশেষ এখনও সেখানে নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে। এককোণে একটি কুষ্ঠরোগীর কালো ঝুলমাখা মাটির হাঁড়ি বাঁশের সহিত ঝুলিত; আর রাজ্যের গরু ছাগল এখানে থাকিত। তাহাই এই চার বৎসর লোকে দেখিয়া আসিতেছিল। আজ হঠাৎ ইহার গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে— রিফিউজি ক্যাম্প।

মেয়েদের আনিয়া এখানে নামানো হইল। আরও দূর-দূরান্তর হইতে লোক আসিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন কোনো যোগের সময়ের গঙ্গার ঘাটের ভিড়—"বান তো সোজা হয় নি। ফুলকাহা থেকে বাঘডোবড়া— সাতাশ মাইল। কত গাঁ যে ভেসেছে তার কি ঠিক আছে।" তাই এই ভিড়। তবু তো কত লোক ধর্মশালায় আছে; কত লোক এখানে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে।

এখানে এক-এক গাঁয়ের লোক, এক-এক দিকে জায়গা দখল করিয়াছে।

"আপনারা কোথাকার— ফুলকাহার নাকি? আপনারা? আর আপনারা?"

মোটামুটি আলাপ-পরিচয় জমিয়া ওঠে। তা কেবল মৌখিক। হাজার হইলেও তারা ভিন্-গাঁয়ের লোক, নিজের গাঁয়ের লোক হইল আপনার জন।

"আর চাটাই চাই এখানে— চাটাই!"

ভলান্টিয়ররা চেঁচায়, "কটা উনুন হবে? চারটে? স্লিপ নেন। রিলিফ আপিসে যান। ঐ যে নিশান টাঙানো— গেটের পাশে গরু শুয়ে রয়েছে— ঐ বাড়িটা। ঐখানে ইট পাবেন।"

"কে কে যাবে ভাই, ইট আনতে?" ঝা-গিন্নী, তিয়র-গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুসহরনীরা বলে, "আমরা আনবো"; সাঁওতালনীরা বলে, "আমরা আনবো।"

"তোমরা কি মা এসব কাজ করতে পার, না কোনোদিন করেছ। আমাদের গাঁয়ের ইজ্জৎ খ্যাতি আমাদের হাতে। তোমাদের কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।"

সব দরকারী জিনিসই বাহির হইল— মায় শিলনোড়া পর্যন্ত। সাঁওতালনীরা ছাড়া আর সকলেই বলে, আমরা বামুনের হাতের পেসাদ পাবো। ব্রাহ্মণীরা হাসিয়া উনানের দিকে যান। তিয়র মহিলারা মশলা বাঁটিতে বসে।

ছোট ছেলেদের আগে খাওয়াইয়া দেওয়া হইবে। দিয়াছে ভুট্টার ছাতু। তিয়র মেয়েরা ছাতু মাখে, ব্রাহ্মণীরা রুটী সেঁকেন।

সুমন্তের স্ত্রী নৌখের স্ত্রীকে বলেন, "দিদি ঐ কচি পোয়াতি বৌটাকেও এখনি বাচ্চাদের সঙ্গে খাইয়ে দাও। কম ঝক্কি তো গেল না ওর উপর আজ। এখন সবই ভগবানের কৃপা।"

বৌ ঘাড় নাড়িয়া এখন খাইতে আপত্তি জানায়। ঝা-গিন্নী হাসিয়া বলেন, "দেখলে তো আমার বৌয়ের ঘাড় নাড়া। আর, একবার যে ঘাড় নেড়েছে, আর ওকে 'হাঁ' বলাও তো।"

তিয়র-গিন্নী বলেন "এই জিনিসই তো ভালোবাসি না বৌমা। যা বলি তাই শোনো। 'না' কোরো না। তাহ'লে বড্ড রাগ করব কিন্তু, মা।"

বৌ শালপাতা লইয়া বসে।

শাশুড়ি একগাল হাসি মুখে লইয়া বলেন, "এ আজ আজব কাণ্ড দেখালে বহিন।"

বড়দের খাওয়াদাওয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যে আর দুইখানি নৌকায়, গ্রামের পুরুষেরা ও মসজিদের বারান্দার লোকেরা আসিয়া পড়ে। ছেলেদের অধিকাংশই শুইয়া পড়িয়াছে। যাহারা জাগিয়া ছিল তাহারাই পেট্রোম্যাক্সের আলোতে প্রথম চিনিয়াছে আত্মীয়পরিজনকে।

ব্রাহ্মণ মেয়েরা থালা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। অন্য জাতের মেয়েরা ঘোমটা টানিয়া হাত গুটাইয়া বসে। সাঁওতালনীরা সাঁওতালদের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে দুই হাত দিয়া মকাইয়ের রুটি খায়।

মসজিদের দলের লোকেদের মধ্যে অধিকাংশই শীর্ষাবাদিয়া মুসলমান— এদেশে বলে 'বাধিয়া'। ইহাদের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। মাছের মতই যেন ইহারা জলের জীব। গঙ্গাতে যেখানে চড়া পড়ে সেখানে তাহারা হানা দেয়। এমনি করিয়া দলে দলে রাজমহলের গঙ্গার পথে বিহারে আসিয়া এ অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহারা নাকি মুর্শিদাবাদের নবাবের হাবসী সৈন্যদের বংশধর। তাই জলের ধারে থাকিলেও ইহাদের রক্ত এখনও গরম। হাসিমস্করা করিতে করিতে হঠাৎ চটিয়া রামদা লইয়া মারিতে যায়। এদের মোড়ল মনিরুদ্দি শীর্ষাবাদিয়া সঙ্গের মেয়েদের একদিকে জায়গা দেখাইয়া দেয়। তাহার পর ব্রাহ্মণ আর তিয়রদের বলে, "চলুন, আমরা বেটাছেলেরা সব একটু বাইরে ঘুরে আসি। দেখছেন না, নইলে মাঠাকুরেনদের খাওয়া হবে না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো" বলিয়া নৌখে ঝার সহিত সকলে বাহির হইয়া যায়। মেয়েরা আবার খাইতে আরম্ভ করে। ভিনগাঁয়ের বেটাছেলের সম্মুখে খাইতে আবার লজ্জা কি। তাড়াতাড়ি সকলে খাওয়াদাওয়া সারিয়া লয়। আবার উনুনে ফুঁ দেওয়া আরম্ভ হয়।

ফুলকাহার দলের এক বর্ষীয়সী মহিলা বলেন, "এদের রান্নাবাড়ার কি আর বিরাম নেই?"

রহিকপুরার ব্রাহ্মণ, তিয়র, শীর্ষাবাদিয়া, বনপর সব মহিলাই একসঙ্গে বলিয়া উঠে—'তাতে আপনার কি হচ্ছে', 'আমরা সারারাত রাঁধব', 'বাড়িতে আমরা খেতে পাই না, এখানে এসে দুটি পাচ্ছি। না ভাই, তাই না?' আরও কত মন্তব্য তাহারা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিয়া বলে। বৃদ্ধা ঘুমাইয়া পড়িবার ভান করে।

"নিশ্চয়ই গোবরাহার বাড়ি।" রহিকপুরার সব মেয়েরা একসঙ্গে হাসিয়া উঠে। এ অঞ্চলে গোবরাহার লোকদের বোকা বলিয়া দুর্নাম আছে।

পরের দিন।

সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। ক্ষতির পরিমাণ এই কয়দিন কেহই ভাল করিয়া ভাবিবার সময় পায় নাই। নদীরও কূলকিনারা নাই; দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়াও কূলকিনারা পাওয়া যায় না। বাড়িটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে কিনা কে জানে!

ডাকবাংলাতে জেলা হইতে হাকিম আসিয়াছেন। কোথাকার এক ছোকরা কুশী নদীর ভয়ানক বানের কথা কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছে। সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরা। আবার লিখিয়াছে, "নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র"। একখান রদী কাগজ— তাতেই আবার লেখা "জাতীয় দৈনিক পত্র"। উহা দেখিয়াই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এতক্ষণে হয়তো উপর হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। কাল হয়তো জেলা-কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় খবর-দেওয়া কাগজের কাটিং সেক্রেটারিয়েট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া কলেক্টরীতে আসিয়া যাইবে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া চাকরি করিবার কপাল আর আজকাল নাই।

কেরানি বাবু আসিয়া খবর দেন, "কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে; এ অঞ্চলের রইস এঁরা।"

"আচ্ছা, আসতে বলুন।"

"হেঁ হেঁ হেঁ— এই আপনার সঙ্গে ফ্লড্ সম্বন্ধে কথা বলতে এলাম। আপনি এসেছেন শুনেই ছুটে এসেছি। একটা আলাদা ফ্লড্-রিলিফ-কমিটি কায়েম করা যায় না?"

"একটা আছে না?"

"ওটা কংগ্রেসীদের ঘরোয়া। সেবার কাজ তো কেবল খদ্দরধারীদের একচেটিয়া নয়।"

"আচ্ছা এ বিষয়ে পরে কথাবার্তা হবে। এখন একটু অন্য কাজ আছে।"

"হেঁ হেঁ, আচ্ছা, তাহলে পরে আবার দেখা করব"— কয়েকপাটি পান-খাওয়া দাঁতের সমাহার। বোর্‌স্! কম্পমান দরজার পর্দায় এখনও তিনটি ছায়া দেখা যাইতেছে।

ক্রীং ক্রীং।

"হজৌর।"

"ওভারসিয়ার বাবুকো সেলাম দেও।"

"হজৌর।"

"ওভারসিয়ার বাবু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এক্স্ট্রা নৌকো নেই?"

"১৯৩৭এর ফ্লড্এর পর আটখানা নৌকো এখানে রাখবার ব্যবস্থা হয়। এতদিন এখানে পড়ে ছিল। এ কয় বছর কোনো কাজে আসে নি। এইসব রইসরা নিজেদের বাড়ির কাজে লাগাতেন। ব্যবহারের অযোগ্য ব'লে এ বছর চেয়ারম্যান সাহেব নিলাম ক'রে দিয়েছেন।"

"কিনেছে কে?"

"এই খানিক আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাই।"

"তাঁরা ব্যবহারের অযোগ্য নৌকো নিয়ে কি করবেন? ব্যবহারের অযোগ্য রিপোর্ট দিয়েছিল কে? আপনি? ব্যবহারের অযোগ্য— নন্‌সেন্স্। ঐ নৌকোয় বেঙ্গলে নুন 'স্মাগ্‌ল্' করা হবে। সব খবর আমরা রাখি। কেরানি বাবু লিখুন। টু দি চেয়ারম্যান। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য কখানি নৌকো দিতে পারেন? টু দি কলেক্টর···আজকের রিপোর্ট ভোরের ট্রেনে যেন চ'লে যায়, কেরানি বাবু।

"নিরঞ্জন বাবুকে ডাকো— রিলিফ-কমিটির সেক্রেটারীকে। চাই ফিগার্‌স্। কত গ্রাম

অ্যাফেক্‌টেড্‌ ; লোক মরেছে কি ? গরু বাছুর ? কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম একেবারে ভেসে গিয়েছে ? কত নৌকো দরকার ? ভেটারীনারী ডাক্তারকে নিশ্চয়ই সপ্তাহে একদিন এখানে সেণ্টার খুলতে হবে। আরও কত লেখাপড়ার কাজ আছে। স্টেনোকে নিয়ে এলাম না, বড় ভুল হয়ে গেল।"

দিনরাত লেখাপড়ার কাজ চলিতেছে ; আর চলিতেছে সোডা আর রম্‌।

"মেডিকাল ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে লেখাপড়া। ভেসেলিন লাগবে বললেন না ডাক্তারবাবু পাঁকুইয়ের জন্যে ? আর সালফিনামাইড্‌। কলেরা ইনকুলেশন, সে তো পরে হলেও চলবে। কুইনিন, মেপাক্রিন। ডি. ও. দিন হেল্‌থ অফিসারের কাছে। আর-একখানা দিন রিজিয়নাল গ্রেন সাপ্লাই অফিসারের কাছে— তু ওয়াগন ভুট্টার জন্যে তাগাদা। কলেক্টরের কাছে চিঠি দিন— জল সরলেই বীজ লাগবে। হাজার মণ কলাই, হাজার মণ কুরথী।

"স্ট্যাটিস্‌টিক্স জোগাড় করুন, কত বাড়ি ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তাদের জন্যে গড়ে দেড়শো টাকা ক'রে বাড়ি তৈরির গ্র্যাটুইটাস রিলিফ দেওয়া হবে। হিসেবের ফর্দ করে পাঠিয়ে দিন নেক্‌স্‌ট ডাকে। হ্যাঁ, আর একটা লিস্ট করতে হবে তাকাভি লোনের। লোনে বীজ দেওয়াই ভালো। টাকা পেলে তারা অন্য কাজে খরচ করে ফেলবে।

"টু দি কলেক্টর—এ অঞ্চলের গরু-মহিষ যে-সকল নির্বিঘ্ন স্থানে পাঠানো হইয়াছে সেখানকার জমিদারেরা, অথবা তাহাদের কর্মচারীরা, গরু চরার জন্য মোটা টাকা আদায় করিতেছে। সমাজের 'পেস্ট' এরা। তাদের কাছে চিঠি দিন, এই টাকা লওয়া বন্ধ করিতে। আরোগ্যের পথের রোগীর জন্য চাই মিছরি। সরকারী জেলা-ফ্লড-কমিটির যে আটখানা নৌকো ছিল তাহার কি হইল ?

"এখানকার রিলিফ কমিটিতে কংগ্রেসী আর অকংগ্রেসী দলে বিশাল মতদ্বৈধ আছে। নির্দেশ দিন কি করি।

"একটা স্কীম এসেছে— পাট দেওয়া হবে বন্যাপীড়িত লোকদের। নেওয়া হবে তাদের কাছ থেকে পাটের দড়ি। মজুরি তারা পাবে। মজুরির কিছু অংশ গভর্মেণ্টের ঘর থেকে দিতে হবে। এর নাম স্থৎরী সেণ্টর স্কীম।"

লেফাফা, চিঠি, টেলিগ্রাম, সার্ভিস-মার্কা ডাকটিকিট, দিস্তা দিস্তা কাগজ, কলিং বেল্‌।— "অত বড় কাগজে লিখবেন না। আদ্ধেক ক'রে নিন।" কেরানিবাবুর নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ নাই। লেখাপড়ার কাজ বাড়ে ; কাজ এগোয় না। কাগজের চাপে আসল কাজের দম বন্ধ হইয়া আসে।

উত্তর আসা আরম্ভ হইয়াছে। ফাইল বাড়িতে থাকে।

"জেলায় অধিক বীজ না থাকায়, কৃষিবিভাগকে লেখা হইয়াছে। তাঁহারা দিতে পারিবেন কি না সে আশ্বাস এখনও পাওয়া যায় নাই। অসুবিধা হইতেছে যে, কণ্ট্রোল দাম বাজার-দরের অর্ধেক।

"রেল-লাইনে গরু চরা বারণ। উহার উপরের ঘাস কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো যাইতে পারে। কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, যাহারা ঐ ঘাস রেল-কোম্পানির নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে, তাহাদের কি হইবে। যাহা হউক, রেলওয়ে এস. ডি. ও.-কে এ বিষয় লিখিতেছি।

"স্থৎরী সেণ্টর স্কীম অসম্ভব। যাহা হউক আমি লোকাল গভর্মেণ্টকে রেফার করিতেছি।

"বার্লি লোকাল মার্কেট হইতে জোগাড় করিবার চেষ্টা করিবেন।

"ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড লিখিতেছে যে, বন্যাপীড়িত লোকদের নৌকা সাপ্লাই করিবার নৈতিক অথবা কানুনী দায়িত্ব তাহাদের নাই। তাহাদের এই জবাবের জন্য শিক্ষা দেওয়া উচিত।

"গ্রাটুইটাস রিলিফের জন্য পাঁচশো টিন কেরোসিন তেল চাহিয়াছেন। আজকাল কন্টোলের বাজারে ইহা অসম্ভব। পনেরো টিন লোকাল মার্কেট হইতে লইবেন। আমি পরে রিপ্লেস করিব।

"ডিস্ট্রিক্ট ফ্লড কমিটির সরকারী নৌকাগুলির কোনো হদিস পাওয়া যাইতেছে না। যে অফিসারের দায়িত্ব তাঁহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া চিঠি দিয়াছি।"

চারিদিকে প্লাবনের জলের ফেনা; এখানে কেবল কথা কথা— কথার ফেনা! লাল ফিতার নাগপাশ আষ্টেপৃষ্ঠে বর্তমান সমস্যাটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে— অজগরের নিষ্পেষণে হরিণশিশুর মতো।

এদিকে সুমৃৎ নৌখেকে জিজ্ঞাসা করে, "ও কি করছে মহাত্মাজীর চেলারা।"

"আসশওড়ার জঙ্গলে গন্ধওয়ালা দাওয়াই দিচ্ছে। সাপের ওষুধ।"

"এ কি এত জাঁতা কেন?"

জবাব দেয় ভলান্টিয়র, "ব'সে ব'সে ভুট্টা পেষো। অর্ধেক তোমাদের। অর্ধেক আমাদের ফেরত দেবে। ব'সে খাবে কেন? ভিক্ষে নেবে কেন? নিজের রোজগার নিজে খাও।"

নৌখে আর সুমৃৎ দুইজনে বলাবলি করে, "কথাটা ব'লেছে মার্কার কথা, দামী কথা।"

সারঙ্গীলাল রইস হাকিম সাহেবকে লইয়া বজরায় উঠিতেছে; সাহেবকে বন্যাপীড়িত এলাকা দেখাইতে হইবে। সঙ্গে লইয়াছে কলের গান, থার্মোফ্লাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়র, সোডার বোতল, আরও কত কি।

সুমৃৎ আর নৌখে বোতলের দিকে ইসারা করিয়া চোখ টেপাটিপি করে।

রাত্রে হঠাৎ নৈখে ঝার পুত্রবধূর প্রসববেদনা উঠিয়াছে। সুমৃতের স্ত্রী উৎকণ্ঠা চাপিয়া বলে, "এ আমি আগেই ভেবেছি। এই শরীরের অবস্থায় কি এত টানাপোড়েন সয়।" সুমৃৎ দৌড়িয়া রিলিফ কমিটিতে খবর দিতে যায়। শীর্ষাবাদিয়া মনিরুদ্দি, আর তাহার ভাই ছলিমুদ্দি ক্যাম্পের এক কোণায় নিজেদের চাটাইগুলি দিয়া ঘিরিয়া আবরু করিয়া দেয়। কানী মুসহরনী মালসাতে করিয়া কাঠের আগুন লইয়া আসে। সুমৃতের স্ত্রীর সহিত অনেকেই সেই চাটাই-ঘেরা ঘরে সারারাত চেঁচামেচি করে।

ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে শোনা যায় ঝা-গিন্নী বলিতেছেন, "এতটা বয়স হল; কিন্তু এখনও আমি এসবে একেবারে হকচকিয়ে যাই। ভাগ্যি তুমি ছিলে বহিন। না হলে বিদেশে বিভুঁয়ে, কি দশা যে হত এখন, তাই ভাবি।"

বাড়ি ছাড়িয়া কাহারও মন টিকে না। মৈনা বলদজোড়ার সোজা শিংদুটিতে কতদিন তেল দেওয়া হয় নাই। লালিয়া গরুটি আবার জোলো ঘাস খায় না। হরষু চরবাহা গরুগুলিকে ভোখলাহার মাঠে কি অবস্থায় রাখিয়াছে, কে জানে। গোলার মকাইগুলি পচিয়া উঠিল। পশ্চিমের ঘরের দেওয়াল বোধ হয় এতদিনে পড়িয়া গিয়াছে। পাংরঙ্গীর লাউগাছটি বোধহয় এত জলে মরিয়া গেল। আলিজানের

বড় বলদটার আবার ঘাড়ের ঘা শুকাইতে ছিল না। গাঁয়ে বলদের ঘায়ের জন্য একটুও ফিনাইল পাওয়া যায় না। আর এখানে, নালীর মধ্য দিয়া ফিনাইলের নদী বহিতেছে। কবে যে আবার ওপারের সবুজ মখমল ঢাকা পাহাড়ের নিচেটা আবার দিনকয়েক আগের মত সাদা হইয়া যাইবে, কোশের পর কোশ সাদা কাশের চুনকামে। দিনরাত গল্পগুজব। কাপড় চিনি কেরোসিন তেলের অভাবের সেই একই কথা একঘেয়ে লাগিতেছে। রিলিফের বাবুদের আজব চালচলনের কথা, আর কতদিন বলা যায়। —একটু প্রাণভরে নদীর জল খেতে দেবে না এরা। কি যেন একটা বদ গন্ধওয়ালা ওষুধ মিলাইয়া দিবে।— এখানে খযনির থুতু ফেলতে দেবে না। থুতু আবার গিয়ে ফেলে আসতে হবে কোথায় ?

নিরবচ্ছিন্ন অবসরের একঘেয়েমির মধ্যে এইসব বাধানিষেধগুলি আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে।

নৌখে, সুমুৎ আব মনিরুদ্দি প্রত্যহ বহু রাত পর্যন্ত জাগিয়া গল্প করে। ভিন গাঁয়ের নানারকম লোক— বলা তো যায় না। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে কেউ যদি রাতে ভয়ডর পাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

ঘুম ভাঙিলেই প্রত্যেকেরই মনে পড়ে— জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে কি ? ভোর হইতেই প্রত্যহ সকলে ছুটিয়া দেখিতে যায় জলের অবস্থা। স্টীমারঘাটের পাশের ময়রার দোকানের নিচে ছিল একটি টিউবওয়েল। এখন আর তাহা ব্যবহার করা হয় না ; কিন্তু এখন সেটি হইয়াছে কত জল বাড়িয়াছে তাহা মাপিবার যন্ত্র।

"আজ যেন কলের উপরের খাঁজটি দেখা যাচ্ছে।"

"দুর, ও তো হাওয়ায় জলে ঢেউ লেগেছে, তাই।"

সেদিন প্রত্যূষে নৌখে ঝা নদীতে মুখ হাত ধুইতে গিয়াছে। হঠাৎ সে উত্তেজিতভাবে দৌড়াইয়া ফিরিয়া আসে। হঠাৎ চীৎকার করিতে করিতে আসে, "জল কমছে, জল কমছে সুমুৎ—'

"সত্যি ?" যেন বিশ্বাস হইতে চায় না।

"তা' না তো কি মিথ্যে বলছি ? দু আঙুল চার আঙুল নয়— আধহাত কমেছে।"

"চুপচাপ থাক্, আর বলিস না। আবার হয়ত বেড়ে যাবে।"

সকলে ধড়্মড়্ করিয়া উঠে, ছেলেরা কাঁদে। মায়েরা ছেলে ফেলিয়া জল দেখিতে যায়। লোকে লোকারণ্য, টিউবওয়েলের ত্রিশ গজের মধ্যে যে পৌছিতে পারে সেই ভাগ্যবান।

"পুবে হাওয়া দিচ্ছে। আর জল বাড়বে না।"

"কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।"

"আবার আশ্বিনে আর-এক ঝোঁক আছে।"

"আর এখনই একটু গরম পড়লে, আজই আবার জল বেড়ে যাবে।"

হট্টগোলে হাকিম সাহেবের ঘুম ভাঙে, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট পরিয়া এদিকে আসেন। কেরানিবাবু ওভারসিয়রবাবু আগাইয়া আসে। "জল তাহলে সত্যিই কমল। কালকের স্টেট্স্‌ম্যানে দেখছিলাম যে এলাহাবাদে গঙ্গার ম্যাক্সিমাম জল বাড়বার রেকর্ড পৌছতে আর মাত্র একফুট বাকি।"

ওভারসিয়রবাবু এই অভাবনীয় সংবাদের আরও বিস্তৃত খবর জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করেন।

"হটো, হটো, রাস্তা ছাড়ো।" হাকিম ডাকবাংলাতে ফিরিয়া যান।

হু হু করিয়া জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেরূপ গতিতে বান আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তীব্রতর গতিতে জল শুকাইতেছে।

দলে দলে লোক প্রতিঘণ্টায় জলের মাপ দেখিতে আসে।

এ কয়দিন বন্যার স্রোতে, গ্রামের কলহ, মনের পঙ্কিলতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্লাবনের বিশালতার মধ্যে গ্রামীন মনের সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। পরের দিন পোবগ্রাহা দিয়ারার কালো মাটি, জলের মধ্য হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনের অবচেতন স্বার্থলোলুপ কিষাণ-মন, আবার চেতন হইয়া উঠে। অস্বাভাবিক পরিবেশের সমাপ্তির সহিত স্বাভাবিক গ্রামীন মনও মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

কালো, ভিজা, আঠালো পলিমাটি। কলাই কুর্থী ফেলিয়া দাও, কোঁচড়ের মধ্য হইতে কেবল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। জমি তৈয়ারি করিবার দরকার নাই, কেবল ফেলিবার মেহনৎ; নরম পাঁকের মধ্যে পা বসিয়া যায়, সেই পা কাদা ঠেলিয়া তোলার মেহনৎ; নিড়ানোর দরকার নাই; মজুরের খরচ নাই; সোনার ফসল ফলিবে।

যাহা পাও নিজস্ব করিয়া লও; সব জিনিস ব্যক্তিগত করিয়া লইতে চেষ্টা কর; নিঙড়াইয়া লও, শুষিয়া লও, চুরি করিয়া লও, লাঠির জোরে লও।

জমি, পলিমাটি-পড়া কালো জমি দেখিয়া, আদিম লোভাতুর কিষাণ-মন কি চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে? বন্যার জল সরিতেছে— রাখিয়া যাইতেছে কুটিল সংকীর্ণ মনের ঈর্ষাদ্বন্দ্বের উর্বর ভূমি; কলাইয়ের ও কলহের ফসলের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

নাম লেখাও কন্ট্রোল দরে কলাই কুর্থী বীজের জন্য। সুমৃৎ নিজের জমি লেখায় তিন হাজার বিঘা, নৌখে লেখায় চার হাজার বিঘা।

সুমৃৎ অন্য তিয়রদের নাম লেখায়। হাকিম বলেন, "গেনা তিয়র; কত বিঘা জমি; কত টাকা তাকাভি চাই; একসঙ্গে সকলে কথা বলবেন না; আপনি কেন ওর হয়ে বলছেন; যার জমি সেই বলবে।"

সুমৃৎ বলে, "ও জাতে তিয়র, নিরক্ষর অন্ধ, তাই আমি বলে দিচ্ছিলাম।"

"অন্ধ?"

"লেখাপড়া জানে না, তাই বলছিলাম, দৃষ্টি নেই।"

নৌখে ঝা ব্রাহ্মণদলের নেতৃত্ব করে। বলে, "ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গতি। একে হুজুর বিনা পয়সায় বীজ দিতে হবে, এর জমি নেই এক ধূরও।"

সুমৃৎ বলিয়া উঠে, "না হুজুর, এর পনেরো-যোলো বিঘা জমি আছে।"

বচসা জমিয়া উঠে। হাকিম অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। "ওভারসিয়রবাবু, আপনিই তাহলে লিস্টটা করুন। আমি একটু আসছি।"

যে যাহা পারে সঞ্চয় করিতেছে। সাঁওতালদের জন্য বীজের কথা, না নৌখে ঝা, না স্থমৃতের মনে আসে। বিরসা মাঝি গরুর জন্য ফিনাইল চুরি করিয়া মাটির গেলাসে রাখে। মঙ্গল মুসহর রিলিফের বাবুদের কাছে চুপি চুপি ইহার খবর দিয়া আসে। পাংরঙ্গীর ছাগলটা শুকনো শালপাতা চিবাইতেছিল। গোকুল তিয়র এদিক-ওদিক তাকাইয়া তাহার পেটে সজোরে এক লাথি মারে। তুরিয়া বন্‌পরের পুত্রবধূ কাপড়ের আঁচলে, আধসেরটাক নুন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহা ভিজিয়া উঠিয়াছে। কানী মুসহরনী ভয় দেখায়, আমি হাকিমকে বলিয়া দিব। সাঁওতালেরা শুকনো শালপাতার বোঝা বাঁধে, বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য।

স্থমৃতের স্ত্রীর কাপড়খানি শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল। হঠাৎ সেখানিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'যত চোরের আড্ডা' বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ-মহিলাদের ভিতর দিয়া চলিয়া যান।

কাহারা কত তাড়াতাড়ি এখান হইতে বাহির হইতে পারে, তাহারই জন্য বাঁধাছাঁদা চলিতেছে। কয়দিনের মেলা ভাঙিয়া গেল। গন্থয়া মুসহর বলে, "বাধিয়ারা যাবে না?"

"মুখ সামলে কথা বলিস। শীর্বাবাদিয়া না ব'লে ফের যদি বাধিয়া বলিস, তাহলে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব— ব'লে রাখলাম।"

মুসহর আর সাঁওতালেরা বাহির হইয়া পড়ে, এ কয়দিনের হাসিখুশি আলাপ নাই। সকলের মনের মধ্যে আগামী সমৃদ্ধির ছবি; বাড়ি গিয়া কি দেখিব, এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও অতীতের ক্ষতি অনায়াসে ভুলিবার প্রয়াস।

তুচ্ছ জিনিস লইয়া ছোটোখাটো ঝগড়া লাগিয়াই আছে। হাতগজ, চেন, লগা, বিঘা কাঠার দ্বারা সীমায়িত, সংকীর্ণ জমির মালিক। উদারতা আসিবে কোথা হইতে? শীর্বাবাদিয়া, মুসহর ও সাঁওতালদের নৌকার দরকার নাই। মধ্যের কোশখানেক একবুক জল তাহারা হাঁটিয়া চলিয়া যাইবে। কিছু কষ্টই নাই। কতটুকুই বা বোঝা— কত কটা বীজই বা পাইয়াছে। মুসহর ছেলেপিলেরা এখনই বীজের কলাই চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মনিরুদ্দি বলে, "ছোটলোক কোথাকার। গায়ে কাদা ছিটোচ্ছে!"

"আমি কি ইচ্ছা ক'রে দিচ্ছি নাকি"— বিরসা সাঁওতাল জবাব দেয়।

গেন্থয়া মুসহর ফিস ফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "সেদিন ইস্কুলের কাছে বানে একটা হরিণ ভেসে এসেছিল। সেটাকে আমি আর হরিয়া প্রথমে ছুঁয়েছিলাম। ঐ শালা বাধিয়া মনিরুদ্দি কোথা থেকে এসে খচ্ করিয়া ছুরি দিয়ে হরিণটিকে জবাই করে। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণটার গায়ে থুতু দিয়ে দেয়— যাতে আর কেহ ঐ মাংস না খায়। একেবারে পাষণ্ড। কি দিয়েই যে ভগবান এদের স্বষ্টি করেছিলেন! হরিণটার পেটে আবার বাচ্চা ছিল। 'বাধিয়া' বলবে না, ওঁকে গুরুঠাকুর বলবে।"

তিয়রদের মধ্যে এক স্থমৃৎ নৌকা আনাইয়াছে, অনুরূপ ঝা তাহাতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। স্থমৃৎ বলে, "সরিয়ে নাও, নামিয়ে নাও বস্তা, জায়গা নেই।" অনুরূপ ঝা কাকুতি মিনতি করে।— নৌখের পুত্রবধূ আর-একটু ভালো না হইলে, নৌখে ঝা যাইতে পারে না; ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর-কাহারও নৌকা

ভাড়া করিবার সংগতি নাই, আর তাহা হইলেই তাহার কলাই বুনিবার দেরি হইয়া যাইবে। শীত পড়িলে আর কলাই বুনিয়া কি হইবে? পাঁক শুকাইলে, কলাই বোনা না-বোনা সমান।

"ও সব আবদার তোমার গুরু নৌখে ঝার কাছে গিয়ে করোগে যাও। শীগগির নামো বলছি।"

"আচ্ছা, ভগবান আছেন।"

"শাপ দেওয়া হচ্ছে। রহিকপুরার বামুনের দেওয়া শাপ স্থমুৎ তিয়র এই—" ফুঃ ফুঃ বলিয়া, হাতের তেলোয় ফুঁ দিয়া, নদীর দিকে উড়াইয়া দেয়।

স্থমুৎ মেয়েকে বলে, "মাকে ডাক্। এখনও সেখানে কি হচ্ছে?"

স্থমৃতের স্ত্রী নিজের কাপড়খানি তখনও খুঁজিতেছিলেন— "থাক্, ও আর পাওয়া যাবেনা। কোন্ মুসহরনী নিয়ে গিয়েছে কে জানে।— একবার আঁতুড়ঘরে কচি বৌটিকে দেখে আসা যাক—যতই ঝগড়া থাক্ বৌটি একদিন তো মা বলেছিল। বড় ভালো মেয়েটি, হাজার হ'লেও রহিকপুরার বামুনের ঝাড় তো নয়। এখনও সঙ্গদোষে খারাপ হতে পারে নি।"

হঠাৎ আঁতুড়ঘরে ঢুকিতেই দেখেন, নৌখে ঝার স্ত্রী তাড়াতাড়ি একখানি তাহারই শাড়ির মত আধময়লা শাড়ি প্রসূতির বালিশের নিচে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। তিয়র-গিন্নির মাথায় রক্ত চড়িয়া যায়। বৌটির সহিত দেখা করিবার কথা আর মনে থাকে না। বন্যার স্রোতের মত গালির স্রোত বহিতে থাকে। একজন সাঁওতালনী ঠেলিয়া দুইজনকে আলাদা করিয়া দিতে দিতে, নির্বিকারভাবে সঙ্গিনীকে বলে, "বিদেশে বিভূঁয়ে আকজালকার দিনে আঁতুড়ের কাপড় জোটানো যে কী ব্যাপার, তা কেউ ভাববে না।"

ভলান্টিয়াররা কর্ডন করিয়া বামুনের দলকে ঘিরিয়া রাখে। তিয়রেরা নৌকো হইতে চীৎকার করে "চোট্টা ভণ্ডের দল।" কর্ডনের ভিতর হইতে বামুনেরা বলে, "ছোট জাতের পয়সার গরম শীগগিরই বেরবে।"

নৌকা ছাড়িয়া দেয়। পাৎরঙ্গী আবার কখন তাহার ছাগলটিকে চড়াইয়া দিয়াছে নৌকার উপর। স্থমুৎ তিয়র ছুঁড়িয়া ছাগলটিকে নদীর তীরের দিকে ফেলে, আর সেটিকে উদ্দেশ করিয়া বলে, "তোর জাতভাইদের এখানে ছেড়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে আসিস।"

পাৎরঙ্গী চীৎকার করিয়া এককোমর জলে নামিয়া পড়ে ছাগলটিকে বাঁচাইবার জন্য।

বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ

শ্রীসুকুমার সেন

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিকে বাঙালী বৈষ্ণব একযোগে স্মরণ করে এসেছে প্রায় পাঁচ শ বছর ধরে। বৈষ্ণব-বাড়ীর সন্তান নয় এমন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বৈষ্ণব গীতিকাব্যভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হল বিগত শতাব্দীর মাঝের দিকে। সেই সূত্রে বিদ্যাপতির সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম পরিচয় ঘটল। এই পরিচয়ের দূত হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবিধার্থসংগ্রহে তাঁর একটি ছোট প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামে। তাতে বৈষ্ণব-কবিদের আলোচনা-প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির ভনিতায় একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছিল। তারপর বিদ্যাপতির উল্লেখ এবং এক-আধটি পদ উদ্ধৃত দেখা যায় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিতে (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার-ইতিহাসে (১৮৭১), বালক রবীন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষক এবং তাঁহার কাব্যচর্চার অন্যতম প্রথম পরিপোষক, নর্মাল স্কুলের পদার্থবিদ্যাধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গালা-সাহিত্যসংগ্রহে (১৮৭২) এবং রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালাভাষা-ও-সাহিত্যবিষয়ক-প্রস্তাবে (১৮৭২-৭৩)। এর পরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জগদ্বন্ধু ভদ্রের মহাজন-পদাবলী (১৮৭৪-৭৫), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ (১২৮৫) এবং সারদাচরণ মিত্রের বিদ্যাপতির-পদাবলী (১২৮৫)। এঁরা সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে বিদ্যাপতি বাঙালী কবি।

বিদ্যাপতির বাঙালীত্বে সংশয় তুললেন জন্ বীম্‌স্ ইণ্ডিয়ান্-অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় (১৮৭৩) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে। তারপরে বার হল বঙ্গদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বেনামি প্রবন্ধ 'বিদ্যাপতি'। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় যথার্থ প্রত্ন-গবেষণা এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা গেল। মিথিলায় থেকে অনুসন্ধান করে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যে সব তথ্য রাজকৃষ্ণ প্রকাশ করলেন এই প্রবন্ধে তা তার অনুবর্তীদের অবশ্যগ্রাহ্য হয়ে এসেছে। গ্রীয়র্সন রাজকৃষ্ণেরই পদবী অনুসরণ করেছেন তাঁর মৈথিল-ক্রেষ্টোম্যাথিতে (১৮৮২) এবং প্রবন্ধে (ইণ্ডিয়ান্-অ্যান্টিকোয়ারি ১৮৮৫, ১৮৯৯)। রাজকৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন মিথিলায় বিদ্যাপতির নামে এমন পদও প্রচলিত আছে যা বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি।

এরকম অনেকগুলি পদ গ্রীয়র্সন প্রকাশ করলেন ক্রেষ্টোম্যাথিতে। এই পদগুলি নিয়ে এবং পদকল্পতরু-পদামৃতসমুদ্র-কীর্ত্তনামৃত প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে ব্রজবুলি পদগুলি বেছে নিয়ে একত্র করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্কলন করলেন বিদ্যাপতি-পদাবলী (১৩১৬) সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলনের নূতন সংস্করণ রূপে। নগেন্দ্রনাথ যদি বিদ্যাপতি-ভনিতার পদগুলি নিতেন তবে বলবার কিছু থাকত না। অনির্বিচারে কবিরঞ্জন-কবিবল্লভ ইত্যাদি ভনিতার ভালো ভালো পদগুলি বিদ্যাপতির বলে চালাতে গিয়ে তিনি ভিজে কম্বল ভারী করে দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনের ভার-বৃদ্ধি হয়েছে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের হাতে। তিনি (এবং তাঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র) নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনপদ্ধতিতে সংশয় প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, বাছাই কাজে বেশি দূর অগ্রসর হতে সাহস করেন নি।

বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে নগেন্দ্রনাথ (ও তাঁর অনুবর্তীরা) রাজকৃষ্ণ-গ্রীয়র্সনের অতিরিক্ত কিছু বলতে পারেন নি। উপরন্তু অর্বাচীন পাঠের ও অমূলক জনশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করে বিদ্যাপতিকে

অসম্ভাবিতরূপে দীর্ঘজীবী অনুমান করতে বাধ্য হয়েছেন। এই গলদ লক্ষ্য করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কীর্তিলতার ভূমিকায় তা দ্রষ্টব্য। কিন্তু তিনিও প্রমাণগুলির প্রামাণ্য যাচাই না করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সুরে সুর মিলিয়ে গেছেন। বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে হরপ্রসাদ নিজেরই সংগৃহীত তথ্য— যা আমি এই আলোচনায় কাজে লাগিয়েছি— ব্যবহার করতে পারেন নি। তা ছাড়া বাঙালী বিদ্যাপতির অস্তিত্বও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে, যদিও বহুকাল পূর্বে (১৯০৫) শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এই কবির প্রতি শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের পূর্বে মিথিলায় লেখা কোন বইয়ে বা পুথিতে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ নেই। বাংলায় চণ্ডীদাসেরও প্রায় সেই দশা। কবিদ্বয়ের মধ্যে আরও একটু মিল রয়েছে। চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতিরও বহুত্ব-স্বীকার অপরিহার্য হয়েছে।

২

বৃহস্পতি বাচস্পতি ইত্যাদির মত বিদ্যাপতি শব্দটিও খুব পুরানো, যদিও বৈদিক এবং ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে মেলে নি। শব্দটি বৈদিকের চেয়েও প্রাচীন, কেননা এটি প্রাচীন ঈরানীয় ভাষায় পাওয়া গেছে। আবেস্তায় সোমদেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে "বএদ্যাপইতে" (অর্থাৎ বিদ্যাপতে) বলে। অর্বাচীন সংস্কৃতে "বিদ্যাপতি" প্রথম পাই কবির নাম রূপে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বিদ্যাপতি কবি মিথিলার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য ছিলেন না। ইনি ছিলেন কর্ণদেবের সভাকবি। এঁর লেখা পাঁচটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত আছে। একাদশ শতাব্দীতে কর্ণদেব ও তাঁর পিতা গাঙ্গেয়দেব তীরভুক্তি ও পশ্চিম বাংলা অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কর্ণদেবের একটি ছোট প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে বীরভূম-সীমান্তে পাইকোড়ে।

মৈথিল কবি দ্বিতীয় বিদ্যাপতিই আসল অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বললে সকলে এঁকেই বুঝেন। এঁর পরেও বিদ্যাপতি নামে বা বিরুদে একাধিক কবি ছিল, বাংলাদেশে এবং মিথিলায়। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীখণ্ডের এক কবি বিদ্যাপতি-ভনিতায় পদ লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিদ্যাপতির ভনিতায় বাংলা রাগাত্মিক পদ বহু পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এক বাঙালী কবি বিদ্যাপতি সত্যনারায়ণের-পাঁচালী কাব্য লিখেছিলেন। গ্রীয়র্সনের সংগ্রহে মৈথিল কবি জয়রামের দুটি পদ আছে। ভনিতায় কবির নামের সঙ্গে বিদ্যাপতি বিরুদ আছে, "ভণহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয়রাম"।

বাংলায় যেমন নরহরি-জ্ঞানদাস-লোচন ইত্যাদির ভালো ভালো পদ পরবর্তী কালের কীর্তনিয়াদের মুখে এবং আঁখরিয়াদের কলমে "কহে চণ্ডীদাসে" ছাপ পেয়ে এসেছে মিথিলায়ও তেমনি অনেক পদ "ভনই বিদ্যাপতি" মার্কা নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। বাংলার বৈষ্ণবসমাজে জয়দেব-পদ্মাবতীর নজিরে ও চণ্ডীদাস-রামীর আদর্শে বিদ্যাপতি-লছিমার রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী খাড়া হয়েছিল প্রায় তিন-চার শতাব্দী আগে। যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন যে শ্রীচৈতন্য ভালোবাসতেন "চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রায়ের নাটক-গীতি" শুনতে তখন সহজপন্থী বৈষ্ণব সাধকরা বিদ্যাপতিকে তাঁদের একজন সিদ্ধাচার্য বানিয়ে নিলেন অনায়াসে।

কবি-সাধকসমাজের বাইরেও একজন বাঙালী বিদ্যাপতি ছিলেন। ইনি একটি চিকিৎসাগ্রন্থ লিখেছিলেন (১৬৬১) 'বৈদ্যরহস্য' নামে। এই বিদ্যাপতির বাপের নাম বংশীধর।

৩

বিদ্যাপতির জীবৎকাল নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমে আবশ্যক তাঁর পোষ্টা রাজা-জমিদারদের শাসন-কাল ঠিক করা। "মহামহোপাধ্যায় সৎঠক্কুর" শ্রীবিদ্যাপতি কামেশ্বর-রাজপণ্ডিতের একাধিক বংশধরের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এঁদের কাল ও পৌর্বাপর্য নির্ভর করছে প্রধানত বিদ্যাপতির সংস্কৃত ও প্রাকৃত (অবহট্‌ঠ) রচনার উপর। অতএব বিদ্যাপতির রচনাসূত্র অনুসরণ করা যাক।

কার্ণাট-বংশীয় হরসিংহদেব (বা হরিসিংহদেব) ছিলেন মিথিলার শেষ স্বাধীন ভূপতি। এঁর রাজধানী ছিল সিমরাওন-গড়। বাংলা মুসলমান-শক্তির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হবার শতাধিক বৎসর পরেও যে রাজবংশ পূর্বভারতের বৃহত্তম ভূখণ্ডে হিন্দুর স্বাধীনতা অটুট রাখতে পেরেছিল তার শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এই শেষ রাজা, সেনবংশের চূড়ামণি লক্ষ্মণসেনদেবের মতই। লক্ষ্মণসেনের মত হরসিংহও কাব্যগীতিরসের বোদ্ধা ছিলেন। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষার একটি গল্পে হরসিংহদেবের সঙ্গীতকলাজ্ঞানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। সেকালে উত্তরাপথের শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজা ছিলেন ইনি, তাই এঁকে কবিরা "হিন্দুপতি" বলে অভিনন্দিত করে গেছেন। দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসু-দ্‌-দীনের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষে (১৩২৩-২৪) পরাজয়ের ফলে তীরভুক্তি হরসিংহদেবের হস্তচ্যুত হয়। নেপাল-তরাইয়ে এঁর বংশ রাজত্ব করতে থাকে। এঁর সঙ্গে যে-সব কবি পণ্ডিত-গুণী ছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা নেপালেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। হরসিংহদেবের বংশের সঙ্গে নেপাল-রাজবংশের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল বিবাহসূত্রে।

হরসিংহদেবের সান্ধিবিগ্রহিক মহামন্ত্রী মহামহত্তক ঠক্কুর চণ্ডেশ্বর বড় পণ্ডিত ছিলেন। এঁরা বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রী,—পিতা মহাসান্ধিবিগ্রহিক ঠক্কুর বীরেশ্বর, পিতামহ মহাসান্ধিবিগ্রহিক ঠক্কুর দেবাদিত্য, পিতৃব্য মহামহত্তক গণেশ্বর (যিনি 'সুগতিসোপান' ও 'দানপদ্ধতি' লিখেছিলেন), পিতৃব্যপুত্র মহামহত্তক মন্ত্রী রামদত্ত (যিনি লিখেছিলেন যজুর্বেদীয় 'বিবাহাদিপদ্ধতি')। চণ্ডেশ্বরের লেখা বা লেখানো অনেকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ আছে। সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজমন্ত্রীরা সৈনাধিপত্যও করতেন। চণ্ডেশ্বরও হরসিংহদেবের বিজয়বাহিনীর নেতা হয়েছিলেন একাধিকবার। এঁর প্রশস্তিকার কবি লিখেছেন, মন্ত্রিরত্নাকর যখন সমরে অগ্রসর হতেন তখন হস্তিবল চমকিত হওয়ায় বঙ্গসৈন্য রণে ভঙ্গ দিত, কামরূপ-সেনা বিরূপ হত, চীনেরা কুঞ্জে বিলীন হত, লাটেরা পলায়নপর হত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

> বঙ্গাঃ সংজাতভঙ্গাশ্চকিতকরিঘটাঃ কামরূপা বিরূপা-
> শ্চীনা কুঞ্জাদিলীনাঃ প্রমুদিতবিলসৎ [কিঙ্কিণীকাঃ কিরাতাঃ]।
> নেপালাদ্ ভূমিপালাদ্ ভুজবলদলিতাস্তে চলাটাশ্চ লাটাঃ
> কর্ণাটাঃ কেন দৃষ্টাঃ প্রসরতি সমরে মন্ত্রিরত্নাকরস্য ॥

হরসিংহদেবের রাজ্যকালেই মহামন্ত্রী চণ্ডেশ্বর রাজার প্রায় সমান মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তার পরিচয় পাই "রস-গুণ-ভুজ-চন্দ্রৈঃ সংমিতে শাকবর্ষে" (=১৩১৪) বাগমতী-তীরে এঁর তুলাপুরুষ-দানে। পরবর্তীকালে চণ্ডেশ্বরের এই কীর্তি হরসিংহদেবের খ্যাতিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতসমাজে।

চণ্ডেশ্বর তাঁর পরিজনদের নিয়ে হরসিংহদেবের অনুগমন করেছিলেন নেপাল-তরাইয়ে। তবে তাঁর জ্ঞাতিরা কেউ কেউ দেশেই রয়ে গিয়েছিলেন। এঁদেরই একজন— রাজপণ্ডিত কামেশ্বর যিনি হরসিংহদেবের একজন সভাসদ্ ছিলেন— তীরভুক্তিতে নবাগত মুসলমান-শক্তির আনুকূল্য ও আনুগত্য

করে হরসিংহের ভ্রষ্ট রাজ্যাংশের কিছু অধিকার পেয়েছিলেন। কামেশ্বরের পুত্র ভোগেশ্বর (বা ভোগেশ) ফীরূজ-শাহ্ তুঘ্‌লককে বাংলা-অভিযানে সহায়তা করেছিলেন বলে "রাউ" অর্থাৎ "রায়" উপাধি পেয়ে কতকটা যেন আনুষ্ঠানিকভাবে রাজসিংহাসন লাভ করেছিলেন। তবে সে সিংহাসন স্বাধীন-রাজার নয়, সামন্ত-রাজার বা জমিদারের। বিদ্যাপতি কীর্ত্তিলতায় ভোগেশ্বর সম্বন্ধে লিখেছেন যে প্রিয়সখা বলে ডেকে ফীরূজ-শাহ্ তাঁকে সংবর্ধিত করেছিলেন, "পিঅসখ ভণিঅ পিরোজ-সাহ্ সুরতান সমানল"।

ভোগেশ্বরের দুই পুত্র, গণেশ্বর, (বা গণেশ) এবং ভবেশ্বর (বা ভবেশ)। কীর্ত্তিলতা অনুসারে ভোগেশ্বরের মৃত্যু হয় ২৫১ লক্ষ্মণ-সংবতে (=১৩৭০)।[১] পিতার মৃত্যুর পর দু ভাই রাজ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন, অথবা নেপাল-মোরঙ্গের প্রথামত দু ভাই একত্র অধিকার ভোগ করেছিলেন, কিংবা বড় ভাই একমাত্র রাজ্যাধিকারী হয়েছিলেন, তা বোঝা যায় না। তবে পরবর্তী রাজারা যে-ভাবে গণেশ ও তাঁর ছেলেদের উপেক্ষা করে এসেছেন তাতে মনে হয় ভোগেশের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছিল। ভোগেশ মারা যাবার অল্পকাল পরেই গণেশ নিহত হলেন তীরভুক্তির প্রাদেশিক শাসনকর্তা তুর্কী মালিক অসলানের হাতে। গণেশের এই অপঘাতের মূলে হয়ত পারিবারিক ষড়যন্ত্র ছিল।

গণেশের তিন ছেলে, রামসিংহ, বীরসিংহ ও কীর্ত্তিসিংহ। কীর্ত্তিলতার মতে বীরসিংহ বড়, কীর্ত্তিসিংহ ছোট।[২] কীর্ত্তিলতায় রামসিংহের নাম আছে প্রসঙ্গক্রমে, এবং মুদ্রিত পাঠ হচ্ছে "রাঅসিংহ"। কিন্তু "মিথিলামহীমহেন্দ্র" মহারাজাধিরাজ রামসিংহদেবের রাজ্যকালে (১৪৪৬ সংবৎ=১৩৯০) লেখা পুথি পাওয়া গেছে। এঁর এক সদস্য পণ্ডিত শ্রীকর অমরকোষের টীকা লিখেছিলেন। মালিক অসলানের কবল থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আশা করে বীরসিংহ ও কীর্ত্তিসিংহ দু ভাই গেলেন জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহিম শর্কীর কাছে। ইব্‌রাহিম তাদের ভিড়িয়ে নিলেন নিজের অভিযান-বাহিনীর সঙ্গে। মুখ ফুটে কিছু বলতে না পেরে ব্রাহ্মণসন্তান দু ভাই "তুলুক-সঙ্গে সঞ্চার পরম কট্‌ঠে আচার রক্‌খিঅ" দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন! তাঁরা ভাবতে লাগলেন, আমাদের এই দুঃখকাহিনী মায়ের কানে গেলে তিনি কী আর বাঁচবেন।

তংখণে চিন্তই এক্কপই কিত্তিসিংহ অরু রাএ
অম্মহ এত্তা দুক্‌খ সুনি কিমি জিব্বহ মঝু মাএ।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মনকে প্রবোধ দিলেন, সেখানে বিশ্বস্ত মন্ত্রী আনন্দ-খান ও সুপবিত্র মিত্র শ্রীহংসরাজ আছেন, আমাদের সহোদর শ্রীরামসিংহ আছেন, মন্ত্রী গোবিন্দদত্ত আছেন, বীর হরদত্ত আছেন,—এঁরা নিশ্চয়ই মাকে প্রবোধ দিয়ে রাখবেন।

তহাঁ অচ্ছএ মন্তি আনন্দ-খান
জে সন্ধি-ভেদ-বিগ্‌গহো জান।
সুপবিত্ত-মিত্তো সিরি-হংসরাজ
সরবস্‌স উপেক্‌খই অম্হ কাজ।

১ তারিখে সন্দেহের কারণ আছে। কীর্ত্তিলতা পড়লে মনে হয় যেন গণেশের মৃত্যুর ঠিক পরেই কীর্ত্তিসিংহ জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহিম শর্কীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অথচ ইব্‌রাহিমের রাজ্যকাল হচ্ছে ১৪০১-৪০। ২ গ ৪৭৪১ ('শুদ্ধিকল্পতরু')।

সিরি অম্‌হ সহোদর রামসিংহ
সংগাম পরক্কম রুট্‌ঠ সিংহ।
গুণে গরুঅ মন্তি গোবিন্দ-দত্ত
তস্থ বংস-বড়াই কহএো কত্ত।
হরক ভগত হরদত্ত নাম
সংগাম-কম্ম অজ্জুন মান।
তস্থ পরবোধে মাএ মঝু হিঅ ন ধরিজ্জই সোগ
বিপঅ ন আবই আস্থ ঘর জস্থ অনুরত্ত ও লোগ॥

যখন অসহ্য হল, সঙ্গীরা একে একে পরিত্যাগ করতে লাগল, তখন সাহস করে কীর্ত্তিসিংহ ও বীরসিংহ ইব্‌রাহিমের মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হলেন। তাঁদের ওকালতিতে স্থলতানের দয়া হল, তিনি তীরহুতের দিকে ফিরলেন। কীর্ত্তিলতা অনুসারে অসলানের সঙ্গে কীর্ত্তিসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে অস্‌লানের পরাজয় হয়, কীর্ত্তিসিংহ তার প্রাণ না নিয়ে দয়া করে ছেড়ে দেন। এই যুদ্ধকাহিনী অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। আসলে ইব্‌রাহিমের বাহিনীর সামনে অসলান দাঁড়াতেই সাহস করে নি। যাই হোক ভাইদের পিতৃরাজ্য সমর্পণ করে ইব্‌রাহিম চলে যান।

৪

মিথিলায় প্রচলিত একটি কাহিনী এই সঙ্গে তুলনীয়। এখানে নায়ক কীর্ত্তিসিংহ নন, শিবসিংহ। খাজানার দায়ে হোক অথবা ঔদ্ধত্যের জন্যে হোক দিল্লীর বাদশাহ তীরহুতে ফৌজ পাঠিয়ে দেন রাজাকে ধরে আনতে। শিবসিংহ বন্দী হয়ে দিল্লীতে নীত হলেন। বিদ্যাপতিও অনুগমন করলেন তাঁকে উদ্ধার করতে। বাদশাহের কাছে গিয়ে বিদ্যাপতি বললেন, আমি না-দেখা ব্যাপার বলে দিতে পারি। পরীক্ষার জন্যে বিদ্যাপতিকে একটা সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখা হল। অনেকক্ষণ পরে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে কয়েকটি মেয়েকে দেখিয়ে বলা হল ওরা এর আগে কি করেছে তা বর্ণনা করতে। মেয়েরা ইতিমধ্যে যমুনায় স্নান করেছিল। বিদ্যাপতি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করে দিলেন, “কামিনী করু অসনানে” ইত্যাদি। বাদশাহ খুশি হয়ে শিবসিংহকে ছেড়ে দিলেন এবং বিদ্যাপতিকে তাঁর নিবাসগ্রাম বিসপী জাগীর দিলেন। এই কাহিনী জনশ্রুতি মাত্র, তবে একেবারে অমূলক না হতে পারে। কীর্ত্তিসিংহের পিতামহ ভোগেশ ফীরুজ-শাহার অনুগত ছিলেন। স্থতরাং দিল্লী-দরবারের সঙ্গে তাঁদের পূর্বাপর বাধ্যবাধকতা ছিল বলে মনে হয়। কীর্ত্তিসংহের কীর্ত্তি কীর্ত্তিলতায় প্রচুর পল্লবিত হয়েছে, তবুও একথা বুঝতে দেরি হয় না যে; দিল্লীর অথবা জৌনপুরের মুসলমান স্থলতানের কাছে তাঁদের যথেষ্ট কষ্ট— সম্ভবত বন্দীর দশা—ভোগ করতে হয়েছিল।

তবে দিল্লীর বাদশাহের কাছে বিদ্যাপতির জাগীর পাওয়ার কথাটা নেহাৎ মিথ্যা বলেই মনে হয়। আসলে বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম কেউই রীতিমত লেখাপড়া করে দান করেন নি, না বাদশাহ না শিবসিংহ। শুধু বিদ্যাপতির নামডাকের জোরে তাঁর অধস্তন পুরুষেরা (?) গ্রামটির অধিকার ভোগ করে এসেছিলেন বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি। এই অধিকারে ছেদ পড়ল রেভিনিউ সার্ভের দরুন।

তীরহুতে যখন সার্ভে হয় তখন বিসপী গ্রামের জমিদাররা স্বত্বপ্রমাণের জন্যে দাখিল করেছিলেন শিবসিংহের নামিত "শাসন" বা ভূমিদান-তাম্রপট্ট। বাদশাহী ফরমান দিলেও চলত কিন্তু পুরানো ফারসী দলিল তৈয়ারী করা ঢের বেশি কঠিন কাজ। শিবসিংহ কর্তৃক বিদ্যাপতিকে দেওয়া এই শাসন-পট্টের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সবটা প্রকাশ করলেন গ্রীয়র্সন (১৮৮৫)। রাজকৃষ্ণ ও গ্রীয়র্সন দুজনেই এটিকে অকৃত্রিম মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখে এটির কৃত্রিমতা অল্পকালের মধ্যেই ধরা পড়ল। শাসনে লক্ষ্মণ-সংবৎ[১], বিক্রম-সংবৎ[২] ও শক-সংবতের[৩] সঙ্গে "সন" অর্থাৎ ফসলী-হিজরী সংবতেরও[৪] উল্লেখ রয়েছে, অথচ সন প্রবর্তিত হয়েছিল প্রায় দু শ বছর পরে আকবরের দ্বারা! এক ঢিলে চার পাখীর পরিবর্তে চার ঢিলে এক পাখী মারতে গিয়ে আরো বিপদ ঘটল, চারটি তারিখে মিল নেই। দলিলটি যে জাল তার আরো প্রমাণ আছে। সে বড় মজার।

শোনা যায় যে-সাহেবের কাছে দলিলটি দাখিল করা হয়েছিল তিনি পণ্ডিত ডাকিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন। শাসনের শেষ শ্লোকের অনুবাদ শুনে সাহেব নাকি বলেছিলেন, আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই, গোরু এবং শুওর দুইই আমাদের চলে; সুতরাং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে আমাদের শাপ লাগবে না। শাসন-পট্ট সত্ত্বেও সম্পত্তি গভর্নমেণ্টের খাস হল। অনুবাদের দোষে সাহেব ভুল ভেবেছিলেন। শাপ তার উপর ফলেছিল কিনা জানি না, তবে শাসন-রচয়িতা খ্রীষ্টান সাহেবদেরও বাদ দেন নি। তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সুকৌশলে,— হিন্দু ও তুর্ক ছাড়া অপরে ভূমি অধিকার করলে আত্মমাংসের সঙ্গে স্বধর্ম্ম খেতে (ও খোয়াতে) হবে। শাসন-লেখকের একথা অজ্ঞাত ছিল না যে সাহেবদের কাছে একমাত্র অখাদ্য হচ্ছে মানুষের মাংস। শ্লোকটি এই,

গ্রামে গৃহ্লন্ত্যমুষ্মিন্ কিমপি নৃপতয়ো হিন্দবোঽন্যে তুরুষ্কা
গোকোলং স্বাত্মমাংসৈঃ সহিতমনুদিনং ভুঞ্জতে স্বে স্বধর্ম্মম্।
যে চৈনং গ্রামরত্নং নৃপকররহিতং পালয়ন্তি প্রতাপৈ-
স্তেষাং সংকীর্ত্তিগাথা দিশি দিশি সুচিরং গীয়তাং বন্দিবৃন্দৈঃ ॥

ভাষা অত্যন্ত ভুল। শিবসিংহের সভায় দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। এমন অখাদ্য রচনা তাঁদের হাত থেকে বেরতে পারে না। শাসন-পট্টটি জাল, এবং হাল আমলের জাল।

১ ২৯৩। ২ ১৪৫৫। ৩ ১৩২১। ৪ ৮০৭।

রবীন্দ্র-সমাজদর্শনের এক দিক

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে তাঁর বাল্যজীবনের একটি আপাত-তুচ্ছ স্মৃতিকথা উল্লেখ করেছেন, অনেকেরই হয়তো সে-কথা মনে পড়বে। তাঁদের গৃহশিক্ষক অঘোরবাবু ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। একদিন উৎসাহ ক'রে তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে যান মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে। তারপরের ঘটনাটুকু রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই শোনা যাক :

টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল ; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই ; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়া ছিল ; সে-দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।—'জীবনস্মৃতি', "নানাবিদ্যার আয়োজন"

রবীন্দ্রনাথের মানসদৃষ্টির স্বরূপ-সন্ধানে এই ঘটনাটি যে-আলোকপাত করে তার মূল্য শুধু কেবল সাহিত্যিক কেন, এযুগের মনোবিজ্ঞানীদের কাছেও অপরিমেয়। কাব্যের ক্ষেত্রেই হোক বা জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রেই হোক, রবীন্দ্র-দর্শনের ঐকান্তিক সমন্বয়মুখীনতার উৎসে নিহিত আছে কবির আবাল্যকালের এই সৃষ্টিধর্মী সংগতি-সন্ধানী দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি তাঁর সহজাত,—স্বভাবেরই অন্তর্গত। উক্ত অঘোরবাবুই আর-একদিন মানুষের একটি কণ্ঠনলী ছাত্রদের দেখিয়ে তার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করেছিলেন বিশ্লেষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। বালক রবীন্দ্রনাথের মন তাতে সায় দেয়নি একেবারেই।

আমার বেশ মনে আছে ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয় ; কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরা করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যতবড়ো আশ্চর্য হউক-না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে।

বলা বাহুল্য, তাঁর তরুণ চিত্ত এমন সুনিশ্চয়তার সঙ্গে সেদিনই কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে সমর্থ হয় নি, করবার বয়সও সেটা একেবারেই নয়। কিন্তু নিতান্ত বাল্যবয়সেই চিত্তের সদ্যোবিকাশোন্মুখ মুহূর্তে এই-যে তথাকথিত বাস্তব জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার প্রতি এক অতিসহজ সচেতনতা, প্রাণময় একটি জীবের কাটা-ছেঁড়া বিশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচারকেই সৃষ্টিরহস্যের শেষ কথা বলে স্বীকার করতে ইতস্তত করা, দুর্লভ এই স্পর্শচেতনার বলেই সেদিনের সেই বালক কালক্রমে, রবীন্দ্রনাথ বলতে আজ আমরা যে সমগ্রদর্শী জীবনশিল্পীর ধারণা করি, সেই রবীন্দ্র-দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন।

তাঁর সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালের মধ্যে জীবনের 'ইস্কুলঘরে' অঘোরমাস্টারের দল হানা নিতান্ত কম দেন নি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যখনই সৃষ্টির কোনো প্রাণধর্মী উদার কল্পনা উপস্থিত করেছেন, দেশের এই 'অঘোর'-পন্থী মাস্টারমশায়ের দল কবিকে আক্রমণ করেছেন তাঁদের শবব্যবচ্ছেদ-প্রবণ বিশ্লেষণবুদ্ধির যষ্টি উদ্যত ক'রে। জীবনস্মৃতির অঘোরমাস্টারের মতোই অপরাহত তাঁদের অধ্যবসায়, অব্যর্থ তাঁদের অভ্যুদয়। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর চিত্তের বড় বেদনাময় সেই মুহূর্তগুলি ; নিষ্ফল আক্ষেপে সে-বেদনা তিনি সহ্য করেছেন

নীরবে কিন্তু কোনোদিন পরাভব স্বীকার করেননি মানবমনের এই উদ্ধত একদেশদর্শিতার কাছে। একটা 'অর্থহীন' কাটা পায়ের নিরুদ্দেশ বন্দনায় কালক্ষেপ না ক'রে চিরদিন তিনি তাই মানুষের সমগ্রসত্তার পরিচয় নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষকে এতখানি সত্য ক'রে, সম্পূর্ণ ক'রে দেখার অদম্য প্রেরণা তাঁকে তাঁর পরিবারের, সম্প্রদায়ের, সমাজের, এমন কি স্বদেশেরও সমস্ত সংকীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

ভারতীয় সাধনা যে মৃতের সাধনা নয়, নবযুগের নবীনতর চিন্তার সঙ্গে তার সমন্বয়, এবং পরিণততর সতেজ বিকাশ যে কিছু দুরাকাঙ্ক্ষা বা ব্যর্থ কল্পনা মাত্র নয়, তার সজীব এবং বলিষ্ঠতম প্রমাণ পেয়েছি আমরা রবীন্দ্রনাথের বিরাট জীবনে। অথচ রবীন্দ্রমানসের এই উদার স্বরূপটির ধারণা তাঁর স্বদেশবাসীর চিত্তেও আজ পর্যন্ত যে সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চয় নয়, একথা যতই লজ্জার হোক-না কেন অস্বীকার করবার উপায় নেই। দেশের পুরাতনীরা তাঁকে এবং তাঁর চিন্তাকে চিরদিনই new wine in old bottle বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এবং নবীনদের মধ্যে যাঁরা স্বদেশের চিন্তানায়কদের চিন্তার বা সৃজনকল্পনার সংবাদ রাখেন তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রমানসের old-wine-in-new-bottle ফাঁকিটুকু ধরতে পেরেছেন এমনতরো একটা সুচতুর সুবিজ্ঞ ভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন। আর আমরা যারা তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তের পর্যায়ভুক্ত বলে পরিচিত,—কবির পরম দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা তাঁর অজেয়-উদার বাণীকে ক্ষুদ্রকণ্ঠে গ্রহণ ক'রে তুচ্ছ কলবাক্যে পর্যবসিত করেছি; সে-বাণীর ভক্তি-গদ্গদ বিহ্বল উচ্চারণ স্থানে-অস্থানে প্রয়োজনে-নিষ্প্রয়োজনে যতই কেন না করি, অন্তরের স্বীকৃতি ও উপলব্ধিতে এবং জীবনের একনিষ্ঠ প্রয়োগে তাকে প্রাণবান তথা বেগবান ক'রে তুলতে পারিনি; আমাদের জাতীয় জীবনে সে-বাণী যতটুকুমাত্র সত্য হয়ে উঠছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে শুধু রবীন্দ্রনাথের একলব্য-শিষ্যদের হাতে; সব্যসাচী অর্জুনের আবির্ভাব আচার্য রবীন্দ্রনাথের তথা ভারতের ভাগ্যে আজও সুদূরপরাহত।

দেশের আজ পরম দুর্দিন; ভ্রাতৃবিরোধের বর্তমান কালো আবহাওয়ায় মহাত্মার মতো দেশনায়ক পর্যন্ত অন্ধকারে আলোর সন্ধানে হাতড়ে ফিরছেন। এই অশুভলগ্নে রবীন্দ্রবাণীর প্রয়োজনীয়তা আরও অপরিহার্য বলে মনে হয়। মহাত্মাজী একদিন যাঁকে ভারতের বাণী-রাজ্যের 'প্রহরী-প্রধান' (The Great Sentinel) ব'লে অভিহিত করেছিলেন সেই সুদূরদর্শী কবিমনীষীর মানসতীর্থ-লোকে আমাদের ছড়িয়ে-পড়া মন এবং বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত দৃষ্টিকে আজ একান্তে ফিরিয়ে আনতে হবে, সংহত করতে হবে। সেখানে যে-আলো আজও অলক্ষ্যে জ্বলছে হয়তো তাতেই পথের সন্ধান মিলবে। এ উপদেশ পলায়নপন্থী ভীরুর উপদেশ যাঁরা মনে করতে চান করুন; কিন্তু একনিষ্ঠ আত্মপ্রস্তুতির মূল্য দিতে যাঁরা কুণ্ঠিত নন, যাঁরা সকল প্রকার সংগ্রামে বা সেবার কর্মে সাময়িক উত্তেজনার চেয়ে মস্তিষ্কের স্থির বিচারের এবং আবেগ বা অনুভূতির গভীরতায় বিশ্বাসী— তাদের স্থায়ী কার্যোপকারিতা সম্বন্ধে নিতান্তই অচেতন নন, আমাদের এই অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা কেবলমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে তাঁরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হোন-না কেন।

কাটা একটি পা বা কণ্ঠনলী যে-অর্থে সমগ্র মানুষটির চেয়ে বড়ো নয়, বরং নিতান্তই অসংলগ্ন এবং অর্থহীন—জড় মাংসপিণ্ড মাত্র, মানুষের সম্প্রদায়গত ব্যষ্টি-পরিচয়টি ঠিক অনুরূপ বিচারেই তার সমাজগত গোষ্ঠী-পরিচয়ের চেয়ে অধিকতর সংগত বা অর্থপূর্ণ হবার দাবি রাখে না। সমাজ যেখানে নিষ্প্রাণ, বলা

নিষ্প্রয়োজন, সেখানেই শুধু সমাজের নানা অঙ্গের শবব্যবচ্ছেদ সম্ভব। ভারতবর্ষীয় সমাজ য[illegible] সজীব ও সতেজ ছিল, আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও তার সর্বাঙ্গীণ স্বরূপের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঐক্যটি ততদিন সম্পূর্ণ হারায়নি। দেশের অসম্পূর্ণ ইতিহাস, যা ছাত্রদের গলাধঃকরণ করানো হয় বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে— এবং এতকাল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তা নির্বিবাদে করা হয়েছে— তাতে বিরোধ-বিগ্রহের বিবরণ যা পাই তা রাষ্ট্রের ইতিহাস হিসাবে আংশিকভাবে তথ্য যদিও হয়, বৃহত্তর সমাজের ইতিহাস হিসাবে সেগুলি না তথ্য না সত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ইতিহাসের সেইসব 'দুঃস্বপ্ন'গুলোকে সমাজের জাগ্রত জীবনে স্থান দেবার মতো দুর্মতি আর কিছুই হতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃতির বা সভ্যতার ইতিহাসে নানান অসম্পূর্ণ অসংহতি বা antithesisগুলি যেখানে সংহতি বা synthesis লাভ ক'রে জীবনের ছবিতে অনির্বচনীয় সুষমা ফুটিয়ে তুলেছে, এবং সমাজজীবনে যুগোপযোগী গতিবেগ সঞ্চার ক'রে জাতীয় সভ্যতাকে পূর্ণতর ও নবতর পরিণামের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেছে সেখানেই তাদের যথার্থ মূল্য। স্বদেশের ইতিহাসকে আজ রাষ্ট্রীয় দফতরখানার ধূলিজাল থেকে মুক্ত ক'রে সতেজ প্রাণশক্তির প্রবল বিকাশ রূপে জানবার দিন এসেছে। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজ-জীবনের বিশেষ ছন্দটির প্রতি, তার সৃষ্টিধর্মী পরিণামটির প্রতি রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় দেশবাসীর দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন। দেশের ইতিহাসকে, বিদেশী বিদ্যালয়ের পরানো ঠুলি খুলে আমরা স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিতে সেই প্রথম দেখতে শিখলাম বিশ্বচিত্তের প্রকাশলীলার প্রতীকরূপে। যুদ্ধবিগ্রহের নিরর্থক ঝঞ্ঝা-ঝঞ্ঝনার একটা তাৎপর্য পেয়ে ইতিহাসের প্রাণের সন্ধান যেন সেদিন আমরা পেলাম।—

> বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে—তাহার এক প্রান্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রান্তে মিলন।

এ-মিলন peace treaty বা U.N.O.-মার্কা রাষ্ট্রনৈতিক মিলন নয়। যুগযুগান্তকালস্থায়ী এ-মিলন আর্য-অনার্যের তথা দেশী-বিদেশী অসংখ্য অন্যান্য জাতির মিলন; রক্তের তথা ধর্মের মিলন, অন্তরের অন্তস্থলে প্রেমের মিলন।—

> প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে মীমাংসা হইলেই এতবড়ো বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিসটা তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয় সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না।
>
> —'পরিচয়', "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা"

ভারতবর্ষীয় সমাজ বা "হিন্দু"-সমাজ সেই মিলনেতিহাসেরই সজীব পরিণাম রূপে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মানসপটে। রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষ্যে সে কথা বলেছেন:

> ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। —'স্বদেশ' "ভারতবর্ষের ইতিহাস"
>
> হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী তৈলঙ্গী, নায়ার,—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দু সভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই।
>
> —'আত্মশক্তি', "ভারতবর্ষীয় সমাজ"

মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।…

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

"হিন্দু" শব্দটিকে তিনি চিরদিনই তার বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক অর্থে গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে শব্দটির যে-সংকীর্ণ সাম্প্রতিক প্রয়োগ ঘটেছে, তিনি কোনোদিনই তা স্বীকার করেননি। তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক্ :

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাতপরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। …জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরতর; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না।

—'পরিচয়', "আত্মপরিচয়"

ভারতের অন্য আর-এক প্রান্তে 'হিন্দি-ইস্‌লাম'-এর সেরা কবি মহম্মদ ইক্‌বালও একদা "হিন্দ্" বা "হিন্দোস্তান"-এর বন্দনা-গানে শব্দটির এই অসাম্প্রদায়িক তাৎপর্যই গ্রহণ করেছিলেন প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সরল প্রেরণায়।

আজ পশ্চিমদেশের হাওয়া লেগে 'নেশন'ধর্মী রাষ্ট্রনীতি ভারতের লোকচিত্তে সহজ 'সমাজ'-বুদ্ধিটিকে আঘাত করেছে এবং তথাকথিত শিক্ষিত দেশবাসীদের ত্রুটিতেই অর্ধচেতনপ্রায় জনসমাজের আবহাওয়াকে অতর্কিতে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। দেশের সর্বসাধারণের প্রতি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। এতদিনের রাষ্ট্রীয় মিলনচেষ্টায় যে সর্বনেশে ফাঁকি আমরা পুষে রেখেছিলাম আজ তা অত্যন্ত মারাত্মকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ন্যাশনালত্বের সাময়িক সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকিয়ে আমরা দেউলে হতে বসেছি কারণ আমাদের মিলনচেষ্টা, সর্বসাধারণকে নিয়ে যে বৃহৎ সমাজভূমি তার গভীর থেকে প্রাণের রস কোনো দিনই পায়নি। চল্লিশ বৎসর হতে চলল এই অতি অপ্রীতিকর সত্যটি রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করেই উপলব্ধি করেছিলেন :

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে-সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।…এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

—'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১০ : "ব্যাধি ও প্রতিকার"

নিষ্ঠুর এই নিদ্রাভঙ্গের মুহূর্তে এখনো দৃষ্টি আমাদের বিভ্রান্ত, প্রতিবেশীকে প্রতিবেশী ব'লে চেনা দূরের কথা মানুষকে মানুষ বলে চেনবার শক্তিই পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। এই সংকটের আভাস রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায়-অভিমানী সমসাময়িক সমাজের নানা অঙ্গে দেখতে পেয়ে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীকেই ডেকে বলেছিলেন :

সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—

ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?

তবে কি-মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্র নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। —'পরিচয়', "আত্মপরিচয়"

কত বিরাট, বিচিত্র ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল তাঁর ভারতীয় সমাজস্বপ্ন ভাবলে আজো অবাক হতে হয়, এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিজেদেরকে শতাব্দীকাল পিছনের বলে জেনে ধিক্কৃত করতে ইচ্ছা করে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তিকে।—সমাজ-দর্শনে তাঁর সমগ্রের ধারণা কতখানি সংস্কারমুক্ত ছিল একবার শুনুন :

কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কথনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে, তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসঙ্গত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ। —'পরিচয়', "আত্মপরিচয়"

রবীন্দ্রনাথের আত্মা আজো কালের পথ চেয়ে আছে এই শুভলগ্নটির অপেক্ষায়। জীবনে যা তিনি কল্পনার আকারে আমাদের দিয়ে গিয়েছেন কবে দেশের তরুণ প্রাণদের জীবন-উৎসর্গ-করা বলিষ্ঠ প্রেরণায়, তাদের বিচার ও শুভবুদ্ধির নিষ্কলুষ প্রয়োগে ভারতের ইতিহাসে তা সত্য হবে! হিন্দুসমাজের কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোথাও অন্ধতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেননি। তিনি নিঃসংকোচে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন :

হিন্দুসমাজের কর্তব্য কী? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল? বিচার ও পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নাই। বিচার বুদ্ধিটা মানুষের আছে এই জন্যই। 'পরিচয়', "আত্মপরিচয়"

সমাজের প্রতি দেশের তরুণদের কর্তব্য সম্প্রদায়-নির্বিশেষ এই নিত্য ধর্মের পথেই জ্ঞানের আলোকে সম্পাদন করতে হবে। অন্য আর কোনো পথ আছে ব'লে মনে হয় না।[১]

১ রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' গ্রন্থের "সতী" নাট্যকাব্যটি পাঠক-সাধারণের সচরাচর তেমন চোখে পড়ে না। বর্তমান আলোচনার আলোতে কবিতাটি শান্তচিত্তে পুনরায় পাঠ করবার দিন এসেছে। সেখানেও তাঁর মূল কথাটি একই :

"সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্য ধর্ম সত্য চিরদিন।"

পত্রাবলী

নবীনচন্দ্র সেনকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবি নবীনচন্দ্রের (১৮৪৭-১৯০৯) সহিত কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের কথা নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' ও রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় নাই ; কর্মোপলক্ষ্যে নবীনচন্দ্রকে অধিকাংশ সময় কলিকাতার বাহিরেই থাকিতে হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (২৬ চৈত্র ১৩০০) পর কলিকাতায় যে শোকসভা হয় রবীন্দ্রনাথ তাহাতে প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যোগী হইয়া নবীনচন্দ্রকে এই সভার অধিনায়কত্ব করিতে অনুরোধ করেন। নানা কারণে নবীনচন্দ্র এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই ; 'আমার জীবন' পঞ্চম খণ্ডে এই প্রসঙ্গ আলোচিত ও রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সময়ে নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বর্ষের (১৩০১) সহকারী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই বৎসরেই পত্রালাপের ফলে নবীনচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয় ; নিম্নমুদ্রিত চিঠি কয়খানিতে তাহারই কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। নবীনচন্দ্রের আত্মীয়, চট্টগ্রাম-নয়াপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়ের নিকট মূল পত্রগুলি রক্ষিত আছে, চট্টগ্রাম-কানুনগোপাড়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধরঞ্জন রায়ের সৌজন্যে আমরা সেগুলির প্রতিলিপি পাইয়াছি ; তিনি এগুলি তাঁহার 'মহাকবি নবীনচন্দ্র' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।— এই চিঠিগুলির দুইটি ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' চতুর্থ ভাগে অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভা প্রসঙ্গে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।— রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে'র চতুর্থ ভাগে 'বন্ধুসমাগম' নামে যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছিলেন, পাদটীকায় প্রসঙ্গতঃ তাহা উদ্ধৃত হইল।— সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
২৫ শ্রাবণ, ১৩০১

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। হিন্দুমেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি[১] তখন আমি অখ্যাত অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র— তথাপি আমি যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে আমাকে মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহবাক্য

১ 'আমার জীবন' চতুর্থ খণ্ডে এই সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়া নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"স্মরণ হয়, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটীতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্ব্বে আমার "পলাশির যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

বলিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতা মাত্র— কিন্তু আপনি যে সেই ক্ষুদ্রবালকের সহিত ক্ষণকালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পরে আজ প্রায় সপ্তাহখানেক হইল রাণাঘাটের ষ্টেশনে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম আপনি আমার গাড়িতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বাল্যপরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্তু সে দিন আপনি ধরা দিলেন না। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারের দিনে সাহিত্য পরিষদ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনও আপনার দর্শনলাভ হইল না। সহৃদয়তাগুণে আজ আপনি নিজে হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনপত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন ? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে— আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্য্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি— আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অধিকারটি আমি রক্ষা করিতে পারিব।[২]

আপনার সাদর নিমন্ত্রণ মনে রাখিলাম— সুযোগ অভাবে যদি বিলম্ব হইয়া পড়ে আপনি যেন ভুলিবেন না। আমি এখন কিছুকাল ধরিয়া পদ্মা যমুনা ও ইছামতী নদীর মধ্যে জলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। কবে কলিকাতা অভিমুখে ফিরিব তাহা কিছুই স্থির নাই। কোন্ পথ দিয়া ফিরিতে হইবে তাহাও এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারি না— কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবেন আপনি যখন আমাকে প্রশ্রয়

হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদা পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—"ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাসিমুখে করমর্দ্দন কার্য্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন-কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি 'নেশনাল মেলায়' গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি একদিন একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন—"কে ? রবিঠাকুর বুঝি ? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা মিঠা আঁব।" তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। আমার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছে—আজ "কাঁচামিঠা আঁব" পরিপক্ক "ফজলী"। তাঁহার গৌরবে সৌরভে বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত। রবিবাবু আজ বাঙ্গলার 'শেলি' 'কিট্‌স্' 'এডগার পো' — কত কিছু বলিয়া পরিচিত। নব্য বঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের ও তাঁহার সঙ্গের অনুকরণে উন্মত্ত।"—'আমার জীবন', চতুর্থ ভাগ, পৃ ২৬৪ ৬৫

২ নবীনচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"স্মরণ হয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম আমার নিম্নে তাঁহার স্থান হইলে আমি ও বঙ্গসাহিত্য উভয়ে নিরাশ হইব। আমার আশা তাঁহার স্থান আমি অযোগ্যের বহু উর্দ্ধে হইবে। মাইকেল 'মেঘনাদবধ' কাব্যের, হেম বাবু 'বৃত্র সংহারের' এবং আমি 'পলাশির যুদ্ধের' কবি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু রবিবাবু কোনও এক কাব্যবিশেষের কবি বলিয়া কেহ তাঁহার নাম করেন না। অথচ তিনি রাশি রাশি পুস্তক লিখিয়াছেন তিনি নিঃসন্দেহ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান গীতি-কবি।..."—'আমার জীবন', চতুর্থ ভাগ, পৃ. ২৬৬-৬৭

দিয়াছেন তখন অনতিকাল মধ্যে আপনাকে কিঞ্চিৎ উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে— যদি পারি ত পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিব।

প্রণয়প্রার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদহ

কুমারখালি

১৩।৮।৯৪

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

লেখকের জীবনে মাঝে মাঝে অনেকগুলি অচিন্ত্যপূর্ব্ব আনন্দের বিষয় ঘটিয়া থাকে। কখন আপনাদের গৃহের একপ্রান্তে আমি একটুখানি প্রীতির আসন অধিকার করিয়াছিলাম তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। আপনার পুত্র যে আমার পত্রোত্তরের জন্য আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন, তাহা আমার আশার অতীত। তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবেন তাঁহার কল্পনার রবিবাবু যে গোপন প্রীতি উপহার পাইতেছে বাস্তব রবিবাবু সশরীরে সেই প্রীতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবে— কিন্তু বাস্তবে কল্পনায় বিরোধ বাধিলে বাস্তবকে বহুল পরিমাণে মার্জ্জনা করিয়া লইতে হইবে।

আপনার আতিথ্য আমি সৌভাগ্যস্বরূপে গ্রহণ করিব। শুনা যায় পুরাকালে কোন কোন দস্যু গৃহস্থকে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দিয়া ডাকাতি করিতে যাইত। আমিও সেইরূপ উদারতার সহিত, উপদ্রব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, যথাসময়ে আপনাকে প্রস্তুত হইতে সংবাদ দিব। সম্প্রতি আমাকে বহুকাল পাবনা রাজসাহীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে— ছুটি পাইলেই সে সংবাদ আপনাকে পত্রযোগে এবং প্রত্যক্ষরূপে জানাইতে চেষ্টা করিব।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদহ

কুমারখালি

২২।৮।৯৪

সাদর সম্ভাষণ নিবেদন—

আমার নমস্কারগুলি আপনার পত্রযোগে ফেরৎ পাইলাম এবং সেই সঙ্গে আপনার শতকোটি প্রণাম আসিয়াও পৌছিয়াছে অত্র রসিদদ্বারা জানাইলাম। কিন্তু আপনার এত প্রণাম রাখিবার স্থান আমার এলাকার মধ্যে নাই সেই কারণে ইচ্ছা ছিল সেগুলি আপনারই দ্বারে ফেরৎ পাঠাইয়া আপনার ব্যবহারের প্রতিশোধ লইব— কিন্তু আমার স্বভাবের মধ্যে ক্ষত্রোচিত প্রতিহিংসাপরায়ণতা নাই বলিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি। কথাটা এই, নমস্কার কেবল বাহিরের ভঙ্গীমাত্র— আপনার মত হাকিম যদি সরাসরি আইন

জারি করেন তবে সেটা রদ্ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু মনের শ্রদ্ধা আপনি কোন আইনেই ফিরাইতে পারিবেন না। আপনাকে যে নমস্কার দিয়াছিলাম সে মনের নমস্কার, সামাজিক নমস্কার নহে। তাহার পরিবর্ত্তে আপনি সামাজিক প্রণাম পাঠাইয়াছেন— অতএব আপনার ঋণ শোধ হইল না জানিবেন— এখনও আমার জিত রহিয়াছে।

আপনার পুত্রকে যে একটি চন্দ্রবিন্দু "তাঁহাকে" শব্দযোগে পাঠাইয়াছিলাম সে যদি তাহার বয়সের পক্ষে গুরুতর হইয়া থাকে তবে সেটা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপাততঃ তাহার নাম ৩ জানিবার প্রবল অভিলাষ হইয়াছে। বিশেষতঃ কেবলমাত্র সর্ব্বনামের দ্বারা তাহাকে সম্ভাষণ ও উল্লেখ করিতে গেলে ক্ষুদ্র চন্দ্রবিন্দুটাকে সম্বরণ করিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। আপনার boy Mirandaর হৃদয় আমি যদি আকর্ষণ করিয়া থাকি সেজন্য আপনি ঈর্ষা করিবেন না— আপনাদের নিভৃত মায়াদ্বীপটির মধ্যে আমার মত অভ্যাগত যতটুকু স্থান গ্রহণ করিবে তাহাতে আপনার অধিকারের কিছুই লাঘব হইবে না। আমার ভক্তটির মুখে আমার রচিত গান শুনিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইয়াছে, এ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিবই সেজন্য আপনাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ চেষ্টাই আবশ্যক হইবে না।

আমি এখন কেবল যে নদীস্রোতে এবং কল্পনাস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছি তাহা মনে করিবেন না। কর্ম্মস্রোতও অত্যন্ত প্রবল। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম একমাসের মধ্যে অবসর করিয়া উঠিতে পারিব না। আমার ইচ্ছা ছিল ইতিমধ্যে কোন একদিন রবিবারে আপনাদের ওখানে গিয়া পড়িব কিন্তু কোন মতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আগামী রবিবারের পরে সম্ভবতঃ রেলপথ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িব। আমার যখন কলিকাতা অভিমুখে ফিরিবার সময় হইবে অন্ততঃ সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনি সংবাদ পাইবেন। আপনাদের মায়াদ্বীপের সকলকেই আমার অভিবাদন জানাইবেন।

প্রণয়াভিমানী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পতিসর

দি আত্রাই

২০ ভাদ্র ১৩০১

ভাই নবীনবাবু,

মহাজন যে কেবল ঋণী করেন তাহা নহে মহাজন পথ দেখাইয়াও থাকেন। শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"— আপনি আমাকে যে প্রীতিসম্বোধনে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া আপনাকে প্রিয় সম্বোধনে বাঁধিতে পারিলাম— ইহাতেও আপনি মহাজনত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দিনকতক আমি এমনই কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে নিঃশ্বাস লইবার অবকাশ ছিল না— এ কয়দিন নিঃশ্বাস লইবার উপযুক্ত বাতাসেরও অপ্রতুল ছিল। সেইজন্য এতদিন আপনাকে লিখিতে পারি নাই।

৩ নির্ম্মলচন্দ্র সেন

আমাকে অতি অলস অথবা অতিকর্ম্মশীল, এই দুয়ের মধ্যে যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিতে পারেন— বিকল্পে আমি ঐ দুই বিশেষণেরই যোগ্য বটে— কিন্তু এমন কখনও মনে করিবেন না যে, আপনাদের স্নেহ এবং আদর আমি বিস্মৃত হইয়াছি— বিশেষতঃ অলক্ষ্য হইতে বউ ঠাকুরাণী মাদৃশ ক্ষুদ্রশক্তি স্বল্পক্ষুধা ক্ষীণ ব্যক্তির প্রতি যে স্নেহপূর্ণ এবং ছত্রিশ ব্যঞ্জনপূর্ণ পরিহাস ও পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার আয়োজনের মধ্যে ব্যঞ্জন অংশ নিঃশেষ করিতে আমি অশক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু স্নেহ অংশটুকু সম্পূর্ণরূপেই সম্ভোগ করিয়াছিলাম, এবং তাহা ব্রাহ্মণসুলভ লোভবশতঃ সঙ্গে বাঁধিয়াও আনিয়াছি। [৪]

---

৪ নবীনচন্দ্রের গৃহে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যগ্রহণ প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার জমীদারি কার্য্যে কুষ্টিয়া যাইবার পথে এক দিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার একজন আত্মীয় তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; ফুটোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ; মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা; কুঞ্চিত অলকাশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব শ্মশ্রু শোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধান সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরাণ ও রেশমী চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অনহৃতা-ব্যঞ্জক। গাড়ী হইতে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল—

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।"

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি গান রচনা করিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক আমার পুত্র নির্ম্মল তাহা হারমোণি ফ্লুটের সঙ্গে গাইল। তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে। রবিবাবু তাহার গলার প্রশংসা করিলেন, এবং আরও দুই একটি গান গাইতে বলিলেন। সে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান গাইল। তিনি এ হইতে নির্ম্মলকে বড় ভালবাসিতে লাগিলেন। নির্ম্মল তাঁহার গানে নূতন নূতন সুর দিয়া গাইয়াছিল বলিয়া না কি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার বন্ধুদের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া হারমোণি ফ্লুট তাঁহার সমক্ষে দিলাম। তিনি বলিলেন তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না, কারণ যন্ত্রে গলার মাধুর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটি মাত্র পর্দা কিছুক্ষণ টিপিয়া, সুরটি মাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, একটি নূতন কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া উহা গাইতে লাগিলেন। আমি এমন সুন্দর গান অতি অল্পই শুনিয়াছি।

গীত। এস এস ফিরে এস!...

একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস। তাহাতে রবি বাবুর কামিনী-লাঞ্ছিত বংশী-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ! আমার বোধ হইতে লাগিল, কণ্ঠ একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শমাত্র অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গি! গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে। আমি তখন "রৈবতক"-"কুরুক্ষেত্রে"র কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল; আমার নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল। আমি পৌত্তলিকের এ ভাব দেখিয়া রবি বাবু কি মনে করিবেন ভাবিয়া, আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে এ গানের জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তার পর নিজের রচিত আরও দুই একটি গীত গাহিলেন।...গানের পর তাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবি বাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা। তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই। তাহার পর তাঁহার গান ও কবিতার কথা হইল। নিধু বাবুর গানগুলি ৪।৬ লাইন একটি সম্পূর্ণ ভাবের ফোয়ারা, এবং তাঁহার গানগুলি বড় দীর্ঘ এক একটি কবিতা বিশেষ, বলিলে তিনি বলিলেন তাঁহার ছোট ছোট গানও আছে।...

দুজনে বহুক্ষণ গল্প করিতে করিতে আহার করিলাম, এবং আহার করিতে করিতে সাহিত্য ও বহু বিষয় আলাপ করিলাম। অপরাহ্নে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে রাণাঘাট দেখাইতে ও বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'ভারতী'তে 'রৈবতকের' সেই

আপনার বই সমালোচনার অধিকার যদি আমাকে দেন তবে কোন মাসিক পত্রে তাহার সমালোচনাই করিব চিঠিপত্রে আভাস দিয়া তাহার নূতনত্ব নষ্ট করিব না।

যে বৈষ্ণব পদটির ৫ অর্থনির্ণয়ের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহার অর্থ আমার নিকট এত সহজ বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, আশঙ্কা হয় তাহা ভ্রম হইবে। নতুবা আপনারা প্রশ্ন করিবেন কেন? তথাপি সাহসপূর্ব্বক, যাহা মনে উদয় হইল, তাহাই লিখিয়া দিলাম।

রাধিকা বলিতেছেন, প্রথম সেই চোখের দেখার ভালবাসা প্রতিদিন এতদূর উঠিল, যে তাহার আর অবধি রহিল না। সে যে পুরুষ এবং আমি যে রমণী এ জ্ঞান আর রহিল না। কেবল এইটুকু জানি যে দুইজনের মনে মনোভব প্রবেশ করিয়াছে। হে সখি, সেই প্রেমের কথা আজ বুঝি কানু ভুলিয়াছে, কারণ, তখন ত দূতীও খুঁজিতে হয় নাই আর কাহারও আবশ্যক ছিল না, কেবলমাত্র পঞ্চবাণই উভয়ের মিলন সাধন করিয়াছিল। এখন সেও বিরূপ হইল সুতরাং তুমি হইলে দূতী— সুপুরুষের প্রেমের কি এমনই রীতি।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রেম যখন পরস্পরের সমস্ত প্রভেদ দূর করিয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটাইয়াছিল, তখন মাঝখানে ভালবাসা ছাড়া আর কিছু আবশ্যক ছিল না। এখন সেই ভালবাসা বিরূপ হইয়াছে তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইয়াছে। উভয়ের অথবা একজনের মনে আত্মচেতনা জাগিয়া

অপূর্ব্ব সমালোচনার উল্লেখ করিয়া রবি বাবু বলিলেন—"আমি ও দিদি এ সমালোচনার কিছুই জানিতাম না। উহা বোধ হয় আমাদের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আপনি আমাদের অবিচার করিবেন না।...আমি ও দিদি [স্বর্ণকুমারী] উহার জন্য বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" নগরভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রির আহারে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।...তিনি [রবীন্দ্রনাথ] এ বেলা বড় খাইতেছিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন -"আমাকে ক্ষমা করিবেন। বধূঠাকুরাণী সকালে একদিকে আমার প্রতি ৫৩ রকমের ব্যঞ্জনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আলাপে৭ এরূপ একটা মোহিনী শক্তি (charm) আছে যে আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সকালে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আর বোঝাই লইতে পারিতেছি না।" আমি বলিলাম—"এ কেবল শিষ্টাচারের কথা। কলিকাতার "বৈঠকখানার বীরকে" (Hero of the Calcutta drawing room) আমি গরীব কি খাওয়াইতে পারি? আর আলাপ— আমি 'বাঙ্গালের' আলাপে রবি বাবুকে মুগ্ধ করিবার শক্তি থাকিবারই ত কথা!" তখন সুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবমতে আমরা খুব ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলাম। আহারান্তে আমি ও সুরেন্দ্র বাবু উভয়ে রবি বাবুকে নিশীথ সময়ে গোয়ালন্দ মেলে তুলিয়া দিয়া জীবনের একটি দিন বড় আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।...' —আমার জীবন, চতুর্থ ভাগ, পৃ. ২৭১-৭৩

৫ রামানন্দ রায়ের নিম্নোদ্ধৃত পদ—

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজনু দোতী না খোজনু আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

উঠিয়াছে তাই মাঝখানের সেই ব্যবধানটুকু অবলম্বন করিয়া মান অভিমান সাধ্যসাধনা এবং দূতী প্রেরণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যদি সে আপনাকে তুলিতে পারিত তবে সে আপনিই আসিত দূতী পাঠাইত না।

সেই কীর্ত্তন গানটি [৬] কপি করিয়া পাঠাই।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বর,

আমার দলের লোক বিলাতে এখন আর কই? পরিচিতবর্গের মধ্যে একমাত্র অমি [৭] আছে, সে সিভিল সার্ভিস পড়িতেছে— এই আগষ্ট মাসে পরীক্ষা দিবে। সে ত আপনারও পরিচিত। তবু তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার ঠিকানা আমার জানা নাই— কলিকাতায় গেলেই আশুদের [৮] ওখান হইতে জানিতে পারিবেন। আর, জগদীশ বসু অল্পকালের জন্য গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকেও একখানি পত্র দিলাম। কোন ভাল ইংরাজ পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই আমার মতে সব চেয়ে ভাল হয়। সে জন্য Dr. Mallik কে[৯] পত্র লিখিলে সাহায্য পাইতে পারিবেন। তাহারা নবাগত ভারতবর্ষীয়দের সাহায্যার্থে একটা কি দল বাঁধিয়াছেন। তাঁহার ঠিকানাও আমার অগোচর।

নির্ম্মলকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। সে যেন অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়া এবং দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া কৃতী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে এই আমি একান্ত মনে প্রার্থনা করি। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘটনাক্রমে আমি কলিকাতায় যাইতেও পারি কিন্তু এখন হইতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। দীর্ঘকাল দেখা হয় নাই— কবে আপনার সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে? ইতি—২৬শে শ্রাবণ ১৩০৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬ ৪ সংখ্যক টীকায় উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'এস এস ফিরে এস' গান। 'আমার জীবন' পাঠে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই গানটি নবীনচন্দ্রকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল যে, ভক্তজনদিগের নিকট গানটির প্রশংসা করিয়া তিনি "গানটি একবার রবিবাবুর মুখে তাঁহাদের শুনিতে" বলিতেন।

৭ শ্রীঅমিয়নাথ চৌধুরী, সার্ আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা

৮ সার্ আশুতোষ চৌধুরী

৯ ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক

সবুজ যার চোখ

শ্রীলীলা মজুমদার

মলয়ার চারিদিকের পরিচিত পুরোনো পৃথিবীখানা কাঁচের বাড়ির মত ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ভেঙে পড়ল। পাছে তার অণুকণা চোখে প্রবেশ করে, মলয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করল। ত্রিভুবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়খানিও ঘন কুজ্ঝটিকায় পূর্ণ হ'ল। নিমেষের মধ্যে চিত্ত থেকে সুখ ও শান্তি বিদায় নিল। পাঁচ দণ্ড আগে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না কে জানে সে কেমন ক'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে সোনালি দিবালোক হরণ ক'রে নিল।

পাঁচ দণ্ড আগে বুকভরা অসীম শান্তি নিয়ে প্রতাপের রেশমি জামার ছেঁড়াটুকু সেলাই করতে মলয়া বসেছিল। পাঁচ দণ্ড পরে মলয়ার শিথিল হাত থেকে উড়ে গিয়ে বৃন্তচ্যুত ফুলের মত ঈষৎ গোলাপগন্ধ লাগা গোলাপী লিপিখানি মাটিতে পড়ল।

গোলাপী চিঠিতে সুগোল হরফে যা লেখা আছে তার মর্ম এই যে: যখনই আমি হীরের কানবালা জোড়া পরব তখনই তোমাকে স্মরণ করব এবং চিরতরে জ্যৈষ্ঠমাস আমার প্রিয় হয়ে থাকবে। ইতি। পাপিয়া।

জ্যৈষ্ঠমাসে মলয়া দুই ছেলে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল, ফিরেছিল আষাঢ় মাসে সেখানে ঘোর ঘনঘটা শুরু হবার পর। প্রতাপ স্টেশনে এসেছিল এবং পুরোনো গৃহিণীর পাকা ফলের মত রূপ নিয়ে কৌতুক করেছিল। বাড়ি এসে সাদা বেনারসি শাড়ি উপহার দিয়েছিল। মলয়ার হৃদয় কোমলতায় ভরে গিয়েছিল। ভেবেছিল দোকানে যাবার ওঁর সময় হয় না, তবুও অনেকদিন পর এসেছি বলে সময় করে নিয়ে নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। খুশিতে মন ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠেছিল।

আসলে প্রতাপ তার বিবেককে উৎকোচ দিচ্ছিল।

ক্রোধ একখানা উন্মুক্ত অসির মত মলয়ার চেতনাকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ করে দিল।

ষোল বছর আগে মলয়ার বিবাহ হয়েছিল আর এই ষোল বছর ধ'রে চিত্তে অবিরাম বিয়ের বাঁশি বেজেছিল। আজ সহসা যেন সে থেমে গেল।

তখন মলয়ার একুশ বছর বয়স। ঠিক সুন্দরী নয়। কিন্তু তন্বী তরুণী, বিয়ের গোড়েমালা প'রে কি সুন্দর দেখিয়েছিল। তখন তার আজানুলম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম ছিল; অঙ্গুলিপ্রান্ত আপনা থেকেই গোলাপী আভা ধারণ করত।

সে সকল প্রাচীন সম্পদ যে কবে হারিয়ে গেছে মলয়া তা লক্ষ্যই করে নি। পলায়মান যৌবনের জন্যে তার মনে কোনো অনুতাপই ছিল না। প্রতাপ আর মলয়া উভয়েই আধাবয়সী হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দুই ছেলের কৈশোরে যে কৈশোরকে খুঁজে পাওয়া যায় সে ত নাগালের বাইরে যায় নি। তাই মলয়ার হাসিকৌতুকের অন্ত ছিল না। তার বিষম গর্ব ছিল যে, পৃথিবীর সেরা সম্পদ যে মনের শান্তি সে তার শেকলবাঁধা বন্দিনী।

আর মলয়া ভাবত : আমি যা কিছু পেয়েছি চিরদিন সে আমার ৷

পাপিয়া !!

পাপিয়া কেমনতর তা সে ভাবতে চেষ্টা করল। মনে পড়ল; প্রতাপের বন্ধু প্রোফেসার ঘোষের শ্যালিকা পাপিয়া। শ্যালিকা শব্দ উচ্চারণমাত্র হৃদয়ে যে মধুবরসের সৃষ্টি হয় পাপিয়া তার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারিণী।

পাপিয়ার বয়স নিতান্ত তরুণ নয়, কিন্তু মন্ত্রবলে সে যৌবনকে দেহে বন্দী ক'রে রেখেছে। বাঁকানো ভ্রূযুগল ; চূড়ো করে চুল বাঁধা ; আশ্চর্য রাঙা বিম্বাধর ; কতখানি আসল আর কতখানি নকল বুঝবার উপায় নেই। পাপিয়া তন্বী, তা'র সাজ-আভরণ অপূর্ব। হাতের নখের রঙ ঠোঁটের রঙের সঙ্গে মিলে যায়।

যা কিছুকে মলয়া এতদিন কৌতুক-মেশানো অবহেলা ক'রে এসেছে, পাপিয়ার সে সকলই আছে। তাই পাপিয়া মলয়ার স্বামীর হৃদয় হরণ করেছে।

মনে পড়ল লোকমুখে শোনা কথা, পাপিয়ারও নাকি স্বামী আছে, বড় ভালো লোক, কোথাকার অধ্যাপক নাকি, সে মাসে মাসে পাপিয়াকে রাশিরাশি টাকা পাঠায় তার সান্নিধ্য থেকে বহু দূরে বাস করবার জন্য।

তখন মলয়া কাঁদল। যখন কেঁদে কেঁদে আর কাঁদা যায় না তখন উঠে এসে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্মম হয়ে নিজের রূপকে বিচার করল।

সেদিনকার তন্বী সকলের অগোচরে কোথায় বিদায় নিয়েছে। রূপকে চিরদিন সে মনোমুগ্ধকর কিন্তু অকিঞ্চিৎকর মনে করে এসেছে। রূপ দিয়ে কাকেও কখনো সে লুব্ধ করে নি। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির তার বিষম গর্ব।

আয়নায় মনে হল, স্নিগ্ধ কোমল মুখখানি যেন কঠিন হয়ে উঠেছে। তবু ঠোঁটের কোণে কোণে অবিরাম হাসি যে রেখা টেনে দিয়েছে সেগুলি পড়া যাচ্ছে। কথা কইতে গেলে গালে টোল খায়, কথা না কইলেও তার ছায়াটুকু লেগে থাকে। কিন্তু হৃদয় থেকে হাসি বিদায় নিয়েছে।

মলয়া দুই হাতে চোখ ঢাকল, আঙুলের মধ্য দিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ল।

কেন তুচ্ছর কাছে শ্রেয়ঃ হেরে গেল !

মনে পড়ল, তার এক বন্ধু বলেছিল যে, স্বামীকে আয়ত্ত করতে চাওয়াটাই ইম্মর্যাল ! অপরকে অধিকার ক'রে তা'র ব্যক্তিত্বর অবাধ গতিতে হস্তক্ষেপ করা মহাপাপ ! অবশ্য মহাপাপ শব্দ সে উচ্চারণ করে নি, কারণ ওতে কেমন একটা ধর্ম-ধর্ম গন্ধ আছে।

আরও মনে হ'ল ঐ বন্ধুর সঙ্গেই পাপিয়া একদিন এসেছিল। মাদ্রাজী শাড়ী প'রে, কটিতটে মাদ্রাজী রূপার মেখলা প'রে। তাই দেখে মলয়া বলেছিল, কি সুন্দর কারুকার্য। আর মনে মনে ভেবেছিল, কি সুন্দর পাপিয়ার কোমরটাও ! হেসেছিল ভেবে, ঐ মেখলা পরলে মলয়াকে কেমন দেখাবে। গর্বে পরিপূর্ণ হয়েছিল ভেবে যে : মলয়ার কোনোদিন মেখলার প্রয়োজন নেই। মলয়া এমনিই সম্রাজ্ঞী ! ঈর্ষা তার সবুজ নেত্র উন্মীলিত করে হৃদয়ে জেগে উঠল। তার মাথার শত শত রুষ্ট সাপ গর্জে উঠল। তার সবুজ ভুজঙ্গের বিষে পৃথিবীর বর্ষাস্নিগ্ধ সুঘন শ্যামল বনানীর শোভা ম্লান হ'ল।

ঈর্ষাকে মলয়া ঘৃণা করে। ঈর্ষা দুর্বলতার স্বীকৃতি। কিন্তু আজ মনে হ'ল, স্বামীর কাছ হ'তে

পূর্ববর্তী জীবনে যত সুখ পেয়েছে সমস্ত অর্থহীন। পরবর্তী জীবনেও আর কোনো সুখের আশা নেই, কারণ বিদ্যাবুদ্ধি সৌহার্দ্য সব পরাজিত হয়েছে পাপিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপরাশির কাছে।

মলয়ার চিন্তার স্রোত কেমন বদ্‌লিয়ে গেল। বাংলাদেশের সতীনারীদের নিদ্রাহীন সতর্কতা চিরদিন ছিল তা'র কৌতুকের উপাদান। অপরের পতন স্খলন ত্রুটি ইত্যাদি সকল দুর্বলতা অকাতরে সে মনে মনে শতবার মার্জনা করে এসেছে। বন্ধুবান্ধবদের বারংবার বলেছে, দুর্বলদের পুনরায় সুযোগ দেওয়া হোক্। বলেছে, আদিপুরুষ যাদের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছে তারা দুর্বলতার উত্তরাধিকারী। নারীপুরুষ-নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করা হোক।

কিন্তু প্রতাপকে সে ক্ষমা করবে না। কি ক'রে প্রতাপ এমন করতে পারল?

সহসা মনে পড়ল, গত বছর প্রতাপের বোনের বিবাহে অতিথিদের তালিকা রচনা করা হয়েছিল তার মধ্যে পাপিয়ার ঠিকানা আছে। পাপিয়াকেও সে ক্ষমা করবে না। সতীর দৃপ্ত দৃষ্টির রোষানলে তাকে দগ্ধ করবে।

তখন মলয়া পাপিয়ার যোগ্য সজ্জা ধারণ করল। সুচতুর কবরী-রচনা। কাজলে কুম্‌কুমে সিঁদূরে প্রলেপে সুগন্ধে সযত্নে প্রসাধন। অঙ্গে সোনার অলঙ্কার, পরনে শুভ্র নববস্ত্র।

প্রথম আজ মলয়া পাপিয়ার বাড়ি পদধূলি দিল।

পাপিয়ার বাড়ি ছোট, গোলাপী পর্দাশোভিত। দোতলার বারান্দায় বেতের খাঁচায় হল্‌দে পাখি গান গাইছে। খিলানে গোলাপী লতার ফুলের ঝাঁক। পাপিয়ারই উপযুক্ত বটে।

পাপিয়া থাকে দোতলায়। সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে মলয়া উপরে এল! কতবার প্রতাপ এখানে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠেছে? মলয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সবুজ চীনেমাটির আধারে শ্যামল পাতার রাশি। সবুজ ঘরের দেয়াল। প্রাচীন কাঁচের পুঁতির মালার পর্দা, স্পর্শমাত্রেই রিম্‌ঝিম্ করে বেজে উঠবে। কোথায় পেল পাপিয়া?

মলয়া অপ্রতিভ হয়। হৃদয়াবেগ উপশমিত হয়, কণ্ঠ কম্পিত হয়, পাপিয়াকে ডাকবে কেমন করে? যদি পাপিয়া ছুটে এসে কটি বেষ্টন করে কানে কানে বলে "মলয়া, তুমি এসেছ ব'লে বড় খুশি হয়েছি।"

কেমন করে মলয়া বলবে "তুই আমার স্বামীর হৃদয় হরণ করেছিস বলে তোকে দগ্ধ করতে এসেছি।"

মলয়া পর্দায় হাত দেয়, সেই কলস্বনে পাপিয়া ছুটে আসে। "মলয়া! ও মলয়া! তুমি সত্যি আসবে আমি ভাবতে পারি নি!" পাপিয়া মলয়াকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়।

সবুজ দেয়াল, শ্যামল সাজ-আবরণ, সবুজ গাল্‌চে পাতা। সে শ্যামলিমা হৃদয়ে প্রবেশ করে। সবুজ দেয়ালের সামনে নীচু চৌকির উপর লাল ফুলের ছড়া।

মলয়াকে অবাক্ করে দেয়।

বাহিরের রুদ্র-দগ্ধ দিবালোকে মেঘের ছায়া পড়ে, সহসা বর্ষণ শুরু হয়। তবু মলয়া ভাষা খুঁজে পায় না।

পাপিয়া কি সুন্দরী ! রূপসী নয়, কিন্তু মনোমোহিনী। সবুজ মুসলমানী জামা পরেছে, সবুজ পাড়ের মিহি সাদা শাড়ী পরেছে, গলায় সবুজ মালা পরেছে, হাতে সবুজ কাঁচের চুড়ি। পাপিয়ার চোখে জড়িমা, অধরে মাধুরী।

মলয়ার নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। এই সময়ে কিরণ বলে ছেলেটি প্রবেশ করে।

"তুমি ভিজেছ ?" পাপিয়ার ভ্রূযুগল ধনুকের মত, হাত দুখানি রাঙা কোকনদ। পাপিয়ার মৃদুস্পর্শে কিরণের শিহরণ হয়। মলয়ার হৃদয়ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়।

"কিরণ এখানে খাবে। তুমিও খেয়ে যাও মলয়াদি।" মলয়ার নামের সঙ্গে ছোট একটি 'দি' জুড়ে দিয়ে প্রায় সমবয়সী পাপিয়া মলয়ার বয়সের সঙ্গে দশ বৎসর জুড়ে দেয়।

"খেয়ে যাও মলয়াদি, আমি নিজে রান্না করেছি।"

মলয়া ঘাড় নাড়ে— "আমার বাড়িতে যে কাজ আছে।"

কিরণও উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। "সত্যি পাপিয়া, মানুষকে ধরপাকড় কর কেন ? মলয়াদি'র কাজ আছে, মলয়াদি বাড়ি যেতে চায়। চলুন মলয়াদি, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।"

মলয়াও উঠে পড়ে। বলে "চলি, পাপিয়া। তোমার বাড়িঘর সুন্দর লাগল।"

"উদারতার সৃষ্টিশক্তি" : অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪০	৯	সবারই ধর্মে	ধর্মে সবারই
	১০	হূণান্ধ	হূণান্ধ্
	১৯	ধর্ম	ধর্মাবলম্বী
	৩৩	বোখারায়	বোখারার
১৪১	১৫	কেননা···তর্কজাল	কেহ···তর্কজালে
১৪২	১১	তবু···দলও	তবুও···দল
	১৩	তথাপি জ্ঞানালোচনা	জ্ঞানালোচনা
১৪৭	৩১	ভরা	ভয়া
১৫১	৩২	বীরু হিন্দু	বীরু
১৫৪	১৫	নরকতত্ত্ব	পরমতত্ত্ব

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। ১৮৭০ সনে তাঁহার জন্ম এবং ১৮৯৯ সনে ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই স্বল্প-পরিসর জীবনে তিনি বাংলা-সাহিত্যে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বর্ণমুষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাঁহার মৃত্যুর আট বৎসর পরে, ১৯০৭ সনের আগষ্ট মাসে 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' (পৃ. ৭৩৫) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলীতে বলেন্দ্রনাথের তিনখানি পুস্তক ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩ দ্রষ্টব্য) ও বিভিন্ন মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগৃহীত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে কতকগুলি রচনা ইহাতে বাদ পড়িয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর একটি ত্রুটি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রচনার কালানুক্রমে সংকলন করিলেও লেখকের শক্তির ও মতামতের ক্রম-পরিণতি বুঝিবার সাহায্য ঘটিত; কিন্তু তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই।" এমন কি পুনর্মুদ্রিত রচনাগুলি কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যা হইতে গৃহীত, তাহার নির্দেশও গ্রন্থাবলীতে পাইবার উপায় নাই। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বা পুরাতন মাসিকপত্রের সংখ্যাগুলি, এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে বর্তমান পাঠকের পক্ষে বলেন্দ্রনাথের রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা নাই বলিলেই চলে। ভবিষ্যতে যাহাতে বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর একটি সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয়, এই আশায় আমরা তাঁহার একটি কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জী প্রস্তুত করিয়াছি। তারকা-চিহ্নিত (*) রচনাগুলি বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই বুঝিতে হইবে।

১২৯২	জ্যৈষ্ঠ	...	'বালক'	...	এক রাত্রি (বালকের রচনা)
	শ্রাবণ	...	"	...	চন্দ্রপুরের হাট
	আশ্বিন-কার্তিক		"	...	বনপ্রান্ত
	ফাল্গুন	...	"	...	পুলের ধারে
				...	সন্ধ্যা (কবিতা)
১২৯৩	বৈশাখ	...	'ভারতী ও বালক'	...	মিলন (বালকের রচনা)
	আষাঢ়	...	"	...	সন্ধ্যা
	ভাদ্র	...	"	...	ঊষা ও সন্ধ্যা
	কার্তিক	...	"	...	অশ্রুজল (কবিতা)
	পৌষ	...	"	...	যাত্রা
১২৯৪	জ্যৈষ্ঠ	...	'ভারতী ও বালক'	...	অবসান (কবিতা)
			"	...	কাহিনী
	আষাঢ়	...	"	...	* আশা †

† ১২৯৫ বৈশাখ মাসের ভারতী ও বালকে "পাঠকদিগের প্রতি নিবেদন" দ্রষ্টব্য। তাহাতে লিখিত আছে "গত বৎসরের সূচিপত্রে ভুল ক্রমে 'আশা' নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার লেখক"।

প্রবন্ধশেষে লেখকের নাম ছিল "শ্রী ব না ঠা।"

১২৯৪	শ্রাবণ	··· ‘ভারতী ও বালক’	···	প্রণাম
	ভাদ্র	··· ”	···	বন্দিনী
	কার্তিক	··· ”	··	হৃদয়াঞ্জলি
	অগ্রহায়ণ	··· ”	···	দু’জনায়
	চৈত্র	··· ”	··	বিরহ
১২৯৫	বৈশাখ	··· ‘ভারতী ও বালক’	···	স্ত্রী ও পুরুষ
	জ্যৈষ্ঠ	··· ”	···	বসন্তের কবিতা
	আষাঢ়	··· ”	···	আষাঢ়ে গল্প
	শ্রাবণ	··· ”	···	আষাঢ় ও শ্রাবণ
	ভাদ্র	··· ”	···	অতীত
	অগ্রহায়ণ	··· ”	···	জন্মভূমি
	পৌষ	··· ”	···	ভূত কথা
	ফাল্গুন	··· ”	···	কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী
	চৈত্র	··· ”	···	রঙ্ ও ভাব
			···	গোধূলি ও সন্ধ্যা
			···	অতির গতি
১২৯৬	বৈশাখ	··· ‘ভারতী ও বালক’	···	হাসি (কবিতা)
			···	হিমে (কবিতা)
	জ্যৈষ্ঠ	··· ”	···	মেঘদূত
	আষাঢ়	··· ”	···	প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য
	শ্রাবণ	··· ”	···	অশ্রুজল
			···	শ্রাবণের বারিধারা
			···	বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
	ভাদ্র	··· ”	···	জীবন-ট্র্যাজেডি
			···	মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী
			···	ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা
	আশ্বিন	··· ”	···	অন্তরঙ্গ-তত্ত্ব
			···	মহত্ত্ব
	কার্তিক	··· ”	···	বিবিধ প্রসঙ্গ : কৃতজ্ঞতা, বড়মানুষি, উপভোগ
			···	স্মৃতি ও কবিতা
			···	সন্ধ্যা
			···	কৃত্তিবাস ও কাশীদাস

১২৯৬	অগ্রহায়ণ ···	'ভারতী ও বালক' ···	স্বভাব ও সাহিত্য
		···	মত্ততা সুখ
		···	বঙ্গসাহিত্য। রামপ্রসাদের গান
		···	বিদেশের ঝরা ফুল
	পৌষ ···	„ ···	রমলা
		···	নগ্নতার সৌন্দর্য্য
		···	রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর
	মাঘ ···	„ ···	সে
	ফাল্গুন ···	„ ···	ভারতচন্দ্র রায়
		···	ক্ষণিক শূন্যতা
		···	কেতকা-ক্ষেমানন্দ
	চৈত্র ···	„ ···	প্রেম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
১২৯৭	জ্যৈষ্ঠ ···	'ভারতী ও বালক' ···	* কল্লোলিনী (কবিতা)
	আষাঢ় ···	„ ···	প্রেম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
		···	সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়
	···	'সাহিত্য' ···	* বিজ্ঞতা (কবিতা)। ইহা ১৩০৬ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'প্রদীপে'ও মুদ্রিত হইয়াছে।
	শ্রাবণ ···	'ভারতী ও বালক' ···	রাধা
	আশ্বিন ···	„ ···	দুষ্মন্ত
	অগ্রহায়ণ ···	„ ···	যশোদা
		···	কৈফিয়ৎ
	পৌষ ···	„ ···	শরৎ ও বসন্ত
	চৈত্র ···	„ ···	বোল্‌তা
		···	সখ্য
১২৯৮	বৈশাখ ···	'ভারতী ও বালক' ···	বোল্‌তা ও মধ্যাহ্ন
	জ্যৈষ্ঠ ···	„ ···	শিব
	···	'সাহিত্য' ···	* কবি ও সেন্টিমেন্ট্যাল
	ভাদ্র ···	„ ···	* প্র্যাকটিক্যাল
	···	'ভারতী ও বালক' ···	* লণ্ডনে কংগ্রেস
	অগ্রহায়ণ ···	'সাধনা' ···	ঋতুসংহার
		···	জানালার ধারে

১২৯৮	পৌষ ...	'ভারতী ও বালক' ...	বুদ্ধদেব
		...	রত্নাবলী
		...	দেয়ালের ছবি
	মাঘ ...	" ...	মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ
		...	মালবিকাগ্নিমিত্র
	ফাল্গুন ...	" ...	পুরাতন চিঠি
		...	নীতিগ্রন্থ
		...	সাময়িক সারসংগ্রহ : খৃষ্টীয় নরক, কৃত্রিম দাম্পত্য নির্বাচন
	চৈত্র ...	" ...	অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ
		...	সাময়িক সারসংগ্রহ : "ক্রিমিনাল" মানবতত্ত্ব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ক্রিমিনাল-তত্ত্বের প্রয়োগ
		...	তখনকার কথা
১২৯৯	বৈশাখ ...	'সাধনা' ...	সাময়িক সারসংগ্রহ : প্রেমে পড়া
		...	অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর
	আষাঢ় ...	" ...	ধর্ম্মজঙ্গল
		...	সাময়িক সারসংগ্রহ : জাপানী সভ্যতা
	শ্রাবণ ...	" ...	বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা
	ভাদ্র-আশ্বিন ...	" ...	কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা
	অগ্রহায়ণ ...	" ...	সারসংগ্রহ : নূতন "ফেডারেশন"
	মাঘ ...	" ...	মুসলমান সমাজ
	ফাল্গুন ...	" ...	ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম
		...	অনার্য্য ব্রাহ্মণ
	চৈত্র ...	" ...	ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা
১৩০০	বৈশাখ ...	'সাধনা' ...	উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র
		...	সারসংগ্রহ : আকবরের স্বপ্ন
	জ্যৈষ্ঠ ...	" ...	খণ্ডগিরি
		...	সাময়িক সারসংগ্রহ : সশস্ত্র য়ুরোপ
	আষাঢ ...	" ...	উত্তরচরিত
		...	সাময়িক সারসংগ্রহ : বিক্রমাদিত্য
	শ্রাবণ ...	" ...	সাময়িক সারসংগ্রহ : লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও আহার্য্যসংস্থান ; বর্ম্মার ডাকাত

১৩০০	ভাদ্র …	‘সাধনা’ …	কণারক
	আশ্বিন-কার্তিক	„ …	প্রাচীন উড়িষ্যা
		…	রবিবর্ম্মা
	পৌষ …	„ …	বারাণসী
	মাঘ …	„ …	মৃচ্ছকটিক
		…	হিন্দু দেবদেবীর চিত্র
	ফাল্গুন …	„ …	জয়দেব
	চৈত্র …	„ …	পশুপ্রীতি
১৩০১	বৈশাখ …	‘সাধনা’ …	কাব্যে প্রকৃতি
	অগ্রহায়ণ …	„ …	বোম্বায়ের রাজপথ [লেখার শেষে বা সূচীতে লেখকের নাম নাই]
১৩০২	জ্যৈষ্ঠ …	‘সাধনা’ …	গুজরাটে গরবা
১৩০৩	বৈশাখ …	‘ভারতী’ …	কলবেদনা
১৩০৫	বৈশাখ …	‘ভারতী’ …	দিল্লীর চিত্রশালিকা
	জ্যৈষ্ঠ …	„ …	বেনোজল
	ভাদ্র …	„ …	প্রাচ্য প্রসাধনকলা
	অগ্রহায়ণ …	„ …	শুভ উৎসব
	মাঘ …	„ …	গৃহকোণ
	ফাল্গুন …	„ …	নিমন্ত্রণ-সভা
		[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]	
১৩০৬	আশ্বিন-কার্তিক	‘প্রদীপ’ …	* রবিবর্ম্মা (অসমাপ্ত)
		…	* লাহোরের বর্ণনা (অসমাপ্ত)
		…	* শিবসুন্দর †
১৩০৭	অগ্রহায়ণ …	‘পুণ্য’ …	প্রার্থনা
	পৌষ …	„ …	গান
	চৈত্র …	„	টা ও খান
১৩০৮	বৈশাখ …	‘পুণ্য’ …	সুরা দেবী

১৯০৭ সনে ‘স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী’ প্রকাশিত হইবার পর বলেন্দ্রনাথের যে-কয়টি অপ্রকাশিত রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার তালিকা :—

নীরবে …	‘সাহিত্য’, আষাঢ় ১৩২৩
সৌরভ, তুজনায়, বিদায় (কবিতা) …	‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩

† রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—“বলেন্দ্র কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসংকল্প মহদাশয়কে ‘প্রদীপ’ সম্পাদকের নিকট ঋণমুক্ত করিলাম।”

বধূ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইল— সেইজন্য যদি চ তোমার নাম জানি না মা, তথাপি আশা করি, যে ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে এ পত্র তোমার হস্তে পড়িবে।

ভগবান অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আছেন— তাঁহারই আলোক আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে তাঁহারই বায়ু প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্বাসরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছ; তাঁহারই সঙ্গে তোমার একান্ত যোগ ত এক মুহূর্ত্তকালও বিচ্ছিন্ন নাই— যিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন সেই অন্তর্যামীকে যে কেমন করিয়া পাওয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তিনি কাহার কাছে কখন কেমন করিয়া যে দেখা দেন তাহা তিনিই জানেন— কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ জানিয়ো তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই এবং করিবেন না। উপনিষদে ঋষি একটি কথা বলিয়াছেন— স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা— ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদের বন্ধু— কারণ বন্ধুই যদি না হইবেন তবে সৃষ্টি করিলেন কেন? তিনি এই নিমেষেই আমাদিগকে লুপ্ত করিতে পারেন। সেই যে আমাদের জনিতা অর্থাৎ পিতা এবং বন্ধু— স বিধাতা— তিনিই আমাদের বিধাতা— অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রত্যেক সুখ দুঃখ তাঁহারই বিধানে ঘটিতেছে। যখন একথা নিশ্চয় যে আমার বন্ধুর বিধান ছাড়া জগতে আর কোনো বিধান নাই তখন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি ধন্য— সুখ দুঃখ আমার সকলি শিরোধার্য্য— সকল কর্ম্মে সকল স্থানেই তিনি আমাকে আমার সার্থকতার দিকেই লইয়া যাইতেছেন ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই। আমিই কি কেবল তাঁহাকে চাই তিনি কি আমাকে চান না? যদি না চাহিবেন তবে আমার মত ক্ষুদ্রটুকুর জন্য জগৎ জুড়িয়া এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন কেন? শুধু কেবল আমিই যদি তাঁহাকে চাহিতাম তবে কোনকালে তাঁহাকে পাইতাম না— কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর ভাবনা কিসের? তাঁহার কাল অনন্ত তাঁহার পথ বিচিত্র এবং এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমাদের শেষ নহে। অতএব প্রত্যহই নির্ভর করিয়া থাক— ইহা নিশ্চয় মনে রাখ তিনি তোমাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়েন নাই।

আমি গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবার অধিকারী নহি— আমি হিতৈষীর ন্যায় তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে জীবনে প্রত্যহ একটা কোনো মঙ্গল কর্ম্ম করিয়ো যাহা নিতান্তই তাঁহারই উদ্দেশে করা হইবে। যাহার জন্য যশ চাহিবে না, যাহার প্রতিদান পাইবে না, যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে গোপনে সম্পন্ন করিবে। তখন মনে মনে এই বলিয়ো, "ভগবান এই কাজটি সম্পূর্ণ তোমাকেই দিলাম— ইহা তুমিই জানিলে আর

আমিই জানিলাম।" যদিও সংসারের সকল কাজই তাঁহারই কাজ, কারণ এ সংসার তাঁহারই সংসার— তথাপি সে সকল কাজের সঙ্গে আমাদের নানা স্বার্থ নানা বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে। দিনের মধ্যে অন্তত একটা কোনো কাজ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক, বাধ্য না হইয়া, সমস্ত ফলকামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পার তবে সেই কর্ম্মের মধ্যে তোমার পূজা সমাধা হইবে তোমার জীবন কৃতার্থ হইবে। ভগবানের কাজে ছোট বড় নাই, তিনি ভাবগ্রহণ করেন— তুমি তোমার সাধ্য বুঝিয়া সামান্য যাহা কিছু পার তাহাই করিয়ো। কর্ম্মে ভগবানের যে পূজা তাহাই শ্রেষ্ঠ।

মাতঃ আমার এই আশীর্ব্বাদ পত্র তোমার কোনো কাজে লাগিবে কিনা জানি না কারণ, আশীর্ব্বাদ সার্থকভাবে করিবার শক্তি সকলের নাই— আমিও ফলকামনানিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ করিয়া এই পত্রখানি তোমাকে প্রেরণ করিলাম— তাঁহারই জয় হউক।

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল হইতে আমার শরীর অসুস্থ হইবার অনেক কারণ ঘটিয়াছে— আশা করিতেছি আবার শীঘ্র বললাভ করিয়া কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিব।

আমার কোন কোন রচনা তোমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়াছে শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। নরনারীর চিত্তে ভগবানের অমৃতধারা প্রবাহিত করাইয়া দেওয়া— কোন লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

যে সংসারে তুমি প্রবেশ করিয়াছ সেই সংসারকে তুমি ধৈর্য্যে, ক্ষমায় মঙ্গলে ও মাধুর্য্যে অভিষিক্ত কর। এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিয়ো, ভগবান আমাদের সেবার অপেক্ষা রাখেন না— মানুষের সেবার মধ্যেই তাঁহার সেবা। তিনিই স্বামিরূপে আমাদের প্রীতি, পুত্ররূপে আমাদের স্নেহ, দীনরূপে আমাদের দয়া গ্রহণ করেন। যাহার সেবা করিবে মঙ্গল করিবে পূজারূপে তাহা ঈশ্বরের চরণেই পৌঁছিবে। শোকদুঃখকে তাঁহার হস্তের দান বলিয়া নতশিরে ধারণ করিলে জীবনের সমস্ত বেদনাও সার্থক হইয়া উঠিবে। সংসারকেই ঈশ্বরের পবিত্র পাদপীঠ জানিয়া সেই সংসার মন্দিরেই তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে— এবং প্রসন্নচিত্তে প্রফুল্লমুখে প্রতিদিন সংসারের কল্যাণসাধনদ্বারা ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিবে।

সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদবিবাদ করিতে চাহি না। তাঁহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে, কর্ম্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার ত আমাদের রচনা নহে, আকার ত তাঁহারই।

তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ যে, ভগবানের প্রতি ভক্তি তোমার চিত্তে যে অমৃতরস বর্ষণ করিবে তাহা যেন নিয়ত তোমার চারিদিকের সংসারকে মধুময় করিয়া রাখে। ইতি ৫ই কার্ত্তিক ১৩১০

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় জানিয়ো সুখ দুঃখ বাহিরের ঘটনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না— বাহিরের ঘটনা অতি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র— ঈশ্বর যাহার অন্তঃকরণে সুখী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে জগৎ হইতে সুখ লাভ করিতে পারে। আমি অনেক লোককে জানি যাহারা সুখকর সমস্ত উপকরণদ্বারা বেষ্টিত কিন্তু চিরজীবন সুখ অনুভব করিল না। দূর হইতে উপদেশ দেওয়া সহজ— কিন্তু আমি জানি অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে জীবন যখন সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তখন জগৎ হইতে রস আকর্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু জীবন যখন পাইয়াছ, বাঁচিতেই যখন হইবে তখন নিজের সংকীর্ণ অবস্থার ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের মধ্যে মাথা তুলিতেই হইবে— আলো পাইতেই হইবে, মুক্তবায়ুর মধ্যে আত্মাকে বিস্তৃত করিতেই হইবে। বাহিরের প্রতিকূলতা যতই কঠিন অন্তরের শক্তিকে ততই প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত করিতে হইবে। তোমার চারিদিকে যেটুকু লেশমাত্র সুখ যেটুকু কণামাত্র আনন্দ আছে তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখ—বল "আনন্দং পরমানন্দম্"। পরাভূত হইয়ো না— দুঃখকে সর্ব্বদা দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিলেই তাহার জাল ছিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে—সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারম্বার মনকে বুঝাইয়ো। আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া আছি ইহার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ব্যয় হইতেছে, সেই শক্তির কণামাত্র হ্রাস হইলেই আমি তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম ; এই যে এতবড় শক্তির দ্বারা বিধৃত আমি, এই যে এতবড় প্রেমের দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি— আমার খেদ কি লইয়া? কে আমাকে কি বলিল, কে আমাকে কি বুঝিল ইহাই কি জগতে সকলের চেয়ে বড়? আমার যে এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিশক্তি একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার— আমার যে একবার মাত্র নিঃশ্বাস লইবার ক্ষমতা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা— আমার মত এই পরমাশ্চর্য্য সত্তাকে কোনো দুঃখই মলিন করিতে এবং কোনো পীড়নই ক্ষুদ্র করিতে পারে না। মন যখনই অপ্রসন্ন হইতে চাহিবে তখনই তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তিতে ঊর্দ্ধের দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা—

সুখই হউক দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক অপ্রিয়ই হউক যাহাই প্রাপ্ত হইবে তাহাকেই অপরাজিত চিত্তে উপাসনা করিবে। ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩১৩।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্টমার্ক ১৬ এপ্রিল ১৯০৭]

মাতঃ

ঈশ্বর যদি আমার মধ্যে আশীর্ব্বাদ করিবার যথার্থ শক্তি দিতেন তবে আমার আন্তরিক মঙ্গল-কামনা তোমার জীবনকে এই মুহূর্তেই নবপ্রভাতের আলোকের ন্যায় স্পর্শ করিত। যে জীবন শান্তির জন্য প্রার্থী, পরিপূর্ণতার জন্য ব্যাকুল, উপর হইতে তাহার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে পারি ঈশ্বর যদি কোনোদিন আমাকে এমন অধিকার দান করেন তবে আমি ধন্য হইব। আমিও যাত্রী— তীর্থ কতদূরে তাহা তীর্থের অধীশ্বরই জানেন। দুর্গম পথের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করিয়া আমাকে চলিতে হইবে,— আমারই কি আনন্দের সম্বল জমিয়াছে? নববর্ষের দিনে আমি ঈশ্বরের কাছে এই কথাই জানাইয়াছি যে সুখে দুঃখে আমার জীবনকে লইয়া প্রতিদিনই তুমি ত মঙ্গলসঙ্গীত রচনা করিয়া চলিয়াছই— আমার প্রার্থনা কেবল এই যে তোমার সেই মঙ্গলে আমারও অন্তঃকরণ যেন যোগ দিয়া চলে— আমি যেন তোমার হাতের সমস্ত দানকেই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। ঈশ্বর না জানি আরো কি দাবী করিবেন সে কথা মনে করিতে ভয়ও হয়, সেটুকু দুর্ব্বলতা ছাড়িতে পারি নাই— কিন্তু তবু আমার মন যেন একান্ত ভাবে বলিতে পারে আমার কাছে তোমার যত দাবী তুমি সমস্তই মিটাইয়া লও— তুমি কিছুই ছাড়িয়ো না-- আমি সহিতে পারিব— আমি আনন্দিত হইব। ঈশ্বর তাঁহার পরমদানগুলিকে দুঃখের ভিতর দিয়াই সম্পূর্ণ করেন— তিনি বেদনার মধ্য দিয়া জননীকে সন্তান দেন— সেই বেদনার মূল্যেই সন্তান জননীর এত অত্যন্তই আপন। সেই কথা মনে রাখিয়া, যখন ঈশ্বরের কাছে সত্য চাই, আলোক চাই, অমৃত চাই তখন অনেক বেদনা অনেক ত্যাগের জন্য নিজেকে সবলে প্রস্তুত করিতে হইবে। মা, ঈশ্বর যদি তোমাকে বেদনা দেন তবে নিজের দোষে সেই বেদনাকে ব্যর্থ করিয়ো না— তাহাকে সফল করিবার জন্য সমস্ত হৃদয়মনকে প্রস্তুত করিয়া জাগ্রত হও, সংসারের সমস্ত আচ্ছাদন আবরণের ঊর্দ্ধে জাগ্রত হও। মনে মনে বল, আমি দুর্ব্বল নই— বল আমি পরাস্ত হইব না— বল আমার ক্ষণিক জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবনের সম্বল রহিয়াছে, এ জীবনের সমস্ত জালই একে একে কাটিয়া যাইবেই, কিন্তু সে সম্বল কোনোকালেই ফুরাইবে না, তাহা সূর্য্যের আলোর মত অক্ষয়। ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে মহিমা স্থাপন করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া দেখ— নিজেকে দীন বলিয়া দুর্ব্বল বলিয়া অপমান করিয়ো না, কারণ তাহা কখনই সত্য নহে। তোমার অন্তরাত্মার মধ্যেই বিজয়লক্ষ্মী বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিলেই তোমার আর কোনো ভয় থাকিবে না— তুমি যে কি মহৎ তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবে— তুমি ঈশ্বরের আনন্দের ধন—এই বার্ত্তা নিজেকে শুনাইয়া দাও! যাহাই ঘটুক, ঘটনা সমস্তই তোমার আত্মার কাছে অতি তুচ্ছ— তোমার চেয়ে বড় কেহই নাই সেই জন্যই সকলের মধ্যেই তুমিও আছ। তোমার কিছুতে ভয় নাই, কিছুতেই ক্ষতি নাই, ঈশ্বর তোমার। (ক্রমশঃ]

[কাদম্বিনী দত্ত (১২৮৫ ?—১৩৫০) লোকসমাজে সুপরিচিতা ছিলেন না বা সাধারণ অর্থে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ঈশ্বরজিজ্ঞাসা তাঁর "অসামান্য ধীশক্তি" রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল—প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল উভয়ের মধ্যে পত্রযোগে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছিল।—প্রথম-জীবনেই কাদম্বিনী দেবী যে গভীর শোক পেয়েছিলেন সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় তার শান্তির সন্ধানে উৎসুক হয়ে রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে তিনি বিশেষ আশ্রয় লাভ করেছিলেন ; তারই ফলে ক্রমশঃ তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রব্যবহারেও প্রবৃত্ত হন।—তাঁর ভ্রাতা 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা এই চিঠিগুলি পেয়েছি।—কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি ইতিপূর্বে প্রবাসী (পৌষ, মাঘ, চৈত্র ১৩৩৪ ; বৈশাখ ১৩৩৫), নবমঞ্জরী (১৩৫২), বর্তমান (বৈশাখ ১৩৫৪) প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক বিশ্বভারতী পত্রিকা]

দরাপ খাঁ গাজী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুরধুনি মুনিকন্যে, তারয়েঃ পুণ্যবন্তং—
স তরতি নিজপুণ্যৈস্—তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বং—তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥

"হে স্বর্ণদী জহ্নুমুনিকন্যা গঙ্গা, তুমি পুণ্যবান্‌কে তারণ করো, কিন্তু তাতে তোমার কি মহত্ত্ব? সে নিজ পুণ্যে তরে। কিন্তু যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে তারণ করো, তবেই পৃথিবীতে তোমার মহত্ত্ব—আর সেই মহত্ত্বই মহত্ত্ব।"

দরাপ খাঁ গাজীর রচিত বলিয়া পরিচিত এই শ্লোকটী বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রচলিত। নিজ ধর্মের দেব-দেবীর পূজার সঙ্গে এবং দেব-দেবী সম্পর্কিত স্তব-স্তোত্রের সঙ্গে পরিচিত বাঙ্গালী হিন্দু বোধ হয় এমন কেহ নাই, যিনি দরাপ খাঁ-কৃত গঙ্গা-স্তোত্রের, উপরে প্রদত্ত মালিনী-ছন্দের শ্লোকটী অন্ততঃ না জানেন, এবং আবেগের সহিত পাঠ না করেন। আমার পূজ্যপাদ পিতামহ প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে ইংরেজী ১৯০৬ সালে দেহরক্ষা করেন, তখন আমার বয়স ছিল যোল বৎসর; তাঁহার নিকট বহুবার এই শ্লোকটী শুনিয়াছি, এবং শ্লোকটী মনে করিয়া রাখিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। দরাপ খাঁ গাজী যে এই শ্লোকের রচক তাহা তাঁহারই কাছে শুনি, এবং দরাপ খাঁর পরিচয়, তাঁহার জ্ঞাত-মত, তিনি এইটুকু আমাকে বলিয়াছিলেন যে (দরাপ খাঁর সময় সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণা ছিল না, কৌতূহলও ছিল না), দরাপ খাঁ নামে এক মুসলমান আমীর বা অভিজাত ব্যক্তি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ফকীর হইয়া যান, ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে তাঁহার মুসলমান ধর্ম ও শাস্ত্র অনুসারে তিনি সাধন-ভজন করিতেন; তীর্থক্ষেত্র বলিয়া ত্রিবেণীতে বহু হিন্দু যাত্রী ভক্তিভরে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত, দরাপ খাঁ তাহা দেখিতেন; তাঁহার সাধন-ভজনে নিষ্ঠা দেখিয়া গঙ্গাদেবী প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেখা দেন; এবং দরাপ খাঁ মুসলমান হইলেও, উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে ভেদ করিতেন না, গঙ্গার কৃপায় তিনি গঙ্গাভক্ত হইয়া পড়েন; তখন তাঁহার মুখ দিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটী গঙ্গা-স্তব বাহির হয়, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী হইতেছে একটী। পরে মুদ্রিত পুস্তকে দরাপ খাঁর (বা দরাফ খাঁর) রচিত বলিয়া শ্লোকটী বহু স্থলে দেখিয়াছি; এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত "বৃহৎ-স্তব-কবচ-মালা" পুস্তকে, দরাপ খাঁ রচিত অষ্টশ্লোকময় গঙ্গা-স্তবটী সম্পূর্ণ পাইয়াছি (দশম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৪ সাল, পৃঃ ৫০৯।৫১০)। বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত এই গঙ্গাস্তবটী নীচে দিতেছি; অষ্টম বা শেষের শ্লোকটীই সুপরিচিত, এবং সেটী উপরে দেওয়া হইয়াছে।

শার্দুলবিক্রীড়িত

১। যৎ ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্‌বান্ধবৈঃ
যস্মিন্ পান্থদৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীকুর্বতী পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাঽসি ভাগীরথী॥

"যে মানবদেহকে মাতৃগণও ত্যাগ করিয়াছে, মিত্র ও আত্মীয়গণও যাহা ছোঁয় না, পথিকের দৃষ্টি যাহার উপর পড়িলে তাহারা শ্রীহরি স্মরণ করিয়া থাকে, এই প্রকার সেই মানুষের মৃতদেহকে নিজের কোলে তুমিই তুলিয়া লও ; এইজন্য, হে ভাগীরথী, তুমিই হইতেছ করুণাময়ী মাতা।"

আর্য্যা

২। অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিণি, শশিশেখর-মৌলি-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণ-সময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥

"হে বিষ্ণুচরণ-নিঃসৃতে, শিব-শিরোজটা-স্থিত শ্বেত-মালতী-মালা-স্বরূপিণী, তোমাতে (তোমার জলে) দেহত্যাগের সময়ে আমাকে যে হরতা বা শিবত্ব দান করা হইবে তাহা হরিতা অর্থাৎ হরণ করা হয় নাই।"

মন্দাক্রান্তা

৩। শূন্যীভূতা শমন-নগরী, নীরবা রৌরবাখ্যা,
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥

"হে মাতঃ গঙ্গে, যেদিন হইতে তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেদিন হইতে যমপুরী শূন্য হইয়া গিয়াছে, রৌরব-আদি নরক নীরব হইয়াছে, মর্ত হইতে স্বর্গে প্রতিদিন বহুবার যাতায়াতের ফলে স্বর্গীয় বিমান-সমূহ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, এবং স্বর্গে সিদ্ধগণের সহিত স্বর্গবাসিগণ হস্তে কেবল অর্ঘ্যপাত্র ধরিয়াই রহিয়াছেন।"

উপেন্দ্রবজ্রা-ইন্দ্রবজ্রা

৪। পয়ো হি গাঙ্গ্যং ত্যজতামিহাঙ্গং পুনর্নচাঙ্গং যদি বৈতি চাঙ্গম্।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গ্যম্ ॥

"এই পৃথিবীতে যাহারা দেহত্যাগ করে, যদি তাহাদের দেহে গঙ্গার জল লাগে, তাহাদের আর দেহধারণ করিতে হয় না—(তাহারা বিষ্ণুত্ব লাভ করে বলিয়া তাহাদের) করে চক্র, শয়নে অনন্তনাগ, যান-রূপে গরুড়-পক্ষী এবং চরণে গঙ্গাজল আসে।"

শার্দূলবিক্রীড়িত

৫। কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি-দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোক-জননি ত্বদ্বারিপূরোদরে
মজ্জজ্জন্তু-কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈকমাদায় যৎ ॥

"কত অক্ষি, কত মস্তক-করোটি, কত চিতাবাঘ ও হাতীর চর্ম, কত কাক ও পেচক প্রভৃতি পক্ষী, কত সর্প, সুধাধাম চন্দ্রের কত খণ্ড; এমন কি, তুমিও কত, হে ত্রিলোক-জননি! কারণ তোমার বারিপূর্ণ গর্ভে মজ্জনশীল জন্তুসমূহ প্রত্যেকে তোমাকেই পাইয়া (স্বর্গলাভের জন্য) উদিত হয়।"

শিখরিণী

৬। কুতোঽবীচিবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ॥

"যদি তোমার তরঙ্গ নেত্রপথে আগত হয়, তাহা হইলে অবীচি নামে নরক কোথায় থাকে? অল্প-পরিমাণে তোমার জল যদি পান করা যায়, তাহা হইলে যে পান করে তুমি তাহাকে পীতাম্বর নারায়ণের বৈকুণ্ঠপুরে নিবাসের ফল বিতরণ কর। যদি দেহধারী মানবের দেহ, হে গঙ্গে, তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে শতক্রতু ইন্দ্রের পদলাভও, হে মাতা, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র ব্যাপার হয়।"

শিখরিণী

৭। ত্বমম্ভো লোকানামখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগল্ভী নিম্নানামপি নয়সি সর্বোপরি নতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জনয়সি মুরারাতিনিবহান্
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে॥

"হে জলময়ী মাতা, তুমি জগতের অশেষ পাতক-সমূহ দহন করিয়া থাক; নিম্ন স্থানেও তুমি গমন কর, কিন্তু যাহারা (তোমার চরণে) নত, সকলের উপরে তুমি তাহাদের লইয়া যাও। তুমি নিজে বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত, কিন্তু তুমি বহু বহু মুরারি বা বিষ্ণুর উদ্ভব ঘটাইয়া থাক; আহা, মাতর্ গঙ্গে, তোমার কি অদ্ভুত চরিত্র সদা জয়যুক্ত হইতেছে!"

এই শ্লোকগুলি যিনি লিখিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তিনি কিছু অধিকার লাভ করিয়াছিলেন ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং শ্লোকগুলি হইতে প্রকাশিত তাঁহার মনোভাব যে সাধারণ গঙ্গাভক্ত, পৌরাণিক-দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুরই মত ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। দরাপ খাঁ গাজী যদি সত্য-সত্যই এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষায় এতটা দখল যাঁহার ছিল এবং হিন্দুধর্মের প্রতি যিনি এতটা নিষ্ঠা বা প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কে তিনি সেই মুসলমান সজ্জন ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সুখের বিষয়, দরাপ খাঁ গাজী সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যিক উল্লেখ আছে, এবং "পাথুরে' প্রমাণ"-ও আছে। ইনি ত্রিবেণীতে বাস করিতেন বলিয়া যে কিংবদন্তী আমার পিতামহের নিকট শুনিয়াছিলাম, এই সাহিত্যিক উল্লেখ এবং "পাথুরে' প্রমাণ" এই দুইয়ের দ্বারা সেই কিংবদন্তী সমর্থিত হইতেছে।

দরাপ খাঁর নামের সহিত "গাজী" উপাধি মিলিতেছে। "গাজী" অর্থে, যে মুসলমান ব্যক্তি, ধর্মের নামে, বিধর্মী অমুসলমানের বিপক্ষে আক্রমণে বা যুদ্ধে যোগদান করে; এই উপাধি হইতে দরাপ খাঁ

যে কোনও কালে অন্ততঃ যোদ্ধা ছিলেন, এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। "খাঁ" বা "খান্" পদবী তুর্কী ভাষার, ইহার অর্থ "রাজা", এবং ইহা উচ্চবংশের মুসলমানের— বিশেষতঃ তুর্কী-জাতীয় মুসলমানের—পরিচায়ক। দরাপ বা দরাফ নামটী লইয়া পরে বিচার করিব।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যতগুলি "ধর্মমঙ্গল" কাব্য পাওয়া গিয়াছে, সে গুলির মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর রচিত গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ১৬৫০-এর মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই বইখানি এতাবৎ অপ্রকাশিত ছিল, সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম্-এ পি-এচ্-ডি এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল এম্-এ-র সম্পাদনায় বর্ধমান-সাহিত্য-সভা কর্তৃক অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৫১ সাল)। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের প্রারম্ভে বন্দনা-পালা অংশে, গণেশ, ধর্ম, ঠাকুরাণী বা দেবী, চৈতন্যদেব, সরস্বতী, বিপ্র—ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ বন্দনার পরে, দিগ্‌বন্দনা অংশে, কবির পরিচিত বা শ্রুত বিভিন্ন স্থানের দেবতাদের বন্দনা আছে। দেবতাদের মধ্যে, মুসলমান পীরেরাও বাদ যান নাই। এই দিগ্‌বন্দনায় আমরা পাইতেছি—

ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয় কাজী॥—পৃ. ১৫, মুদ্রিত সংস্করণ

"ত্রিপর্ণী" বা ত্রিবেণীর দফর খাঁ গাজী ভিন্ন, কবি রূপরাম আরও অন্য পীরের স্মরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ার "শুভি খাঁ" বা শাহ্ সুফী অন্যতম। কথিত আছে, এই শাহ্ সুফী ছিলেন দফর খাঁ বা দরাপ খাঁর ভাগিনেয়।

কারবালার যুদ্ধ লইয়া ফারসীতে মহাকাব্যের আকারে কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়; সেইগুলির আধারে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় "জঙ্গনামা" নামক কাব্য-ধারা বা কাব্য-মালা আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ জঙ্গনামা-গুলির মধ্যে বশীরহাটের অন্তর্গত জিরিকপুর-নিবাসী কবি য়াকুব আলীর রচিত বইখানি ("ছহি বড় জঙ্গনামা") ১১০১ বঙ্গাব্দে (১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে) লিখিত—এই বইখানি বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বিশেষ লোকপ্রিয়। এই বইয়ের প্রারম্ভে দরাফ খাঁর বন্দনা এই ভাবে আছে—

ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান॥[১]

ত্রিবেণীর ঘাটে যিনি বাস করিতেন এমন মুসলমান সাধক গাজী দফর খাঁ বা দরাফ খান্‌কে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যাইতেছে। তিনি কয়েক শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

ত্রিবেণীতে দরাফ খান্ বা দফর খানের মসজিদ ও তৎকর্তৃক স্থাপিত সমাধি আছে, তাঁহার কীর্তির নিদর্শন আছে, তাঁহার সম্বন্ধে সেখানে কিংবদন্তীও আছে। এতদ্ভিন্ন ত্রিবেণীর সন্নিকট ভাগীরথী তীরবর্তী নানা স্থানে দরাফ খান্ সম্বন্ধে নানা গালগল্প আছে। "গাজীর কুড়ুল" বলিয়া একটী

১। আব্দুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ" বা মুসলমান বাঙ্গালা কবিদের রচনা হইতে চয়ন, কলিকাতা, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকা—আব্দুল কাদির রচিত "বাঙলা কাব্যের ইতিহাস, মুসলিম সাধনার ধারা", পৃ, ৩১।

লোকোক্তি ত্রিবেণী অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে—'ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে অবস্থান' অর্থে এই উক্তি প্রযুক্ত হয়; বৃদ্ধ লোকে বলিয়া থাকে—"বাবা, মৃত্যু তো হয় না, গাজীর কুড়ুল হ'য়ে আছি"—অর্থাৎ, জীবন্মৃত অবস্থায় আছি। কথিত আছে, "গাজীর কুঁড়ুল" নামে প্রসিদ্ধ দুইটী লৌহদণ্ড দরাফ খাঁ বা দফর খাঁর তপস্যার প্রভাবে শূন্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, ১৩০২ সালের "জন্মভূমি" পত্রিকায় এই শ্রেণীর কতকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। একটী গল্প এই ধরণের: দরাফ খাঁ ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার ধারে বাস করিতেন। নিজ ধর্ম্মমতে সাধনার ফলে, তাঁহার অলৌকিক শক্তি হইয়াছিল, তিনি প্রেতযোনির কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিতেন। একটী লোককে ষাঁড়ে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলে; মৃত্যুর পরে তাহার স্বর্গলাভ হয়, কারণ ষাঁড়ের শিঙ্গে গঙ্গামাটী লাগিয়াছিল, এইভাবে মরণকালে গঙ্গামৃত্তিকার সংস্পর্শে তাহার সদ্‌গতি হয়। প্রেতমুখে এই কথা শুনিয়া দরাফ খাঁয়ের মনে গঙ্গাভক্তি জাগরিত হয়, এবং ইহার পর হইতে তিনি গঙ্গার সাধনা করেন, ও সিদ্ধিলাভ তাঁহার হয়।

ত্রিবেণী-সম্বন্ধে উল্লেখ লক্ষ্মণসেন মহারাজের সভার কবি ধোয়ীর "পবনদূত" কাব্যে পাওয়া যায়। সুহ্মদেশের অন্তর্গত এই তীর্থের নিকটে বিষ্ণুর একটী বড় মন্দির ছিল বলিয়া ধোয়ীর কাব্য হইতে জানা যায়। এখন হইতে একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪৭ সালের Journal of the Asiatic Society (of Bengal) পত্রিকার মে-মাসের সংখ্যায় বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসের D. Money মনি সাহেব An Account of the Temple of Triveni near Hugli নামে একটি প্রবন্ধে (৩৯৩-৪০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) ত্রিবেণীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, এবং দরাফ খান সম্বন্ধে যে সমস্ত জনশ্রুতি ও অন্য তথ্য তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সেগুলিও প্রকাশ করেন। ত্রিবেণীর দরাফ খাঁর মসজিদে অবস্থিত দরাফ খাঁর নামযুক্ত একটী আরবী লিপির শেষাংশ পাইয়া মনি সাহেব সেটীর অনুলিখন ইংরেজী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করেন; ইহাতে হিজরীতে যে তারিখ দেওয়া আছে, মনি সাহেব তাহার সহিত খ্রীষ্টাব্দের সমীকরণে ভুল করেন। পরে Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার XLI বা একচল্লিশের খণ্ডে H. Blochmann ব্লকমান সাহেব বাঙ্গালা-দেশের কতকগুলি আরবী ও ফারসী শিলালেখের পাঠোদ্ধার প্রকাশিত করেন, তন্মধ্যে (Notes on Arabic and Persian Inscriptions in the Hugli District প্রবন্ধে—pp. 280ff.) ত্রিবেণীতে দরাফ খান্ গাজীর সমাধিতে অবস্থিত ও মনি সাহেবের দ্বারা আংশিকভাবে প্রকাশিত শিলালেখটী সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করেন, এবং দরাফ খানের আরও দুইটী আরবী-ভাষাময় শিলালেখ সানুবাদ প্রকাশিত করেন। দরাফ খান্ সম্বন্ধে এই লেখগুলি হইতেছে তাঁহার সময়ের প্রত্যক্ষ "পাথুরে'" প্রমাণ।

দরাফ খান বা দফর খানের নামের শুদ্ধ রূপ হইতেছে "ধ্ব.ফর্ খান্"—ইহার ভারতীয় অনুবাদ হইবে "বিজয় রায়" অথবা "জয়রাজ"; "ধ্ব.ফর" আরবী শব্দ, ইহার আদিতে যে "ধ্ব.া" বা "জোয়্" অক্ষর আছে, আরবীতে তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে dhw (ইংরেজী this, that, then প্রভৃতি শব্দের th- বা dh-এর ধ্বনির সহিত অন্তঃস্থ-র বা w-র ধ্বনি মিশ্রিত)। ফারসীতে এই ধ্বনি সাধারণ জ় z-তে পরিবর্তিত হয়। মূল আরবী উচ্চারণে যেন Dhwafar, ফারসী উচ্চারণে ও তাহার অনুকরণে ভারতীয় উচ্চারণে Zafar। "খান্" শব্দ তুর্কী ভাষার, ইহার মূল অর্থ "রাজা"—ইহা তুর্কীদের মধ্যে ব্যবহৃত

আভিজাত্য ও সম্মান বাচক পদবী ছিল। পরে ফারসী ভাষাতেও এই পদবী গৃহীত হয়, এবং ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও ইহার ব্যবহার ক্রমে সাধারণ হইয়া দাঁড়ায় ; এবং ক্বচিৎ হিন্দু, এমন কি ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই পদবীর প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রিবেণীর একটী আরবী লিপিতে দফর (দরাপ) বা জ়ফর খাঁকে "খান জ়ফর" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম-প্রথম এই খান পদবী, কেবল তুর্কীদের নামেই ব্যবহৃত হইত।

আরবীর শুদ্ধ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার চেষ্টা এখন হইতে ৬।৭।৮ শত বৎসর পূর্বে ফারসীভাষীদের মধ্যে অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। এইজন্য Dhwafar হইতে Dafar "দফর" রূপের উদ্ভব সহজেই হইতে পারে ; ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে নামটী রূপরামের ধর্মমঙ্গলে এই "দফর" রূপেই লেখা হইয়াছে। "দফর" হইতে বর্ণব্যত্যয়ে "দরফ", পরে "দরপ" ও শেষে "দরাফ, দরাপ" এইরূপ পরিবর্তন সহজ। ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব ত্রিবেণীতে "জ়ফর"-এর স্থানীয় উচ্চারণ "দপর" শুনিয়া গিয়াছেন (JRAS 1847, p. 394); ১৮৭০ সালেও ব্লকমান সাহেবও ত্রিবেণীতে "জ়ফর" স্থলে "দপর" শুনিয়াছিলেন (JASB., 1870)। স্থতরাং Dhwafar বা Zafar হইতে "দফর, দপর, দরফ, দরাফ, দরাপ"। "ধ্ব.া" বা "জ়োয়্" অক্ষরের মত "দ্বাদ্" বা "জ়োআদ" অক্ষরের এবং "ধ.াল" বা "জ়াল" অক্ষরের উচ্চারণও কেহ-কেহ আরবীর মোতাবেক শুদ্ধরূপে করিতে চেষ্টিত হইতেন ; ইহার ফলে "খিদির, খিজ়ির", "জ়োহা, দোহা", "ফদল, ফজ়ল," "দ্বাল্লীন্, জ়াল্লীন্", পুরাতন বাঙ্গালা "করধা" = আধুনিক বাঙ্গালা "কর্জ, কর্জা = কর্জ়.", "সিলিমাবাজ, ফতেয়াবাজ, — সিলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ", "কাগদ, কাগজ", "তাকাজ়া" স্থানে "তাকাদা বা তাগাদা", "খেদমৎ, খেজমৎ", প্রভৃতি বানান ও উচ্চারণ, প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় দেখা যায়।

"জ়ফর খান (ধ্ব.ফর খান্)" হইতে "দরাফ বা দরাপ খাঁ"—এই তো গেল নাম-রহস্য। দরাফ খানের শিলালেখ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কি জানা যায় ? ত্রিবেণীতে দফর বা দরাফ খাঁর যে সমাধি আছে, এই সমাধি এখন "গাজীর কুড়ুল" নামে প্রসিদ্ধ, এই নামটী, সমাধি-মধ্যে দুইটী লোহার কীলের জন্য হইয়াছে। এই সমাধির সংলগ্ন একটী মসজিদ আছে। সমাধি ও মসজিদ উভয়ই এখন নিতান্ত ভগ্ন অবস্থায়। সমাধি ও মসজিদ উভয়ই, হিন্দু যুগের একটী কাল পাথরের মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া, তাহার প্রস্তরাদি মাল-মশলা লইয়া তৈয়ারী হইয়াছিল। হিন্দু মন্দিরের নক্‌শা-কাটা পাথর এবং বহু দেবমূর্তি ও রামায়ণ-মহাভারতের খোদিত চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত পাথর, মসজিদ ও সমাধির গায়ে এখনও লগ্ন আছে ; ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব এগুলির কতকগুলি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন, এবং ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ" নামে ইংরেজীতে যে মূল্যবান্ প্রবন্ধ Journal of the (Royal) Asiatic Society of Bengal-এ প্রকাশিত করেন (পৃঃ ২৪৫-২৬২), তাহাতে এই-সব মূর্তি ও চিত্রের কথা এবং তলায় সেনযুগের রাজাদের সময়ের বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত-ভাষায় চিত্রের বর্ণনা-মূলক যে লিপি আছে তাহার চিত্র, প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

দরাফ খাঁ গাজী ছাড়া তাঁহার আত্মীয় আরও কতকগুলি ব্যক্তির সমাধি এই স্থানে আছে।

দরাফ খাঁ গাজীর যে তিনটী লেখ পাওয়া গিয়াছে, তিনটীই আরবী ভাষায় লেখা। প্রথমটীর পাঠ সর্বত্র অটুট নাই, কষ্টে পড়িতে হয়, অনেকটা এখন পড়াই যায় না। ইহা হইতেছে ২৪ ছত্রের দীর্ঘ একটী আরবী "ক্বসীদঃ" বা কবিতা। ইহাতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জ়ফর খানের (দফর খানের)

বীরত্বের কথা আছে, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো আছে। ১৭, ১৮ ও ১৯-এর ছত্র হইতে এই তথ্যটুকু পাওয়া যায়ঃ "...তুর্ক ধ্ব.ফর খান্, সিংহের মধ্যে সিংহ......জনহিতকর ইমারত-নির্মাতাদের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন যোদ্ধাদের পরেই, কাফেরদিগকে তরবারী ও বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া, ও প্রত্যেক (মুসলমান)-কে প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিয়া..."; শেষের ছত্রে তারিখ দেওয়া আছে—হিজরা ৬৯৮, অর্থাৎ ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই লেখটীতে নাকি আর একটী নাম পাওয়া যায়, —নাস্বির মুহম্মদ হ. ওরফে বুর্হান কাদ্বী (কাজী)। দরাফ খাঁর সমাধির মাতওয়ালীর কাছে যে "কুর্সী-নামা" বা বংশাবলী মনি-সাহেব ১৮৪৭ সালে পাইয়াছিলেন, তাহাতে দরাফ খাঁন (জ়ফর খান)-এর অন্যতম পুত্রের নাম পাওয়া যায়—"বরখান গাজী"। এই "বরখান গাজী" (বড় খাঁ গাজী ?) ও শিলালেখের "বুর্হান কাজী" সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

দরাফ খাঁর দ্বিতীয় লেখটীর তারিখ হইতেছে হিজরী ৭১৩, ১লা মহর্‌রম, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৩১৩, ২৮শে এপ্রিল। ইহা দুইখানি প্রস্তর-খণ্ডে উৎকীর্ণ; ইহাতে "দারু-ল্-খয়্রাৎ" (অর্থাৎ "মঙ্গলালয়") নামে একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত আছে। শমস্দ্দীন সুলয়্মান বা ফীরোজ় শাহ্ (১৩০২—১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ) তখন বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান ছিলেন। এই লেখে, জ়ফর খানকে "বিখ্যাত খান্", ও নানা সদ্গুণের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ও তাহার পূরা নাম হিসাবে "খান্ মুহ.ম্মদ ধ্ব.ফর খান্" বলা হইয়াছে। তৃতীয় শিলায় লেখটীরও তারিখ ৭১৩ হিজরী = ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ; ইহাতে কেবল ঈশ্বরের স্তুতি আছে, কাহারও নাম নাই।

লিপি তিনখানি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, ১২৯৮ সালে, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম জয়ের পরেই, পাথরে তৈয়ারী স্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া তাহার মাল-মশলা লইয়া বিজেতা বিদেশী তুর্কীরা একটী মসজিদ তৈয়ারী করে। সম্ভবতঃ ধ্ব.ফর (জ়ফর) খান্ ছিলেন এই বিজয়ী তুর্কী সেনার নেতা, কাফের-বধ ও তাহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া যোগ্য মুসলমান পাত্রে দান রূপ পুণ্য কর্ম তিনিই করিয়াছিলেন; এবং হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসের উপরে প্রস্তুত প্রথম মসজিদটী তাঁহারই কীর্তি ছিল; কারণ, ১২৯৮ সালের কাব্যময় আরবী লিপিটীতে, তাঁহাকে জনহিতকর ইমারতের নির্মাতা বলিয়া প্রশংসা করা হইতেছে। বাঙ্গালার মুসলমান সুল্তান রুক্নুদ্দীন কৈকাউস শাহের আমলে জ়ফর খান্ এই স্থান জয় করিয়া, উহার জায়গীরদার বা শাসক রূপেই উপনিবিষ্ট হন বলিয়াই মনে হয়; কারণ এই ঘটনার ১৫ বৎসর পরে, সম্ভবতঃ তাঁহার মসজিদের সংলগ্ন স্থানেই, তিনি যে একটী মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় আরবী লিপিটী হইতে পাওয়া যাইতেছে; আরবী ও ফারসী ভাষা এবং মুসলমান শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচারের জন্য বাঙ্গালা প্রদেশে ইহার অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও বিদ্যালয়ের খবর এতাবৎ পাওয়া যায় নাই—এই ভাবে মুসলমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে ইনি সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশে প্রথম পথপ্রদর্শক হন। তৃতীয় লিপিটী ঈশ্বরের স্তুতিময়—এটীর তারিখও মাদ্রাসা তৈয়ারীর তারিখ, ইহার আরবী লেখাটী অতি সুন্দর ছাঁদের, সম্ভবতঃ এই লেখা মাদ্রাসার ভিত্তি-গাত্র অলঙ্কৃত করিবার জন্য উৎকীর্ণ হয়। ধ্ব.ফর খান্ পরে ত্রিবেণীতেই দেহরক্ষা করেন, এবং সেখানেই সমাহিত হন; তাঁহার বংশের কয় জনের সমাধিও ঐ মজারে বা গোরস্থানে বিদ্যমান।

উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর গ্রামের মসজিদে একটী আরবী শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে,

সেটীর নির্মাতা অথবা নির্মাণের জন্য আজ্ঞাদাতা বলিয়া একজন ধ্ব.ফর বা জ়ফর খাঁর নাম পাওয়া যায়। এই শিলালেখটীর তারিখ হইতেছে ৬৯৭ হিজরা, অর্থাৎ ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ত্রিবেণীর জ়ফর খাঁর আরবী কবিতাময় লেখের এক বৎসর পূর্বেকার। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় JASB. 1909-এ প্রকাশিত তাঁহার পূর্বোল্লিত সপ্তগ্রাম-বিষয়ক প্রবন্ধে এবং তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ"-এ, গঙ্গারামপুরের মসজিদের নির্মাতা জ়ফর খাঁকে আমাদের ত্রিবেণীর জ়ফর খাঁর বা দফর খাঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে তাহা হইলে জ়ফর খাঁকে এক জায়গা হইতে বহুশত মাইল দূর অন্য জায়গায় টানিয়া আনিতে হয়। গঙ্গারামপুরের মসজিদও বাঙ্গালার স্থল্‌তান রুকুনুদ্দীন কৈকাউস শাহের আমলে প্রস্তুত হয়, ইহা শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, গঙ্গারামপুরের মসজিদের নির্মাতা জ়ফর খাঁ, ত্রিবেণীর জ়ফর খাঁ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ত্রিবেণীর জ়ফর খাঁর লম্বা-চওড়া পদবী নাই, কেবল "তুর্ক জ়ফর খাঁ" এবং "বিখ্যাত খাঁ—খাঁ মুহ.ম্মদ জ়ফর খাঁ" এই বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং ত্রিবেণীর মাদ্রাসার লেখে তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু প্রার্থনা করা হইয়াছে, ঈশ্বর যেন তাঁহাকে তাঁহার শত্রুদের উপরে বিজয় দেন, এবং তাঁহার মিত্রদের রক্ষা করেন; ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার শাসন, বা ত্রিবেণীতে তাঁহার অবস্থান, তখনও নিঃশঙ্ক বা নিরুপদ্রব হয় নাই। গঙ্গারামপুরের জ়ফর খাঁর কিন্তু খুব জমকালো নাম ও পদবী দেখা যায়—"শিহাবু-ল্-হ ক্ক্ ওঅ-দ্-দীন, সিকন্দর থানী (=দ্বিতীয় আলেক্সান্দর), উলুঘ অধ্ব.ম (অজ়ম্) হুমায়ূন ধ্ব.ফর (জ়ফর) থান্ বহ্.রাম্ অয়্-তকীন্ স্থল্‌ত্বান।" এই এতগুলি বিরুদ যাঁহার নামে ব্যবহৃত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই কোনও অতি উচ্চ পদস্থ এবং রাজবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন—তিনি সম্ভবতঃ দিল্লীর তুর্কী রাজবংশেরই কেহ ছিলেন, যাঁহাকে প্রায় স্বাধীন রাজার সম্মান এই লেখে দেওয়া হইয়াছে; "দ্বিতীয় আলেক্সান্দর", ইহা তো মহামহিম সম্রাটেরই উপাধি হইতে পারে; "উলুঘ্" শব্দ তুর্কী ভাষার, "অজ়ম" আরবী ভাষার, দুইয়েরই অর্থ এক—'মহান্'; "হুমায়ূন জ়ফর খান্" তাঁহার ব্যক্তিগত নাম—ত্রিবেণীর জ়ফর খাঁর ব্যক্তিগত নাম হইতেছে "মুহ.ম্মদ"; "বহ্.রাম" ফারসী নাম বা উপাধি; "অয়্-তকীন" অর্থে 'চন্দ্রদেব'—ইহা তুর্কী নাম বা উপাধি; ইঁহাকে আবার "স্থল্‌ত্বান" বা 'স্বাধীন রাজা' বলা হইয়াছে, এবং ইঁহার সম্বন্ধে শেষ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে "ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন ও তাঁহার জীবন দীর্ঘ করুন।" আর একটী জিনিস লক্ষণীয়; গঙ্গারামপুরের জ়ফর খান নিজেকে "গাজী" বলেন নাই—"গাজী" অর্থে, যে বিধর্মীদের সঙ্গে লড়াই করে। এতগুলি বিরুদ ১২৯৭ সালে নিজের নামের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া, এক বৎসরের মধ্যেই ১২৯৮ সালে যে তিনি সে-সমস্ত বিরুদ পরিত্যাগ করিবেন, ত্রিবেণীতে হিন্দুদের সঙ্গে লড়িয়া তজ্জন্য কেবল "গাজী" উপাধি পাইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, এক বৎসরের মধ্যে ত্রিবেণী জয় করিয়া তাহার পাথরের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে কারুকার্যময় মসজিদ বানাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিবেন—এক ব্যক্তির পক্ষে ইহা কঠিন ব্যাপার; স্থতরাং বলিতে হয়, গঙ্গারামপুরের জ়ফর খান্ সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি।

ত্রিবেণীতে ব্লকমান সাহেবের সংগৃহীত "কুর্সী-নামা"তে জ়ফর খাঁ-দরাফ খাঁর বংশাবলী পাওয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কাহিনীও ঐ "কুর্সী-নামা"তে আছে। এই "কুর্সী-নামা"র কাহিনী একেবারে অবিশ্বাস্য—জ়ফর খাঁর শিলালেখের সঙ্গে তাহার কোনও সামঞ্জস্য হয় না। শিলালেখের প্রমাণে বুঝিতে

পারা যায় যে, জফর খাঁ ত্রিবেণী-জয়ের পরে সেখানে অন্ততঃ ১৫ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। "কুরসী-নামা"র মতে, শাহ জফর খাঁ গাজী কেবল হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার উদ্দেশ্যেই আসেন, এবং প্রথম রাজা "মান নৃপতি" নামে একজন হিন্দু রাজাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু হুগলীর হিন্দু রাজা ভূদেব কর্তৃক নিহত হন। জফর খাঁর পুত্র Ughwan অগ্‌ওয়ান খাঁ তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, রাজা ভূদেবকে নিহত করেন, বহু হিন্দুকে মুসলমান করেন, ও রাজা ভূদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। জফর খাঁ-দরাফ খাঁর অধস্তন পুরুষদের বংশলতা ("কুরসী-নামা"-মতে) এই—
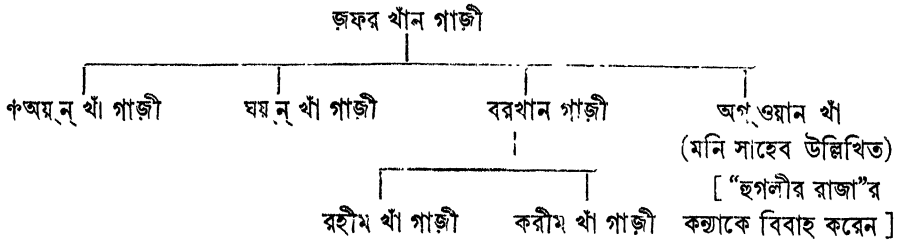
ইহাদের সকলের সমাধি ত্রিবেণীতে আছে—জফর খানের হিন্দু-রাজবংশ-জাত পুত্রবধূর-ও। এটী ছিল একটী গাজী-বংশ—সম্ভবতঃ এই বংশের প্রত্যেকেই আশ-পাশের হিন্দুদের সঙ্গে লড়িতেন। তবে ইহারা দুই পুরুষের পরে নিশ্চয়ই আর খাঁটী তুর্কী রহিলেন না, এদেশের মেয়ে বিবাহ করিয়া ভারতীয় এবং বাঙ্গালীই বনিয়া গেলেন। তুর্কী-বিজয়ের একটী ধারা ইহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন—কোনও রাজ্যের রাজধানী দখল করিয়া, সেখানে উপনিবিষ্ট তুর্কী ও অন্য স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বাস কায়েম করা। সাতগাঁ ও ত্রিবেণী ত্রয়োদশ শতকের শেষে তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে, ঐ স্থান ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী দেশে মুসলমানদের একটী কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৪১৭ শকাব্দায়) বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের রচিত "মনসা-মঙ্গল" কাব্যে, চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা বর্ণনা-প্রসঙ্গে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর একটী উজ্জ্বল বর্ণনা কবি দিয়াছেন। হিন্দুতীর্থ সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া তিনি বলিতেছেন—

নিবসে জবন জতো   তাহা বা বলি কতো   মঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
ছয়দ মোলা কাজি   কেতাব কোরান রাজি   দুই ওক্ত করে তছলীম॥
মসিদ মোকাম ঘরে   সেলাম বাজায় করে   ফয়তা কবরে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবি   দ্বিজ বিপ্রদাস কবি   উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে॥

—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, JASB. 1909, পৃ. ২৫৪।

রূপরাম-ও ১৬৫৩ সালে বলিয়াছেন যে, দফর খাঁ গাজীর মোকামে ষোল শত কাজীর বা গাজীর বাস ছিল।

দফর খাঁ গাজীর গঙ্গাভক্ত হওয়ার কথা ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, "সুরধুনি মুনি-কন্যে" এই শ্লোকটীও অনুবাদের সহিত তিনি দিয়াছেন। মনি সাহেব যে একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন, তাহার পরিচয় তিনি তাঁহার প্রবন্ধের শেষ অংশে ও অন্যত্র দিয়াছেন। হিন্দু দেববাদ তিনি বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করেন নাই; পতনের যুগের রোমানদের দেববাদের অনুরূপ বস্তু বলিয়া

ইহাকে মনে করিয়া, দফর খাঁর গঙ্গাভক্তির এক উৎকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং অজ্ঞও নির্বোধের মত যাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার কবিতার ভাষায় কল্পনাময় করিয়া লিখিবার হাস্যকর ও বিরক্তিকর প্রয়াস করিয়াছেন। সাহেবের বোধ-বিচার ও কাণ্ড-জ্ঞান মতে, গঙ্গাদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া দফর খাঁ গঙ্গাভক্ত হইয়া উঠেন, এবং গঙ্গাকে মোক্ষদাত্রী ও মাতা বলিয়া স্তব করেন। এ সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন।

দফর খাঁর গঙ্গাভক্তির কোনও প্রমাণ আছে কি? কিংবদন্তী ও উপলব্ধ সংস্কৃত শ্লোকগুলি ভিন্ন আর কোনও পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে এই কিংবদন্তীকে একেবারে তো উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। মুসলমান কবি য়াকূব আলী-ও প্রায় আড়াই-শত বৎসর পূর্বে দরাফ খানের প্রতি গঙ্গাদেবীর বিশেষ অনুগ্রহের কথা এইভাবে, মুসলমান আত্মসম্মান-জ্ঞানকে বজায় রাখিয়া, বলিয়াছেন—গঙ্গা তাঁহার ওজুর (অর্থাৎ নমাজের পূর্বে হাত-মুখ ধুইবার) জল যোগাইতেন। কেবল তিনি যে সম্মুখে প্রবাহিত নদী গঙ্গার জলে ওজু করিতেন, এই কথাটুকু বলাই অভিপ্রেত নহে—মনে হয়, এখানে গঙ্গার সহিত দরাফ খাঁনের দেবী-ভক্ত সম্বন্ধ লইয়া যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

আমার মনে হয়—প্রতিবেশ-প্রভাবের কারণে, শেষ বয়সে দফর খাঁর হিন্দুয়ানির দিকে আকর্ষণ হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। প্রতিবেশ-প্রভাবে, দীর্ঘজীবন-লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে, বয়সের ধর্মে, অনেক কিছুই হয়। দফর খাঁ ছিলেন তুর্কী বিজেতাদের অন্যতম, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন যোদ্ধা, বিধর্মীর বিরুদ্ধে অভিযানকারী তুর্কী সওয়ার—chevalier বা knight : সেই জীবনের পরিচয় পাই, তাঁহার ১২৯৮ খ্রীষ্টীয় সালের আরবী লেখের মধ্যে। ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার, প্রধানতঃ দুইটী বিভিন্ন পথ বা পদ্ধতি ধরিয়া হইয়াছিল—"তুর্কানা পদ্ধতি" ও "সুফিয়ানা পদ্ধতি"। তুর্ক সেনার দল, "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—"জিতিলে গাজী, মরিলে শহীদ", এইরূপ নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ চালাইত—কাফের-বধ, মূর্তি- ও মন্দির-ধ্বংস, মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ করা, জোর করিয়া মুসলমান করা, এই-সব ছিল পুণ্য কাজ; আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিল, পরাজিত এবং ঈশ্বর-কর্তৃক অভিশপ্ত মূর্তি-পূজক বিধর্মী হিন্দুর ধন-রত্ন লুঠ করিয়া, তাহার নিকট হইতে পাওয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্যে নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া। তুর্কী-বিজয়ের প্রথম শতকে, সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া এই তুর্কানা ঢঙ্গে বা পদ্ধতিতে কাজ চলিতেছিল; ঐ শতকের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তেরর শতকের, বিখ্যাত সূফী মরমিয়া কবি পুণ্যশ্লোক সাধু মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী (জীবৎকাল খ্রীষ্টাব্দ ১২০৭—১২৭৩) সুদূর রূম বা এশিয়া-মাইনরে বসিয়া লিখিয়াছেন—

চূন্ মস্ত্-ই-অবদ্ গশ্‌তী, শম্‌শীর-ই-অজ়ল বি-সিতান্;
—হিন্দূয়ক্-ই-হস্তী-রা তুর্কানঃ তু য়ঘ্‌মা কুন্॥

"যখন তুমি ভবিষ্যতের অনন্তের (রসে) মাতাল হইবে, তখন অতীতের অনন্তের তলওয়ার লইবে; তুমি জীবনকে লুঠিয়া লইবে, যে ভাবে (যে তুর্কানা ঢঙ্গে) তুর্ক হতভাগ্য হিন্দুকে লুঠ করে।"

কিন্তু এই জবরদস্তী রীতি কার্য্যকর হইল না—ইহার ফলে হিন্দুরাও আরও জোরে বাধা দিবার জন্য লাগিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আসিল সূফিয়ানা পদ্ধতিতে ইসলাম-প্রচার। সূফী সাধনায় ও চিন্তাধারায় এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান ও মনোভাব ছিল, যাহা হিন্দুরাও সমর্থন করিতে পারে। সূফী সাধকগণ শান্তিপূর্ণ ভাবে হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা, সাধন-ভজন ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা, চারিত্র্যের দ্বারা, এবং কোথাও-কোথাও সিদ্ধাই বা কেরামতি জাহির করিয়া, আশ-পাশের

হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুফীবেশধারী সকলেই যে সাধু পুরুষ ছিল, তাহা নহে; ধর্মধ্বজী "পঞ্চম বাহিনী"র কাজ করিবার জন্য কেহ-কেহ হিন্দু রাজ্যে গিয়া বসিত, সুফী মতের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা কাহারও-কাহারও পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুফী-নাম-ধারী কতকগুলি মুসলমান, হিন্দু রাজ্যের অভ্যন্তরে আসিয়া হিন্দু রাজার নিকট সাধন-ভজনের জন্য বাসের অনুমতি লইত। পরে ইহারা হিন্দুর নিকটে মহাপাতক-রূপে বিবেচিত গোহত্যার অনুষ্ঠান করিত। রাজ্যস্বামী হিন্দু রাজা ইহাতে শাস্তি দিতেন। তখন "অত্যাচারিত" মুসলমান, পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাজ্যে গিয়া ফরিয়াদ করিত; বিপন্ন মুসলমানকে রক্ষা করিবার অজুহাতে তখন মুসলমান রাজ্য হইতে বিজীগিষু মুসলমান সেনার আক্রমণ হইত। হিন্দু রাজার দেশে বহুদিন অবস্থান হেতু, তথা-কথিত এই মুসলমান সাধুর কাছে হিন্দু রাজ্যের সব খবর জানা থাকিত, তাহাতে মুসলমান সেনার পক্ষে হিন্দুদের জয়ে সহায়তা মিলিত। বাঙ্গালাদেশে ও অন্যত্র বহু হিন্দু রাজ্য মুসলমান অধিকারে আসার কাহিনী এই ধরণের। এইরূপ মুসলমান "সাধক"কে অবশ্য পরলোক-সর্বস্ব সত্যকার সুফী বলা চলে না। আবার আর এক শ্রেণীর সাধু ছিল, যাহারা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকের কাছে হিন্দু অনুষ্ঠানের, হিন্দু শাস্ত্রের এবং শাস্ত্রালোচনার নিন্দা করিত; কেবল বসিয়া-বসিয়া নাম জপ কর—শাস্ত্র-মত পূজা-পাঠ তীর্থ-যাত্রা প্রভৃতির কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহার ফলে, বহু সময়ে সাধনা না হইয়া সাধনার আভাস মাত্র দেখা দিত, এবং দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, যাহা সংস্কৃত সাহিত্যকে, তীর্থ-যাত্রার উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকে আশ্রয় করিয়া ছিল, তাহার উপরে আঘাত লাগিত। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে সাধনার দিকে যাঁহাদের ঝোঁক ছিল, তাঁহাদের মধ্যে তুলসীদাস-প্রমুখ সাধক ছিলেন—বিশেষ ভাবে সংহত এবং শক্তিশালী মুসলমান রাজশক্তির সমক্ষে হিন্দুর discipline বা পরিপাটী অথবা নিয়মানুবর্তিতাকে নষ্ট হইতে দিতে তাঁহারা চাহেন নাই। এই শ্রেণীর 'সুফী' সাধকদের দ্বারাও হিন্দু-সমাজের ভিতরে ভাঙ্গন ধরাইতে সাহায্য হইয়াছিল। হিন্দুজনগণ মধ্যে এইরূপ সুফী সাধকদের প্রভাব কতকটা নিশ্চয়ই হইতেছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ার ফল—হিন্দুসমাজে ভক্তিবাদের পুনঃপ্রচার, এবং সারা ভারত জুড়িয়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের ভাষানুবাদের সাহায্যে প্রাচীন সংস্কৃতির সংরক্ষণের চেষ্টা। কিন্তু তাহা হইলেও, সুফী প্রচারকদের মধ্যে সত্যকার জ্ঞানী ও দরদী সাধক, ঈশ্বরানুভূতি-যুক্ত বা দিব্যোন্মাদ-যুক্ত মহাপুরুষ কিছু-কিছু নিশ্চয়ই ছিলেন। ইহারাই প্রকৃত-পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান চিন্তার সমন্বয় কার্য্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আত্মনিয়োজিত হন। ব্যবহারিক জীবনে সুফীদের সব চেয়ে বড় কথা ছিল—"সুল্‌হ্‌-ই-কুল্ল্‌" অর্থাৎ 'বিশ্বমৈত্রী'। কেবল কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র, অন্য ধর্মের মানুষের সে সৌভাগ্য হইতে পারে না,—ঈশ্বরের অবমাননাকর এরূপ বিশ্বাস বা বোধ বা বিচার তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা নিজেরা অনেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলামের সমস্ত নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম পালন করিতেন—ওজু, নামাজ, রোজা, সম্ভব হইলে হজ, সব করিতেন; কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বী যাহারা তাহা করিত না, ভাবশুদ্ধির সঙ্গে যাহারা নিজেদের ধর্ম পালন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে ইঁহারা সহৃদয়তা ও উদার-ভাব পোষণ করিতেন। এই ভাবের ভাবুক হওয়ায়, সত্যকার সুফীদের চেষ্টায়, এবং উদারচেতা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, 'সন্ত', ভক্ত, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের সহযোগিতায়, প্রথম হইতেই ধীরে-ধীরে ভারতের পুণ্যভূমিতে একটী সত্যকার "মজ্‌মাউ-ল্‌-বহ্‌রৈন্‌" অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সংস্কৃতি ও সাধনার 'মহাসাগরের

সঙ্গম' হইতেছিল। কাশ্মীরের সুলতান জয়্‌নু-ল্‌-আবেদীন (১৪২০-১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে), মোগল সম্রাট্‌ আকবর ও তাঁহার কয়েকজন সভাসদ্‌, রাজকুমার দারা শেকোহ্‌, সন্ত কবীর, ভক্ত নানক, সন্ত্‌ দাদূ প্রভৃতি, ইঁহারা এই সমন্বয়ের প্রধান নেতা ছিলেন। "তুর্কানা ঢঙ্গ"-এর অবসান কিন্তু এখনও হয় নাই; মুসলমান বলিয়া বিশেষ অধিকার যাহারা চায়, তাহারা সর্বদাই এই তুর্কানা ঢঙ্গকেই ভারতের মুসলমান সভ্যতার, মুসলমান রাজ্যের, মুসলমান জীবনের একমাত্র কথা বলিয়া, এই উৎকট আদর্শকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। ধর্মকে ইহারা বরাবরই অনুচিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পথ বলিয়া দেখিয়াছে, এবং সেইভাবেই ধর্মকে অপমান করিয়াছে। এই মনোভাবেরই অবশ্যম্ভাবী বা সহজ পরিণতি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এদেশে আসিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া, দফর খাঁ ত্রিবেণীতে বিজেতা তুর্কী রাজার জাতির সম্মানিত ব্যক্তি হইয়া বসিলেন। ধর্মের দিকে তাঁহার প্রাণের টান ছিল, সেই জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বাস-মত মূর্তি-পূজার মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তুলিলেন। মোহম্মদীয় ধর্মের শাস্ত্রের জ্ঞান প্রচারিত হউক, এই উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসা স্থাপিত করিলেন, তাহার নাম দিলেন "দারু-ল্‌-খয়্‌রাৎ", অর্থাৎ 'পুণ্যকার্য্যের স্থান'। এই লেখে নিজেকে এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—"মুরব্বীউ-ল্‌-অর্‌বাবি-ল্‌-য়ক্বীন", অর্থাৎ যাঁহারা নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী, "তরীকা" বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথের পথিক যাঁহারা, তাঁহাদের মুরব্বী বা পৃষ্ঠপোষক। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে আকর্ষণের পরিচায়ক। জনশ্রুতি-অনুসারে, তিনি গাজী অর্থাৎ তুর্কানা পথের যোদ্ধা হইতে, শেষে পীর অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার সাধক, প্রেমের সাধক, সূফী হইয়া যান। তখন তাঁহার কাছে হিন্দুর লৌকিক পূজার নূতন অর্থ প্রতিভাত হয়; হিন্দুর দেবতাবাদের সঙ্গে হিন্দুর দার্শনিক এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধারণার বিরোধ যে নাই, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশের একটী প্রধান তীর্থের শ্রেষ্ঠ মন্দির তিনিই হয়তো ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে মসজিদ বানান; কিন্তু অহরহঃ তাঁহার সমক্ষে সেই ত্রিবেণী তীর্থে হিন্দু ধর্ম-জীবনের, হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসের, সৌন্দর্য্য-সুষমাময় হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের স্রোত, সম্মুখে প্রসারিত গঙ্গার স্রোতের মতই প্রবাহিত ছিল। মনের গাঁঠ খুলিয়া গেলে সবই সহজ হয়; বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক ও রূপক যে বিভিন্ন ভাষারই মত, এই উপলব্ধি তাঁহার আসিয়া যায়—গঙ্গা-ভক্তিকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারা যায়। এই সহানুভূতির ফল, এই মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভাষা-পরিবর্তনের ফল কি গঙ্গার স্তুতিময় শ্লোক—"সুরধুনি মুনিকন্যে"? ইহা অসম্ভব নহে, যে গঙ্গাষ্টকের শ্লোকগুলি কোনও সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দুর রচনা, পীর দফর খাঁন গাজীর প্রতি রচয়িতা শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নামেই এগুলি তিনি প্রচারিত করেন;—সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু এই প্রশ্ন স্বতঃ মনে জাগে—তুর্কী বিজেতা খান্‌ দফর খান্‌ গাজী, বাঙ্গালাদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্থায়ী অধিবাসী হইয়া, পরিণত বয়সে কি জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ্‌ গাজীর অথবা আন্তোনি ফিরেঙ্গীর পূর্বাভাস হইয়াছিলেন? তাই কি তিনি গঙ্গার ভক্তরূপে বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন?

পত্রগুচ্ছ

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ভাগলপুর
বৃহস্পতিবার
[পোস্টমার্ক : ৫।৯।৯৮]

এখনও আকাশে মেঘ করে রয়েছে, দিনটা বিশ্রী। শুধু Verlaineএর "Il pleut dans mon coeur" ছত্রটি মনের ভিতর বাজছে।...

এক এক সময়ে নিজেকে বড়ই তুর্বল মনে হয়—ইচ্ছা করে যে এই কঠিন পৃথিবীতে যদি কোথাও একটু কোমল স্থান পাই ত সেখানে এই পরিশ্রান্ত খিন্ন দেহমনকে রেখে weep away this life of care। এ জগতে কোনো জিনিসই স্থায়ী নয়। সকলেরই একটা শেষ আছে— কষ্টেরও— কিন্তু সে শেষ কোথায় কবে হবে— সেইটে যদি কেউ বলে দিতে পারত! Leopardi ঠিক কথাই বলে গেছে— এ পাপ পৃথিবীতে pain ছাড়া আমরা আর কিছু স্পষ্টভাবে জানিনে। স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত দেহ অবলম্বন করে থাকে বলে আমরা সে বিষয়ে সচেতন নই— আর বেদনা দেহের কোনো একটি স্থানে ফুটে ওঠে বলে আমরা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করি, এবং সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট, নিঃসন্দেহ— তেমনি সুখ সমস্ত মনের ধর্ম বলে স্পষ্ট অনুভূতির বিষয় নয়, কিন্তু তুঃখ মনে তাই, বেদনা দেহে যা।

ভাগলপুর
রবিবার
১৯।৯।৯৮

আমার মনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে প্রচলিত মতগুলোকে না আমল দেওয়া। অর্থাৎ সচরাচর enlightened নামধারী লোকদের সঙ্গে মতে যাতে না মেলে তার জন্য আমার একটু চেষ্টা আছে কারণ তার ভিতর একটু distinction আছে। বাস্তবিক বুদ্ধির দ্বারা যাচিয়ে নিতে গেলে আর পাঁচ বিষয়ের সত্যের মত বৈজ্ঞানিক সত্যও টেঁকে না। একটু বেশি দূর পর্যন্ত যুক্তি নিয়ে গেলে দেখা যায় যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্যেরই গোড়ায় গলদ— বড় বড় সব থিয়োরি শুধু হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে।— অনেক জিনিস যা আমরা প্রমাণপ্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মনে করি, তার ভিত্তিতে সব অপ্রামাণ্য জিনিস— অর্থাৎ— আগে একটা ধরে নিয়ে, বিনা যুক্তিতে মেনে নিয়ে তার উপর আমাদের scientific process প্রয়োগ করে scientific philosophy বলে অদ্ভুত জিনিস বার করি। যাতে করে যত ফিলিস্টাইন মহা আনন্দ লাভ করে। criticism-এর সুমুখে ধর্মের dogmaও দাঁড়ায় না, বিজ্ঞানের dogmaও দাঁড়ায় না। আসল কথা হচ্ছে, যে-সকল কথা প্রমাণের উপর নির্ভর করে তা আমাদের বিশ্বাস করবার

দরকার নেই। যা একজনে যুক্তির উপর দাঁড় করায় তা আর একজনে যুক্তির দ্বারা ভূমিসাৎ করে। আর বিজ্ঞানে-যা বলে তা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, তোমার আমার কি এসে যায় বলো। পৃথিবী কমলালেবুর মত দেখতে বলেই যে আমার কাছে বড় রসালো ও মিষ্টি লাগছে তাও না, আর তিনকোণা হলেই যে আমার বড় বয়ে যেত তাও নয়। কি বল ?— যেসব কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করি এবং যার কোনো প্রমাণ হতে পারে না, শুধু গায়ের জোরে বিশ্বাস করতে হয়, আমি সেই সব কথাই বিশ্বাস করতে ভালবাসি, কারণ তার জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কারও সঙ্গে মিছে তর্ক করতে হয় না। আমি যদি দু'শ বৎসর পূর্বে জন্মাতুম, যখন অধিকাংশ লোকের শুভাশুভ লক্ষণে আস্থা ছিল, তা হলে ওকথা (পার্শিবাগানের কথা) হেসেই উড়িয়ে দিতুম। আজকাল অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে না বলে আমি বিশ্বাস করি। খুব ভাল কারণ নয় ?

ন- বাবুর কাছে শুনেছি যে পার্শিবাগানে বহুতর প্রেতাত্মা বহুদিন ধরে বসবাস করে আসছে। ন- বাবুর পিতা বাড়িটি কিনে অনেক কষ্টে তাদের সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছিলেন। তাঁকে ঐ বাড়ির গুণে ক্রমে theosophist এবং spiritualist হতে হয়েছিল। কালিকৃষ্ণবাবু না জেনেশুনে বাড়ি কিনে ঠকেছেন। তাঁর মেয়ে জামাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁদের নতুন বাড়িতে গিয়েই একটি ছেলে মারা যায়। তারপর কালিকৃষ্ণবাবু বাড়িটি হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেন— কিন্তু ন- বাবু ছাড়া আর খরিদ্দার পেলেন না। ··· ন- বাবু (আজকাল সঙ্গীত সভার বাল্মীকি) বলেন তিনি ছাড়া ও-বাড়িতে আর-কেউ থাকতে পারবে না, কারণ যাঁরা সব আগাগোড়া সাদা কাপড় পরে রাত্তিরে গাছের তলায় কিম্বা ডগায় দাঁড়িয়ে থাকেন, সিঁড়ি দিয়ে কেবলই ওঠেন ও নামেন, ছাতের উপর দুপুর রাতে ফুটবল খেলেন, দ্বোর জানালায় নাড়া দেন, ঘরের অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হাসেন, তাঁদের সকলেরই সঙ্গে তাঁর অনেক দিনকার পরিচয়, বন্ধু বললেই হয়, আর তা ছাড়া নিজের দু'একটি নিকট আত্মীয়ও এখন সেই দলভুক্ত হয়েছেন। সেইজন্যে ন- বাবু পার্শিবাগানে বেশ আপনার লোকের মধ্যেই থাকতে পারেন। বাইরের লোকদের এই প্রেতাত্মার দল বড় জ্বালায়।

ভাগলপুর

বুধবার

[পোস্টমার্ক ২১।৯।৯৮]

তুমি আর কোন্ না জানো যে কোন মনের ভাব সম্বন্ধে ঠিক যেটুকু তার চাইতে বেশি করে বলা, ভাবের অভাবটুকু বেশি কথা দিয়ে পূরণ করে দেবার চেষ্টা আমার কাছে কতটা অসন্তোষজনক মনে হয়। আমিও কি সব রকম আতিশয্য ও কৃত্রিমতাকে ভয় করিনে। বেশি করে বলে কি বানিয়ে বলে আমাকে কি কেউ ভুল বুঝিয়ে দিতে পারে ? তা যদি কেউ পারে তা হলে ত তাকে মাথার মণি করে রেখে দিই। আমার প্রধান দুঃখ এই যে— ভুলকে সত্য বলে মনে করবার ক্ষমতা চলে গেছে। সেই জন্যই ত সত্যকে পাবার জন্য এত আগ্রহ, এবং যেখানে তা পাই আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য এত প্রয়াস। ··· আমি *Renaissance*-য়ে একটি কথা পড়ি, কথাটি তখন আমার মনে দিব্যি বসে গেছল। Pater এ জীবনে একমাত্র চিরস্থায়ী সুখ শুধু intellect-এর চর্চায়— এইভাবে বক্তৃতা দিতে দিতে মাঝ

থেকে এই আর একটি কথা বলেন, "মুক্তির আর একটি উপায় আছে passion-য়ে, কিন্তু দেখো যেন সেটি সত্য passion হয়।" আমি ও-পরামর্শটি ভুলিনি। বহুদিন ধরে আমি যেটি আমার মনের প্রধান passion মনে করি, সেটিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, জীবনে পরীক্ষা করে দেখেছি, অবিশ্বাস করে দেখেছি, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনি, নষ্ট করতে পারিনি।

ভাগলপুর
বৃহস্পতিবার
[পোস্টমার্ক ২২।৯।৯৮]

তোমার কি মনে হয় না যে ভালবাসাও আমরা কষ্টের ভিতরই বেশ ভাল করে অনুভব করি, স্পষ্ট চিনতে শিখি। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে আত্মার তিনটি অবস্থা আছে,— জাগ্রত, সুষুপ্ত ও নিদ্রিত। সুখ জিনিসটা সুষুপ্তির ধর্ম। আমরা কথায় কথায় বলি— সুখের আবেশ, সুখের মোহ। কাউকে কখনো কোনো কালে কোনো দেশে "দুঃখের মোহ" বলতে শুনেছ? কষ্ট জিনিসটার মত আত্মাকে সজাগ সচেতন করে তুলতে আর কিসে পারে? আমি যে সব কথা বলছি তা থেকে অনুমান করে নিয়ো না যে এখন আমার মনের ভিতর একটা কিছু বড় রকমের ব্যথা জেগে আছে।··· আমার জন্য একটু কষ্ট করে একটি কাজ করবে? আমাকে Le Gallienne-এর তরজমা Omar Khayyam খানি পাঠিয়ে দেবে? আমার বিশ্বাস তোমাদের সে বইখানা আছে। এখানে আমি পড়াশুনা কিছুই করিনে। বইয়ে মন বসে না। তবে মধ্যে মধ্যে এক একবার একখানা বই টেনে নিয়ে দু'এক পাতা পড়তে সাধ যায়। এ বাড়িতে কেতাব কোরানের নাম গন্ধও নেই। দী-র বই সব কলকাতায় পড়ে আছে। থাকবার মধ্যে হাতের গোড়ায় একখানা Shelley আছে। আমি থেকে থেকেই বইখানা খুলে দুটি একটি কবিতার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাই, কিন্তু মনের সুখে পড়া হয় না। Shelley আমি এখন সইতে পারছি নে। আমি যা চোখের আড়াল করে রাখতে চাই— মনের অসহ্য আবেগ, অনন্ত কামনা, অসীম অতৃপ্তি— Shelley'র প্রতি পাতায় প্রতি ছত্রে তাই। এক একটি কথা হৃদয়ে ছুরির মত বেঁধে, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত গায়ে এসে পড়ে। Omar Khayyam আমার ভাল লাগবে, কেননা— ভাল মনে পড়ছে না কেন, কিন্তু আমি জানি ভাল লাগবে। বুঝলে?

ভাগলপুর
সোমবার
[পোস্টমার্ক ২৬।৯।৯৮]

তুমি একটি কথা বড় ভুল বুঝেছ— fascination অর্থ বুঝি উপর উপর টান?—charm শব্দটি তাই বোঝায় বটে, কিন্তু fascination বড় সর্বনেশে জিনিস— তুমি তার অর্থ জান না, আর যেন কখন না জানতে হয়।···

বলতে যাচ্ছিলুম এই যে ও হচ্ছে (je t'aime) "মুক্তির ভাষা"। যখন সত্য সত্যই ও কথা আমরা বলতে পারি তখন আমরা আমাদের এই দৈনিক সামাজিক সাংসারিক ego থেকে মুক্তিলাভ করি। সে মুক্তি

কারও পক্ষে ক্ষণস্থায়ী, কারও পক্ষে চিরস্থায়ী। অথবা মুহূর্তের চাইতে বেশিকাল স্থায়ী। কথা এক, কিন্তু প্রকৃতির ভেদে তার বিভিন্ন অর্থ। কেহ বা শুধু রূপযৌবনের উপর লুব্ধ নেত্র স্থাপন করে, দেহের প্রতি পরমাণুর দুর্দান্ত লালসা ঐ দুটি কথায় প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেটি তার সমস্ত প্রকৃতির ব্যক্তি। আবার কেহ বা শুধু মনের জন্য মনের আকাঙ্ক্ষা ঐ কথায় পুরে দিয়েছে— কেহ বা একত্রে দুই। এসব প্রভেদ শুধু বাইরের প্রভেদ— ভিতরকার মিল এই বিষয়ে— সকলেই ঐ মুহূর্তে একটি অসহ্য দুঃখ কিম্বা অসহ্য সুখের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সচরাচর জীবনে আমরা যাকে সুখ দুঃখ বলি— তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পৃথক সুখ দুঃখ। যে একবার মনের ভিতর ও-ভাব অনুভব করেছে এবং মুখের কথায় প্রকাশ করেছে, তার কোনো জিনিসে মন বসে না— শুধু যন্ত্রের মতো সংসারে কাজ করে চলে যেতে হয়। আমি বলছি নে যে একবার সত্যি সত্যি ও-কথা একজনকে বললে ভবিষ্যতে আবার সত্য সত্য আর একজনকে বলা যায় না। মনুষ্যচরিত্র অত একাগ্র নয়।

ভাগলপুর
রবিবার
[পোস্টমার্ক ২।১০।৯৮]

আমি যদি কখন কারও শ্রদ্ধা লাভ করি সে শুধু এই কারণে যে আমি আজ পর্যন্ত কারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে প্রয়াস পাইনি। ··· আমরা সকলেই সময়ে সময়ে এমন কাজ করি কিম্বা কথা বলি যা অন্যের অভিমত হয়— আবার অন্য সময়ে হয়তো ঠিক তার উল্টো। পৃথিবীতে true to oneself হবার প্রধান বিপদ হচ্ছে অপর লোকে ভুল বোঝে— বহুরূপী মনে করে— একটি মাত্র pose অবলম্বন করে সেইটেই আর পাঁচজনের চোখের সুমুখে দিনরাত ধরে রাখতে পারলেই মানুষের চরিত্রটা সহজ সরল ঠেকে। অন্ততঃ আমার মত লোকের পক্ষে তাই। আমাদের সরল নাম লাভ করতে হলে অসরল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজকাল দিন পড়েছে এমনি যে, আমাদের লোকে অযথারূপে মন্দ লোক মনে করলেও সহ্য হয়, কিন্তু hypocrite মনে করলে কিছুতেই সহ্য হয় না। এ কথা আসলে Ernest Renan-র, আমি মতে মেলে বলে আপনার করে নিয়েছি। তবে আমাদের সকল চাঞ্চল্য, সকল চপলতার মধ্যেও একটা সুনির্দিষ্ট জিনিস অবশ্যই আছে, যেটা ধরতে পারলেই আমাদের পুরোরকম ধরতে পারা যায়। যেমন নদীর জল সর্বদা তরল চঞ্চল অস্থির হলেও তার গতি এবং গতির দিকটে বেশ সুনির্দিষ্ট,— তোড় বড্ড বেশি প্রবল হলেও একটি পথ ধরেই চলে, বড় জোর এক পাশ থেকে আর এক পাশে একটু সরে যেতে পারে,— নিজের সীমাবদ্ধ পরিসর হতেও মুক্তিলাভ করে না, একপাশে ভাঙন ধরলে আর একপাশে মাটি জমে। ··· তুমি ইচ্ছে কর ত উপমাটা আরও বেশি দূর নিয়ে যেতে পার, নদীর স্রোতের সঙ্গে মনের অনেক মিল দেখতে পাবে— আমি শুধু খেই ধরিয়ে দিলুম। ···

বাস্তবিক তুমি ঐ চিরপ্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকটা জান না?— আমি বলে আসছি যে সেকেলের মেয়েদের সঙ্গে আজকালকার মেয়েদের মিলিয়ে দেখতে গেলে যে বদল দেখতে পাওয়া যায় তাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইনে। কিন্তু ঐ শ্লোকের কথা যদি ঐতিহাসিক সত্য বলে মানতে হয়, তাহলে আজকালকার মেয়েদের বরণীয় পদার্থ যে আর একটা কিছু হয়েছে সেটা বড়ই সুখের বিষয়। শ্লোকটি হচ্ছে এই—
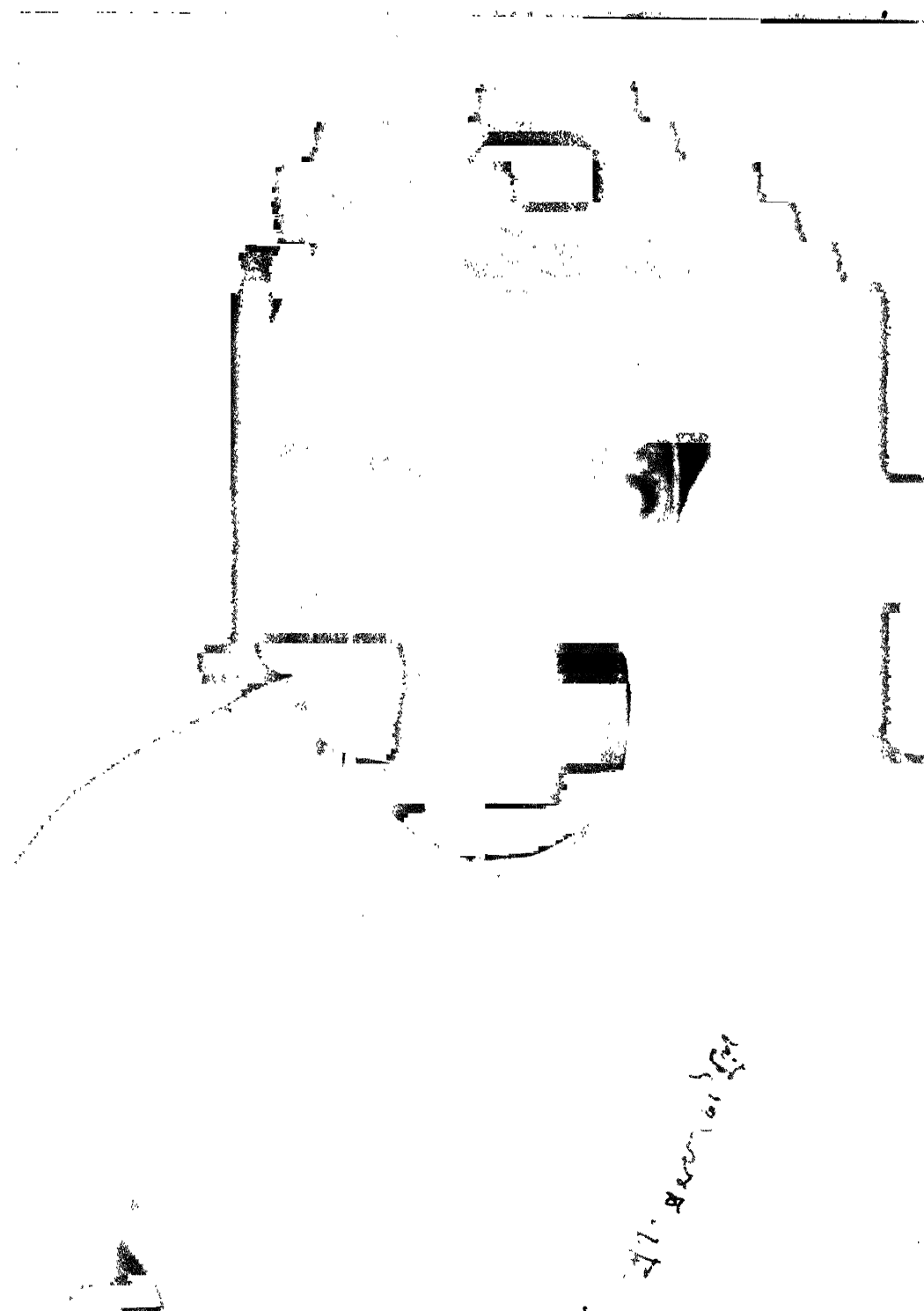
যৌবনে প্রমথ চৌধুরী

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥"

আমি যে "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ"ও নই, এবং "Dissolutely pale and femininely fair"ও নই, সে কথা আমাকে আর কারও বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। এখন বুঝতে পারছ আমি ও কথাটা কেন চাপা দিতে চাই। তোমার সঙ্গে আগে আমার যে ধরনের কথাবার্তা হত তার উল্লেখ করেছ। তখন আমার মুখে analysis-এর সরস্বতী আবির্ভূত দেখতে পেতে। এমন কোনো কথাটা উঠত না যার বেশ শান্ত নির্লিপ্তভাবে আমি চিরে চিরে কঙ্কাল বার করতুম না। বিশেষতঃ ভালবাসা জিনিসটে আমার হাতে নিস্তার পেত না। কিন্তু এখন আমি ও কথা মুখে আনিনে— analysis তুমি হাতে নিয়েছ। কারণ এই, আমি হচ্ছি ও বিষয়ে বাঙ্গলায় যাকে বলে পুরোনো পাপী। যদি মাপ করো তো বলি— তোমার মনের আজকাল যে অবস্থা, আমি সে অবস্থা পেরিয়ে এসেছি। এখন analysis আমার কায়দার ভিতর— আমি analysis-এর কায়দার ভিতর নেই। আমরা এখন analyse করি শুধু মনোভাবের সব উপাদানগুলো পৃথক পৃথক করে দেখবার জন্য নয়,— রসায়নে একে বলে qualitative analysis— এ হচ্ছে প্রথম stage। আমরা আজকাল সেই উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করতে শিখেছি এবং তার ভিতর কোন্‌টা হচ্ছে সর্বপ্রধান, যাকে ইংরেজিতে বলে active principle— সেইটে বার করতে চেষ্টা করি— এ শেষ stage,— একে quantitative analysis বলে। যখন আমরা প্রথমে বিশ্লেষণ আরম্ভ করি, তখন কোন জিনিস সাধারণতঃ যাকে আদি ভূত বলে মনে করে তা নানা "ভূতে" বিশ্লিষ্ট হয় দেখে আমরা সন্দেহ করি ওর ভিতর একটা কিছু আদি জিনিস আছে কিনা, যাকে আর বিশ্লিষ্ট করা যায় না। তারপর দেখি যে শুধু আদি ভূত বলে যে একটা জিনিস আছে তাই নয়, এক-একটা দ্রব্যের এক-একটা আদিভূত active principle, তাতে করেই আর পাঁচটা ভূতকে টেনে নিয়ে এসে একত্রে মিলিয়ে মিশিয়ে রাখে— সময়ে সময়ে যদিও প্রতি উপাদানের ভিতরকার গতি বিভিন্ন দিকে যেতে চায়। আমরা সব elementsকে আলাদা করে ছাড়িয়ে নিতে পারি কিন্তু কিছুতেই মিশ্রিত করে একটি করে তুলতে পারিনে। সেটা প্রকৃতির কার্য।

ভাগলপুর
রবিবার
[পোস্টমার্ক ৩।১০।৯৮]

শুনতে পাই বিবাহ হলেই একত্রে থাকবার দরুন সংসারে অনেক বিষয়ে সমান interest-এর দরুন স্ত্রী-পুরুষের ভিতর একটা বন্ধন জন্মে যায় এবং অনেকে শুধু সেই ভরসায় যে বিবাহবন্ধনে প্রবেশ করেন শুধু তাই নয়— তাঁদের বিশ্বাস সেইটেই একমাত্র খাঁটি টেঁকসই বন্ধন। খুব সম্ভবত ওরকম হয়ে থাকে। কিন্তু যেরকম ভালবাসা সকলের পক্ষেই সম্ভব এবং প্রতি লোকের পক্ষেই যার তার প্রতি হওয়া সম্ভব, কিম্বা অবস্থার গুণে হওয়াটা অনিবার্য, সে ভালবাসাটা আমার কাছে কোনোকালেই লোভনীয় মনে হয় নি, আজও হয় না। যে ভালবাসার মূল হচ্ছে অন্তরে, বাইরের অবস্থায় নয়, সেই ভালবাসারই মর্ম ও মর্যাদা আমি বুঝতে পারি।··· নাটক নভেলে যে ভালবাসার কথা পড়তে পাই— তাই আমি বুঝি আর তাই আমি জানি। আমরা চারপাশের লোকের মুখে ও-ভাবটার প্রতি বিদ্রূপ সদাসর্বদাই শুনতে পাই। অনেকে মনে করেন

যে ও-সব কবিত্ব, কল্পনা, মিছে কথা, বাজে কথা, শুনলে শুধু হাসি পায়, ইত্যাদি মত ব্যক্ত করাতে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। এবং নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জনসমাজে প্রমাণ করবার লোভটাও সাধারণ লোকের পক্ষে এত বেশি এবং এত দুর্নিবার্য— বিশেষতঃ সঙ্গে সঙ্গে যখন রসিকতারও খ্যাতি অর্জন করা যায় যে, অষ্টপ্রহর ও-রকম মতামত না শোনাটাই আশ্চর্যের বিষয় হত। নাটক নভেলও আধপাগল, খেয়ালি, সেন্টিমেণ্টাল লোকে লেখে, কিন্তু সদ্বিবেচক, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, সাংসারিক লোকেরা পড়েন কেন, সে প্রশ্ন তাঁরা নিজেদের কখনো জিজ্ঞেস করেন না। যদি সমস্ত মানবহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা চিরদিন ধরে ঐ পথে না চলে আসত, যদি স্বাধীনভাবে সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে ভালবাসবার এবং ভালবাসা পাবার ইচ্ছেটা মানবপ্রকৃতির মূল হতে না আসত, তাহলে "কবিত্ব" বলে এত বড় একটা মিথ্যে কি করে এতদিন ধরে সমাজে চলে আসছে, শুধু তাই নয়, ক্রমে পত্রে পুষ্পে আরও স্বশোভিত হয়ে আসছে। স্ত্রীপুরুষের সামাজিক সম্পর্কজাত ভালবাসায় সংসারযাত্রাটা নির্বাহ করা যায়— দুজনে ঘর না করলেও ত সংসারযাত্রা চলে যায়। সামাজিক জীবন ত মানুষের শুধু কতকটা অংশ অবলম্বন করে রাখে— বাদবাকিটুকু— যেটুকুতে মানুষের বিশেষত্ব— যে অংশটুকুর ভিতর আমরা নিজের নিজের আত্মার পরিচয় পাই— ধর্ম, প্রেম যে অংশটুকুর মধ্যে ফুটে ওঠে— সমাজসংসারের তা বাইরে— যাতে তার চরিতার্থতা সে জিনিস কোনো official প্রেম, কোনো official ধর্মের দ্বারা হয় না। সেই জন্য আমরা যখন পরমাত্মাকে কিম্বা আর একটি জীবাত্মাকে নিজের বুকের ভিতর টেনে আনতে চাই তখন সমাজের কোনো নিয়ম, কোনো কৌশল আমাদের বিশেষ সাহায্য করে না।…

আমি কৈশোর উত্তীর্ণ না হতে হতেই টের পেয়েছিলুম যে জীবনে কোন্ কোন্ জিনিস আমাকে অধিকার করে নেবে— beauty, mind— এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না যে আমার মনোজগতের কেন্দ্র হবে The Eternal Feminine— তবে তখন বিশ্বাস ছিল যে সাহিত্যজগতেই ঐ তিনটি জিনিস পাব— এবং realise করব।— Shelleyর Alastor-এর মতো একটি মানসী রমণীর আজীবন উপাসনা করব। যদি কখন মনে হত শুধু কল্পনাজগতে যদি মনের আশ না মেটে— তা হলেও ঠিক বুঝতে পারতুম না যে Danteর Beatrice-এর মতো একটি মর্ত্যরমণীতে সমগ্রভাবে Eternal Feminine-এর সাক্ষাৎ পাব, না Don Juan-এর মতো আংশিকভাবে অনেকে তা খুঁজে বেড়াব। একথা বোধ হয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে Dante এবং Don Juan এক হিসেবে এক জাতির লোক— উভয়েই স্ত্রীগত প্রাণ — অমিল শুধু স্বভাবের অন্য অংশে, এবং অবস্থার বৈচিত্র্যে। কথাটা হঠাৎ শুনতে হয়তো একটু খারাপ লাগে— কারণ সামাজিক শিক্ষার প্রভাবে যে সংস্কারটি আমাদের মনে বসে গেছে তাতে আঘাত লাগে। কিন্তু আমি কি ভাবে বলছি বোধ হয় বুঝতে পারছ— কেবল খাঁটি মনোবিজ্ঞানের হিসাবে— সামাজিক কিম্বা নৈতিক কিম্বা spiritual হিসেবে নয়— তাতে ত ও উভয়ের ভিতর আসমান জমিন্ ফারাক্।

ভাগলপুর

সোমবার রাত্রি

[পোস্টমার্ক ৪।১০।৯৮]

মুঙ্গের আমি আদ্যোপান্ত না দেখলেও যতটা দেখবার মতন ততটা দেখেছি। বঙ্কিমবাবুর নভেলের মুঙ্গের কেমন জানি নে, কিন্তু প্রকৃত মুঙ্গের যা বারোমাস সমান থাকে এবং যা যার চোখ আছে

সেই দেখতে পায়— সেই মুঙ্গের— বাস্তবিকই এত সুন্দর ও এত romantic—অর্থাৎ এত romantic ভাব মনে আসে যে আমি কখন কল্পনাও করি নি যে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ আমাদের এত হাতের গোড়ায় এমন একটি স্থান আছে যা ইউরোপের স্মৃতি মনে আনে,— যেখানে মনে হয়, ইংরেজি নভেলের একটি বিশেষ মিষ্টি রকমের অধ্যায়, সাথী পেলে সহজে বিনা চেষ্টায় বাস্তবিক করে তোলা যায়। মুঙ্গের শহর মুঙ্গের দুর্গ হতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন— মধ্যে বিস্তৃত পরিখা ও উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। শহরটি জঘন্য, মানুষে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটেকে যে রকম বিশ্রী করে তুলতে পারে, সেই রকম বিশ্রী। আর দুর্গটি যেন তোমার আমার জন্য তৈরি। তার ভিতর প্রবেশ করলেই মনে হয় সংসারের ধূলা, কাঠিন্য, রৌদ্র, গোলমাল সব বাইরে ফেলে এসেছি। দুর্গের এক পাশের প্রাচীর শহরের দিকে, আর বাদ বাকি তিনদিক ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার ভিতর হতে গেঁথে তোলা। প্রাচীরের উপর দিয়ে চলবার পথ— বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে— আর এখানে গঙ্গার প্রসর এত বড় যে অপর তীর চোখে পড়ে না— মনে হয় সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। আর কেল্লার অভ্যন্তরে বিস্তৃত lawn, কোথাও বা কানায় কানায় জলেভরা স্বচ্ছ পুষ্করিণী, কোথাও বা অসমতল ভূমি একটি ছোট্ট পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে— আগাগোড়া ঘাসের সবুজ রংয়ের কার্পেট মোড়া, অসংখ্য গাছপালায় সুশোভিত, আর মাঝে মাঝে পরিষ্কার, পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন নিভৃত নির্জন পথ— দুপাশে গাছের avenue— লোক সমাগম একেবারে রহিত বললেই হয়। আমি যে গেল পূর্ণিমার রাত্তিরে প্রথম দুর্গটি দেখতে যাই,— চন্দ্রালোকে আমাদের কলকেতার পথঘাটমাঠগুলোকেও একটু কবিত্বময় করে তোলে— মুঙ্গের দুর্গটিও আমার মায়াজগৎ মনে হচ্ছিল— আমি দিনে দেখি নি, আর যদি সূর্য্যের আলোয় দেখলে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় তাহলে আমার আর তা দেখেও কাজ নেই। আমি আর দী- ঘন বৃক্ষাচ্ছন্ন একটি পথ দিয়ে নীরবে অন্যমনস্ক হয়ে,— নিরুদ্দেশভাবে— সুমুখে যে দিক সেই দিক ধরে চলছিলুম— চারিদিকে ভাল কিছু দেখা যাচ্ছিল না, চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে এখানে ওখানে একটু আধটু ঝরে পড়ছিল মাত্র— দুজনেই বোধ হয় the girls we left behind এর স্মৃতিতে একটু কাতর হয়ে পড়েছিলুম— এমন সময় কোনো একটি অনির্দিষ্ট দিক থেকে একরাশ ফুলের গন্ধ এসে আমাদের চঞ্চল করে তুললে— সে চাঞ্চল্য হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে thrill of joy— ইন্দ্রিয় ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে যেখানে মন নামক বস্তুর সঙ্গে মিশে যায়,— সে গন্ধ ঠিক সেইখানে গিয়ে স্পর্শ করেছিল— মনের ভিতর একটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত সুখ হঠাৎ যেমন এসে পড়ে' আমাদের আনন্দে অধীর করে তোলে— সেইরকম। সে কি ফুলের গন্ধ জান, যাকে "হরশৃঙ্গার" বলে—আর আমরা বলি শিউলি। শিউলির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার অনেকদিন চলে গেছল, হঠাৎ এই বিদেশে আমাদের বাঙ্গলাদেশের শরৎকালের সমস্ত association যে ফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত, তা যে আমার ইন্দ্রিয়গোচর হবে তা কখন মনে ভাবিনি। আমি তোমাকে কিছুতে বোঝাতে পারছি নে যে সেই ক্ষণিকের জন্য কি অপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলুম। ভৈরবীর মধ্যে হঠাৎ কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে গিয়ে যেরকম আঘাত করে, ঠিক সেই ভাবের। (জানি নে তোমরা ভৈরবীতে কড়ি মা লাগাও কি না, ওস্তাদি হিসাবে সেটা বেদস্তর— কেননা ঐ সুরটাতে ঐ রাগিণীটেকে অততা মর্ম্মস্পর্শী করে তোলে)।......

তুমি অবশ্য moments of inspiration বলে জিনিসটে মান। একটুখানি চাঁদের আলোতে, একটা ফুলের গন্ধে, একটা গানের সুরে, আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটা একেবারে হঠাৎ খুলে দেয়।

তুমি সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব বলে জিনিস যে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাস কর, আমিও করি, কিন্তু ও জিনিসগুলোর পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র গুটিকতক মাহেন্দ্রক্ষণে হয়,— নিজের চেষ্টায় হয় না, বাইরের সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব এসে তা ফুটিয়ে তোলে। একটি মানুষের ভিতর যা-কিছু মহৎ, সুন্দর, মধুর, গভীর ভাব আছে, তা একটা ফুলের গন্ধে যত ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা দশ ভলুম ফিলজফিতে পারে না।...

ভাগলপুর

বৃহস্পতিবার

[পোস্টমার্ক ৬।১০।৯৮]

আমার এবারকার যাত্রা আর কেঁচে যায়নি। এখন পর্যন্ত ঠিক, খুব পাকা রকম ঠিক আছে যে, কালই আমি ভাগলপুর থেকে বিদায় নিচ্ছি। পরশু সকালে আবার সেই পুরোনো কলকতায়। পুরোনো কথাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, কারণ হয়ত গিয়ে দেখব এই একমাস সময়ের মধ্যে জায়গাটা অদ্ভুত রকম নতুন হয়ে উঠেছে— অর্থাৎ আমার পক্ষে। আর নূতনত্ব এ রকম ধরনের যে না হলেই হত ভাল। তবে আশার ত আর মানুষের মানে মোদ্দা নেই,— তাই মনে হচ্ছে গিয়ে অশান্তির মধ্যে পড়ব না। আর আমি যেমন গোলমাল হাঙ্গাম হুজ্জুত ভয় করি ও অপছন্দ করি— তেমনি আমার কপালেই যত ঐ আপদ জোটে। আমি অশান্তিকে ডরাই— আর তুমি ঠিক এঁচেছ আমি শ্রীহীনতা সইতে পারি নে। তবে এইটুকু তোমার ভুল যে, সংসারের সৌন্দর্য খালি সুখ ও বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে পাওয়া যায়। দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্য দৈন্যের ভিতরও যথেষ্ট শ্রী আছে। শ্রী নেই শুধু সাংসারিকতার ভিতর, নীচতার ভিতর, মিথ্যার ভিতর, খিটিমিটির ভিতর, নির্মমতার ভিতর। প্রকৃত সৌন্দর্যের একটা স্থির শান্ত অটল ভাব আছে, ইংরাজিতে যাকে calm, repose, dignity বলে। নরনারীর মুখে, প্রকৃতির দৃশ্যে, মনের ভাবে, চিন্তায়, ব্যবহারে, কথাবার্তায় এই প্রসাদগুণ সৌন্দর্যের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু দেখো যেন আমাকে ভুল বুঝো না। আমি জড়তা অসাড়তাকে সুন্দর বলছি নে— আমাদের শাস্ত্রে ঐ অবস্থাটাকেই তমোগুণ-প্রধান বলে। হঠাৎ দেখতে তমোগুণকে সত্ত্বগুণ বলে ভুল হতে পারে— কিন্তু তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে সকল প্রকার শক্তি ও জীবনের অভাব সত্ত্বগুণের ভিতর বিপুল শক্তি সংহত সংযত— জীবন পরিপূর্ণ, চূড়ান্ত এবং সেই জন্যেই চেষ্টাহীন। কিন্তু ও তো গেল ideal সৌন্দর্যের কথা— আমাদের জীবনে realisable নয়— শুধু আমরা যদি ঐ রকম সৌন্দর্য অনুভব করতে শিখি এবং ভালবাসতে শিখি, তাহলে আমাদের ব্যবহারে ভাবে ভাষায় কম বেশি মাত্রায় তার রূপ দেখতে পাওয়া যায়। জগতে সবই মায়ার খেলা— এ কথাটি লোকের মনে বসিয়ে দেবার উদ্দেশ্য তাদের নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, জ্ঞানহীন জড় পদার্থ করে তোলা নয়— কিন্তু সুখদুঃখ সকল অবস্থাতেই সমান ধীর ভাবে চলতে শেখানো— বাহ্য অবস্থাতে অবিশ্বাস এবং সুখদুঃখের জন্য নিজের আত্মার উপর নির্ভর করতে শেখানো। এদেশে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, আমিরি মেজাজ ও ফকিরি মেজাজ একই জিনিস। ফকিরকে আমির করে দিলেও তার মনের কিছু পরিবর্তন হয় না— সংসারকে একই চোখে দেখে— আমির ফকির হলেও তাই। দুজনেই জানে "দুনিয়া ফানা হ্যায়" পৃথিবী মায়ায় গড়া— যে লোক একবার the eternal sadness of things নিজের মনের ভিতর অনুভব করেছে, সে নিজের দুঃখকষ্ট ধীর উদার ভাবে দেখতে পারে। ধান ভানতে শিবের গীত

যাকে বলে তাই দেখি করতে বসেছি— আসল কথা বলবার ইচ্ছা ছিল এই যে, আমরা যাকে "ভদ্রতা" বলি, সে হচ্ছে মনুষ্যচরিত্রের পূর্বে যা বলছিলুম সেই মহৎ সৌন্দর্য্ সামাজিক ব্যবহারে যতটা সম্ভব realise করবার চেষ্টা। যারা আন্তরিক ভাবে তা না পারে নিজের জন্মসুলভ স্বভাবের গুণে— তারা বাহ্যিক ভাবেও সেটা আনতে চেষ্টা করে। রোগশোক দুঃখকষ্টে আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় না— আমার পক্ষে অসহ্য শুধু মাছির ভন্‌ভনানি, মশার কামড়। বুঝলে? এক আধ ঘা বড়গোছ তলোয়ারের চোট সহ্য হয়, কিন্তু সহ্য হয় না শুধু চারপাশ থেকে ছুঁচের খোঁচানি। এ কথাটা হচ্ছে Heiner। তিনি বলেন পুরুষের চেয়ে মেয়েরা আমাদের বেশি অস্থির করে তোলে, কেননা তাদের হাতে তরবারি নেই, ছুঁচ তাদের একমাত্র অস্ত্র। অবশ্য এটা রসিকতা মাত্র, এ কথা বলে দেবার আবশ্যক নেই।

তুমি আমার ছোট চিঠিগুলোর বর্ণনা দেও যে weighed and found wanting— সেদিনকে যে বড় চিঠি পেয়েছিলে সেখানে বোধ হয় weighed and found excessive হয়েছিল। সকালে চিঠি ডাকে দিতে হলে বড় চিঠি লেখা হয় না— কারণ সকালে দু'চার জন লোকের সুমুখে বসে লিখতে হয়। আমি আবার ছাই লোক দেখিয়ে কোন কাজ ভালো করে করতে পারি নে— শুধু বোধ হয় বাজে বক্তৃতা ছাড়া। অপর লোক সুমুখে থাকলে তাদের ভুলে গিয়ে শুধু নিজের কাজে মন দিতে পারি নে। এই তোমাকে চিঠি লিখছি, কিন্তু সামনে একটি ভদ্রসন্তান বসে আছেন বলে মন বিক্ষিপ্ত রয়েছে। মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্কভাবে তাঁর সঙ্গে ভদ্রতার হিসেবে দুটো একটা কথাও বলছি, আর মিনিটে মিনিটে মাপ চাচ্ছি এই বলে যে চিঠি শেষ করলুম আর কি? আপনি কিছু মনে করবেন না, চিঠিখানা বড় জরুরি। তিনি বলছেন "না, লিখুন না— সে কি কথা— আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না।"

ভাগলপুর
বৃহস্পতিবার
[পোস্টমার্ক ৭।১০।৯৮]

এই আমার শেষ চিঠি। চিঠি লেখবার চিঠি পাবার দিন ফুরিয়ে আসছে বলে একটু কষ্ট হচ্ছে। আমাদের সুখের সঙ্গে যা জড়িত তা শেষ হয়ে এলে যে রকম কষ্ট হয়। এ স্থানটা ছেড়ে যাচ্ছি বলেও মন একটু নরম আছে। আমার চিরদিনই অমনি হয়— কোনো স্থানে কিছুদিন থাকবার পর ঠিক চলে আসবার পূর্বে আমার মন বরাবরই ঈষৎ খারাপ হয়। জানিনে কেন হয়— যেখানে কিছুদিন থাকি তার উপর একটু মায়া জন্মায়— কিম্বা হয়ত যে কোনো জিনিস হোক না ছেড়ে আসবার সময় পৃথিবীতে যে সবই চলে যায়, কিছুই থাকে না, এ যে শুধু যাওয়া আসা,— এই সত্যটি মনে উদয় হয়। আজকে এমনি মনে হচ্ছে— আবার একদিন পরে ভাগলপুরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মন থেকে চলে যাবে। না, তা যাবে না— আজীবন ভাগলপুরের সঙ্গে একটা সুখস্মৃতি জড়িত থাকবে।... চিঠির দিন শেষ হয়ে এল, কত কথা বলবার ছিল, বলা হল না— এই যা দুঃখ। কাল বলব, কাল বলব করে কত মনের কথা চেপে রেখে দেই— সে কাল আর আসে না— মনের কথা মনেই থেকে যায়, কারণ সুযোগ অবকাশ যখন আসে আমরা জানতে পাই নে— একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। এক বসন্তের কথা আর এক বসন্তে বলা হয় না, কারণ এক বৎসরকাল মন তো আর এক স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকে না। নতুন নতুন মনের ভাব আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তুমি হয়তো ভাবছ যে আমি Omar Khayyam পড়ছি আর তার wineএর নেশা আমার ধরেছে। Omar পড়ছি বটে— প্রথম ছত্র হতে শেষ ছত্র পর্যন্ত— বার বার উল্টে পাল্টে— কিন্তু কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করবার জন্য নয়— কোনও নূতন কথা শোনবার জন্য নয়— শুধু মনের ভিতরকার রাগরাগিণীগুলো বাইরে শোনবার জন্য। আমাদের প্রাচীন পুরাতন এসিয়াতে মন নামক বস্তু নিয়ে এমন কে জন্মগ্রহণ করেছে যার কাছে all this unintelligible world কখনো কখনো কেবল ছায়ামাত্র মনে হয় না, যে সংসারের ছোটো কাজ, ক্ষুদ্র বাসনার মত্ততা, অবজ্ঞার চক্ষে দেখে না। যারা ঠিক চোখের সুমুখের জিনিস ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, যারা হাতের গোড়ার জিনিস ছাড়া ছুঁতে পারে না— যারা নিজের সংকীর্ণ মনের ভিতর যেটুকু আসে— সরাখানিকে ধরা জ্ঞান করে— তাদের কাছেই Omar Khayyamএর কথা পাগলের কিম্বা মাতালের বকুনি। Omar Khayyam যে কেন সৃষ্টির অর্থ খুঁজে পায় না, জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট দেখতে পায় না, তা তাঁরা কি করে বুঝবেন— কারণ তাঁরা তো নিজের নিজের জীবনের উদ্দেশ্য দিব্য স্পষ্ট বুঝেছেন— নিজে কিঞ্চিৎ টাকা রোজগার করা— সদুপায়ে ভালোই, না হয় ত আইনকে ফাঁকি দেবার মত অসদুপায়ে— তারপর ছেলেকে বিলেত পাঠান, civil servant করবার জন্য— বাস্ হয়ে গেল। আর সংসারের সার বস্তু এঁদের মতে— Omarএর wine নয়— টাকা — এঁরা বিশ্বাস করেন টাকার অনেক গুণ— কুৎসিতকে সুন্দর করে— নির্বোধকে বুদ্ধিমান করে— জঘন্য প্রকৃতির লোককে মাননীয় করে তোলে।— সংসারে কারও সঙ্গে ঝগড়া করা আমার ইচ্ছে নয়— এঁরা এঁদের প্রকৃতি নিয়ে সুখে থাকুন, শুধু আমাকে না জ্বালালেই বাঁচি।— এঁরা আলাদা থাকুন, নিজেদের ভিতর বিয়েথাওয়া করুন, ধনেপুত্রে এঁদের লক্ষ্মী বেড়ে উঠুক, তাতে আমার মতো লক্ষ্মীছাড়া লোকের কোনো আপত্তি নেই— শুধু অনুগ্রহ করে যেন না মনে করেন যে আমরা তাঁদের হিংসে করি।— তুমি হয়তো মনে মনে হাসছ এই মনে করে যে দৈব তোমার কপালে আচ্ছা এক পাগল জুটিয়েছে। ভয় পাবার কোনো দরকার নেই, তুমি তো জান আমার বৈরাগ্য সন্ন্যাস পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যায় না। কৌপীন কমণ্ডলুর সৌন্দর্য আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, বৌদ্ধ ভিক্ষু, নগ্ন ক্ষপণকের দলে প্রবেশ করবার ইচ্ছে কোনো কালেই হয়নি— বীভৎসরসিক আমি নই। তবে হাজার হোক ব্রাহ্মণ সন্তান, বল্কল, আতপান্ন, নিভৃত নির্জন শুদ্ধশান্ত তপোবন, নির্মল পবিত্র তমসা, ঋষিকন্যা ইত্যাদির প্রতি যে প্রাণের টান নেই, সে কথা বলতে পারিনে।— যেখানে সংসারের পাপতাপ রোগশোক প্রবেশ করে না, যেখানে কাজের ভিতর শুধু শাস্ত্রচর্চা, যেখানে সুখদুঃখ নেই— কেবল চির আনন্দ— সে দেশে কল্পনায় কাকে না নিয়ে যায়। কিন্তু সে দেশটা বহু অতীতে পড়ে গেছে, আর তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে কি হবে, যাবার তো যো নেই— আর গেলেই বা আমাদের স্বভাব নিয়ে কদিন টিঁকতে পারি। জলে ত আর আমাদের পিপাসা বারণ হয় না— তমসার জলেও নয়। আমরা চাই wine—আর সে কি wine জান?

Thou art the wine whose drunkeness is all we can desire O Love!

এর চাইতে বড় ফিলজফি আমি জানিনে, তুমি জান কি? জানও যদি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা কোরো না। কারণ যতদিন নেশা আছে ততদিন আমি তা বুঝতে পারব না। নেশা আমার কাটবেও না, আর যদি কেউ দুনিয়ার মালিক থাকেন তাহলে তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা এ জীবনে যেন এ নেশা না কাটে।

তুমি ঠিকই বলেছ, আজকাল আমরা জীবনে সঙ্গী চাই, দুঃখের একজন ভাগিদার করবার জন্য। সুখ চাই চটে কিন্তু হাতের ভিতর ত আসে না— যদি বা আসে তো বাজিকরের স্বর্ণমুদ্রার মতো মুঠো যতই চেপে ধরিনে কেন, ধরে রাখতে পারিনে— কোন ফাঁকে পালিয়ে যায় কিম্বা মুঠোর ভিতরই মিলিয়ে যায়। দুজনে সংসারে সচরাচর যাকে সুখ বলে তা একত্র লাভ করতে হলে দুজনেরই হাল্কা মন চাই—সমাজের ষোল আনা সাহায্য চাই। তোমার আমার কপালে কি তা জুটবে ?

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

Wigwam
5. 6. 23.

কল্যাণীয়েষু

…এই ঘটনার বলে তুমি আবিষ্কার করেছ যে মানুষের ভিতর আজও অপরের উপর প্রভুত্ব করবার অত্যাচার করবার প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে বজায় আছে, আর তার ফলে মানবসমাজে অসংখ্য অত্যাচার নিত্য নিয়মিত ঘট্‌ছে। এ সম্বন্ধে যে তোমার চোখ খুলে গিয়েছে তা দেখে খুসি হলুম। কেননা তুমি সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেছ যে একটা বুলি অর্থাৎ ছু-মন্ত্রের দ্বারা কালই সমাজের সকল পাপ দূর হবে না। তুমি অবশ্য বিশ্বাস করো না যে, সেকালে সত্যযুগ ছিল আর এখন কলিযুগ এসেছে। তুমি যখন নতুন যোগীর দল গড়বার প্রস্তাব করেছ, যারা মানুষকে মুক্তির বাণী শোনাবে, তখন তুমি নিশ্চয়ই মানো যে, মানুষ মনুষকে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে তুলতে পারে। আর যুগ যুগ ধরে মানুষ, লোক-সমাজকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে তুলতে চেষ্টা করে এসেছে। আর সে চেষ্টা যদি একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা না হয়ে থাকে তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, সত্যযুগ মানুষের পিছনে নয় সুমুখে। আর যদি বলো পূর্ব্বযোগীদের সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে, তা হলে পর-যোগীদের সে চেষ্টাও যে নিষ্ফল হবে তা বলাই বাহুল্য। অতএব যদি ধরে নেও যে মানুষের উপর মানুষের যে অযথা অত্যাচার আজও সমাজে দেখা যায়, সে হচ্ছে অতীতের survival মাত্র তা হলে হতাশ হয়ে পড়বে না।

তবে তোমার এ কথা আমি সম্পূর্ণ মানি যে, বর্ত্তমানেও এমন সব লোকের প্রয়োজন আছে যারা মানুষকে মুক্তির বাণী শোনাবে। কিন্তু সে মনুষ্যত্বের যোদ্ধার দল কোনরূপ "ব্যারাকে" গড়া যায় না।… কেননা যিনি কোনও মহৎ আদর্শ প্রচার করতে যাবেন সে আদর্শ তাঁকে আগে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে। আমরা কাউকে কিছু উপলব্ধি করতে শেখাতে পারিনে। কারণ এ উপলব্ধির মূল মানুষের নিজের অন্তর— পরের মুখের কথা নয়। বুদ্ধদেবকে সেকালে জনৈক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁর গুরু কে, তিনি উত্তরে বলেন যে, তাঁর গুরু তিনি নিজে। যিশুখৃষ্টকে ও প্রশ্ন করলে তিনি ঐ একই উত্তর দিতেন। যিনি কোনও সত্য নিজের অন্তরে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন, সে সত্যই যাঁর সত্তা হয়ে উঠেছে তার কাছ থেকেই সহস্র লোকে প্রাণ পায়, তার প্রচারের গুণে নয়, তার সত্তার গুণে।… খৃষ্টধর্ম্মের মন্ত্রে বহুলোককে দীক্ষিত করা যায়, যারা "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন" করতে প্রস্তুত, কিন্তু ও উপায়ে তৈরী করা যায় শুধু Jesuit, Jesus Christ নয়। আর মানুষের মুক্তির জন্য চাই Jesus, Society of Jesus নয়, কেননা সে Society হবে একটা নব উৎপাত। সুতরাং ঐ যোগীর দল তৈরী করার কল্পনা ছেড়ে দাও,

কেননা সে দল গড়ে উঠলে, তারা করবে মানুষের মনের উপর অত্যাচার। তারা মানুষকে স্বাধীন করবে না, কেননা তারা কোন লোকের "স্ব" জিনিষটিকে মানবে না। সুতরাং তুমি যে সব কথা বলেছ, সে সব কথা তোমার নিজের অন্তর দিয়ে যাচাই করে নিজে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে— আর সে সাধনার প্রথম পদ হচ্ছে তোমার যে "অহং"য়ে আঘাত লাগায় সংসারের evilএর কথা তোমার মনে পড়েছে সেই অহংকে ভোলা। আমাদের শাস্ত্রে যাকে "অহং" বলে ইউরোপীয় শাস্ত্রে তাকে ego বলে; আর সেইটির গণ্ডী না পেরুতে পারলে "আত্মজ্ঞান" ভাষান্তরে self-consciousness লাভ করা যায় না। আমাদের প্রকৃতির লোকদের অর্থাৎ "অহং"য়ে আঘাত লাগলে যাদের রাগ হয় অর্থাৎ ঐ সূত্রে যাদের "অহং"য়ের গণ্ডী আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে তাদের কাজ হচ্ছে ছোট ছোট evilএর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা লড়া। এ জাতের লোকের ভিতর থেকে Saint বেরয় না।

অনেক বক্তৃতা করলুম। কিন্তু নিজের বক্তব্য ঠিক বোঝাতে পারলুম কি না বুঝতে পারছিনে। একটা কথা স্বীকার করা যাক। এ যুগের materialism আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। matter এবং motionএর গতিবিধির হিসেবেই আমাদের সকল চিন্তাকে নিয়মিত করছি। তাই Physics থেকে ধার করা দুটো কথা mass এবং energy হয়েছে আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা। mass-consciousness, mass-movement প্রভৃতি শব্দ শুনলে আমরা নেচে উঠি, তার পর আমরা moral energy, spiritual energy প্রভৃতি বাড়বার কথা দুবেলা বলি, যেন spirit জিনিষটে এক রকম steam। এ ব্যাপার যে crass materialism তা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। তাই আমরা সব জিনিষই organise করতে চাই। মানবের আত্মা পরমাণু নয় যে সেই সব পরমাণু যোড়া দিয়ে একটা প্রকাণ্ড আত্মা গড়ে তোলা যায়। আত্মা যে এক ছাড়া দুই হতে পারে না, আর সেই ঐক্যজ্ঞানই যে সকল জ্ঞানের মূল ও আধার, আর আত্মা যে জড় পদার্থ নয় automatic, এ সত্য আমরা হারাতে বসেছি তাই আমরা একটি মানুষের মত মানুষের চাইতে অসংখ্য অমানুষের সমষ্টিকে বড় জিনিষ মনে করি।— কিন্তু মনে রেখো, এ জগৎ যদি কেউ সৃষ্টি করে থাকে ত তেত্রিশ কোটি দেবতায় তা করেনি— করেছেন তা এক ঈশ্বর। মানুষেরও সব ঐশ্বর্য্যের মূলে আছে এক, বহু নয়।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

Wigwam
Darjeeling
10. 6. 23.

কল্যাণীয়েষু

…আমার মনটা আসলে বিষয়গত নয়, তাই মধ্যে মধ্যে যা খুসি তাই লিখতে আমি বাধ্য হই। আর পাঁচজনের মত কাজের কথা অবশ্য আমিও বলি, কিন্তু সে কথা তেমন কাজের হয় না। কেননা ফূর্ত্তি করে আমি বলতে পারি সুধু বাজে কথা। মনকে যদি আমি একবার পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারি তা হলে বোধ হয় আমার লেখা সত্য সত্যই সাহিত্য হয়ে ওঠে।— তবে কি জানো মানুষ মাত্রেরই vanity আছে। তাই আমার যে পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যা আছে, মাথায় কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে— তাই প্রমাণ করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারিনে। ফলে পলিটিকসও লিখি ইকনমিকসও বকি। শিক্ষার হয়ে ওকালতি

করি, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, আর সময়ে সময়ে মহা দার্শনিক হয়ে উঠি যেমন হয়ে উঠেছিলুম তোমাকে সেদিন চিঠি লেখবার সময়।— তুমি যা বলেছ তা ঠিক— এ পৃথিবীতে organisationএরও প্রয়োজন আছে। তবে আমার বক্তব্য এই যে organisationএর দ্বারা কোনও জিনিষের organic growth হয় না। মানুষকে এক হিসেবে পৃথিবীর আর পাঁচটা বাহ্যবস্তুর মধ্যে একটা বাহ্যবস্তু হিসেবে দেখা যায়। সুতরাং মানুষকে বাইরে থেকে দেখলে তাকে organise করবার লোভ সহজেই হয়। অপর পক্ষে মানুষ নিজেকে দেখতে পারে সুধু নিজের অন্তরের দিক থেকে, অর্থাৎ মানুষ নিজেকে spirit বলেই জানে, নিজেকে বাহ্যবস্তু বলে জানা তার পক্ষে অসম্ভব। এখন, spiritকে যে জড় পদার্থের মত organise করা যায় না সে কথা বলাই বাহুল্য।— যারা অপরকে মানুষ করে তুলতে চায় তারা তার উপায় ঠাওরাবে organisation, কিন্তু যে নিজেকে মানুষ করতে চায় সে জানে যে তার উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমাজ নামক organisationএর উপরে মনকে না তুলতে পারলে আমাদের মনুষ্যত্ব একচুলও বাড়ে না। আর মজা এই যে, যারা মানুষকে organise করতে চেষ্টা করেছে তারা কারও মনুষ্যত্ব বাড়ায়নি। অপর পক্ষে যে নিজে মানুষ হয়েছে সে অপরকেও মানুষ করে তুলতে কৃতকার্য্য হয়েছে। অন্তত ইতিহাস পড়ে ত তাই মনে হয়। আমার মনে হয় আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শিষ্যত্ব করে এই organisation প্রভৃতি ইউরোপীয় জিনিষের অতিভক্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমাদের পক্ষে spiritএর উপর ঝোঁক দেওয়াটা দরকার।…

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

শ্রীরাধারানী দেবীকে লিখিত

20 Mayfair
Ballygunge
5. 12. 30

কল্যাণীয়াসু

কাল তোমার চিঠি পেয়ে, এতদিন তোমার নীরব থাকবার কারণ বুঝতে পারলুম। তুমি উত্তরাপথের যে অংশ প্রদক্ষিণ করে এলে, সে অংশের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। গুজরাটের ভিতর জানি সুধু বম্বে ও সুরাট। আর "বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তিমেখলায়" তার রূপ দেখেছি সুধু ম্যাপে আর কীর্ত্তি শুনেছি ইতিহাসের মুখে। ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন করা সুধু নবীন ভাবুকদের পক্ষে নয় সকলের পক্ষেই শ্রেয়ঃ। এরকম পর্য্যটনের ফলে অন্ততঃ এই লাভ হয় যে আমাদের দেশটা যে কত প্রকাণ্ড ও কত বিচিত্র, সে জ্ঞানটা অন্ধলোকেরও হয়।

সবরমতী আশ্রমের কথাপ্রসঙ্গে তুমি বাঙালীদের সম্বন্ধে যা বলেছ সে সব কথাই ঠিক। তবে আমার মনে হয় যে বাঙালীর মনের উপর ভারতবর্ষের অতীতের চাপ ছিল না বলেই বাঙালী বর্ত্তমান ইউরোপের কথাবার্ত্তা হালচালের এতটা বশীভূত হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে স্মৃতির তেমন গাঢ় রঙ নেই বলেই আশার নতুন রঙের ছোপ লেগেছে। এ রঙ যে আজও এত ফিকে তার কারণ তা মনের অন্তস্তলে অর্থাৎ subconscious selfয়ে বসে যাবার সময় পায় নি। ইউরোপের সব ideaই এখনও আমাদের conscious selfয়েই কিলবিল্ করছে। তার ফলেই আমাদের এইসব ক্ষণিক উত্তেজনা, নব

নব উন্মাদনা। আমাদের মনের সব নতুন ভাবই মনের উপর আলগা হয়ে বসে আছে। আমাদের এই জলো দেশে মানুষের মনও যে কতকটা তরল ও চঞ্চল হবে সে ত ধরা কথা। Plato তাঁর সমসাময়িক Athenianদের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে Spartaর মহাভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁর Republic Spartaর আদর্শে গড়েছিলেন। কিন্তু তিনি Athensকে Sparta করতে কৃতকার্য্য হন নি। আমিও বাঙালীর মন ও চরিত্রের এই সব ত্রুটি লক্ষ্য করে মধ্যে মধ্যে অতীত ভারতবর্ষের মহা ভক্ত হয়ে পড়ি, তার পরই মনে হয় যে জীবন ও মনের সহজ গতিরোধ করে সমাজকে অটল করলেই তা অচল হয়ে পড়্‌বে। সবরমতী আশ্রমের ideal বাঙালীর মনে বসে না বলেই তার কর্ম্মকাণ্ড বাঙালীর হাতে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ড যোগহীন হলেই তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

ভাল কথা, অপরাজিতা দেবী কে বলো ত? বিজলীতে তাঁর একটি লেখা আমার চোখে পড়েছিল। এবং তা যে আমার খুব ভাল লেগেছিল, তার প্রমাণ সেটি পড়ে অবধি লেখিকাটি কে, জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হয়েছে। কেন জানি নে আমার মনে হয়েছিল লেখিকার নামটি ছদ্মনাম। এখন যখন শুনছি যে অপরাজিতা তোমার পরিচিতা তখন আমি চাই যে তিনি যেন আমার কাছে অপরিচিতা না হয়ে থাকেন। এ কথাটি তুমি আমার হয়ে তাঁকে জানিয়ো। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

20 Mayfair
Ballygunge
17. 7. 30

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেলুম। তুমিও দেখছি আমার বন্ধু দিলীপের মত ভ্রাম্যমাণ হয়ে উঠলে, অবশ্য সখ করে নয়, বাধ্য হয়ে। শরীর অসুস্থ হবার মত পাপ আর দুনিয়ায় নেই, বিশেষতঃ তার পক্ষে যে পৃথিবীতে কিছু করতে চায়, তা লেখাপড়াই হোক আর অন্য কোনও কাজই হোক। আমার দেহে স্বাস্থ্য চিরকালই আছে কিন্তু বল কস্মিনকালেও ছিল না, আর যেটুকু ছিল তাও কিছু দিন থেকে কমে কমে আসছে। এও এক কারণ যার ফলে কলম ধরতে আর তেমন প্রবৃত্তি হয় না।

রবিবাবু অবশ্য আজও কলম গোটান নি, কারণ তাঁর কলম থেকে আজকের দিনে দেদার ইংরাজী লেখা বেরুচ্ছে। আসল কথা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির শক্তি অফুরন্ত। ইংরাজীতে যাকে বলে exuberance সে জিনিষ যে প্রতিভার ধর্ম তা রবিবাবুর রচিত সাহিত্য থেকেই প্রমাণ হয়। আমাদের আর পাঁচজনের যে নাম করেছ তাদের কারও নাম রবিবাবুর নামের পাশে উল্লেখ করা যেতে পারে না। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যা সম্ভব তা আমরা করেছি, হয়ত পরেও করব। কিন্তু আমাদের মনের মাপ আমরা জানি, অন্ততঃ আমি ত জানিই। তবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলে যে আমার পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এমন কথা আমি কখনো মনে স্থান দিই নি। আমার বিশ্বাস আমরা যে যা পারি সেইটুকুই ভাল করে করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। তা লোকে আমাদের লেখার তারিফ করুক আর না করুক। ভাল কথা, পরশুরাম ইতিমধ্যে কি করেছেন জানো? তিনি একখানি নতুন বই লিখেছেন, তার নাম "চলন্তিকা"। "চলন্তিকা" "গড্ডলিকা"র স্বজাত নয়। এটি হচ্ছে একখানি অভিধান।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। আমিও আবার কলম ধরেছি। এখন কি লিখছি জানো? ইতিহাস। জনৈক বন্ধুর উপরোধে বাংলায় হর্ষচরিত লিখছি। এ লেখা পড়ে ঐতিহাসিকরা বলবেন যে এ ইতিহাস নয়, আর তোমরা বলবে যে এ সাহিত্য নয়। উভয়পক্ষেরই মত সত্য। তবে প্রবন্ধটি যখন আরম্ভ করেছি তখন শেষ করবই। তার পর হর্ষচরিতের আদি লেখক বাণভট্টচরিত লিখব। রাজচরিতের চাইতে কবিচরিত আমার বিশ্বাস বেশি interesting হবে। তার পর চৈনিক পরিব্রাজক I-tsingএর ভ্রমণবৃত্তান্তের পরিচয় দেব। এই তিনটি প্রবন্ধে আমার বিশ্বাস হর্ষযুগের একটি মোটামুটি ছবি দিতে পারব। দেখো, আমার অন্তরে একটি amateur scholar আছে এবং সে ব্যক্তি থেকে থেকে নিজেকেই জানান দিতে চায়। আসল কথা এই যে বর্ত্তমানে সাহিত্য রচনা করতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ লোকে এখন চরকা পিকেটিং ব্যতীত আর কোন কথাই কানে তোলে না। আর ও সব বিষয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। কারণ গোলে হরিবোল দেবার কোনও সার্থকতা নেই। যে কথা লক্ষ লোকে বলছে, সে কথা বিশেষ কোনও ব্যক্তি না বল্‌লে দেশের কোনও ক্ষতি নেই। জান বোধ হয়, জনমত এখন লেখাপড়া বয়কট করবার পক্ষপাতী। লেখাপড়া লোকে ছেড়ে দিলে অথবা মুলতুবি রাখলে নাকি দেশের মঙ্গল হবে। দেশের এ অবস্থা যে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয় তা বলাই বাহুল্য। এও এক কারণ যার দরুন, কিছু মন দিয়ে লিখতে উৎসাহ হয় না। অবশ্য তোমরা যতটা বাইরের গোলমালকে উপেক্ষা করে লিখ্‌তে পার আমরা ততটা পারি নে, কারণ "বাহির" জিনিষটে আমাদের ঢের বেশি গাঘেঁষা। আজকাল পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হলে কথা হয় সুধু পিকেটিং ও বয়কটের বিষয়, লেখাপড়ার কথা কেউ উত্থাপন করে না। এই সব কারণে আমি এখন ইতিহাস অর্থাৎ অতীতের দিকে চোখ ফিরিয়েছি। অতীতের মহাগুণ এই যে তা মৃত অতএব শান্ত— দ্বিতীয়তঃ অতীতকে কেউ আর reform করতে যায় না। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই পক্ষে মাঝে মাঝে অতীতের দেশে হাওয়া বদলাতে যাওয়া ভাল, তাতে আর কিছু না হোক restএর ফলে মন সুস্থ হয়। এ সব অবশ্য moodএর কথা। আর আমি নানা সময়ে নানারূপ moodএর বশবর্ত্তী হয়ে পড়ি। নিজের সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করলুম, এখন থামি। তুমি চিঠি লিখলেই আমার কাছ থেকে তার জবাব পাবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

20 Mayfair
Ballygunge
2. 8. 30

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেয়েছি কাল বিকেলে আর আজ সকালেই তার উত্তর দিতে বসেছি। দেখছ আমি কত ভাল correspondent. এক কালে আমি চিঠি পেতুম কিন্তু লিখতুম না। তার পর রবিবাবুর পরামর্শে আমি পত্রলেখক হয়ে উঠি। তিনি আমাকে বলেন যে চিঠির উত্তর না দেওয়ার অর্থ লোকসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের কারবারের সুধু সাহিত্য নয় পত্রও একটি মস্ত উপায়। তার পর থেকে এই পত্র মারফৎ আমি বহু বন্ধুলাভ করেছি। তুমি সম্ভবতঃ তাদের দুচারজনকে নামে চেনো— যথা ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখুয্যে, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। এঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় পত্র মারফৎ,

তার পর তাঁদের দর্শন পাই। একেই বলে পত্র আবডাল দিয়ে আলাপ। অবশ্য এমন লোকও আছে যাদের সঙ্গে পত্রব্যবহার বেশি দিন চলে না কারণ তাদেরও বেশি কিছু বলবার নেই ফলে প্রত্যুত্তরে আমারও বেশি কিছু বলবারও থাকে না। এ রকম লোকের সঙ্গে চিঠির আলাপের অকালে মৃত্যু হয়। অপর পক্ষে উপরে যাঁদের নাম কল্লুম তাঁদের কাছ থেকে আজও লম্বা লম্বা চিঠি পাই। গত মেলে অমিয় বিলেত থেকে আমাকে একখানি ছ পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছে, উত্তরে আমিও চার পাতা চিঠি লিখেছি। যা মনে আসে তাই লিখতে যার কাছে সঙ্কোচ হয় না, তাকেই লম্বা চিঠি লেখা যায়। আমরা যখন সাহিত্য লিখতে বসি তখন একটা না একটা ভঙ্গী অবলম্বন করতে বাধ্য হই। একমাত্র চিঠির ভিতরই আমরা সহজ হতে পারি। অবশ্য কাকে লিখি সহজ হওয়াটা তার উপর নির্ভর করে। আমরা যারা সাহিত্যিক বলে পরিচিত, আমাদের যাকে তাকে মন খুলে চিঠি লিখতে ভয় হয়, পাছে সে চিঠি খোলা চিঠি হয়ে ওঠে।

কেদারবাবুর লেখার আমি মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছি আর সেকথা সবাই জানে, কেননা আমার সে স্তুতি ছাপার অক্ষরে উঠেছে। রাজশেখরবাবুর প্রথম লেখা পড়ে আমি যথেষ্ট বাহবা দিই। এমনকি আমার সে appreciation পড়ে Sir P. C. Roy আমাকে বলেন যে আমি তাঁর Bengal Chemicalএর ম্যানেজারের মাথা খাচ্ছি। তাঁর ভয় হয়েছিল যে আমাদের প্রশংসায় রাজশেখরবাবুর মাথা ঘুরে যাবে এবং তার ফলে তিনি রসায়ন ছেড়ে রসসাহিত্যেরই চর্চ্চা করবেন। আর শরৎবাবুর ত আমি কিছুদিন ধরে বাঁধা উকিল ছিলুম। সাহিত্যের নানা ছোট আদালতে আমি তাঁর হয়ে বাহাজ করেছি। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ তুমি যাঁদের যথার্থ সাহিত্যিক বলে মনে করো আমিও তাঁদের গুণকীর্ত্তন করতে ত্রুটি করিনি। একবার ফ্রান্সের দুটি pianistএর মধ্যে কে বড় এ নিয়ে একটি সঙ্গীতসভায় মহা ঝগড়া বাধে, এমন কি সমজদারদের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। এমন সময় একটি মহিলা এক কথায় গোল মিটিয়ে দেন। তিনি বলেন একজন হচ্ছেন the best of all the pianists কিন্তু অপরটি হচ্ছেন the only pianist। আমিও বলি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন the only poet.

আমার "হর্ষচরিত" তোমাদের পাঁচজনের মনঃপূত হবে কিনা জানিনে তাই প্রকাশ করতে একটু ইতস্ততঃ করছি। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় "হর্ষ" সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানা বই লিখেছেন। তাঁরই অনুরোধে আমি এ প্রবন্ধ লিখেছি কতকটা মূল হর্ষচরিতের সাহায্যে। রাধাকুমুদের পদানুসরণ করতে হয়েছে বলে নিজের পথে যেতে পারিনি। পরের আঁচল ধরে চলতে আমার কি রকম বাধবাধ লাগে। সে যাই হোক্ প্রবন্ধটি বেরুলে পড়ে দেখো। সব লেখাই যে ভাল হতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। আজ বেজায় গরম অতএব এখানেই থামি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

20 Mayfair
Ballygunge
25. 1. 31.

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেলুম। এ চিঠিতে অসুখের খবর নেই, সেইটে সুখবর। পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই যা একেবারে রোগমুক্ত; যদি থাকত ত মানুষে আর স্বর্গের কল্পনা করত না। স্বর্গটা

চির-আরামের পৃথিবী ছাড়া আর কিছুই নয়। তা হলেও দেশভেদে রোগের পরিমাণভেদ আছে। এখন ভারতবর্ষ যে সদা রোগগ্রস্ত দেশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং আমার বিশ্বাস চিরকালই তা ছিল। তাই না এ দেশের লোক সেকালে জীবনটাকে ভবযন্ত্রণা বলেই জানত। ভারতবর্ষের মহা শত্রু হচ্ছে কীটাণু। এ যুগের সদ্য-আবিষ্কৃত injectionএর কৃপায় দেশের লোক যদি রকমারী রোগের হাত থেকে মুক্তি পায় তা হলেই ভারতবাসীরা আবার দাঁড়িয়ে উঠবে। এই দেশব্যাপী রোগশোক দুঃখদারিদ্র্যের কথা যখনই মনে পড়ে তখনই আমি pessimist হয়ে পড়ি। আর তার pessimism একটা মানসিক রোগ মাত্র যার সংসারের দুঃখমোচনের শক্তি নেই, আর আমার বিশ্বাস সে শক্তি আমার নেই। সুতরাং যা অপ্রিয় সত্য তার দিকে পিঠ ফিরিয়েই আমরা optimist হতে পারি; আর তা হওয়াই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ জীবনের উপর যার ভরসা নেই, তার পক্ষে জীবনযাত্রা বিড়ম্বনা মাত্র। যাক্ এসব কথা।

তুমি যে পত্রের আবডালে সাহিত্য আলোচনা করতে চাও তা নির্ভয়ে করতে পারো। সাহিত্য ধর্ম্ম প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলোর কোন আভিধানিক অর্থ নেই অর্থাৎ ও সব কথার মানে dictionary-অন্তরে পাওয়া যায় না। মানুষে কতকটা তার শিক্ষা আর কতকটা তার প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্ম সাহিত্য প্রভৃতি কথার নিজের মনোমত অর্থ নিজে করে নেয়। এসব জিনিষ নানাভাবে দেখা যায় বলেই ত তাদের মহত্ত্ব। আর এই কারণেই যুগে যুগে সাহিত্যের নূতন নূতন সংজ্ঞা প্রচলিত হয়। সুতরাং সাহিত্য সম্বন্ধে, আমার বিশ্বাস, প্রতি লোকের নিজস্ব মতের যথেষ্ট মূল্য আছে, অবশ্য যদি তার মতের পিছনে মন থাকে। সকলের মন একছাঁচে ঢালাই হয়নি বলেই ত পৃথিবীর সাহিত্য এমন বহুরূপী।

তা ছাড়া সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। আমার বিশ্বাস প্রতি সাহিত্যিকের অন্তরে double personality আছে, তার একটি হচ্ছে সামাজিক ব্যক্তি অপরটি সাহিত্যিক। এ দুই যে পরস্পরের ছায়ামাত্র তা নয়। আর আমার বিশ্বাস যথার্থ সাহিত্যিকের সাহিত্যিক personality হচ্ছে deeper personality, যেটিকে তার সামাজিক personality অনেক সময়ে চেপে রাখ্‌তে পারে কিন্তু কখনই ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এ দুই personalityই গড়ে তোলা যায় এবং সে গড়ে-তোলা নির্ভর করে কে কোন্‌টিকে বড় মনে করেন তার উপর। অবশ্য অধিকাংশ লোক এর কোনটিকেই নিজে গড়ে তুলতে চান না। সে গড়নের ভার—অবস্থা ও বাহ্য ঘটনার হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন। ফলে অধিকাংশ লোক কি জীবনে কি মনে চিরকালই পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। সমাজে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সামাজিক লোকের মতে দোষ হিসাবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মনোজগতে বাঁচতে হলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতেই হয়। আমরা কাব্যই লিখি আর অলঙ্কারই লিখি তার ভিতর কোনই মূল্য থাকে না যদি তা একটি ব্যক্তিবিশেষের মনের পরিচায়ক না হয়। এই মনের বিশেষত্ব যদি এক পয়সাও হয়, ত তার দাম ষোল আনা। আমার এ মত নিয়ে অবশ্য মস্ত একটা বক্তৃতা করা যায়, কিন্তু বক্তৃতা করবার প্রবৃত্তি কালক্রমে আমার কমে এসেছে! অতএব এইখানেই থামি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

মৃচ্ছকটিক

প্রমথ চৌধুরী

আমি যখন এম. এ. পাশ করে' বছর দুয়েক বাড়ীতে বেকার বসেছিলুম, তখন আমার সখ হল যে, সংস্কৃত কাব্যের কিছু চর্চা করব। সংস্কৃতের জ্ঞান আমার ছিল অতি সামান্য। সেই সামান্য জ্ঞান নিয়েই সংস্কৃত নাটক পড়তে আরম্ভ করি।

মৃচ্ছকটিক নাটক অন্যান্য সংস্কৃত নাটক থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং অপর কোন নাটকের সগোত্র নয়। অপর অনেক নাটকের ভিতর একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত কাব্যে একখানি প্রক্ষিপ্ত নাটক বলে' মনে হয়। এর স্বাতন্ত্র্য এতই স্পষ্ট যে, প্রথম থেকেই য়ুরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা এর বিষয় দেদার প্রবন্ধ লিখেছেন। এবং অনেকে গ্রীক নাটকের প্রভাবে এ নাটক লেখা হয়েছে—এই সিদ্ধান্ত করেছেন। আমি গ্রীক জানি নে। কিন্তু ইংরিজী তর্জমায় **Aeschylus, Sophocles, Aristophanes, Euripides,** এঁদের রচিত নাটক পড়েছি। তাঁদের নাটকের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তবে শুনতে পাই গ্রীক ভাষায় খানকতক কমেডি আছে, যার অনুকরণে মৃচ্ছকটিক লেখা হয়েছে বলে' অনেকে মনে করেন। এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাই কেউ কেউ আবার এ মত খণ্ডন করেছেন।

সে যাই হোক, মৃচ্ছকটিক যে দলভ্রষ্ট নাটক, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমি সেকালে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত মৃচ্ছকটিক সংস্কৃততেই পড়ি। তাঁর প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে। তাহলেও এই নাটকখানি পড়ে' আমি মুগ্ধ হই। সেকালে মৃচ্ছকটিকের কোন বাঙ্গলা অনুবাদ ছিল না। এর প্রথম অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১] তিনি একসঙ্গে অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন, তার মধ্যে মৃচ্ছকটিক একটি। তাঁর অনূদিত মৃচ্ছকটিক প্রথম শ্রেণীর অনুবাদ নয়। তাহলেও আমি যতদূর জানি, সেখানি হচ্ছে বাঙ্গলা ভাষায় মৃচ্ছকটিকের একমাত্র অনুবাদ। তার বহুকাল পরে আমি আবিষ্কার করি যে, সংস্কৃত মৃচ্ছকটিকের আর একটি সংস্করণ আছে, যার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া আছে। কিন্তু সে অনুবাদ মোটেই ভাল নয়। তবে উপরে সংস্কৃত থাকায়, সে অনুবাদ ক্রমান্বয় যাচিয়ে নেওয়া যায়। এই সংস্করণ যিনি বা'র করেছেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হলেও বাঙ্গলা ভাষার উপর হয়ত তাঁর বিশেষ দখল নেই। আর এমনও হতে পারে যে, বাঙ্গলা ভাষাকে তিনি ঈষৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন।

এখন আমি এই মৃচ্ছকটিকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। তার থেকেই দেখতে পাবেন যে, এ নাটকের বস্তু কতদূর অভিনব। আপনারা অনুমান করে' নিতে পারেন যে, কবির বলবার ভঙ্গি বিষয়োপযোগী।

১ কয়েক বৎসর পূর্বে এই অনুবাদ পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব হইলে উহার ভূমিকা স্বরূপ এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। তাহার পূর্বে ও পরে লেখক একাধিক প্রবন্ধে মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত নাটকমাত্রেই সূত্রধার কবির নামোল্লেখ করেন—একমাত্র ভাস নামক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাট্যকার ব্যতীত। অধিকাংশ নাটকে নাম ছাড়া কবির আর কোন পরিচয় থাকে না। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের কবির নাম শূদ্রক এবং তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিস্তৃত তালিকা প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। তিনি নাকি ছিলেন ব্রাহ্মণ, রাজা ও ঋগ্বেদাদিতে পারদর্শী। তিনি আরো জানতেন গণিতশাস্ত্র, গণিকাশাস্ত্র, অস্থিশাস্ত্র। শূদ্রক নানা গুণালঙ্কৃত হয়েও একশ' দশ বৎসর বয়সে একটি যজ্ঞ করে' আগুনে পুড়ে মরেন। একথা শুনলেই আমাদের একটু ধোঁকা লাগে। মনে হয় এরকম রাজা কখনো ছিল না। এবং পণ্ডিতরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শূদ্রক যে কোন্ সময়ে কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁদের মতে শূদ্রক হচ্ছেন একটি কিম্বদন্তীর রাজা। বাস্তবিক এরকম মহাপুরুষ কেউ ছিল না। সুতরাং মৃচ্ছকটিক কোন্ সময়ে কে লিখেছে, তা' আজও অজ্ঞাত।

তারপরে এ নাটকে কি কি বিষয় থাকবে, তার একটি ফর্দ প্রথমেই দেওয়া আছে। সে ফর্দটি এই: "উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্ত নামে ব্রাহ্মণজাতীয় অথচ বাণিজ্যব্যবসায়ী এক দরিদ্র যুবক ছিলেন, এবং বসন্তকালের শোভার ন্যায় বসন্তসেনা নামে একটি বেশ্যা সেই চারুদত্তের গুণে অনুরক্ত হইয়াছিল।

রাজা শূদ্রক সেই চারুদত্ত ও বসন্তসেনার নির্দোষ রমণোৎসব, নীতির প্রচার, ব্যবহারের (মোকর্দমার) দোষ, খলের চরিত্র এবং দৈব— এই সমস্তই নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

আমি কোন বাঙ্গলা ইংরিজী বা সংস্কৃত নাটকে এরকম table of contents দেখি নি। এর থেকে মনে হয় মৃচ্ছকটিকের লেখকের সুমুখে আর একখানি নাটক ছিল, যার থেকে তিনি এই বিষয়ের ফর্দ সংগ্রহ করেছেন।

সে যাই হোক, এর থেকে বোঝা যায় যে অন্য সব সংস্কৃত নাটক থেকে এটি কত বিভিন্ন।

মৃচ্ছকটিকের নায়িকা বসন্তসেনা গণিকা— রাজকন্যা ন'ন। চারুদত্ত প্রথমে ছিলেন অতি ধনী বণিক। শেষটা হয়ে পড়েন দরিদ্র। এই দরিদ্র অবস্থাতেই বসন্তসেনা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। এবং এ নাটকের সমস্ত ঘটনা হচ্ছে চারুদত্তের দারিদ্র্য অবলম্বন করে। ব্যবহারদুষ্টতা এক মিথ্যা মোকর্দমায় আদালতের বর্ণনা ও বিচার একটি পুরো অঙ্কে দেখানো হয়েছে। একে ইংরিজীতে trial-scene বলে। Merchant of Veniceএ এই রকম একটি দৃশ্য আছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের trial-sceneএর তুলনায় সেটি নগণ্য আর একরকম ছেলেখেলা বল্লেই হয়। আমি যতবার মৃচ্ছকটিক পড়ি, ততবারই আমার মৃচ্ছকটিকের এই নবম অঙ্ক সম্বন্ধে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লেখবার লোভ হয়। কারণ এটি কোন আদালতের কোন স্বকপোলকল্পিত বর্ণনা নয়; সত্যের ছাপ এর সর্বাঙ্গে আছে। আমি যতদূর জানি, অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এর অনুরূপ বর্ণনা নেই। তবে সে লোভ আমি বরাবরই সম্বরণ করে' এসেছি।

তারপরে এ নাটকে একটি চুরির বর্ণনা আছে। শর্বিলক ব্রাহ্মণসন্তান, উপরন্তু শিক্ষিত। তিনি চুরি করবার সময় বলেছেন যে চুরির আমি নিন্দাও করছি, আবার কাজেও করছি। আসলে তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাজ করেছিলেন। তাঁর স্বগতোক্তি অতি চমৎকার, এবং প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন, রাজবিদ্রোহীদের একজন নেতা। তিনি রাজা পালকের শিরশ্ছেদ করেন এবং চারুদত্তকে মশান থেকে উদ্ধার করেন।

রাজশ্যালক শকারের মোসাহেব বিট ছিলেন একটি অতিশিক্ষিত এবং অতিভদ্র লোক। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক শকারকে একজায়গায় বলেছেন পশুর নব অবতার। এবং এ পশুর দুষ্টস্বভাব ও খলতার পরিচয় পেয়ে রাজবিদ্রোহীদের দলে গিয়ে যোগ দেন। বিট কাব্য এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এ নাটকের বিদূষকও ভাসের অবিমারক। নাটকের বিদূষকের অনুরূপ; অর্থাৎ ঘরে নর্মসচিব এবং যুদ্ধে অগ্রগণ্য যোদ্ধা। এই সব লোক কখনো চারিত্র্যভ্রষ্ট হয় নি। সুতরাং পূর্বে যে বলা হয়েছে এ নাটকে নীতির প্রচার করা হয়েছে, সেকথা সত্য। খলস্বভাব হচ্ছে শকারের স্বভাব।

আমি আগে বলেছি যে, মৃচ্ছকটিক নাটক কালিদাসের পূর্বে ছিল না; কারণ শূদ্রক বলে যুগপৎ রাজা ও কবি কোনকালে কেউ ছিল না। কালিদাস তাঁর প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে বলেচেন যে, তিনি ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রদের মত প্রথিতযশ নাট্যকার ন'ন। সৌমিল্ল ও কবিপুত্রদের গ্রন্থ সব লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ১৯১২ সালে ভাসের গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে দরিদ্র চারুদত্ত নামক একটি নাটকের মোটে চার অঙ্ক পাওয়া গেছে; বাকি ছয় অঙ্ক পাওয়া যায় নি। আমার বিশ্বাস দরিদ্র চারুদত্ত আগাগোড়া ভাসের লেখা। এবং আর কোন চোরকবি সে খণ্ডিত অংশ কিঞ্চিৎ অদলবদল করে' এবং তার নাম মৃচ্ছকটিক দিয়ে নিজের রচনা বলে' চালিয়েছেন।

ভাসের তারিখ ৩০০ খৃঃ; কালিদাসের তারিখ তার শ'খানেক বৎসর পর। Keithএর মতে ইতিমধ্যে দরিদ্র চারুদত্তের লুপ্ত ছ'অঙ্ক কোন অজ্ঞাতকুলশীল কবি লিখেছেন, এবং পূরা নাটকখানির নাম দিয়েছেন মৃচ্ছকটিক। আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি।

আমার মতে মৃচ্ছকটিকের বর্তমান রূপ কোন চোরকবি দিয়েছেন খুব সম্ভবত নবম শতাব্দীতে। Keithএর অনুমান লাফিয়ে চলে। পাঁচ ছয় শ' বৎসর তিনি একলম্ফে উত্তীর্ণ হ'ন।

সে যাই হোক্, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ হচ্ছে বাঙ্গলা ভাষায় মৃচ্ছকটিকের একমাত্র অনুবাদ। এ নাটকের লেখক কে, ও কোন্ সময়ে লেখা হয়েছে, সে বিষয় তিনি মাথা ঘামান নি, এবং তার কোন বিচারও করেন নি। তিনি মৃচ্ছকটিক যে আকারে পেয়েছেন, তারই অনুবাদ করেছেন।

ভাস একজন মহাকবি ছিলেন। এবং দরিদ্র চারুদত্ত কিঞ্চিৎ অদলবদল করলেও সেটি একটি উৎকৃষ্ট নাটক। অতএব তার বাঙ্গলা অনুবাদ আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। আমি পূর্বে একটি ইংরিজী প্রবন্ধে বাণপতি শাস্ত্রীকে অনুরোধ করি যেন তিনি সমগ্র দরিদ্র চারুদত্ত অনুসন্ধান করে না বের করবার চেষ্টা করেন। আমার আশা আছে একদিন না একদিন সে মূল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হবে।

১৩৫০ ?

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

সাহিত্যিকের বড় পরিচয় তাঁর সাহিত্যে। এবং এমন সাহিত্যিক অনেক আছেন সেই পরিচয় যাঁদের একমাত্র পরিচয়। তাঁদের অন্য পরিচয়ে মন আকৃষ্ট কি প্রসন্ন হয় না। মনের যে বিশেষ গড়নে ভাব ও চিন্তার সঞ্চয় প্রকাশের আবেগে সাহিত্যের রূপ নেয়, সে মনের ছাপ এঁদের জীবনে আর কোথাও গভীর নয়, কথায় কাজে চরিত্রে। তাঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির যোগ অতি নিগূঢ়, দৃষ্টির অগোচর। আবার এমন সাহিত্যিক আছেন মনের যে আলোতে তাঁদের সাহিত্যের প্রকাশ তার রঙে তাঁদের চরিত্রের নানাদিক রঙীন। তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিত্বের সংগতি পরিচয়-মাত্র চোখে পড়ে। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই শেষের শ্রেণীর সাহিত্যিক।

প্রমথবাবুকে প্রথম দেখি ১৯০৫ সালে; বাংলা জমিদার-সভার তখনকার দিনের পার্ক স্ট্রীটের আপিস-বাড়িতে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে স্বদেশী যুগের ফুলারি অভিযান আরম্ভ হয়েছে। রংপুর ও বরিশালে সরকারি স্কুলের ছেলেরা স্কুল ছেড়ে বের হয়েছে। ছেলেদের জন্য সরকারি-শিক্ষা-নিরপেক্ষ জাতীয় শিক্ষা ও বিদ্যালয় গড়ে তোলার আন্দোলন চলছে। সেই উপলক্ষে পরামর্শসভা। বাংলা দেশের জ্ঞানে, গুণে, ধনে, রাষ্ট্রব্যাপারে নেতৃস্থানীয়দের প্রায় সকলেই উপস্থিত। আমি তখন এম্-এ ক্লাশের ছাত্র। আমাদের বেশ একটি বড় দল সেখানে হাজির। কি একটা মতবিরোধের ব্যাপারে একজন যুবক উঠে বললেন, 'আমি পদ্মাপারের লোক, আমার মত অন্যরকম।' পরামর্শসভাটি বয়োবৃদ্ধ নেতাদের সভা, কিন্তু দেখলেম এই যুবকটিকে সবাই একটু সমীহ করছেন। পরিচয় শুনলেম নবীন ব্যারিস্টার, এবং সেদিনের বড় পরিচয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ছোট ভাই। প্রশস্ত কপাল, দীর্ঘ উন্নত নাসা, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি— প্রমথবাবুর সেই যুবক বয়সের চেহারা, আর তাঁর ঐ কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

দ্বিতীয়বার প্রমথবাবুকে দেখি এই জাতীয়-শিক্ষা সম্পর্কেই। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ মফস্বলে জাতীয় বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় কলেজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। তার আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের এক সভা। কলেজে সাহিত্যবিভাগের উচ্চ শ্রেণীর জন্য বেদ থেকে কিছু অংশ পাঠ্য করার প্রস্তাব ছিল। একজন আপত্তি তুললেন, ক্লাশে শূদ্র ছেলেও অনেক থাকবে, বেদ কি ক'রে পড়ানো হ'তে পারে। যিনি আপত্তি করলেন তিনি ব্রাহ্মণ নন, চলতি জাত হিসাবে শূদ্র। প্রমথবাবু রসিকতা ক'রে বললেন, 'ও সব নিয়ম আপনার পূর্বপুরুষেরা করেন নি, আমাদের পূর্বপুরুষেরাই করেছিলেন; তখনও আপনারা মেনে চলেছিলেন, এখনও নূতন নিয়ম মেনেই চলবেন।' হেসেই বললেন, কিন্তু সে হাসির আলো ইলেক্‌ট্রিক স্পার্কের আলো।

এর পর প্রমথবাবুকে দেখি অনেক বছর পরে, আর তখন থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আরম্ভ।

'সবুজপত্র' যখন প্রকাশ আরম্ভ হ'ল তখন আমি উত্তর-বাংলার এক শহরে ওকালতিতে মাথা গলাবার চেষ্টা করছি। এ মাসিক-পত্র মনকে খুবই নাড়া দিল। "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" ব'লে সম্পাদকের

'মুখপত্রের' চিন্তা ও ভাষার সংযত কঠিন ঔজ্জ্বল্যে চমক লাগল ; মনে হ'ল এ জিনিস নূতন। মন সাড়া দিয়ে উঠল। কয়েক মাস পরে প্রথম-মহাযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে মফস্বল ছেড়ে কলকাতায় এলাম উচ্চ আদালতে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য। ক্রমে সবুজপত্রের প্রথম যুগ অনেকটা কেটে এল ; রবীন্দ্রনাথ যে যুগকে বলেছেন তিনি আর সম্পাদক দুজনে লগি ঠেলে ওকে চালিয়ে নেবার যুগ। দু-একজন নূতন লেখক দেখা দিলেন। এই নূতন লেখকসৃষ্টি উপলক্ষেই প্রমথবাবুকে কেন্দ্র ক'রে একটি সাহিত্য-মজলিশ গ'ড়ে উঠল, তাঁর ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ীতে।' যার স্মৃতি তাতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মনে মরণান্ত উজ্জ্বল থাকবে। আমার আত্মীয় কিরণশঙ্কর রায়ের প্রথম থেকেই সেখানে যাতায়াত ছিল। তিনি একদিন সঙ্গে ক'রে আমাকে এই মজলিশে নিয়ে গেলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় মজলিশ বসত। দেখলেম মজলিশের অনেক সভ্য বয়সে তরুণ ; কারও কলেজ-জীবন সদ্য শেষ হয়েছে, কারও তখনও হয়নি। আলোচনা চলেছে নানা বিষয়ে, যার ধরনটা হালকা, বিষয়বস্তু হালকা নয়। মনে আছে সেদিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল রোমান আইন। প্রমথবাবু তখন ইউনিভার্সিটি ল কলেজে ছেলেদের রোমান আইন পড়াচ্ছেন। এবং সেই উপলক্ষে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় রোমান আইনের অনেক বই পড়ছেন। বুঝলেম, রোমান আইনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, আর তার প্রতি পর্বে রোমান-আইন-কর্তাদের বুদ্ধির সম্যক দৃষ্টি ও কৌশল তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছে। মজলিশের সভ্যদের অবশ্য রোমান আইন কিছু জানা ছিল না, কিন্তু আলোচনার তাতে কোনও ব্যাঘাত হয়নি। রোমান আইনের যে সব কথার আলোচনা প্রমথবাবু তুলছিলেন মানুষের সমাজের তা চিরন্তন সমস্যার চিরন্তন সমাধানের চেষ্টা। তারুণ্যের উৎসাহ ও সাহসে এবং মুখস্থবিদ্যার ভারহীন বুদ্ধিতে তরুণ সভ্যেরা আলোচনাটা বেশ চালিয়ে নিলেন।

এই মজলিশটি ছিল সাহিত্যিক মনের রসায়ন। বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্যের রচনারীতি স্বভাবত এখানে প্রায়ই আলোচনা হ'ত। কিন্তু আলোচ্য বস্তুর তা ছিল অংশমাত্র। দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দেশী বিদেশী রাষ্ট্রব্যাপার কিছুই বাদ যেত না। সব বিষয়ের অল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞ দু-একজন ক'রে মজলিশে ছিলেন। তবে সব আলোচনায় সকলেই যোগ দিতেন, এবং আলোচনার ধারা এমন ছিল অবিশেষজ্ঞের মন ও বুদ্ধি যাতে উৎসুক ও উন্মুখ হয়ে ওঠে। কোন্ বিষয়ে নূতন ভাল বই কি বেরিয়েছে সে খবর এখানে আদানপ্রদান হত, আর সে পুঁথি সংগ্রহ ক'রে পড়া ছিল অনেক মজলিশির অবশ্য কর্তব্য। বেশির ভাগ বইএর খবর প্রমথবাবুই দিতেন এবং তিনিই কিনতেন। তাঁর বই মজলিশিদের হাতে হাতে ফিরত। বাঙালি লেখকের মনের পুঁজি যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির লেখকদের মনের পুঁজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখকের মনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ— এটা ছিল মজলিশের অকথিত স্বীকৃতি। আর তার আয়োজন ও উপকরণের যোগান এখানে চলত। আলোচনার লক্ষ্য ছিল, এ সব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তার বোঝা না হয়ে ওঠে। বিনা বিচারে কোনও কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড় নামই থাক্ না কেন। 'বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তি'— তা সে বেদ সংস্কৃতেই লেখা হোক, কি ইংরেজি ফরাসি জর্মান ভাষাতেই লেখা হোক। বলা বাহুল্য বহু বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা, ও

যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা, এ দুটি ছিল প্রমথবাবুর মনের প্রতিচ্ছবি। মজলিশিদের অল্প-বিস্তর সমধর্মী মনে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একদিন দেশের প্রাচীন ভাবধারাকে যাচাই করেছিল পাশ্চাত্য ভাবের নূতন আলোতে। সবুজপত্রের যুগে প্রয়োজন হয়েছিল এই নূতন ভাবকে যাচাই করার। সে প্রয়োজন এখনও আছে। প্রমথবাবু আমাদের উৎসাহিত করতেন এই নূতন ভাব ও সাহিত্যকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাব ও সাহিত্যের আলোতে পরীক্ষা করতে। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে সভ্যতা সচল ও সৃষ্টিকুশল ছিল তার সঙ্গে প্রমথবাবুর মনের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর নিজের মন এই ঘনিষ্ঠতার দিকে আমাদের অনেকের মনকে অনুকূল করেছিল।

কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এ মজলিশে উপস্থিত হ'তেন। সে দিন ছিল মজলিশের উৎসবের দিন। রবীন্দ্রনাথ গান গাচ্ছেন, সঙ্গে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী সংগত করছেন এ ছবি মনের চোখে ফুটে উঠছে। জীবনস্মৃতির ভাণ্ডারে আনন্দের সঞ্চয়।

সবুজপত্রের প্রকাশ বন্ধ হ'ল। প্রমথবাবু ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে নূতন বাড়িতে গেলেন। সবুজপত্র আবার প্রকাশ হয়ে উঠে গেল। মজলিশের সভ্যেরা অনেকে কলকাতা ছেড়ে বাংলা ও ভারতবর্ষের নানা শহরে ছড়িয়ে পড়লেন। বছরের পর বছর সে মজলিশের রেশ টেনে কলকাতায় থাকলেম মোটের উপর দুজন— প্রমথবাবু আর আমি! এই দীর্ঘদিনের সাহচর্যে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল নিবিড়। সে সাহচর্য ও পরিচয় আমার জীবনের বড় সম্পদ।

অন্য পাঁচজনের মতই প্রমথবাবুর সাংসারিক জীবন অবশ্য ছিল। সে জীবনের সুখদুঃখের অনেক কথা তাঁর কাছে শুনেছি। প্রথম-যৌবন অবধি নানা শ্রেণীর বহু লোকের সঙ্গে তিনি মিশেছেন। আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা, বড় চাকুরে থেকে আরম্ভ ক'রে গাইয়ে-বাজিয়ে, ইস্কুলমাস্টার, গরিব কেরানি, তহশীলদারের মুহুরি পর্যন্ত। তাঁর নিজস্ব রসিকতায় এদের চেহারা-চরিত্র হাবভাব কথাবার্তার অনেক সরস বর্ণনা তিনি শুনিয়েছেন। এ অভিজ্ঞতার অনেক টুক্‌রো টাক্‌রা তাঁর ছোটগল্পগুলিতে ছড়ান আছে। কিন্তু তাঁর এ জীবন ছিল বাহ্য। অন্নময় ও প্রাণময় কোশের অন্তরে যে মনোময় কোশ, তিনি ছিলেন সেই লোকের অধিবাসী; সেখানেই তাঁর বাস্তুভিটা। ভাব, চিন্তা ও সাহিত্যের জীবনই ছিল তাঁর প্রকৃত জীবন। তাঁর কথায়, গল্পে, রসিকতায় এই জীবনের ছাপ সহজেই সর্বদা ফুটে উঠত। জ্ঞানের নানা কোঠায় নূতন চিন্তা কোথায় কি হচ্ছে, নূতন সত্যের কি আবিষ্কার হ'ল, নূতন সাহিত্য কি সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে তাঁর ছিল অতন্দ্র কৌতূহল। সুতরাং বই পড়াই ছিল তাঁর পেশা ও নেশা। এবং তার আলোচনাই ছিল তার আড্ডা ও আনন্দ। আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, বছরের পর বছর তাঁর যত কথা শুনেছি ও তাঁর সঙ্গে যত কথা বলেছি— এবং সে অনেক কথা— তার সিকিও এ আলোচনার বাইরে নয়। অতি অবান্তর কথাও অল্পক্ষণেই এদিকে মোড় নিত।

বুদ্ধির উজ্জ্বল সূর্যালোকে চিন্তার সুস্পষ্ট মূর্তি, ও ভাষার প্রসাদগুণে তার পরিচ্ছন্ন প্রকাশ যে সাহিত্যে সেই সাহিত্য ছিল প্রমথবাবুর প্রিয়। তাঁর নিজের রচনা বাংলা ভাষায় এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। যে রচনা তাঁর মনে হ'ত চিন্তার শৈথিল্যে অপরিণতবাচ্য, বা ভাষার জড়তায় অস্বচ্ছ প্রকাশ তাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এইজন্য অনেক নামকরা জর্মান লেখকের লেখার উপর তাঁর মন প্রসন্ন ছিল না; আর শ্রেষ্ঠ ফরাসি গদ্য লেখকদের লেখা তাঁর অতি প্রিয় ছিল। সেই কারণেই প্রাচীন

ভারতবর্ষের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের সূক্ষ্ম অথচ বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ধারা, এবং বিপুল শব্দসম্পদের প্রয়োগনৈপুণ্য এই প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি অসাধারণ শব্দকুশলী বাঙালি লেখককে মুগ্ধ করেছিল। প্রমথবাবু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এল্ ক্লাশে Private International Law পড়াচ্ছেন। এই বিষয়বস্তুটি Conflict of Laws নামেও পরিচিত; এবং ইংরেজি ভাষায় এ সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ঐ নাম। মেধাতিথির মনুভাষ্যে যেদিন এর চমৎকার প্রতিশব্দ 'ধর্মসংকট' কথাটি পেলেন তাঁর সেদিনের আনন্দ বেশ মনে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের মেধাতিথির ভাষ্যসমেত যে মনুসংহিতার পুঁথিটি তিনি ব্যবহার করতেন তার দুই খণ্ডের এক খণ্ড আমার কাছে আছে। কি যত্নের সঙ্গে তিনি এই সুবিস্তীর্ণ ভাষ্যটি পড়েছিলেন। তার চিহ্ন এর সর্বত্র। খবরটি ভয়ে ভয়ে লিখলেম। আশা করি বিশ্বভারতী এ বই আমার কাছে দাবি করবেন না। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে নামলেখা তাঁর একখানা বই— প্লাঙ্কের একখানি চটি পুঁথির ইংরেজি অনুবাদ— আমার হাতে এসেছিল। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে বই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। প্রমথবাবুর দুই আলমারি বই অনেকদিন আমার কাছে ছিল। যখন তিনি কলকাতায় থাকতেন না তখন এই বইগুলির মধ্যে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতেম।

মানুষের অনুভূতির যে একটা জগৎ আছে বুদ্ধির আলোতে যা স্পষ্ট দেখা যায় না, ভাষায় যার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সম্ভব নয়— প্রমথবাবু সে কথা ভালো ক'রেই জানতেন। কিন্তু সে জগতের আকর্ষণ প্রমথবাবুর মনে প্রবল ছিল না। অথবা সে আকর্ষণকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। ভাবের বিন্দুমাত্র আতিশয্য যেমন তাঁর লেখায় নেই, কথায়ও তেমনি কখনও তা প্রকাশ হ'ত না। এ কি তাঁর ক্লাসিকাল আর্যমনের সহজ অভিব্যক্তি, না, বাঙালির স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা থেকে মুক্তির চেষ্টায় নিজের মনকে বিশেষ গড়নে গ'ড়ে তুলেছিলেন? ভারতচন্দ্রের এক স্মৃতিসভায় তিনি তাঁর প্রিয় কবির যে জীবনকথা পড়েছিলেন তাতে তাঁর মনের ভাবের দিকটা একটু উন্মুক্ত হয়েছে। তাঁর লেখার কোনও গুণ আবৃত না ক'রে এ রচনাটি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপূর্ব মৃদু আলোতে উদ্ভাসিত। এক-একসময় মনে হয়, ভাবের মুখের রাশ তিনি একটু বেশি জোরে টেনে রেখেছিলেন।

দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুরবস্থা প্রমথবাবুর মনকে সকল সময়ে নাড়া দিয়েছে। তাঁর প্রথম-বয়সের 'তেল নুন লকড়ি' থেকে আরম্ভ ক'রে 'রায়তের কথা', 'দু-ইয়ার্কি' ও নানা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের উপর বহু টীকাটীপ্পনিতে তার প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে। রসিকতা কি বিদ্রূপের আবরণ তাঁর মনের উদ্বেগকে আড়াল করতে পারে নি। তাঁর মৃত্যুর পর পুরো এক বছর অতীত হয় নি। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট, ও ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষের সমস্যাগুলির আলোচনা তাঁর সঙ্গে না করতে পেরে মনের একদিক শূন্য মনে হচ্ছে।

শ্রাবণ, ১৩৫৪

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ইতালীয় তেরজা রিমা ছন্দে রচিত "কৈফিয়ৎ" কবিতায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবি হওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"যৌবনে বাসনা ছিল, দুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে,—
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি।
ফলাতে সঙ্কল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে,
আকাশের নীল আর অরুণের লাল,—
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে।
দলিত অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিল না বেশী অন্তরের ঘটে—
এ কবি ছিল না কভু বাণীর দুলাল।
তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে।
হেথায় হয় না কভু গুরুর আকাল।
পড়িনু কত-না-জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল।
সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ।
বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে
গড়িনু জ্ঞানেতে-ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে।
নেত্রপথে এসে দুটি স্বুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়।
বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি,—
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে।

ফল কথা, কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি।
পূজাপাঠ ছেড়ে তাই বাঁধিয়া কোমর,
সমাজের কর্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,—
সুরু হল সেই হতে সংসার-সমর।
পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিল না স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ।
কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, জানে হৃষীকেশ।
কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে।
এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—
হইল মনের দফা প্রায়শ নিকেশ।
দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক।
এসব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,
না জানি কখন আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর।
হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান।
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।"

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা এই দ্বিতীয় যৌবনের কবিতা। এই দ্বিতীয় যৌবনও তাঁর দীর্ঘ দিন ছিল না। বোধ হয় সাত আট বছরের বেশী নয়। তার পরে তাঁর হাতে আর কবিতা হয় নি। কেন হয় নি তার কৈফিয়ৎ তিনি দিয়ে গেছেন ইতস্তত ছড়ানো ভাবে। "কবিতা লেখা" নামে তাঁর একটি কবিতা আছে, সেটি তাঁর দ্বিতীয় কৈফিয়তের কাজ করবে।

"এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা
কবিরা পায় না নিজের দেখা।
ঢাকা চাপা দিয়ে মনটি রাখি,
নিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাঁকি।
গলা চেপে গায় প্রেমের গান,
ভয়ে ভয়ে ছাড়ে প্রাণের তান।
ভাব-মদে হলে নয়ন লাল,
দশে মিলে দেয় দুচাখো গাল।
সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ি
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ি।
কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী-ব্রত।
বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে।"

এই কথাটি আর একটু স্পষ্ট হয়েছে "প্রেমের খেয়াল" কবিতায়।

"প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখি নি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখি নি তান।
কত না শুনেছি প্রণয় কাহিনী
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহি নি
কাঁপানো গান।"

বস্তুত বয়স হলে মানুষ নিজেই নিজের গলা চেপে ধরে সুরুচি সুনীতির ভয়ে। সমাজ তো চেপে ধরেই। সেইজন্যে প্রথম যৌবনেই সুরুচি সুনীতির শাসন উপেক্ষা করে গলা ছেড়ে গাইতে হয় "কাঁপানো গান"। যাঁরা প্রথম যৌবনে ও-কাজ করেন নি তাঁরা দ্বিতীয় যৌবনে পারেন না। যদি কেউ পারেন তো তিনি ব্যতিক্রম। আমাদের কবি গলা চেপে গাইতে গিয়ে দেখলেন সে যেন সোনার খাঁচার পাখীর গান। এতে তাঁর আন্তরিক আপত্তি। ঐ কবিতায় আছে—

"প্রেমের খেয়াল সহজে মানে না
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম মানে না
ফুলের বান।
প্রেম নাহি মানে আচার বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখীর গান।
প্রেম জানে নাকো দুবেলা মিছার
করিতে ভান।"

দুবেলা মিছার ভান করার চেয়ে না লেখাই ভালো। বোধ হয় সেই কারণে তাঁর প্রেমের কবিতা আপনা আপনি থেমে গেল। এই প্রসঙ্গে "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয়কে লেখা তাঁর "পত্র" কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

"কল্পনা কম্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে।

ভোঁতা হল পঞ্চ বাণ,　　প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।
সমাজের পোষা পাখী,　　সমাজ খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে।"

আবার সেই সমাজের কথাই উঠল। সমাজের উপর কবিমাত্রেরই অভিমান থাকে। এই কবিরও ছিল। এবং কিছু বেশী পরিমাণেই ছিল। সেইজন্যে তিনি সমাজকে সবুজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সমাজকে সবুজ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার ও গল্পলেখকরূপে আপনাকে আবিষ্কার করলেন। নিজের যা শ্রেষ্ঠ তার সন্ধান পেলেন। কবিতা লেখা আর হল না। অথচ ক্ষমতা ও পাথেয় তাঁর ছিল।

ক্ষমতা যে ছিল তার প্রমাণ উপরের উদ্ধৃতিগুলি। ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন বলে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল সনেট। অথচ সনেটও তিনি ষাট সত্তরটির বেশী লেখেন নি, অন্তত ছাপেন নি। পঞ্চাশটি সনেট নিয়ে "সনেট পঞ্চাশৎ"। আরো কয়েকটি সনেট, তেরজা রিমা, তেপাটি বা ট্রায়োলেট, পয়ার, ত্রিপদী, ছড়া প্রভৃতি নিয়ে "পদচারণ"। দ্বিতীয় পুস্তিকাটি আকারে বড় না হলেও প্রকারে বিচিত্র। চেষ্টা করলে এই কবি বিভিন্ন রূপকর্মে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করতেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টার ক্ষেত্র হল চলতি ভাষায় গদ্য এবং সাধনার লক্ষ্য হল ছোট গল্প ও প্রবন্ধ। তাই তিনি ক্ষমতার নমুনা দিয়েই পদ্যরচনায় ক্ষান্তি দিলেন। হয়তো তাঁর মনের কোণে এমন কোনো চিন্তা ছিল যে, কবিতা আমি যতই লিখি না কেন রবীন্দ্রনাথের তুলনায় মাইনর পোয়েট হয়ে থাকতে হবে। ছোটগল্পে ও প্রবন্ধে আমি মেজর। সুতরাং ছোটগল্প ও প্রবন্ধই আমার ক্ষমতার ক্ষেত্র।

কিন্তু সনেট লিখেই তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন আমার এ অনুমান অযথা নয়। "কৈফিয়ৎ" কবিতাটির শেষাংশ উদ্ধার করা যাক—

"এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,　　এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,　　কবিতা না হতে পারে কিন্তু পাকা পদ্য,—
বর্ণ স্বর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।　　প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ"।
আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ　　অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,　　রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।　　বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ।"

পাথেয় তাঁর ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় "চার ইয়ারী কথা"। প্রেমের উপলব্ধি রসের উপলব্ধি তাঁর জীবনে ঘটেছিল, এবং সাংসারিক জীবনের অকৃতকার্যতাকে মধুর করেছিল। এর চিহ্ন রয়ে গেছে এখানে ওখানে এক একটি টুকরায়। যেমন,—

"নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,　　হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—　　হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার।" —ভুল

ক্ষমতা ছিল, পাথেয় ছিল, অথচ কোনোটির সম্যক্ ব্যবহার হল না, কাব্যসাধনা অর্ধপথেই থেমে গেল। মন চলে গেল ছোটগল্পের রাজ্যে, প্রবন্ধের রণক্ষেত্রে। হয়তো ভালোই হল। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির চেয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারের, প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখকের মর্যাদা বেশী। তিনি তাঁর

নিজের পথ নির্ভুলভাবে বেছে নিয়েছিলেন। কার জীবন কেমন করে সার্থক হয় গোড়ার দিকে সে নিজেই তা জানে না, আঁধারে ঢিল ছোঁড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রও তো প্রথম বয়সে কবিতা লিখতেন। অভ্যাস্ রাখলে হেম-নবীনকে অতিক্রম করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে হেরে যেতেন। কবিতায় ক্ষান্তি দিয়ে বঙ্কিম ভুল করেন নি, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পর রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাস রচনায় উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। পীড়াপীড়ি না করলে তিনি "যোগাযোগ" আরম্ভ করতেন কি না সন্দেহ। আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষ করতে বল পেলেন না। এই রকমই হয়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা কেন তাঁর প্রবন্ধ ও গল্পের তুলনায় নিষ্প্রভ, এর যথার্থ উত্তর— গল্প ও প্রবন্ধ তার প্রভা হরণ করেছে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের। অথচ কে একথা অস্বীকার করবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা উচ্চকোটির ছিল ! বন্দেমাতরম্ তার সাক্ষী।

তেমন সাক্ষী প্রমথ চৌধুরীরও আছে। যদিও তেমন প্রসিদ্ধ নয়, প্রসিদ্ধ হবার যোগ্যতা রাখে না। উদ্ধৃতির প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না বলে একটিমাত্র দিচ্ছি। এটি যে তাঁর শ্রেষ্ঠ সনেট তা নয়। হতে পারে এটি তাঁর বিশিষ্ট সনেট। আর কারো হাতে এমনটি হত না।

"কখনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমন্তের রাত্রিহেন থাকে গো জড়িয়ে,
— যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ॥
বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারাণো বর্ণ, লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জ্বেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ॥
কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিঃশ্বাস।
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস॥
বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী,
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবাগাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন কামিনী॥" —রূপক

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা কি টিকবে ? বলা যায় না। কবিতার ইতিহাসে দেখা যায় মহাকাব্যের ভরাডুবি ঘটছে, ভেসে থাকছে ছড়া কিম্বা পদাবলী জাতীয় খণ্ড কবিতা। তিনি যাকে বলতেন চুটকি। টলস্টয় ছিলেন চুটকির পক্ষপাতী। সব যাবে, চুটকি থাকবে, কেন না মানুষের পক্ষে চুটকি তৈরী করা যেমন সহজ মনে রাখাও তেমনই। মানুষের মন যাকে রাখে সেই থাকে। চুটকির উপর আমাদের কবির কতখানি ভরসা ছিল তার প্রমাণ নীচে দিলুম—

"আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত,
অন্তরে সঞ্চিত করি আঁধার আলোক,
প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক।" —বিশ্বরূপ

এটা সংস্কৃতকবিদেরও উচ্চাভিলাষ ছিল।

"আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার,
চুটকিতে রাখি সব আশা ভালবাসা।
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার,—
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা ভাসা।" —গজল

এটি এপিটাফের কাজ করে।

পরিশেষে, আর একটি প্রশ্ন। তাঁর কবিতার উপর কার কার প্রভাব পড়েছে ? আমার উত্তর— ইতালীয় কবি পেত্রার্কার, পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের, ভারতীয় কবি ভাসের, বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্রের। "কৈফিয়ৎ" কবিতায় রবিপূজার কথা আছে। কিন্তু ওটা যেন দক্ষিণমেরুর উপর উত্তরমেরুর প্রভাব। বিপরীতের উপর বিপরীতের।

প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থসূচী

জন্ম ৭ অগস্ট ১৮৬৮। মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

তেল নুন লকড়ি। ১৯০৬?। পৃ ৪৮

১৩১২ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। পরে 'নানা-কথা' পুস্তকের অন্তর্গত।

সনেট-পঞ্চাশৎ। ফাল্গুন ১৯১৩। [২৫ মার্চ ১৯১৩]। পৃ ৫০

চার-ইয়ারী-কথা। জানুয়ারি ১৯১৬। [১১ অগস্ট ১৯১৬]। পৃ ৯৭। গল্প।

The Story of Bengalee Literature (Paper read at the Summer Meeting at Darjeeling on the 14th of June 1917). 1917. [15 August 1917]. Pp 27.

বীরবলের হালখাতা। [৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭]। পৃ ২৭৮। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ হালখাতা; কথার কথা; আমরা ও তোমরা; খেয়াল খাতা; মলাট-সমালোচনা; সাহিত্যে চাবুক; তর্জ্জমা; বইয়ের ব্যবসা; বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ; নোবেল প্রাইজ; সবুজ পত্র; বীরবলের চিঠি; "যৌবনে দাও রাজটীকা"; ইতিমধ্যে; বর্ষার কথা; পত্র; কৈফিয়ৎ; নারীর পত্র; নারীর পত্রের উত্তর; চুটকি; সাহিত্যে খেলা; শিক্ষার নব আদর্শ; কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল; পত্র; প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস; টীকা ও টিপ্পনি; শিশু-সাহিত্য; সুরের কথা; রূপের কথা; ফাল্গুন।

এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্দটি প্রবন্ধ লইয়া বীরবলের হালখাতার দ্বিতীয় সংস্করণ ("প্রথম পর্ব্ব") ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়।

নানা-কথা। [১৩ মে ১৯১৯]। পৃ ৩৬২। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ তেল, নুন, লকড়ি; বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাঙলা ওরফে সাধুভাষা; সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা; বাঙলা ব্যাকরণ; সনেট কেন চতুর্দ্দশপদী?; ব্রাহ্মণ মহাসভা; সবুজ পত্রের মুখপত্র; সাহিত্য-সম্মিলন; ভারতবর্ষের ঐক্য; ইউরোপের কুরুক্ষেত্র; বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান যুদ্ধ; নূতন ও পুরাতন; বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি? অভিভাষণ; বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য; অলঙ্কারের সূত্রপাত; আর্য্যধর্ম্মের সহিত বাহ্যধর্ম্মের যোগাযোগ; আর্য্যসভ্যতার সঙ্গে বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ; ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়; সালতামামি; প্রাণের কথা।

পদ-চারণ। ১৯১৯। [১২ জুলাই ১৯২০]। পৃ ৮৪। কাব্যগ্রন্থ।

আহুতি। ১৯১৯। পৃ ১৯৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী॥ আহুতি; বড়বাবুর বড়দিন; একটি সাদা গল্প; ফরমায়েসি গল্প; রাম ও শ্যাম।

আমাদের শিক্ষা। [২৫ অগস্ট ১৯২০]। পৃ ১০৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ আমাদের শিক্ষা; বাংলার ভবিষ্যৎ; বই পড়া; আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা; নব-বিদ্যালয় ১-৩।

দু-ইয়ারকি। ২৯ জুলাই ১৯২০। [১৯ মার্চ ১৯২১]। পৃ ১৭৫। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ দু-ইয়ারকি; দেশের কথা ১-২; রায়তের কথা, নবযুগ।

বীরবলের টিপ্পনী। ১৩২৮। [২ অগস্ট ১৯২১]। পৃ ১২৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ কংগ্রেসের দলাদলি; "এত্তো বড়" কিম্বা "কিছু নয়"; সাহিত্যে বনাম পলিটিক্স; টীকা ও টিপ্পনী; পত্র; গত কংগ্রেস। পরিশিষ্ট॥ গুলিখোরের আবেদন-পত্র; গর্জ্জন-সরস্বতী সংবাদ।

রায়তের কথা। [১০ অগস্ট ১৯২৬]। পৃ ১।৶+৮০। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; টীকা, প্রমথ চৌধুরী; রায়তের কথা ('তু-ইয়ারকি' হইতে); রঙ্গপুরে উত্তর-বঙ্গ রায়ত কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ; পত্র ('বীরবলের টিপ্পনী' হইতে)।

"অভিভাষণ" ও "পত্র"-বর্জিত এই পুস্তিকার একটি সংশোধিত সংস্করণ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় ১৩৫১ সালের বৈশাখ সংখ্যারূপে [১৬ মে ১৯৪৪] প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী। [২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০]। পৃ ৩১১।

সূচী॥ কাব্য— সনেট পঞ্চাশৎ; পদচারণ। গল্প— চার-ইয়ারী-কথা, আহুতি (সম্পূর্ণ); আরও আটটি গল্প ('নীললোহিত' ও 'নীললোহিতের আদিকথা'য় সংকলিত)। প্রবন্ধ— 'তু-ইয়ারকি' (সম্পূর্ণ); 'বীরবলের হালখাতা', 'নানা কথা' ও 'বীরবলের টিপ্পনী', প্রত্যেকটি আংশিক; কথা-সাহিত্য নামে একটি প্রবন্ধ।

নানা চর্চ্চা। ১ মার্চ ১৯৩২। [১ জুন ১৯৩২]। পৃ ২৭৬। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি; অমু-হিন্দুস্থান; মহাভারত ও গীতা; বৌদ্ধধর্ম্ম; হর্ষ-চরিত; পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ; বীরবল; ভারতচন্দ্র; রামমোহন রায়; বাঙালী পেট্রিয়টিজ্‌ম্; পূর্ব্ব ও পশ্চিম; য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ?; ভারতবর্ষ সভ্য কি না ?; গোল-টেবিলের বৈঠক।

নীললোহিত। পৃ ১৩১। গল্পসংগ্রহ। ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী॥ নীললোহিত; নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা; নীললোহিতের স্বয়ম্বর; অদৃষ্ট; সম্পাদক ও বন্ধু; গল্প লেখা; পূজার বলি; সহযাত্রী; ঝাঁপান খেলা; দিদিমার গল্প; ভূতের গল্প।

নীললোহিতের আদিপ্রেম পৃ ১০৫। গল্পসংগ্রহ। ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী॥ নীললোহিতের আদিপ্রেম; ট্রাজেডির সূত্রপাত; অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি; অ্যাডভেঞ্চার — স্থলে; অ্যাডভেঞ্চার — জলে; ভাববার কথা।

ঘরে বাইরে। ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬। [২৪ নভেম্বর ১৯৩৬]। পৃ ১২৭। প্রবন্ধসংগ্রহ। নয়টি "প্রস্তাব" আছে।

অভিভাষণ। বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, চন্দননগর, ৯ ফাল্গুন ১৩৪৩

সাহিত্যশাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ ব্যতীত ইতিহাস ও দর্শন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণও এই পুস্তিকায় মুদ্রিত আছে।

ঘোষালের ত্রিকথা। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। পৃ ৯৩। গল্পসংগ্রহ।

সূচী॥ ফরমায়েসি গল্প ('আহুতি' হইতে); ঘোষালের হেঁয়ালি; বীণাবাই।

সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, কৃষ্ণনগর, ২৯ মাঘ ১৩৪৪। পৃ ১৫

অণুকথা সপ্তক। ১৩৪৬। [১ জুলাই ১৯৩৯]। পৃ ৫৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী ॥ মন্ত্রশক্তি ; যথ ; ঝোট্টন ও লোট্টন ; মেরি ক্রিস্‌মাস ; ফার্স্টক্লাশ ভূত ; স্বল্প-গল্প ; প্রগতি রহস্য।

প্রাচীন হিন্দুস্থান। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ [৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০]। পৃ ১১৭। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ ভূবৃত্তান্ত ('নানা চর্চা' হইতে : ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি ও অনু-হিন্দুস্থান প্রবন্ধদ্বয়ের সংশোধিত রূপ) ; ইতিবৃত্তান্ত।

গল্পসংগ্রহ। ২০ ভাদ্র ১৩৪৮। [৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১]। পৃ ৫০৭

গ্রন্থাকারে বা সাময়িক পত্রে এ যাবৎকাল প্রকাশিত লেখকের সমস্ত গল্পের সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত। এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পরও চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি গল্প লিখিয়াছিলেন।

Tales of Four Friends. June 1944. Pp 119.

চার-ইয়ারী-কথার শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ডিসেম্বর ১৯৪৪। পৃ ১৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা।

হিন্দু সংগীত। বৈশাখ ১৩৫২। [১৪ জুন ১৯৪৫]। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ হিন্দুসংগীত ; সুরের কথা ('বীরবলের হালখাতা' হইতে) ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখিত সংগীতপরিচয়।

আত্মকথা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩। পৃ ১১৪

১৮৯৩ সালে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত স্মৃতিকথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী কালের আত্মকথার পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর নিকট রক্ষিত আছে।

পত্রাবলী। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। ১ অক্টোবর ১৯৩১

ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বীরবল, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখিত কয়েকটি পত্রালোচনা প্রমথ চৌধুরী এই গ্রন্থে স্বীয় 'মুখ-পত্র' সহ একত্র প্রকাশ করেন। উক্ত ভূমিকা ব্যতীত চৌধুরী মহাশয়ের তিনটি রচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে— বীরবলের পত্র ১-২ ; ফ্রান্সের নব মনোভাব।

বারোয়ারি। ১৯২১। [২ মে ১৯২১]

এই উপন্যাস বারোজন সাহিত্যিকের রচনা— 'ভারতী মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি'। প্রমথ চৌধুরী ৩৩-৩৬ পরিচ্ছেদ লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত 'ছোটগল্প' প্রতি সংখ্যায় সাধারণত একটি গল্প (অন্যান্য সংবাদ ও মন্তব্যসহ) পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইত। উহার নিম্নোক্ত তিনটি সংখ্যা প্রমথ চৌধুরীর পুস্তকতালিকায় স্থান পাইতে পারে।

সেকালের গল্প। ১ আষাঢ় ১৩৩৯

নীললোহিতের আদি প্রেম। ৬ ফাল্গুন ১৩৩৯

ট্রাজেডির সূত্রপাত। ৩১ ভাদ্র ১৩৪০

দুই না এক। বৈশাখ ১৩৫১। এটি শ্রীপ্রতিভা বসু সম্পাদিত ছোটোগল্প গ্রন্থমালার পঞ্চম সংখ্যা, থিয়োফিল গোতিয়ের গল্পের অনুবাদ, ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত; ইহাও প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প-পুস্তিকা-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর 'গল্পসংগ্রহে' এটি স্থান পায় নাই, এই পুস্তিকার প্রকাশক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদ-গল্প 'গল্পসংগ্রহে'র পরিধিভুক্ত নহে; প্রমথ চৌধুরী আরও কয়েকটি দেশী ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেগুলিও গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রকাশ-কাল মুদ্রিত নাই। ভূমিকার তারিখ, প্রেসের নির্দেশচিহ্ন ও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখ ধরিয়া সাজানো হইয়াছে।— বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখগুলি (বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত) শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীহলধর হালদার

গান ও স্বরলিপি

কথা: প্রমথ চৌধুরী **সুর ও স্বরলিপি:** ইন্দিরা দেবী

[প্রমথ চৌধুরী সাধারণ অর্থে গানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তবে তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে, "সংগীতের প্রতি আমার আবাল্য অনুরাগ" ছিল; "বাল্যকালে আমার কান তৈরী হয়েছিল···ওস্তাদী ঢঙের গানে"; "আমি অল্পবয়স থেকেই গান গাইতুম···কানে যে সুর আসত গলায় তা বদলি হত।" সবুজপত্রে যখন সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলেছিল তখন স্বনামে ও 'বীরবল' ছদ্মনামে তাতে যোগ দিয়েছিলেন, সেই সময়কার দুটি লেখা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় 'হিন্দুসংগীত' নামে ছাপা হয়েছে। দু-একটি গানও তিনি রচনা করেছিলেন; সেকথা সর্বজনবিদিত নয় বলে পুরাতন আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা থেকে স্বরলিপিসহ একটি গান পুনর্মুদ্রিত করা গেল।— সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা]

মেঘমল্লার। তালফেরতা

আজি সহসা বরষা এল বিমানচারী।
পরি ঘোর বেশ করি মুক্ত কেশ
ভরি শূন্য দেশ অতি হুংকারি॥
কত বিদ্যুদ্দাম করি ধূমধাম
এবে অবিরাম ধায় সারি সারি॥
এসে ঝাঁকে ঝাঁকে মেঘে বিশ্ব ঢাকে
ঘনগুরু ডাকে ঝরে নভবারি॥
বিনা আজি প্রিয়পতি বিরহব্যথিত মতি
কত সুন্দরী যুবতী ফেলে অশ্রুবারি॥
হেরি কেহ ঋতুরঙ্গ যাচি দূরপ্রিয়সঙ্গ
ঢাকি নীলবাসে অঙ্গ চলে অভিসারি॥

জ্ঞা জ্ঞা II { মা মা রা রা | সা সা ন্‌া সা | রা রা পা মপা | (-ধপা-মপা
আ জি (স হ সা ব | র ষা এ ল | বি র্মা ন চা ০ | ০ ০ ০ ০

জ্ঞা -া) } I -া পা পা পা I { [ণা ধণা ধা] মা -পা পা পা | -া পা পা পধা | মা -পা পা র্সা |
রী ০) ০ রী প রি (ঘো ০ ষ বে | ০ শ ক রি | মু ০ ক্ত কে |

| -া র্সা (র্সা [ ] সা) } I র্সা র্সা I র্সা-নর্রা র্সা ণা | -ধা পা পা পধা | মা-পা
০ শ "প রি") ভ রি শূ ০ ০ ন্য দে | ০ শ অ তি ০ | হু ০

মপা -ধপা | মজ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা II পা পধা I { মা-পা পা না | -া না না না |
ঙ্কা ০ ০ ০ | রি ০ "আ জি" ক ত | খি ০ ন্না দ্দা | ০ ম ক রি |

র্সা -া র্সা র্সনা | -র্সা র্সা না র্সা I র্রা -র্মা র্মা র্রা | -র্সা র্সা র্সা -া | নর্সা-র্রা র্সা ণা |
ধু ০ ম ধা | ০ ম এ বে অ ০ বি রা | ০ ম ধা য় | সা ০ ০ রি সা |

-ধা পা (পা পধা) } I পা পধা I [ণা ধণা ধা] মা-পা পা পা | -া পা পা পধা | মা -পা পা র্সা |
০ রি "কত" ০) এ সে ০ ঝাঁ ০ কে ঝাঁ | ০ কে মে ঘে | বি ০ শ্ব ঢা |

| -া র্সা ([ ] র্সা র্সা) } I র্সা র্সা I র্সা -নর্সর্রা সা ণা | -ধা পা পা পধা | মা পা মপা-ধপা |
| ০ কে "এ সে") ঘ ন গু ০ ০ রু ডা | ০ কে ঝ রে ০ | ন ভ ঝা ০ ০০ |

| জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা II ঝাঁপতাল II ।। { ন্‌া প্‌া | ন্‌া -া ন্‌া | সা সা | সন্‌া -সা সা I ন্‌া সা |
রি ০ "আ জি" (বি না | আ ০ জি | প্রি য় | প ০ তি বি র |

| রা -া রা | রসা রা | জ্ঞা -া জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞমা | রা -া রা | সা সা | সন্‌া-সা সা I
| হ্‌ ০ ব্য | থি ০ ত | ম ০ তি ক ত ০ | সু ০ ন্দ | রী যু | ব ০ ০ তী

I রা রা | মা -রা মা | গমা -পমা | পা -া -া } I { মা পা | ণপা -না না | র্সা র্সা |
ফে লে | অ ০ শ্রু | বা ০ ০ ০ | রি ০ ০) (হে রি | কে ০ হ | ঋ তু |

| র্সনা -র্সা র্সা I র্সনা র্সা | র্রাঃ-র্জ্ঞঃ র্সা | না র্সা | ণধা-ণা পা } I র্রা র্রা | র্রা -া র্মা |
| র ০ ০ ঙ্গ যা ০ চি | দূ ০ র | প্রি য় ০ | স ০ ০ ঙ্গ) ঢা কি | নী ০ ল |

| র্রা র্রা | র্সনা -র্সা র্সা I সা সা | রা -া রা | রসা -রা | জ্ঞা -া -া IIII
| বা সে | অ ০ ০ ঙ্গ চ লে | অ ০ ভি | সা ০ ০ | রি ০ ০

অলঙ্করণ

শ্রীআর্যকুমার সেন

একটা শুভসংবাদের দূত হইয়া পিতামহীর নিকট আসিয়াছিলাম। খবর অবশ্য তিনি ডাকঘর মারফৎ আগেও পাইয়াছিলেন, কিন্তু শুভসংবাদের পাত্র আমি স্বয়ং, আমি নিজে আসিয়া বলিলে সংবাদের মূল্য আরও বাড়িয়া যায়।

স্টেশন হইতে বাড়ি পর্যন্ত মাইলখানেক পথ হাঁটিয়াই আসিয়াছিলাম। ধূলিধূসর জুতাসম্বলিত চরণযুগল রোয়াকে সিঁড়ির উপর পড়িতেই ঠাকুরমা বাহিরে আসিলেন। নত হইয়া পদধূলি লইলাম। তিনি ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে আমার চিবুকে হাত দিয়া চুমা খাইলেন। তারপর বলিলেন, "আয় ভাই, ভেতরে এসে বোস।"

বাবা কলিকাতাবাসী হইলেও ঠাকুরমা গ্রামেই থাকিতেন। আমরা কালেভদ্রে বাড়ি আসিতাম, শান্ত বাড়ি নানাকণ্ঠের কলরবে মুখর হইয়া উঠিত।

এবারে আসিয়াছিলাম একাই। পিতামহীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে।

শুভকর্মের অবশ্য বিলম্ব আছে। সবে আশ্বিনের আরম্ভ, অপেক্ষা করিতে হইবে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত।

স্নানাহার সমাধা করিতে দুপুর পার হইয়া গেল। এতক্ষণ ঠাকুরমা একটিও প্রশ্ন করেন নাই। কিন্তু একটা বিরাট কৌতূহল যে মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, সেটা এখন বুঝিলাম। কাছে বসাইয়া কহিলেন, "তাহ'লে ভাইটির আমার বিয়ের ফুল ফুটল! একেবারে গন্ধর্ব মতে! সব বল্ দেখি শুনি!"

অযথা লজ্জাশরমের বালাই আমার কোনোদিনই নাই। তবু কর্তব্যবোধে একটু ইতস্তত করিলাম, যাহাতে আদেখ্‌লেপনা প্রকাশ না পায়। ঠাকুরমা বলিলেন, "নে, হয়েছে, আর লজ্জা দেখাতে হবে না। তারপর, সে ছুঁড়ী তোকে পাকড়াও করল কি করে? খুব সুন্দরী বুঝি? কি যেন নাম, সুলক্ষণা, না? দিব্যি নামটি, আমাদের সেকেলে কানে ভালো লাগে।"

বলিলাম, "ঠাকুমা, সেকেলে নাম আবার ফিরে আসছে। তোমাদের যুগের জগত্তারিণী ক্ষেমঙ্করী আসতে বোধহয় এখনো দেরি আছে, কিন্তু এখন পড়েছে রামায়ণ মহাভারত আর কালিদাসের পালা, স্নেহলতা-স্বর্ণলতা-আভা-বিভা-নিভাননী এখন অচল।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ইস্, আমাদের কালে বুঝি খালি জগদম্বা জগত্তারিণী চলত? আমার নিজের ত দিব্যি একেলে নাম। বল্ ত কী?"

আশ্চর্যের বিষয়, মনে পড়িল না। "বাপের নাম করলে দুধে ভাতে খায়, মায়ের নাম করলে ছারেখারে যায়," সম্ভবত পিতামহী-মাতামহীর নামও এই প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত। লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "ইয়ে, মানে ভুলে যাচ্ছি, মানে পেটে আসছে মুখে আসছে না।"

শুনিয়া ঠাকুরমা যে খুশি হইলেন না, বলাই বাহুল্য। দোষ অবশ্য পুরাপুরি আমার নহে, কারণ ঠাকুরমা-দিদিমার নাম লওয়ার প্রয়োজন কাহার কবে হইয়া থাকে! তবু বিক্ষুব্ধা বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে নাম মনে আনিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, "ঢের হয়েছে। বেশি ভাবতে গেলে বেচারী স্বলক্ষণার নামটাও ভুলে যাবি। বলি অপর্ণা নামটা সেকেলে, না একেলে?"

মনে পড়িল। বলিলাম, "সেকালেরও নয়, একালেরও নয়, চিরকালের। যাকে বলে চিরন্তন।"

তিনি খুশি হইলেন। বলিলেন, "আমার শ্বাশুড়ী ডাকতেন অর্পণা ব'লে। গুরুজন, শুধরে দিতেও পারতাম না, তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ঐ নামই বাহাল ছিল।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "এদেশে নেমন্তন্ন-চিঠি ছাপা হওয়ার আগে কনের নাম বদলায়। যার নাম ছিল রাধারাণী, তার নাম হয় মণিকা, অণিমা, রমলা। কমলাই চিরকাল শুনে এসেছি, রমলা আবার কিরে বাবা! যাক, তোর বৌয়ের নাম বদলানোর দরকার হয়নি ত?"

স্মিতমুখে কহিলাম, "না ঠাকুমা। তবে তুমি যদি বল, তাহলে না হয় বদ্‌লে হরমোহিনী কি ভুবনেশ্বরী, কিছু একটা ক'রে দিই।"

আমার গালে একটা টোকা মারিয়া পিতামহী বলিলেন, "থাক্, তার চেয়ে বরং বিয়ের পরে আমি নাম পাল্‌টে পাঞ্চালী ক'রে দেব। অবিশ্যি যদি রাঁধতে পারে! পারে ত?"

জানিতাম না। বিপন্ন হইয়া বলিলাম, "পারে বোধ হয়।"

"বোধ হয়? তাহ'লেই হয়েছে। একদিন রাঁধুনী না এলে ভাইটির আমার হোটেল ছাড়া গতি নেই দেখছি। কি করতে পারে? নাচতে, গাইতে, আর ফর্ ফর্ ক'রে ইংরেজীতে কথা বল্‌তে?"

তুমুল লজ্জার সহিত স্বীকার করিলাম, কনের রন্ধনপারদর্শিতা আমার অজ্ঞাত হইলেও উপরোক্ত তিনটি কাজই যে সে উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা জানি।

ঠাকুরমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "শোন্, তোর দাদুর সঙ্গে যেদিন এই বাড়িতে এসে ঢুকলাম, তখন তার বয়েস পনেরো, আর আমার বারো। যাকে বলে ধিঙ্গি মেয়ে। আমি নাচতেও জানতাম না, গাইতেও না। কিন্তু ঘরকন্না শিখেছিলাম, খুব ভালো করেই শিখেছিলাম। তাই ত ধেড়ে মেয়ে এনেও শ্বশুর শাশুড়ী খুশি ছিলেন। তোর মা যখন এল, তারও ঐ বয়েস, কিন্তু একটু আহ্লাদী ধরণের ছিল, বেশি কিছু শেখেনি। সেকাল, মানে আমাদের কাল হলে বিপদে পড়ত, আমি বলে বেঁচে গেল। বুদ্ধিমতী মেয়ে, এক বছরেই পাকা গিন্নি হয়ে উঠল। তোর স্বলক্ষণার বয়েস কত রে?"

ভাবিতেছি, বয়েসটা কতখানি কমাইয়া বলিলে পিতামহী বিশ্বাস করিবেন অথচ অখুশি হইবেন না, সমাধান তিনিই করিয়া দিলেন। বলিলেন, "ভয় পাচ্ছিস কেন, তোর থেকে বড় না হলেই হল। সমানবয়সী না ছোট, তাই বল্।"

আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম, "ধ্যেৎ, আমার চেয়ে অনেক ছোট, অন্তত পাঁচ বছরের। বছর কুড়ি হবে।"

সহসা ঠাকুরমা হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "দেখি কেমন দেখতে! ছবি আছে ত?"

মুখটাতে যতদূর সম্ভব বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া কহিলাম, "ছবি? শোনো কথা, ছবি যেন আমি পকেটে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি! দাদু বেড়াতেন বুঝি?"

"বেড়াতেন বৈ কী! আমার একটা লেসের হাতওলা জ্যাকেট আর বেনারসী শাড়িপরা ছবি রাতদিন ওঁর বুক পকেটে থাকত। একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে তুলেছিলেন। নে, ন্যাকামি না ক'রে ছবিটা বের কর্, দেখি কেমন উর্বশী।"

তবু আরো কিছুক্ষণ ন্যাকামি করিলাম। অবশেষে পরাভব মানিয়া আলনায় টাঙানো পাঞ্জাবীর পকেট হইতে ছবি বাহির করিয়া দিলাম।

পাকা শৌখিন হাতের তোলা ছবি। পরিধানে লেস দেওয়া জ্যাকেট অথবা বেনারসী, কিছুই নাই। তবু ফুলের বাগানে অজস্র পুষ্পের পশ্চাৎপটের সম্মুখে নন্দনের পারিজাতের মত একটি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সুলক্ষণা!

কাঁধের দুই পাশ দিয়া দুইটি স্থূল বেণী কটি ছাড়াইয়া নীচে নামিয়াছে। কানে বড় বড় দুইটি কানবালা, গায়ে শাদাসিধা ব্লাউস। হালকা রঙের শাড়ীতে তনুবল্লরী আবৃত। আসল মানুষটিকে গত ছ'মাস ধরিয়া সমানে দেখিতেছি; তবু এই ছবিখানি চোখের সামনে ধরিলে মোহাবিষ্ট হইয়া যাই।

ক্ষীণদৃষ্টি ঠাকুরমা চোখে চশমা দিয়া অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলেন। পরে কহিলেন, "নাতির আমার রুচি আছে।"

প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করি নাই, তবু যেন আহ্লাদে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বলিলাম, "এমন আর কি!"

"এমন নয় ত কি? এ মেয়ে রাঁধতে না জানলেও কিছু এসে যাবে না। তুই জিতেছিস রে, ভীষণ জিতেছিস!"

"আর ও বুঝি ঠকেছে?"

"বালাই, ঠকবে কেন? ও জন্মজন্মান্তর ধ'রে তপস্যা ক'রে অর্জুনের মত বর পেয়েছে।"

সম্ভবত আমার গাত্রবর্ণের উপর কটাক্ষ। অর্জুনের সহিত আর কিছু মিল আছে বলিয়া জানিতাম না। যাই হোক, শুনিতে ভালোই লাগিল।

বর্ষাকাল সবে দিনকতক হইল শেষ হইয়াছে। এবার পূজা পড়িয়াছে কার্তিকমাসে। কিন্তু আকাশে বাতাসে আগমনীর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। শারদলক্ষ্মী তাঁহার শুভ্র শুচি রূপ লইয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশায় মূর্তিমতী হইয়া আসিয়াছেন। পথে ঘাটে প্রান্তরে কাশফুলের ও স্থলপদ্মের সমারোহ জাগিয়াছে।

রাত বেশি হয় নাই। ঠাকুরমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ওরে, এ তোদের কলকাতা নয়, এখানে শরৎকালের হিম লাগালে অসুখ করে।"

বলিলাম, "এমন রাত ত কলকাতায় পাই না! অসুখের ভয়ে রাত নটায় আমি ঘরের ভিতরে ঢুকে বসে থাকতে চাই না।"

"বেশ, তবে আমিও বসি। ঠাণ্ডা লাগে, দুজনেরই লাগবে।"

উভয়ে শানবাঁধানো রোয়াকে দুটি থামে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

এ বাড়ি প্রথমে পাকা করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন আমার প্রপিতামহ। তাহার পরে তাহার পরিবর্তন, সংস্কার, এবং কিছু কিছু পরিবর্ধন হইয়াছে, কিন্তু আদিরূপ প্রায় অব্যাহত আছে। পরিবার

ছোট, কাজেই বাড়িও গ্রামের অন্যান্য অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ির তুলনায় ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু ছোট হইলেও সুন্দর। কারণ বাড়ির স্থায়ী অধিবাসী বলিতে যদিও ঠাকুরমা মাত্র, তবু বাবা যথাসাধ্য সুসংস্কৃত রাখায় অব্যবহৃত ভূতের বাড়িতে পরিণত হইতে পারে নাই। পিছনের বাঁধানো পুকুরে পদ্মফুল ফোটে, হিমের আক্রমণ এখনো অসহ হইয়া উঠে নাই, তাই কিছু কিছু এখনও আছে।

স্তব্ধতা ভাঙিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "দেখ্, আমার একটা কথা রাখবি ?"

চকিত হইয়া বলিলাম, "বল।"

আত্মগতভাবে ঠাকুরমা বলিলেন, "কি জানি, হয়ত পারবি নে রাখতে। তোর বাপ রাজি হবে কেন ?"

বলিলাম, "বলই না, কি কথাটা। না জানলে হাঁ না বলি কি ক'রে ?

"তোর বিয়ে কলকাতাতেই হবে ত ?"

"তাছাড়া আর কোথায় হবে ?"

"বৌ নিয়ে তোদের কলকাতার বাসায় না উঠে এখেনে উঠ্‌বি ? বৌভাত এখেনেই হোক ?"

চুপ করিয়া রহিলাম। অনুরোধ অসঙ্গত নহে, কিন্তু পালনে বিঘ্ন আছে। কলিকাতায় বাবার নিজস্ব বড় বাড়ি রহিয়াছে দক্ষিণাঞ্চলে, বিবাহের বিলম্ব থাকিলেও কোথায় কিরূপ ভাবে প্যাণ্ডাল তৈরি হইবে, সে বিষয়ে বাবা ইহারই মধ্যে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে বাড়িতে গৃহপ্রবেশ ভিন্ন আর কোনো শুভকর্ম সম্পন্ন করিবার সুযোগ বাবা পান নাই, তাছাড়া পারিবারিক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সবাই কলিকাতায়, এক্ষেত্রে ঠাকুরমার প্রস্তাবে বাবাকে রাজি করানো কঠিন হইবে।

আমার স্তব্ধতা নিরীক্ষণ করিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "পারবি নে, না ? আমি জানতাম, তবু একটু শখ হ'ল, তাই—" কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ঠাকুরমা চুপ করিলেন।

ব্যথিত হইলাম। বলিলাম, "বাবাকে ব'লে দেখব, তবে—" আমারও কথা শেষ করা হইল না।

রাত্রি বাড়িতেছে। কিন্তু ঠাকুরমা উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না।

এই বাড়িরই সামনের বিস্তীর্ণ উঠান দিয়া পায়ে চলার পথের রেখা, পদক্ষেপের অভাবে যাহা আশেপাশের সবুজ ঘাসের সহিত বিলীন হইয়া আসিয়াছে, সেই পথ যে দ্বারের সামনে গিয়া শেষ হইয়াছে, ঐ দ্বার দিয়া কে জানে কত যুগ ধরিয়া এই বাড়ির ছেলেরা বধূ লইয়া পালকী করিয়া সানাইয়ের, শাঁখের শব্দের মধ্যে তুমুল মাঙ্গলিক হুলুধ্বনির মধ্যে বাড়ি আসিয়াছে। কত কাল আগে, যখন এই পাকা বাড়ি, শানবাঁধানো মেঝে, অথবা ইঁটে গাঁথা স্তম্ভের অস্তিত্বও ছিল না, এই বাড়ির প্রথম বড় ছেলে, প্রথম নববধূকে লইয়া ঐ চৌকাঠ পার হইয়া এইখানেই পালকী হইতে অবতরণ করিয়াছিল। এখন যেখানে দরদালান, হয়ত ঐখানেই তকতকে মাটির মেঝের উপর প্রথম বালিকা-বধূর ফুলের মত সুকুমার পা দুখানি ননদ আসিয়া দুধে আলতায় ধুইয়া দিয়াছে। অনেক কাল কাটিয়াছে, অনেক মানুষ সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহ-না-কেহ বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

আমার পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কত বৎসর আগে ? যখনই হোক, এই পাকাবাড়িতে, ঐ

দরদালানে, শানবাঁধানো মেঝেয় চিত্রিত পিঁড়ির উপর প্রায় সমবয়সী বধূকে লইয়া তিনিই প্রথম দাঁড়াইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বালিকা আমার মাও সলজ্জ-নতদৃষ্টি রক্তাবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া স্বামীর সহিত বরণডালার সম্মুখীন হইয়াছিলেন ঐখানেই।

সহসা ঠাকুরমা বলিলেন, "শোন্ বলি। চুয়াত্তর সালের কথা, ইংরেজী নয়, বাংলা। আমার শ্বশুরের শখ ছিল পাকা বাড়িতে ছেলের বৌ আনবেন। মাটির বাড়ি ভেঙে পাকা বাড়ি তৈরী হ'তে হ'তে বছর কেটে গেল, নইলে বিয়ে আমার হ'ত আগেই। তোর দাদুর সঙ্গে যখন পাল্‌কী থেকে নামলাম, দেখি বাড়ি তৈরী তখনও শেষ হয়নি। বধূবরণ হল দরদালানে, আর পূবের যে ঘরে তোর বিছানা ক'রে দিয়েছি, ঐখেনে ফুলশয্যে।

"ফুল এসেছিল কোত্থেকে জানিস্? সব এই বাড়ির বাগান থেকে। জষ্টি মাস, সাদা রঙের যত ফুল থাকতে পারে, ছিল বাগানভরা। আর ছিল পুকুরের পথ। বাড়ির ঐ সদর-দরজা থেকে আরম্ভ ক'রে আগাগোড়া সাজানো হয়েছিল শ্বেতপদ্মে।

"কলকাতায় বিয়ে দেখেছি, দোকানের ফুল এনে কাজ চালাতে হয়। বাড়ি সাজানোর মত অত ফুল পাবে কোথায়? তাই ফুল ওঠে ফুলদানিতে, এখানে গোটাদুই শুকনো পদ্ম, কুঁড়ি থেকে জোর করে ফোটানো, ওখানে গোটাপাঁচেক রজনীগন্ধা, তিনদিন আগে তোলা। নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়িত করা হয় বেলফুলের মালা দিয়ে, পাপড়িখসা ঝরে-পড়া বেলফুল, বেল না আকন্দ বোঝা যায় না। আর থাকে কতকগুলো গোলাপ, যার আমদানী হয় তিনশ' মাইল দূর থেকে, তাতে রঙ্ যদি বা থাকে, গন্ধ থাকে না।

"তবে হ্যাঁ, বলতে পারিস, কলকাতার মত আলোর বাহার হয় না এখানে। মানি। আমার বিয়ের সময় আলোর মধ্যে ছিল ঝাড়লণ্ঠনের মোমবাতি। কিন্তু কনের মুখ তখন দেখা হত ঘিয়ের প্রদীপে, তাতে তেজ হয়ত ছিল না, স্নিগ্ধতা ছিল। নববধূ যখন এসে দরদালান আলো ক'রে দাঁড়িয়েছে, কি হবে তখন বাইরের বিজলীবাতি দিয়ে?

"শুভকর্মে জোরালো আলো, ইংরেজী বাজনা, এসব তখন ছিল না। আজকাল পূজোর মণ্ডপে প্রকাণ্ড ডে-লাইটের আলোয় দেবীর নিজের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পুরুত পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করেন, তার ছোট ছোট পাঁচটি হল্‌দে শিখা গ্যাসের আলোর কাছে কোথায় তলিয়ে যায়। দেবীর মুখ দেখব কি, দেখি ঘামতেলের উপর দুহাজার বাতির আলোর জুলুম, তাতে মুখ চোখ সব এক হয়ে যায়, আর যেটুকুতে আলো পড়ে না, তা থাকে অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে।

"বাড়িতে আসত যখন নতুন বৌ, সানাইয়ের দল ব'সে যেত খুশির সুর নিয়ে। কলকাতার বিয়েতে সানাই ছাপিয়ে আসে মোটরগাড়ির গর্জন আর ভেঁপুর আওয়াজ। নিমন্ত্রিত যারা আসে, তারা নিয়ে আসে রঙবেরঙের উপহার, ভাড়াটে সামিয়ানার তলে ভাড়াটে টেবিলচেয়ারে ব'সে খেয়ে চলে যায়, লগ্ন বেশি রাতে হ'লে বিয়ে দেখার অবসর মেলে না।

"আমার শ্বশুর ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, তবু এই বাড়িতে সাতদিন ধরে গাঁয়ের সব লোক আনন্দ করেছে। নৌকো যখন ঘাটের কাছে এল, ভাবলাম পাড়ে বুঝি মেলা বসেছে। পৌঁছে দেখি মেলা নয়, বরকনেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই।

"তারপরে কতদিন গেল; তোর বাবার, তোর দুই পিসির বিয়ে দিলাম। কত ধূমধাম, কত

আনন্দ। এখন সব নতুন যুগের নতুন কেতা, তোরা ছিলি মাটির সন্তান, হয়েছিস শহুরে বাবু। বুড়ো হলাম, আমার সাজানো বাগান যেমন তেমনি থাকল, আর কোনো সুন্দরী এসে তা থেকে ফুল তুলে খোঁপায় পরল না। আমার পদ্মবনের পদ্ম বছরের পর বছর ফুটল, আবার বছরের পর বছর আপনিই হিমে মুষড়ে শুকিয়ে গেল, জিতল, খালি মৌমাছি আর ভ্রমর। ছোটদের কলরবে আর বাড়ি ভরে উঠল না। যা আছে, তাই আমি আগলে বসে আছি যক্ষির মত, পুরোনো বাড়ি, পুরোনো বাগান, ফেলে-দেওয়া পুরোনো কাপড় গয়না, আর পুরোনো দিনের স্মৃতি।"

ঠাকুরমা চুপ করিলেন। বুঝিলাম যুগান্তরের ধারা আমার কাছ পর্যন্ত আসিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে, এ চিন্তায় তাঁহার প্রাণে নিরানন্দের বন্যা আসিয়াছে।

ঠাকুরমা সেকেলে গোঁড়া লোক নহেন। তাঁহার বয়সও সবে সত্তর পার হইয়াছে এবং কতকটা নিজগুণে, এবং কতকটা স্বামীর শিক্ষাগুণে, প্রায় সর্ববিধ সংস্কারমুক্ত। তিনি যে কলিকাতা ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তাহার কারণ তাঁহার ছেলের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাড়ির অনাচারে অসহিষ্ণুতা নয়, শ্বশুরের ভিটার উপর আন্তরিক আকর্ষণ।

বলিলেন, "অনেককাল কলকাতায় যাইনি, দেখি তোর বিয়েতে যদি যাওয়া হয়। ভেবেছিলাম এ বুড়ো বয়েসে শুকনো শরীরটাকে নিয়ে আর টানাহ্যাঁচড়া করব না, কিন্তু তা ত আর হবে না!"

বলিলাম, "ঠাকুমা, বাবা যদি নেহাৎই এখানে বউবরণে রাজি না হন, তবে আমি বরং পোষমাসের শেষাশেষি এসে মাসখানেক থেকে যাব।"

উৎফুল্লস্বরে ঠাকুরমা কহিলেন, "আসবি? বৌ নিয়ে?"

"কি মনে হয়?"

"ঠিকই মনে হয়। কান টানলে মাথা, আর মাথা টানলে কান, দুইই আসে। তা, ম্যালেরিয়ার ভয় করবে না? তোর যে শহুরে বৌ!"

"ঠাকুমা, পৃথিবীতে সব সময়েই কিছু না কিছুর ভয় আছে। সব ভয়কে যদি এড়িয়ে চলতে হয়, তবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক সোজা।"

"তবে ভয় করিস না। জানিস্, সুলক্ষণার ছবিটা দেখে খুব ভালো লাগল। শাড়িটা আর একটু ভালো হলে বেশি মানাত, কিন্তু সে যাক, গয়নাগাঁটি পরে। কানের গয়না দুটি দিব্যি। বেশ বড় বড় পুরোনো ধাঁচের।"

বহু বৎসর কলিকাতায় পদার্পণ করেন নাই বলিয়াই ঠাকুরমাকে ক্ষমা করিলাম, নচেৎ পারিতাম না। বলিলাম, "ঠাকুমা, গাঁয়ে থেকে তুমি যেন একেবারে ভারতছাড়া হয়ে গেছ, দুনিয়ার কোনো খোঁজ খবর রাখো না। আজকালকার মেয়েরা যখন গয়না পরে না, তখন পরে না। কিন্তু যখন পরে, সেকরার দোকান শুদ্ধ গায়ে চড়িয়ে বসে।"

খুশি হইয়া ঠাকুরমা কহিলেন, "ভালোই ত! গয়নার সৃষ্টি হয়েছে গা সাজানোর জন্যে। মেয়েরা হাতে দুগাছি ফিন্‌ফিনে চুড়ি, আর খুদে একটা হাতঘড়ি পরে বেড়ালে কি ভালো লাগে?"

লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম, "তোমার ইয়ে, মানে নাতবৌ, সেকেলে ভারি ভারি গয়নার ভীষণ ভক্ত। ওর মা বলেন, ওর জন্মানো উচিত ছিল পঞ্চাশ বছর আগে।"

ঠাকুরমা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তোর মায়ের বিয়ের সময় বিলেতী ধাঁচের গয়নার ফ্যাশন এল। আমার নিজের বিয়ের গয়না রেখে দিয়েছিলাম ছেলের বৌয়ের জন্যে, তোর মামাবাড়ির ওরা দেখে নাক সিঁটকিয়ে বল্লে, 'এ গয়না, না বেড়ি?' তোর মা'র চোখের জল দেখে তোর দাদু সব ভেঙে হাল্কা ফুরফুরে গয়না গড়িয়ে দিলেন। ফুঁ দিলে উড়ে যায়। আমার পুরোনো গয়নার গোটাকতক বাকী আছে, সে সব তোর মাকে দিইনি, নাতবৌয়ের জন্যে রেখেছি। ভয়ে ভয়ে বলছি, নিবি ত?"

"কিযে বল ঠাকুমা, নেব না ত কি ফেলে দেব?"

"ভেঙে হাওয়ায় ওড়া ফুরফুরে গয়না গড়াবি না?"

"না। তোমাকে ত আগেই বলেছি ঠাকুমা, স্থলক্ষণা সেকেলে ভারি গয়না ভালোবাসে। আমি কথা দিচ্ছি, ও গয়না যেমন আছে, তেমনি পরবে।"

ঠাকুরমা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় ছোট্ট একটি চুমা খাইয়া বলিলেন, "বুড়ীকে তুই যে কি আনন্দ দিলি দাদা, জানিস নে! কাল তোকে সব গয়না দেখাব। বেশিও নেই, গোটা চারেক। কিন্তু যা আছে, তা আজকালকার বাজারে মাথা খুঁড়লেও পাবি নে।"

পরিতৃপ্ত মনে ঘুমাইতে গেলাম।

অনেক রাত্রে ঘুমাইয়াছি, তবু ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিল। পূবের আকাশ সবে রাঙা হইতে শুরু করিয়াছে, ঘরে ছায়ামূর্তির মত সদ্যস্নাতা শুভ্রবাসা পিতামহী, আমার আধুনিক কালের হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল পিতামহী, হাতে ধূমায়মান চায়ের পেয়ালা। আমার অভ্যাসের কথা বলিয়া দিই নাই, শুধু আন্দাজের উপর আনিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিলাম, "তুমি গুণী লোক, ঠাকুমা। আপাতত দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও, ঘণ্টাখানেক পরে আমি আপনিই উঠব।"

ঠাকুরমা চলিয়া গেলেন। চা শেষ করিয়া শুইয়া শুইয়াই একটা সিগারেট ধরাইলাম, চায়ের কেফিন ও সিগারেটের নিকোটিন মিলিত হইয়া আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে কল্পনার পুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া চলিল।

ভারী ভারী অলঙ্কারে আমার প্রেয়সীকে কেমন মানাইবে? ইস্‌, নিশ্চয় চমৎকার মানাইবে। দেখিতে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব হইলেও স্থলক্ষণা বিলক্ষণ বলশালিনী, গাদা গাদা সোনার চুড়ি বালা বহন করিতে তাহার টেনিস্‌খেলা হাতে একটুও কষ্ট হইবে না।

অলঙ্কারের উপরে আমার একটু সহজাত প্রীতি আছে। কুমারসম্ভবের তপঃক্লিষ্টা পার্বতীর নিরাভরণ রূপবর্ণনার শ্লোকগুলি যতই মিষ্ট হোক, তাহার চেয়ে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে উমার বধূবেশের বর্ণনা। শকুন্তলার অঙ্গে স্বর্ণকারের অলঙ্কার ছিল না, তপোবনবাসিনীর ওসব পাইবার সুবিধা হয় নাই। তাই বলিয়া তিনি নিরাভরণা ছিলেন না, বনের অজস্র ফুল তাঁহার শোভাবর্ধন করিয়াছিল। সত্যই যদি তিনি নিরলঙ্কৃতা হইতেন, দুষ্মন্ত তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতেন না, বৈখানসের সহিত গোটাদুই কথা বলিয়াই বাড়ি চলিয়া যাইতেন।

প্রিয়ার রূপ চিন্তা করিতে করিতে বেলা বাড়িতেছিল। উঠিয়া ঠাকুরমাকে আসিয়া বলিলাম, "ঠাকুমা, কাল কি বলেছিলে, মনে আছে?"

দুষ্ট হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "আছে বৈকি, বলেছিলাম, 'আজকাল গরম একেবারে ক'মে গেছে'।"

"এবারে তুমি ন্যাকামি আরম্ভ করেছ ঠাকুমা, কখন দেখাবে বল।"

"আহা, নাতি আমার ঘোড়ায় চড়ে কনের গয়না দেখতে এসেছেন! আগে হাত মুখ ধুয়ে চারটি খেয়ে নে, তার পরে দেখাব।"

অগত্যা দ্রুতপদে পুকুরঘাটে গেলাম, এবং হাতমুখ ধুইয়া ততোধিক দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিলাম। মুখে কিছু গুঁজিয়া আর এক পেয়ালা চা খাইয়া কহিলাম, "কই দেখাও।"

শয়নগৃহে আসিয়া পর পর সাজানো তোরঙ্গের থাকের দিকে দেখাইয়া ঠাকুরমা কহিলেন, "নামা এগুলো।"

তিনটি গুরুভার ট্রাঙ্ক নামাইলাম। তাহার নীচে একটি প্রকাণ্ড তোরঙ্গ খুলিয়া বহুতর পুরানো ধুাত শাড়ির নিম্ন হইতে ঠাকুরমা একটি বৃহৎ গহনার বাক্স বাহির করিলেন। গহনাগুলি লইয়া একে একে আমার সামনে রাখিয়া বলিলেন, "দেখ্, পছন্দ হয়?"

পুলকিত দেহে বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলাম।

একছড়া ভারি রূপার গোট। ওজন কত পরমাত্মা জানেন।

একছড়া বৃহৎ সোনার চন্দ্রহার। দুইপাশে সাত থাক করিয়া সোনার শৃঙ্খলের মধ্যে পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট চন্দ্রটি চকচক করিতেছে।

দুই পায়ের জন্য আটগাছা করিয়া ষোলগাছা রূপার মল।

তিনটি-মুক্তা-বসানো একটি ফাঁদি নথ।

ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংলা ভাগবত

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সম্প্রতি কুচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুথির তালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংলা ভাগবতের অনুবাদ পাইয়াছি। ষোড়শ শতাব্দী হইতে কুচবিহারে বর্তমান রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কুচবিহার রাজ-সভা বাংলা সাহিত্য-সাধনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। মহারাজা প্রাণনারায়ণ (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ), মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) নিজেরাই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; তা ছাড়া মহারাজা বিশ্বসিংহের পুত্র শুক্লধ্বজ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত সকলেই বহু কবিদ্বারা রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত-আদি বহু পুরাণের অনুবাদ বাংলা পদ্যে করাইয়াছেন। এখানে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দ্বিজ পীতাম্বর কৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদই প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়।

পীতাম্বরের ভাগবতের যে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা খণ্ডিত ; প্রথম পাতাটি ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরে ৬৯ পাতা (অর্থাৎ ১৩৮ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত পাওয়া যায় না ; তৎপরে ৭০ পাতা হইতে ১৪২ পাতা (২৮৪ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত পাওয়া যায়। পুথিখানির অবস্থা খুবই জীর্ণ ; দেশী তুলট কাগজের পাতা বহু স্থানেই ছিন্ন এবং কীটদষ্ট ; অনেক স্থানে জল লাগিয়া অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। একাধিক লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায় ; প্রথম দিকের লিপিকর নিতান্তই অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়, ফলে বর্ণাশুদ্ধির অন্ত নাই, পদের বহু শব্দ ছাড় পড়িয়া গিয়াছে। পুথিতে কোন লিপিকাল দেওয়া নাই। লিপি দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থে পীতাম্বরের বিশেষ কোন পরিচয় নাই। তিনি নিজেকে কামরূপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই কামরূপ বলিতে ঠিক বর্তমান কামরূপ শহরের কথা মনে করা উচিত হইবে না। এখানে অন্যান্য যে সকল পুথি রক্ষিত আছে তাহা আলোচনা করিয়া মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও কামরূপ শব্দের দ্বারা প্রাচীন কামরূপ জনপদ লক্ষিত হইত। কুচবিহারকেও অনেক কবি কামরূপ দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বহু পুথির দুইদিকের কাষ্ঠ ফলকের উপরে লিখিত রহিয়াছে, 'কামরূপীয় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুথি'। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি আমার নিকটে খুব সার্থক মনে হইল। কারণ, ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এখানে যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহা একটি বিশেষ ভাষায় লিখিত ; সে ভাষাটি খাঁটি বাংলা ভাষাও নহে, তাহা খাঁটি আসামী ভাষাও নহে, তাহার যথার্থ পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়, ইহা 'কামরূপীয় বাংলা ভাষা'।

এই জন্যই প্রথমে একটা সংশয় উঠিতে পারে, পীতাম্বর বাঙালী কবি কি আসামী কবি। অনন্ত কন্দলী প্রভৃতি আসামী কবি বলিয়া স্বীকৃত কবিগণের ভাষার সহিত পীতাম্বরের গ্রন্থের ভাষার পার্থক্য খুব বেশী নহে, আবার কুচবিহারনিবাসী সপ্তদশ শতাব্দীর কবিগণের ব্যবহৃত ভাষা হইতেও

পীতাম্বরের ভাষা কিছু পৃথক নহে। আসলে 'খাঁটি বাঙালী' এবং 'খাঁটি আসামী' কথা দুইটিই আমার নিকট অ-খাঁটি বলিয়া মনে হয়, এবং এই অ-খাঁটি শব্দগুলি এবং তদ্‌ঘটিত তর্কবিতর্কগুলিও আমাদের বিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে প্রাচীন জনপদের ভিতরে অনেক স্থানে নূতন কৃত্রিম সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমরাও এই কৃত্রিম সীমারেখাগুলিকে স্মরণে রাখিয়াই ইতিহাসের বিচার করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হই। প্রাচীন জনপদগুলি একটা ভৌগোলিক বন্ধনেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না; সেখানে দৃঢ়তর ছিল ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধন। সেই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধনের দিক হইতে কুচবিহার ছিল কামরূপের অঙ্গীভূত। এই কারণেই আমি মনে করি, কুচবিহারবাসী কুচবিহারের রাজ-সভার অন্যান্য কবিগণকে যদি বাঙালী কবি বলিয়া বাংলা সাহিত্যে স্থান দিতে হয় তবে পীতাম্বরকেও খাঁটি বাঙালী কবি বলিয়া বাংলা সাহিত্যেই স্থান দিতে হইবে। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত; উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আমাদের সাহিত্য-সাধনা যেভাবে কলিকাতা নগরী ও তৎসন্নিহিত ভূমিভাগকে অবলম্বন করিয়া দিন দিন কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্তও বাংলা সাহিত্যের সাধনা এরূপ কেন্দ্রীভূত ছিল না। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সাহিত্য-সাধনা রূপ লাভ করিয়াছে; এই বিভিন্ন জনপদের বিশিষ্ট সাধনার পরিচয় একত্র করিয়াই আমাদের সাহিত্যের সমগ্র পরিচয় রচনা করিতে হইবে।

পীতাম্বর মহারাজ বিশ্বসিংহের পুত্র কুমার শুক্লধ্বজের আদেশে ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থে অবশ্য কোথাও শুক্লধ্বজের নাম নাই, ভণিতায় সর্বদাই 'কুমার সমরসিংহ' নাম রহিয়াছে। 'সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী'র ভিতরে পাওয়া যায় যে রাজা শুক্লধ্বজকে 'সংগ্রামসিংহ' উপাধি প্রদান করিয়া যুবরাজের পদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন।[১] রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জীতে লিখিত আছে যে, গৌড় আক্রমণে বীরত্ব প্রদর্শন করায় শুক্লধ্বজ 'সংগ্রামসিংহ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।[২] 'সংগ্রাম-সিংহ' এবং 'সমরসিংহ' সমার্থক হিসাবেই ব্যবহৃত হইত মনে হয়। শুক্লধ্বজের ভ্রাতা (জ্যেষ্ঠ?) নরনারায়ণের রাজত্ব কালে এই রাজকুমার শুক্লধ্বজ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, এবং তাঁহার দুর্জয় সাহস এবং বীরত্বের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আকস্মিক আক্রমণে তৎপরতার জন্য তিনি 'চিলারায়' নামে খ্যাত ছিলেন। কথিত আছে এই কুমার শুক্লধ্বজ গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধে বন্দী হন; পুনর্মুক্তির পরে তিনি গৌড়রাজের সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ এবং পীতাম্বর সিদ্ধান্ত-বাগীশকে স্বদেশে লইয়া আসেন। পণ্ডিতদ্বয় প্রথমে নাকি কামরূপে (অর্থাৎ কামরূপ-ভূমি কুচবিহারে) আসিতে সম্মত হন নাই, রাজা তাঁহাদের জীবিকানির্বাহের উত্তম ব্যবস্থা এবং দৈনিক একশত মুদ্রা বৃত্তি দানের অঙ্গীকার করায় তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।[৩] ইহার অবশ্য সকল তথ্যই কিম্বদন্তীমূলক সুতরাং কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না।

এই পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ রাজা এবং রাজমহিষীর আদেশে ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 'জগদ্‌গুরু'

---

১ কোচবিহারের ইতিহাস, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা কর্তৃক প্রণীত। পৃ ১১৮

২ ঐ, পৃ ১১৮

৩ ঐ, পৃ ১১৪

নামে খ্যাত ছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে রাজসভার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কুমার শুক্লধ্বজের আদেশে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণেরও অনুবাদ করেন। তিনি সংস্কৃতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং 'কৌমুদী' নাম দিয়া অনেকগুলি স্মৃতি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।[৪]

পীতাম্বরে ভাগবতে কোথাও রচনাকাল পাওয়া যায় না। কুমার শুক্লধ্বজ ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া ধরা হয়; অবশ্য কুচবিহারের রাজবংশের রাজাগণের সন তারিখ এখনও নিশ্চিত রূপে নির্ণীত হয় নাই; সন-তারিখের কিছু কিছু গোলযোগ এবং সংশয় থাকিলেও কুমার শুক্লধ্বজের মৃত্যুসময় পূর্বোক্ত রূপই মনে হয়। এই কুমার শুক্লধ্বজের আদেশেই আসামের প্রসিদ্ধ কবি শঙ্করদেব তাঁহার 'সীতা স্বয়ংবর' নাটক রচনা করেন। এই শঙ্করদেবও ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। ভাগবতের প্রারম্ভে পীতাম্বর বলিয়াছেন যে তিনি কুমার সমরসিংহের আদেশে তাঁহার সমীপে বসিয়াই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অভিনব পুর শে জে কামতানগর।
……আছয় বিশ্বসিঙ্গ নৃপবর ॥
তাহার তনয় জে শমর সিঙ্গ নাম।
কৃষ্ণর লীলাত তাঞে য়তি অভিরাম ॥
কৃষ্ণপদপদ্মে তার ভকতি শততে।
……গুণ কিছু শ্বভিশ্বাস (?) চির্ত্তে ॥
শিশুমতি পিতাম্বর তাহার সমিপে।
কৃষ্ণের লীলার পদ রছিল শংক্ষেপে ॥—১ম পাতা

সুতরাং পীতাম্বর ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের প্রথম দিকে তাঁহার ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু এবিষয়ে আর একটু চিন্তনীয় কথা আছে। পীতাম্বর কুমার শুক্লধ্বজের আদেশে যে 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণে'র অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাতে রচনারম্ভের কাল দেওয়া আছে। সে পুথির আরম্ভে দেখি—

মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে।
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে ॥
... ...
একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কায ॥
... ...
পুরাণাদি শাস্ত্রে জত রহস্য আছয়।
পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয় ॥
একারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজ দেশভাষাবন্দে রচিয়ো পয়ার ॥
বেদপক্ষবান আর শশঙ্ক শকত।
আরম্ভ করিলোঁ মার্কণ্ডেয় কথা জত ॥

তাহা হইলে ১৫২৪ শক, ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে কবি মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, অর্থাৎ শুক্লধ্বজের মৃত্যুর প্রায় ৩১ বৎসর পরে। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ বলিয়াছেন যে, বোধ হয় কুমারের পূর্বপ্রকাশিত ইচ্ছা অনুসারে কুমারের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও কবি একখানি কাব্য রচনা করিলেন ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, অন্যখানির রচনা আরম্ভ করিলেন ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। তা ছাড়া কুমার শুক্লধ্বজের আদেশে কবি

৪ কোচবিহারের ইতিহাস, পৃ ১৩০-৩১। "শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র তর্কব্যাকরণতীর্থ নামক কামরূপ জেলার নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে সিদ্ধান্তবাগীশের প্রণীত 'কৌমুদী' নিবন্ধাবলীর মধ্যে 'প্রেত কৌমুদী' এবং 'সংক্রান্তি কৌমুদী' নামক দুইখানি গ্রন্থ স্বরচিত টীকার সহিত সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত এবং প্রকাশিত করিয়াছেন।"—ঐ, পৃ ১৩১

শঙ্করদেব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারই আদেশে অন্য কবি একেবারে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহাও মানিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং কবি এখানে কাল-নিরূপণে কোন গোলযোগ করিয়াছেন এজাতীয় সংশয়ও একেবারে অশ্রদ্ধেয় নহে। আমরা মোটের উপরে পীতাম্বরের ভাগবতকে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।

হিন্দুর সকল শাস্ত্রকে দেশভাষায় অনুবাদ করিয়া সর্বসাধারণের ভিতরে ইহার প্রচার করা কুচবিহারের রাজাগণের একটা ব্রতস্বরূপ ছিল। কিন্তু ভাগবত অনুবাদের আদেশের পশ্চাতে কুমার শুক্লধ্বজের বৈষ্ণবধর্মপ্রবণতার একটা পরিচয় থাকিতে পারে। গ্রন্থারম্ভে পীতাম্বর কুমার শুক্লধ্বজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণপদপদ্মে তার ভকতি সততে'। অন্যত্রও ভণিতায় দেখিতে পাই—

কুমার সমর সিংহ হরিপাদপদ্ম ভৃঙ্গ
নারায়নে ভকতি সুজানে।
আজ্ঞা পরমানে তার কৃষ্ণকেসি সুপরায়
শিশুমতি পিতাম্বরে ভনে॥

অন্যত্র— কুমার সমর সিঙ্গ হরিপাদপদ্ম ভৃঙ্গ
ভক্তিমধু পিয়ে রাত্রিদিনে।
আজ্ঞা পরমানে তার কৃষ্ণকেলি সুপআর
শিশুমতি পিতাম্বর ভনে॥—৮৮ খ পৃষ্ঠা

ইহা হইতে মনে হয়, ইহা শুধু প্রভুতুষ্টির জন্য কবির প্রশংসাবাক্য মাত্র নাও হইতে পারে। তা ছাড়া শুক্লধ্বজের ভক্তিধর্মের প্রতি অনুরক্তির পরিচয় আরও রহিয়াছে। কথিত হয়, শঙ্করদেব শক্তিপূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অহোম রাজার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করে। রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আসাম-বিজয়ের পরে শঙ্করদেব আসাম পরিত্যাগ করিয়া কামতারাজ্যে (কুচবিহারে) আগমন করেন। তথায় রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁহার আদেশে তিনি 'সীতা-স্বয়ংবর' নাটক রচনা করেন। ইহার পরে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর শঙ্করদেব তাহার বৈষ্ণব-বিশ্বাসের জন্য পুনরায় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, সে-সময় কুমার শুক্লধ্বজই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।[৫]

পীতাম্বর নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধটি তিনি মূল অবলম্বন করিয়াই অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে যাহাকে ঠিক মূলের অনুবাদ বলা যাইতে পারে পীতাম্বরের লেখা সেরূপ নহে, তিনি মূলকে অনুসরণ করিয়া বাংলায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও তাঁহার লেখা কোথায়ও সংস্কৃতগন্ধী নহে, বৃহত্তর কামরূপ অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজেও ভক্তিপ্রবণ লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়, অনুবাদের ভিতরে বক্তব্য বিষয়ের সহিত কবির হৃদয়ের যোগও বহুস্থানে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আমরা পীতাম্বরের অনুবাদ-কাব্যের প্রকৃতি-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি উপাখ্যান মূলের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিতেছি। ভাগবতের প্রসিদ্ধ সুদামা বিপ্রের কাহিনীটিতে মূলে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে গুরুভক্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মণ্ বর্ণাশ্রমবতামিহ। যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্॥
নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥

—১০।৮০।৩৩-৩৪

[৫] কোচবিহারের ইতিহাস, পৃ ৬১-৬২

পীতাম্বর ইহার অনুসরণে লিখিয়াছেন—

সংসার সাগরে এ জে পরম অপার।
গুরু নৌকা করিলে সে তার পাই পার॥
জে জনে সদায় করে গুরুক ভকতি।
সেহি সে প্রাণীত আমি পরিতুষ্ট অতি॥
গুরুভক্তি করি লোক তোষে জিতো জনে।
যজ্ঞে হোম নহো তুষ্ট তাত করি বিনে॥

—পৃষ্ঠা ১২৯ খ

তারপরে পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—

অপি নঃ স্মর্যতে ব্রহ্মণ্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ। গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে ক্বচিৎ॥
প্রবিষ্টানাং মহারণ্য মপর্তে ী সুমহদ্দ্বিজ। বাতবর্ষমভূৎ তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ॥
সূর্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ। নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥
বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভি-র্নিহন্যমানা মুহুরম্বুসংপ্লবে।
দিশোঽ বিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ॥—১০।৮০।৩৫-৩৮

পীতাম্বর ইহার অনুসরণে লিখিয়াছেন—

আর হেন কথা সখে আছে কি স্মরণ।
গুরুপত্নী আমাক করিল আদেশন॥
কাষ্ঠ আন জায়্য হেন বলিল বচন।
সুনিঞা তাহার বাণী সিদ্রে গেলো বন॥
হেন বেলা বাতবৃষ্টি হৈল অতিসয়।
উছে-নিছে সলিল হইল একার্ন্নয়॥
ব্যাকুল হইলো শিলাবৃষ্টি চোটে অতি।
হেন বেলা অস্তাচলে গেল দীনপতি॥
ভ্রমিয়া বেড়াই সবে পথ না পাইয়া।
সে রাত্রিত বৃক্ষতলে রহিলো বসিয়া॥

তাহার পরে—

এতদ্বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ। অন্বেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্যো ঽপশ্যদাতুরান্॥
অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থে ঽতিদুঃখিতাঃ। আত্মা বৈ প্রাণিণাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ॥
এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্। যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥
তুষ্টো ঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ। ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ॥
ইত্থং বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি। গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে॥

—১০।৮০।৩৯-৪৩

ইহার অনুসরণে পীতাম্বর লিখিয়াছেন—

প্রভাত হইল গুরু শয্যায় উঠিয়া।
দুরহস্তে জত সিশুগনক দেখিয়া॥
উচ্চস্বরে ডাক দিল বর দয়া মনে।
প্রাণত অধিক মোর আস্য সিশুগনে॥
আস্য সিশুগণ বড় দুঃখ পাল্য বনে।
বাতবৃষ্টি ভোখে মুখ সুখাল্য জনে জনে॥
মোর আসির্ব্বাদে বিদ্যা জানহ অচিরে।
এহি বলি গুরু আমসাক নিজ ঘরে॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পীতাম্বর মূলকে অবলম্বন করিয়া মোটামুটি ভাবে তাহাকে একটা বাংলা রূপ দিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ সুদামা বিপ্রের পরবর্তী অংশটি (মূল ১০।৮০।৪৪-৪৫, ১০।৮১।১-২০) পীতাম্বর এইভাবে রচনা করিয়াছেন—

এহি বলি মৌন হইল জগত ঈশ্বর।
প্রত্যুর্ত্তর দিলন্ত দরিদ্র দামোদর ॥
সত্যদেহধরি তুমি ত্রিভুবন-পতি।
তোমার সহিতে জার হইল বসতি ॥
তাহার অসাধ্য আর আছে কোন কাজ।
সদায়ে সে জন প্রভু পূর্ণ যতুরাজ ॥
বেদ কয় তোমাক সরির নারায়ন।
তুমি বেদ পড়িবাক করিল জতন ॥
গুরুর ঘরত কৈলা নিজস্ব আপনে।
এ বড় আশ্চর্য্য প্রভু দেখিলো নয়ানে ॥

অনন্তরে নারায়ন গুনে মনে মনে।
ধনলোভ ব্রাহ্মণের কিছু নাহি মনে ॥
আসিয়াছে জত পুত্রভার্য্যায় বচনে।
ভিক্ষার তণ্ডুল লৈয়া মোর দরশনে ॥
আছেত টুপুলি খানি বামকাখ মাঝে।
জতনে করয় আর নাদে মোক লাজে ॥
আজি সে তণ্ডুলগুরা খাইব ইহার।
নরের দুর্ল্লভ দিব সম্পদ অপার ॥
বিশ্বসিংহ স্থত ছে সমরসিংহ নাম :
পিতাম্বরে কহে ডাকি বোলা রামরাম ॥

দীর্ঘ ছন্দ ॥

এহি বলি নারায়ন স্মিত মুখে ততিক্ষন
বিপ্রক বলিলহে বাণী।
আস্য মোক দেখিবাক কি আনিছ দেহ তাক
আপনে ভুঞ্জেহো শুর্দ্ধো জাণী ॥
অল্পবস্তু সুজতনে ভোজন করো আপনে
সতোষ হইয়া সর্ব্বক্ষন।
প্রচুর সুবস্তু অতি দিলে মোক হিনভক্তি
তাত মোক তুষ্ট নহি মন ॥
হরির শুনি উর্ত্তর সে দরিদ্র দামোদর
গুনে হেট করিয়া মস্তক।
তণ্ডুলের গুণ্ডাগুটি সবে আণে চারিমুঠী
কোন লাজে দিব গবিন্দক ॥
মলিন ভগ্ন বসনে টুপুলী বান্ধি জতনে
গুড়া গুটি আনিল কি কাজে।
করে মনে আলোচন লক্ষ্মী আছে বিত্যমান
ইহাক না দিবো মুঞি লাজে ॥
বিপ্রের বুঝিয়া মন পাছে দেব নারায়ন
কাড়ি নিল কাখের টুপুলি।
সন্দেষ আনি আপনে লাজে না দ কি কারনে
এহি বলি খসাল্য টুপুলি ॥
সে তণ্ডুল গুণ্ডা গুটী খালা হরি একমুঠি
প্রয়োজ সাধিলন্ত মানে।

ইললোকে ভব ভোগ পাছে পাবা বিষ্ণুলোক
সুখে কার্য্য সাধিল জতনে ॥
আর মুঠি চাহ খাত্যে কোন ফল তাত হত্যে
আর প্রভু দিবে ব্রাহ্মনক।
লক্ষ্মীদেবি বলে শুন তুষ্ট জাত নারায়ন
জগতের পূজ্য সেহি লোক ॥
পায়ে গোবিন্দের স্থানে শয়ন ভোজন পানে
সন্তোষ হইল রজনিত।
হরি বড় সম্মানে স্বর্গত আছোহো জেন
হেন হৈল ব্রাহ্মনে(র) চিত্ত ॥
পোহাল্য জবে রজনি বিপ্রে মাগিল মেলাণী
জাইবার আপনার ঘর।
আগবারি থেল হরি অনেক গৌরব করি
চলে বিপ্র আপন মন্দির ॥
ব্রাহ্মণ গুনিতে জায় কি ব্রহ্মন্য যতুরায়
কি মহিমা কহিব তাহার।
দয়াসিল লক্ষ্মীপতি আমি দ্বিজ পাপমতি
মলিন দরিদ্র ঘৃনাকার ॥
লক্ষ্মীনিবাষ-হৃদয় আলিঙ্গিল দয়াময়
প্রেমজল বহিয়া নয়ানে।
হৈয়া ত্রিভুবন পতি মোক পুজিলন্ত অতি
দেব হেন মানি নিজ মনে ॥

জার চরনের নিরে তিনো লোকে গান করে
মস্তকে ধরিল মহেশ্বরে।
হেন দেব নারায়ন পুজিল মোর চরন
চরণের জন নিল সিরে ॥
লক্ষ্মীক তুলি আসনে মোক বসাল্য আপনে
চরন চাপালি নিজ করে।
জার দেবী রুক্মীনি তিনো লোকের জননী
বিছিলেক মোহক চামরে ॥
সে জে শ্রী নিকেতন না দিল মোহক ধন
দয়াত মোহক হেন মনে।
দরিদ্রে পাইলে ধন গর্ব্ব বাড়িবেক মন
না করিবে মোহক স্বরনে ॥ ইত্যাদি ॥
—১২৯-১৩০ ক পৃষ্ঠা

এখানকার শেষ পদটির সহিত মূলের

অধনো হয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ।—১০।৮১।২০

এই শ্লোকটির তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে, পীতাম্বর পণ্ডিতগণের জন্য ভাগবত রচনা করেন নাই,—অশিক্ষিত জনসাধারণই শ্রোতারূপে তাঁহার মানসপটে অবস্থান করিতেছিল।

কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহোৎসবের ভাগবতকার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—

তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপুর্য্যাং গৃহে গৃহে। অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ ॥
নরা নার্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ। পারিবর্হমুপাজহ্রু র্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥
সা বৃষ্ণিপুর্য্যু ত্তভিতেন্দ্রকেতুভি—বিচিত্র মাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ।
বভৌ প্রতিদ্বার্য্যুপক্লৃপ্তমঙ্গলৈ-রাপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ ॥
সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্। গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপুগোপশোভিতা ॥
কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয় বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ। মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥—১০।৫৪।৫৪-৫৮

পীতাম্বর এই বর্ণনাকে সংক্ষেপে নিজের মতন করিয়া রূপ দিয়াছেন—

পাছে দেব চক্রপানি বিবাহ করি রুক্মিনি
ইষ্টরাজাগণ হেন স্থনে।
কৃষ্ণের বিবাহ দেখি হয়া সবে মনে সুখি
দ্বারকাক আসিল আপনে ॥
বিদর্ভ কুরু সঞ্জয় কুন্তিভোজ কেকয়
এবমাদি কত নরপতি।
জার গজমদজলে কৰ্দ্দম হৈল অচলে
কৃষ্ণর পুরি দারবতি ॥
পতাকা তোরণধ্বজে সকল নগর সাজে
ঘটবাতি রুপিল কদলি।
পিন্দি বসন-ভুশন নগরের নারিগণ
গায় গিত শতেপাছে মিলি ॥
জেন বিধিবিহিত কুলাচার উচিত
বিবাহ করিল শ্রীহরি।
কৃষ্ণক জৌতক দিয়া সবে অনুমতি লয়া
রাজাগন গৈল নিজপুরি ॥ —৮৮ক পৃঃ

ইহার পরে প্রদ্যুম্নের জন্ম ও হরণও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এসব অংশেও কবি মূলের অনুবাদ না করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। মূলের ১০।৫৫।১-৩ শ্লোকের স্থানে পীতাম্বরের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাইতেছি—

রুক্মিনিক বিবাহ করি বঞ্চিয়া দ্বারিকাপুরি
জবে নারায়ন কহিলন্ত।
পুর্ব্বত অধিক হৈতে দশগুন নিতে নিত্যে
সুরগন শুরেলা (?) মিলন্ত ॥

অদেব পূর্ব্বকালে　　হরনয়ান-অনলে
　　ভস্মোময় করিল পুরিখা।
পাছে দেবগন মর্ত্য　　রুক্মিণীর উচিত
　　জল লভিল শিত গৈআ॥
বিষ্ণুময় অবতার　　যেন্ন কৃষ্ণের আকার
　　রূপে গুনে নাহিকে অন্তর।

নয়ন দুই সুন্দর　　জেন প্রফুল্ল কমল
　　অভিনব জলধ সুন্দর॥
··· দিনের ভিতরে　　আসিয়া সত্বর অম্বরে
　　প্রদ্যুম্নক লআ গেল বলে।
এহি মোর প্রান বৈরি　　কন্দারিক (?) চুরি করি
　　ফেলাইল সাগরের জলে॥ —৮৮ খ পৃষ্ঠা

ভাগবতের দশমস্কন্ধের পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে ২২-৪৬ শ্লোকে বর্ণিত দৈবকীকে মৃত ষট্পুত্র ফিরাইয়া আনিয়া দেখাইবার উপাখ্যানটি পীতাম্বর নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

সেহি সময়ত দেবী দৈবকী আসিয়া।
রামগোবিন্দক স্তুতি বিস্তর করিয়া॥
মরা ছয় পুত্রক স্মরি ততিক্ষনে।
কান্দি কান্দি গোবিন্দক বোলে দুখ মনে॥
একি নারায়ন　　কহ দেব
　　তোমার চরনে।
সে কংশ দুর্য্যনে মোর　　ছএ পুত্র মারিলহে
　　আনি দেহ দেখোহো নয়ানে॥
তুমি পিতৃবন্ধুগুরু　　ভকতর কল্পতরু
　　পাদপদ্ম জে সেবে তোমার।
পণ্ডিত সকলে কহে　　নিগমেয়ো বাখানে
　　মনোরথ সিদ্ধি হয় তার॥
অবন্তি জে নগরে　　ব্রাহ্মণ জে সান্দিপনি
　　তার পুত্র হরিল সাগরে।
জমের পুরিত হৈতে　　গুরুপুত্র আনি দিল
　　জানিআছে সকল সংসারে॥
তাহার চরণে স্তুতি　　স্থিতি সংঘরণ হে
　　বিধাতাক শ্রজিলা জে জনে।
কোন চিত্র সেহি মোর　　পুত্র দি(ল) আনি
　　মুক্তি পাই জার দরসনে॥
মাএর বচন সুনি　　বলভদ্র নারায়নে
　　দুই দেব যোগমায়া বলে।
তল পাতাল দুই　　প্রবেশ হইল জাই
　　ডুব দিয়া সাগরের জলে॥

কুমার সমর সিংহ　　হরিপাদপদ্ম ভৃঙ্গ
　　নারায়নে ভকতি সুজানে।
আজ্ঞা পরমানে তার　　কৃষ্ণকেলি সুপয়ার
　　শিশুমতি পিতাম্বরে ভনে॥
দুর হন্তে দেখিলন্ত বলি দৈত্যেশ্বর।
আস্তে মোর ঘরক মাধব গদাধর॥
সবান্ধবে আগবারি ভূমিত পরিয়া।
বারে বারে প্রনমিল ভক্তি বড় পায়া॥
ঘরক আনিয়া দিল থুবই আসন।
ভোগবতি নিরে পদ কৈল প্রক্ষালন॥
সবান্ধবে শিরত ধরিল সোই জল।
জে সলিলে তৃভুবন করে নিরমল॥
বহু পূজা কৃষ্ণক করিল দৈত্যেশ্বর।
চরণে পরিয়া স্তুতি করিল বিস্তর॥
বলি বলে নারায়ণ বর জোগিজনে।
ক্ষেনেক ধরিতে জাক নারি পারে মনে॥
হেন বিভু প্রভু আজি দেখিলো নয়ানে।
আজি সে এড়িল মোক এভববন্ধনে॥
ধনজন সম্পদ পাসে বন্দি হয়া।
গৃহ অন্ধকূপে হের আছোহো পরিয়া॥
উদ্ধার করহ আজি মোক নারায়ন।
ভকতবৎসল দেব দেব সনাতন॥
বলির বচন হেন সুনিঞা শ্রীহরি।
বোলে সুন জে কার্য্যে আসিছো তুয়পুরি॥

মরিচির ভার্য্যা উর্ন্না নামে মহাসতি।
ছয় পুত্র তাঁর গর্ব্ভে হৈল উৎপতি ॥
দেবতাগণক হিংসা করে রাত্রিদিনে।
সব দেবগনে সাপ দিল ততক্ষনে ॥
তথাত মরিয়া পাছে হরি দরসনে।
পাপে মুক্ত হয়া স্বর্দ্ধ জাবে ছয়জনে ॥
ঋষিপুত্রগন সে দেবের সাপ পায়া।
হিরন্যকসিপুর তনয় হৈল জায়া ॥
পাছে উপজিল আসি দৈবকী উদরে।
কংসে মারি সবাকে পাঠাইল যমঘরে ॥
সে পুত্র দেখিতে দেবি মনে বাঞ্চা করে।
তা সম্বাক নিতে আসিয়াছি তোর পুরে ॥
কৃষ্ণের আদেশ হেন দৈত্যপতি সুনি।
দৈবকীর ছয়পুত্র তেনে দিল আনি ॥
তা সম্বাক লয়া তবে রামদামোদর।
পাতালের হস্তে আল্য দ্বারকানগর ॥
দৈবকীর পুত্র ছয় দিলন্ত তখনে।
ছয়পুত্র দৈবকী কোলত নিল তেনে ॥
করে ধরি পুরশিয়া করিল চুম্বন।
পুত্র…তাহাক পিয়াইল স্তন
নয়ানের পানি ছয় পুত্রক সিঞ্চিয়া।
কতক্ষণে গলে ধরি আছিল কান্দিয়া ॥
তাত অনন্তরে দৈবকীর পুত্রগন ॥
… … হইল পাপত মোচন ॥
দিব্যরূপ ধরি গেল বিষ্ণুর ভুবনে।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা জেবা জনে স্থনে ॥
তার ভক্তি হয় নারায়নের চরনে।
… … ভুঞ্জি জায় বিষ্ণুর ভুবনে ॥

ঝড়। কাঠখোদাই শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
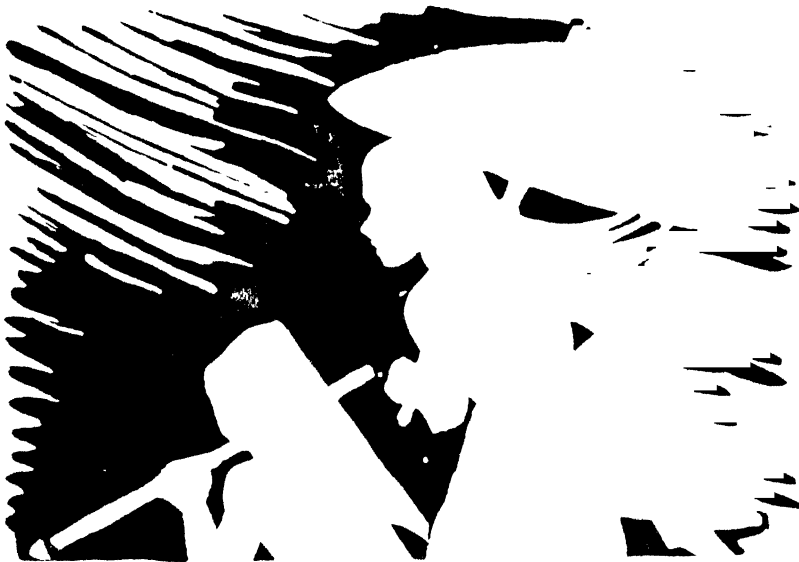
"কবির স্মৃতিরক্ষা"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[গত সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের পরলোকযাত্রার পর, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা কি উপায়ে হইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে চট্টগ্রাম সম্মিলনীর সম্পাদককে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লিখিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা মুদ্রিত হইল। ১৩১৫ সালের চৈত্র সংখ্যা 'মানসী' হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিঠিখানি আমাদের সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত যাঁহারা সবিস্তারে জানিতে চাহেন তাঁহারা তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন—"বারোয়ারি-মঙ্গল" (১৩০৮), ভারতবর্ষ (রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪) বা "চারিত্রপূজা", চারিত্রপূজা; "স্মৃতিরক্ষা", ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩১২; "স্মৃতিসভা" প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৬।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ "কবির স্মৃতিরক্ষা" সম্বন্ধে যেরূপ প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষাকল্পে বহু স্থানে সেইরূপ আয়োজন হইতেছে।—"তাঁহার সমস্ত কাব্যের সমস্ত সংস্করণ, তাঁহার নানা বয়সের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার হাতের লেখা চিঠিপত্র ও কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার বংশাবলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ" যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতিও কলিকাতায় ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ভবনে অনুরূপ আয়োজন করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবির জীবিতকালেই একটি রবীন্দ্র-সংগ্রহ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা]

বোলপুর

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা আমাকে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কবির স্মৃতি-রক্ষা কেমন করিয়া করিতে হইবে? সেজন্য ত কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। কৃত্তিবাসের স্মৃতি নিজেকেই নিজে এত কাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বড় কবি তাঁহারা নিজের কাব্যেই নিজের তাজমহল তৈরি করিয়া যান।

বর্ত্তমান কালে ছবি বা পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্মান প্রকাশের চেষ্টা হইয়া থাকে। সাহিত্য-পরিষদ্ যদি সেরূপ কোনো প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহাতে দোষ দেখি না।

কিন্তু আমাদের দেশে মেলাই মৃত মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রকাশের উপায়রূপে প্রচলিত। জয়দেবের বিখ্যাত মেলা তাহার প্রমাণ।

শুনিয়াছি সিন্ধুদেশের কোনো লোক-বিখ্যাত কবির মৃত্যুদিনের মেলায় সেখানকার লোকেরা সমস্ত রাত্রি সেই কবির কাব্য গান করিয়া থাকে। কত কাল হইতে বর্ষে বর্ষে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, এজন্য কোনো সভাসমিতি বা চাঁদার প্রয়োজন হয় নাই। কবির নিজেরই কীর্ত্তির সাহায্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ, ইহার মত সুন্দর পদ্ধতি আর ত কিছু জানি না।

কবির জন্ম বা মৃত্যুর দিনে তাঁহার জন্মস্থানে বা সাহিত্য-পরিষদে বা নানা স্থানে তাঁহার কাব্য পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা প্রভৃতি প্রচলিত হইলে উপযুক্তরূপে তাঁহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করা হয়।

আমার মতে সাহিত্য-পরিষদে আমাদের দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-বীরের জন্মদিনে বা মৃত্যুদিনে

তাঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনার দ্বারা উৎসব করা উচিত। অবশ্য, ছোট বড় সকলকেই একরূপ সমাদর করিলে তাহার গৌরব থাকিবে না।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান মৃত কবির জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। সেইখানে তাঁহার সমস্ত কাব্যের সমস্ত সংস্করণ, তাঁহার নানা বয়সের প্রতিমূর্তি, তাঁহার হাতের লেখা চিঠিপত্র ও কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার বংশাবলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতে পারিবে।

যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আমার এই প্রস্তাব সাহিত্য-পরিষৎকে জ্ঞাপন করিতে পারেন। ইতি ৩রা চৈত্র, ১৩১৫।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা গীতি-নাট্যের অনেক সংস্কার করেন; পুরাতন মুদ্রিত গানের কিছু কিছু সংশোধন করেন এবং নূতন কয়েকটি গান যোজনাও করেন। তারই দুটি গানের স্বরলিপি নিচে মুদ্রিত হল।

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি :** শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

গান ॥ "যাক্ ছিঁড়ে যাক্ ছিঁড়ে যাক।"

II সা -া সা সা | রা -া রা রা I রা -পা -মা -জ্ঞা | মা -া রা রা I সা -া -া -া | -া* -া -া া॥ I
যা কৃ ছিঁ ড়ে যা ক্ ছিঁ ড়ে যা ০ ০ ক্ মি ০ থ্যা র জা ০ ০ ল্ ০ ০ ০

I মা -া পা পা | পা পা পা -মা I পা ধা ণা ণধা | পা -া -া -া I র্সা -া র্সা র্সা | সা -া -া -া II
দুঃ ০ খে র প্র সা দে ০ এ ল আ ০ জি ০ ০ ০ মু কৃ তি র কা ০ ০ ল্

II না -া না -া | না -া নপা না I না -র্সা র্সা -না | র্সা -া -া -া I র্সা -া র্রা র্রা | র্রা -া র্রর্সা র্রা I
এ ই ভা ০ লো ০ ও ০ গো এ ই ভা ০ লো ০ ০ ০ বি ০ চ্ছে দ ব ০ হ্নি ০ শি

I র্মাজ্ঞা -া র্জ্ঞা -র্মা | র্রা -া -র্সা -া I র্রা -া র্রা র্রর্সা | র্সর্রাঃ -র্সঃ র্সা র্সণা I
খা ০ জ্বা ০ লো ০ ০ ০ নি ষ্ ঠু র ০ স ০ ০ ত্য ক ০

[এই গানটি ডবলে গাইলে * চিহ্নিত তালটি টানতে হবে না।]

I র্সা:-ণ: ণা ধা | পা -া -া -া I পা পর্সা র্সা -া | ণা ধা পা -া I
রু০ ক্ ব র দা ০ ০ ন্ ঘু চে০ যা ক্ ছ ল না র্

I পা -মা -ণা পধপা | মা -জ্ঞা -া -া II
অ ০ ন্ ত০০ রা ০ ০ ল্

II { মা -পা পা পা | পা -া গা মা I মা -পা পা পা | পা -মা পা -া I
যা ও প্রি য় যা ও তু মি যা ও জ য় র ০ থে ০

[মপা-ধপা]
I পা -ণা ণা -া | ধা ধা পা -া I মা-পা মা -জ্ঞা | -া -া -া -া } I
বা ০ ধা ০ দি ব না ০ প ০ থে ০ ০ ০ ০ ০

I না না -া না | না -া না -া I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I না র্সা র্রা র্রা | র্রা -া র্রর্সা র্রর্সা I
বি দা য়্ নে বা র্ আ ০ গে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম ন ত ব স্ব প্ ন০ হ০

র্মর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা র্মা | র্রা -া র্সা -া I র্সর্রা -া র্রা র্রর্সা | র্সর্রা: -র্স: র্সর্রা: -র্স: I
তে০ ০ যে ন জা ০ গে ০ নি০ র্ ম ল০ হো ০ ক্ হো ০ ক্

র্সা ণ ধা -ণা | পা -া -া -া I র্সা -া র্সা র্সা | ণা -া ধা পা I
স ব জ ন্ জা ০ ০ ল্ যা ক্ ছিঁ ড়ে যা ক্ ছিঁ ড়ে

I মা - পা পধা ধপা | মা - জ্ঞা -া -া IIII
মি ০ থ্যা০ র জা ০ ০ ল্

গান ॥ "ভুল কোরো না গো ভুল কোরো না।"

পা -র্সা র্সণা র্সণা | র্সণা: -ধ: ধা -া I ধা -ণা পা পা | মা -া -া -া I
ভু ল্ কো০ রো০ না ০ গো ০ ভু ল্ কো রো না ০ ০ ০

মা -পা পমা পমা | পমা -জ্ঞা জ্ঞা মা I পণা -র্সা র্সা -ণা | -ধা -া -া -া I
ভু ল্ কো০ রো০ না ০ ভা ল বা০ ০ সা ০ ০ ০ ০ য়্

ধা ধা ধা -া | ধা -া -া -ণা I ণা ণা ণা -র্সা | র্সা -া -া -া I না র্সা র্রা র্রা | র্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা I
ভু লা য়ো ০ না ০ ০ ০ ভু লা য়ো ০ না ০ ০ ০ ভু লা য়ো না নি ষ ফ ল

I না -র্সা ণা -ধা | -া -া -া -া I ণর্সা -া -ণা -ধা | ধণা -া -পা -মা II
আ ॰ শা ॰ ॰ ॰ ॰ য়্ না॰ ॰ ॰ ॰ না॰ ॰ ॰ ॰

II ধা -া ধা ধা | ধা -া ধা না I না -া র্সা র্রা | না -া র্সা -া I র্না -র্সা র্রা র্সা | না -া র্সা -া I
বি ॰ চ্ছে দ দুঃ ॰ খ নি য়ে ॰ আ মি থা ॰ কি ॰ দে য়্ না সে ফাঁ ॰ কি ॰

*
I র্সা র্মা র্গা র্মা | র্রা র্জ্ঞা র্সা র্রা I না -া র্সা -া | -া -া -া -া I
প রি চি ত আ মি তা রি ভা ॰ ষা ॰ ॰ ॰ ॰ য়্

I ণর্সা -া -ণা -ধা | ধণা -া -পা-মা II
না॰ ॰ ॰ ॰ না॰ ॰ ॰ ॰

II সা মা মা মা | মা -া মা মা I মা মগপা পা পা | পা -া -া -া I
দ য়া র ছ লে ॰ তু মি হো যো॰॰ না নি দ ॰ ॰ য়্

I মা ধা ধা ধা | ধা -া ধা না I না র্সা র্রা না | র্সা -া -া -া I ধা ধা ধা -না | না -া র্সা না I
হৃ দ য দি তে ॰ চে য়ে ভে ঙো না হৃ দ ॰ ॰ য়্ রে খো না ॰ লু ব্ ধ ক'

*
I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I না র্সা র্বা র্রা | র্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা I
রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ম র ণে র বাঁ ॰ শি তে

I না -র্সা র্রা র্সা | র্সণা -া -ধা -া I ধা ধা ধা ণা | র্সা র্সর্মা র্মা -র্জ্ঞা I
মু গ্ ধ ক' রে॰ ॰ ॰ ॰ টে নে নি য়ে যে য়ো॰ না ॰

I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্মা র্রা | র্সা -া -া -া I ণর্সা -া -ণা -ধা | ধণা -া -পা -মা IIII
স র্ ব॰ না শা ॰ ॰ য়্ না॰ ॰ ॰ ॰ না॰ ॰ ॰ ॰

[এই গানটি ডবলে গাইলে * চিহ্নিত তিনটি তাল টানতে হবে না।]